চিরন্তন ভারত

নবম শ্রেণীর জন্য

নারায়ণ চন্দ্র চন্দ

ও

লাড়লীমোহন রায়চৌধুরী

এ. মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book on History for Class IX for all schools in West Bengal and Tripura.
[Vide T. B. No. SYLL/H/87/19 Dated 13/11/87]

চিরন্তন ভারত

[নবম শ্রেণীর জন্য]

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চন্দ
এম. এ., বি. টি. , ডাবলু-বি-ই-এস.
[রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক]
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক : হেয়ার স্কুল (কলি), বালিগঞ্জ গভঃ স্কুল,
বারাসত গভঃ স্কুল, জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল, টাকী গভঃ স্কুল,
নিউ-আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল

ডঃ লাডলীমোহন রায়চৌধুরী
এম. এ., এল-এল-বি , পি-এইচ্-ডি , ডাবলু-বি-ই-এস.
অধ্যাপক, মৌলানা আজাদ কলেজ, কলিকাতা

এ মুখার্জী
এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

প্রকাশক :
রঞ্জন সেনগুপ্ত
এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

দিল্লী অফিস :
৫৩৩ শেখ সারাই ফেস্ ১
নিউ দিল্লী-১১০০১৭

প্রথম সংস্করণ :
ডিসেম্বর, ১৯৮৭

প্রচ্ছদ শিল্পী : শৈলেন নন্দী

মূল্য : পঁচিশ টাকা

দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬
প্রিন্টিং সিণ্ডিকেট, ৮ মদন ঘোষ লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬
প্রিন্ট-ও-গ্রাফ, ৯সি ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

চিরন্তন ভারত
[প্রাচীন যুগ]

১

ভূগোল ও ইতিহাস

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতির খতিয়ান তৈরী ইতিহাসের কাজ হলেও ইতিহাস পাঠের স্থচনাতেই ভূগোলের কথা আসে। কারণ, ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাস নিবিড়ভাবে যুক্ত। বস্তুতঃ ভৌগোলিক পরিবেশই ইতিহাসের পটভূমিকা। ইতিহাস হ'ল মানুষের কাহিনী, তার জীবনযাত্রা, সমাজ-সভ্যতা সৃষ্টি ও নানা সমস্যা এবং তার সমাধানের কথা। আমরা জানি, পৃথিবীর সব অঞ্চলের মানুষ ও তার জীবনযাত্রা একরকম নয়। ভূ-পৃষ্ঠে দেশের অবস্থান, পাহাড়-পর্বত ও ভূমির প্রকৃতি দ্বারা জলবায়ু নির্ধারিত হয়। ভৌগোলিক প্রকৃতি অবস্থাভেদে মানুষের জীবন ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্য নির্ধারণ করে অধিবাসীদের খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসগৃহ কেমন হবে। জীবিকা সংগ্রহের ব্যাপারটি সহজ কি আয়াসসাধ্য তার ওপর নির্ভর করে অধিবাসীদের জাতীয় চরিত্র, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও জাতীয় সভ্যতার স্বরূপ। বিদ্যাবুদ্ধিবলে মানুষ প্রকৃতির ওপর কিছুটা আধিপত্য বিস্তার করলেও ভৌগোলিক প্রভাব থেকে সে মুক্ত হতে পারে না; মাটির সঙ্গে তার জীবন নিবিড়ভাবে জড়িত। সুতরাং মানুষের সঙ্গে মানুষের ইতিহাসও পরোক্ষভাবে প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত। একজন পণ্ডিতব্যক্তি সত্যই বলেছেন, ভূগোল ও কালক্রম ইতিহাসের সূর্য এবং চন্দ্র, তার ডান চক্ষু ও বাম চক্ষু* (geography and chronology are the sun and the moon of all history)। বলা যায়, ভূগোল ইতিহাসের নিয়ন্ত্রক, কালক্রম ইতিহাসের গতিপথে দূরত্বজ্ঞাপক চিহ্ন (milestone) স্বরূপ।

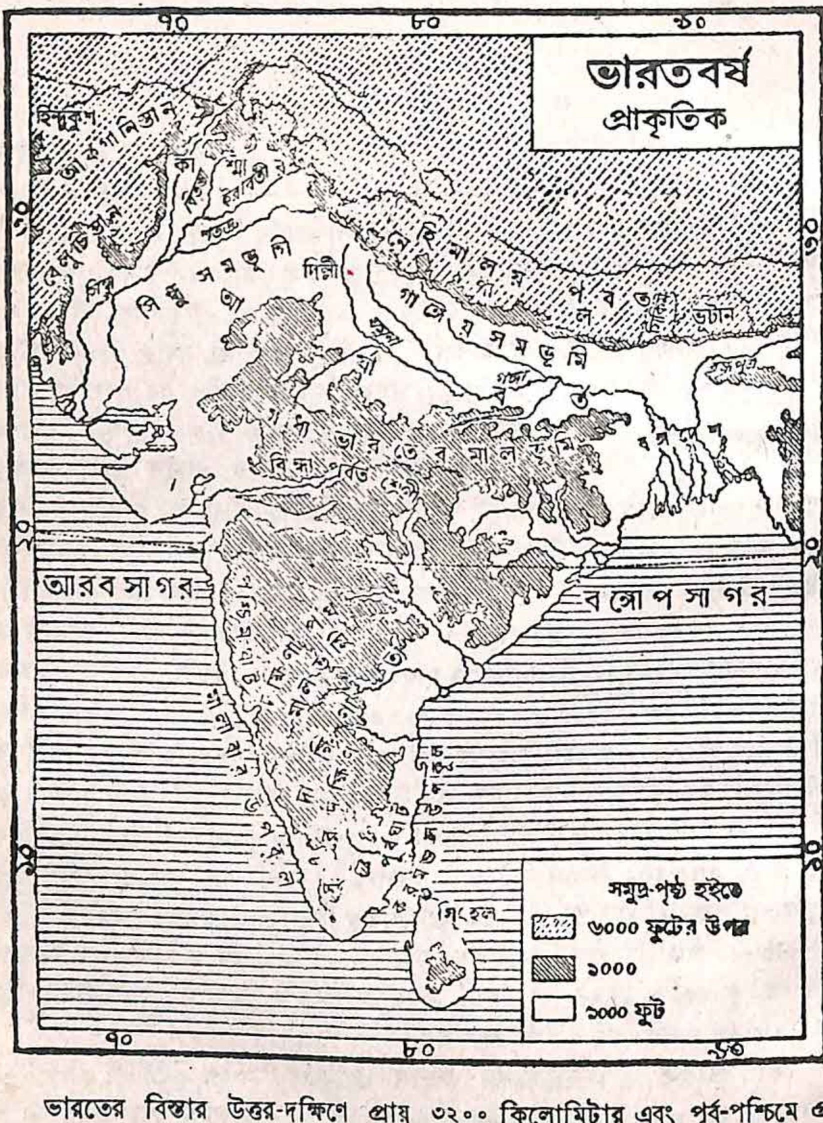
ইতিহাস ভূগোল-নির্ভর

ভারতবর্ষ আমাদের দেশ ; পৃথিবীর কোন্ অংশে কতখানি স্থান জুড়ে এর অবস্থান এবং এর ভূ-প্রকৃতি কেমন তা জানা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে ভারত-ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

(ক) **ভারত উপমহাদেশের প্রধান প্রাকৃতিক গঠন** (Chief physical features of the Indian subcontinent): এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত ভারতবর্ষ ভারতমহাসাগরের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে এগিয়ে গেছে। পৃথিবীর

* **Richard Hakluyt, quoted in V. Smith's Oxford Hist. of India, p. 1**

উত্তর গোলার্ধে ৮'৪° ডিগ্রি থেকে ৩৭'-৬° ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে ভারতের অবস্থান। দেশের প্রায় মাঝ দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা গেছে। তার ফলে এখানে দক্ষিণ অংশে উষ্ণ মণ্ডলের উত্তাপ, মধ্য অংশ নাতিশীতোষ্ণ এবং উত্তরে হিমালয় অংশে জলবায়ু শীতল।



ভারতের বিস্তার উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৩২০০ কিলোমিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার ; আয়তন ৩২,৮০,৪৮৩ বর্গ কিলোমিটার। এর স্থল সীমা ১৫,২০০ কিলোমিটার এবং সমুদ্রতটরেখা ৬,০৮৩ কি. মি. দীর্ঘ। ভারতের আয়তন দেখে মনে

হবে এটি যেন একটি ছোটখাট মহাদেশ।

শুধু আয়তনেই নয়, ভৌগোলিক বৈচিত্র্যেও ভারত মহাদেশতুল্য। এখানে আছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ-শোভিত হিমালয় পর্বতমালা, আছে বালুকাময় মরুভূমি, বিস্তীর্ণ শ্যামল সমভূমি যার ভিতর দিয়ে তুষারগলা জলের ধারা প্রবাহিত, আছে মালভূমি অঞ্চলে অরণ্যমেখলা অনুচ্চ শৈল, কোথাও আছে প্রচুর বারিবর্ষণে-জাত স্বাভাবিক নিবিড় অরণ্য, আর তা নানা জীবজন্তুর নিরাপদ বাসভূমি। বলা যায়, নদী, গিরিবন-শোভিত, সাগর-পাহাড় বেষ্টিত ভারতবর্ষ যেন পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র সংস্করণ (an epitome of the world)।

ভারতবর্ষ পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র সংস্করণ

প্রাকৃতিক বিভাগ : ভূ-প্রকৃতি অনুসারে ভারতবর্ষকে ৫টি প্রাকৃতিক বিভাগে বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঞ্চলে ভাগ করা যায়, যেমন, (১) হিমালয় পর্বতমালা, (২) সিন্ধু-গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের সমভূমি, (৩) মধ্যভারতের মালভূমি, (৪) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও (৫) দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলের সমভূমি।

পাঁচটি প্রাকৃতিক বিভাগ

প্রাকৃতিক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য : (১) প্রায় ২৪০০ কি. মি. দীর্ঘ এবং ২৪০ থেকে ৩২০ কি মি. চওড়া হিমালয় কয়েকটি সমান্তরাল পর্বত-প্রাচীরের মত ভারতের সমগ্র সীমানা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে ১৫টি শৃঙ্গ আছে যার উচ্চতা ৮ হাজার মিটারেরও বেশি। (i) হিমালয় ভারতের উত্তর সীমান্ত যেমন দুর্ভেদ্য করেছে তেমনি উত্তরের তুষারশীতল বায়ু প্রবাহ রোধ করে দেশকে জলবায়ুর তীব্রতা থেকে রক্ষা করেছে। (ii) হিমালয়ের উপত্যকাগুলি নিসর্গশোভায় অনুপম। (iii) হিমালয়ের নিম্ন অঞ্চল বনসম্পদে সমৃদ্ধ, স্বাস্থ্যনিবাস ও পুণ্যতীর্থরূপে সমাদৃত। (iv) হিমালয়ের তুষারক্ষেত্রে উৎপন্ন বড় বড় নদী বারোমাস স্বপেয় জলের ধারা বহন করে ভারতবর্ষকে সুজলা সুফলা করেছে। হিমালয় না থাকলে ভারতবর্ষ মধ্য এশিয়ার মত শীতল মরুভূমিতে পরিণত হত। এদিক থেকে বিচার করলে ভারতকে বলা যায় হিমালয়ের দান।

হিমালয় ভারতের সীমান্ত প্রাচীর, নদনদীর উৎস, দেশের পরিপালক

সমভূমি অঞ্চল : (i) হিমালয় পর্বতের দক্ষিণে প্রায় ২৪০০ কি. মি. দীর্ঘ এবং ২৪০ থেকে ৩২০ কি. মি. বিস্তৃত সমভূমি অঞ্চলের ভিতর দিয়ে সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রসহ বহু উপনদী, শাখানদী প্রবাহিত। নদীবাহিত পলিমাটিতে এখানকার ভূমি উর্বর। (ii) নদীপথে পাহাড় পর্বতের বাধা না থাকায় জলপথে যোগাযোগ ও ব্যবসাবাণিজ্য সহজ হয়েছে ; (iii) উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্য ও অনুকূল জলবায়ু অতি প্রাচীনকাল থেকে নদীতীরে শহর বন্দর ও সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে উঠতে সহায়তা করেছে।

ভূমি উর্বর, জলপথে যোগাযোগ ও বাণিজ্যের সুবিধা ; সভ্যতার লালন-ক্ষেত্র

মালভুমি অঞ্চল : (i) উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চলের দক্ষিণে মালভূমি অঞ্চল পশ্চিমে থর মরুভূমি থেকে পূর্বে ছোটনাগপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণে এই ভূমি ক্রমশ উঁচু হয়ে বিন্ধ্যপর্বতে গিয়ে মিশেছে। (ii) এখানে বড় নদী নেই, বৃষ্টিপাত স্বল্প, ভূমি পাষাণময় ও অরণ্যসংকুল। (i.i) এই অংশে এমন অনেক দুর্গম অঞ্চল আছে যেগুলি ভারতের আদিবাসীদের আশ্রয়স্থল, (iv) মধ্যভারতের মালভূমি অনুর্বর কিন্তু খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। বিন্ধ্যপর্বত উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে প্রাচীর স্বরূপ।

ভূমি অনুর্বর কিন্তু খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ;

দক্ষিণ ভারতের মালভুমি : (i) বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে ত্রিভুজাকৃতি দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। এর পশ্চিম প্রান্ত বরাবর পশ্চিমঘাট পর্বতমালার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ উঁচু এবং ক্রমে ঢালু হয়ে পূর্বদিকে বিস্তৃত। (ii) দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ নদী বরফ-গলা জলে নয়, বৃষ্টির জলে পুষ্ট। কাজেই গরমকালে নদীগুলি হয় স্বল্পতোয়া এবং অনাব্য। (ii) সারাবছর জলপ্রবাহ না থাকায় নদীগুলি স্বাভাবিক জলসেচের পক্ষে উপযোগী নয়। (iii) কৃষ্ণমৃত্তিকা তূলা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

নদীগুলি শীতকালে ক্ষীণ-স্রোতা বর্ষার জলে বেগবতী; কৃষ্ণ মৃত্তিকা বিশেষ ফসলের পক্ষে উত্তম

উপকূলভাগের সমভুমি : (i) পশ্চিম উপকূলে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে সমুদ্র পর্যন্ত প্রায় ৪৮ কি. মি. চওড়া নিম্নসমতল ভূমি। পূর্বঘাট থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত সমভূমি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। (ii) মেঘবাহী মৌসুমীবায়ুর ফলে পশ্চিম উপকূলে বৃষ্টিপাত প্রচুর। ফালি সমভূমি উর্বর, বৃক্ষরাজি-শোভিত। (iii) মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা প্রভৃতি নদীর পলিমাটিতে পূর্ব উপকূল শস্যপ্রদ। (iv) দক্ষিণ ভারতের দুই উপকূলভাগ উর্বর, শস্যশ্যামল, ঘনবসতিপূর্ণ, বিদেশের সঙ্গে সমুদ্রপথে ব্যবসাবাণিজ্যের পক্ষেও অনুকূল। (v) পূর্ব উপকূল শীতগ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই বৃষ্টিস্নাত।

উপকূলভাগ উর্বর; সামুদ্রিক বাণিজ্য ও নৌ-তৎপরতার পক্ষে অনুকূল

ভারতের জনগোষ্ঠী : (Ethnic elements) : ভারতের অধিবাসী আমরা সবাই ভারতবাসী, কিন্তু দেখা যাবে সব অঞ্চলের সকল মানুষের দৈহিক গড়ন এক রকম নয়। দেহগঠনে এরূপ তারতম্যের কারণ সন্ধান করলে জানা যাবে, ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ কোন না কোন সময়ে ভারতে এসেছে। ভারতে আদিমতম মানুষের দেহাস্থি পাওয়া যায়নি কিন্তু বর্তমান কালে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের পরিচয় এখানে মেলে। তাই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বহিরাগত কতক গোষ্ঠীর মানুষ ভারতের বাসিন্দা হয়ে গেছে। এদেশে কোন্ কোন্ জাতিগোষ্ঠীর লোকের মিশ্রণ ঘটেছে, সে সম্বন্ধে নানা মত আছে। ১৯০১ সালের লোকগণনা (Census)

কালে হার্বার্ট রিজলে প্রথম নৃতত্ত্ব সম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহ শুরু করেন। পরে বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ ডঃ বিরজাশংকর গুহ অধিবাসীদের দৈহিক উচ্চতা, মাথার গড়ন, নাকের মাপ প্রভৃতি বিচার করে ভারতবাসিগণকে ৬টি প্রধান গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেন। যথা, (১) নিগ্রিটো (২) প্রোটো-অস্ট্রেল্যায়ড (৩) মঙ্গোল্যয়ড (৪) মেডিটেরানিয়ান (৫) ওয়েস্টার্ন ব্র্যাকিসেফাল ও (৬) নর্ডিক।

৬টি প্রধান মানবগোষ্ঠী : পরস্পর মিশ্রণের ফলে বিশুদ্ধ নিদর্শন দুর্লভ

তবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকের এমন মিশ্রণ ঘটেছে যে, কোনও গোষ্ঠীর বিশুদ্ধ নিদর্শন পাওয়া কঠিন। তবু এইসব জনগোষ্ঠীর মোটামুটি পরিচয় দেওয়া যায়।

১. **নিগ্রিটো** (Negrito) ঃ এই গোষ্ঠীর লোকেদের গায়ের রঙ কালো, নাক খাটো, পশমের মত চুল, গড়নে বেঁটে। দক্ষিণ ভারতে, রাজমহল ও আসামের পার্বত্য অঞ্চলে এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এদের দেখা মেলে। ভারতের আদিবাসী হলেও তারা এখন লুপ্তপ্রায়। আন্দামানের আদিবাসিন্দারা যাতে লোপ না পায় সেজন্য সরকার সচেষ্ট আছেন।



১. নিগ্রিটো



২. প্রোটো-অস্ট্রেল্যায়ড

২ **প্রোটো-অস্ট্রেল্যয়ড** (Proto-Australoid) ঃ 'প্রোটো' কথাটির মানে 'প্রায়' অর্থাৎ এই গোষ্ঠীর মানুষেরা দেখতে অনেকটা অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীর মত। গায়ের রঙ কালো, নাক মাঝারি আকারের, চুল নিগ্রিটোর মত কোঁকড়ান বা লোমের মত নয়, বেশ ঝাঁকড়া।

প্রোটো-অস্ট্রেল্যয়ডরা নেহাৎ বুনো, অসভ্য ছিল না। মানবসভ্যতায় তাদের অবদান অনেক। মাটির পাত্র তৈরী করার কৌশল তারা জানত ; ভারতবর্ষে তারাই

নাকি ধানচাষের সূত্রপাত করেছিল, আখ থেকে গুড় প্রস্তুত, পান চাষ, কার্পাস দিয়ে কাপড় বোনা ও বন্য হাতি পোষ মানানো এদেরই কৃতিত্ব।

৩. **মঙ্গোল্যয়ড** (Mongoloid): এই গোষ্ঠীর মানুষদের দাড়িহীন মুখ, চ্যাপ্টা খাটো নাক, পীতবর্ণ, চওড়া কপাল, উঁচু চোয়াল এবং দেহ নাতিদীর্ঘ।



৩. মঙ্গোল্যয়ড



৪. মেডিটেরানিয়ান

এদের দুইটি শাখা—একটি গোলমাথা বিশিষ্ট, অন্যটি লম্বামাথা। সিকিম, ভূটান প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলের লোকেরা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

৪. **মেডিটেরানিয়ান** (Mediterranean): এরা সকলেই লম্বামাথা লোক, এক গোষ্ঠীর বর্ণ কালো, অন্য গোষ্ঠীর রঙ গৌর, গড়ন অপেক্ষাকৃত লম্বা। পাঞ্জাব, সিন্ধু, রাজপুতনা, উত্তরপ্রদেশে এই গোষ্ঠীর লোক দেখা যায়।



৬. নর্ডিক

৫. **ওয়েস্টার্ন ব্র্যাকিসেফাল** (Western Brachycephal): চওড়া-মাথা গোষ্ঠীর লোক; বাঙলা, বিহার, ওড়িশা প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করে।

৬. **নর্ডিক** (Nordic): লম্বামাথা, দীর্ঘ দেহ, সুগৌর বর্ণ, চুলের রঙ সোনালি। চোখের তারা নীলাভ এই গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য। পাঞ্জাব, রাজপুতনা মহারাষ্ট্র অঞ্চলে নর্ডিক গোষ্ঠীর আর্যদের দেখা যায়। যদিও জলবায়ুর প্রভাবে এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর লোকের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে এ বৈশিষ্ট্যের অনেকটা পরিবর্তন ঘটেছে।

ভারতের মিশ্রজাতি: ভারতের মনোরম জলবায়ু উর্বর ভূমি ও ভৌগোলিক পরিবেশ মানববসতির অনুকূল। অতি প্রাচীনকাল হতে নানা জাতির লোক এসে

ভারতবর্ষকে নিজেদের মাতৃভূমিরূপে গ্রহণ করেছে। সাগরতরঙ্গের মত মানবগোষ্ঠী এসেছে কিন্তু তারা নিজেদের গোষ্ঠীগত পার্থক্য বজায় রেখে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ভারতের অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র থাকতে পারে নি। পরস্পরের সঙ্গে মিশে দৈহিক গঠন, মানসিক প্রবণতা ও আচারব্যবহারে পরস্পরকে প্রভাবিত করে তারা এক মিশ্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। 'ভারততীর্থ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই ঐতিহাসিক সত্যকে কাব্যের মহিমায় সুষমামণ্ডিত করেছেন, বলেছেন—

ভারত বহু মানবগোষ্ঠীর মিলন-ক্ষেত্র, 'জাতির যাদুঘর'

হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক হূণদল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।

বহু গোষ্ঠীর মানুষের বাসভূমি ভারতবর্ষকে ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট স্মিথ জাতির যাদুঘর (an ethnological museum) বলে বর্ণনা করেছেন। যাদুঘরে সংরক্ষিত পুরাবস্তুর মতই বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর বংশধর এখনও ভারতে বিদ্যমান, তবে পার্থক্য এই যে, যাদুঘরে কেবল প্রাণহীন বস্তুপুঞ্জের সমাবেশ, আর ভারতের জীবন্ত মানবসমাজে মিশে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী সজীব এবং সচল। যদিও অনেকেই বলতে পারবে না, তারা কোন্ গোষ্ঠীর লোক, বা তাদের মধ্যে কোন্ গোষ্ঠীর ধারা কতখানি পরিমাণ আছে, তবু তারা জানে তারা ভারতবাসী। ভারতে এখন মিশ্রগোষ্ঠীর মানুষের বাস।

(খ) **ইতিহাসের ওপর ভূগোলের প্রভাব** (Influence of Geography on History) ঃ ভারতবর্ষ বিশাল দেশ। আয়তনে এই দেশ রাশিয়া বাদে সারা ইউরোপের সমান। ভারতের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু বিচিত্র রকমের ; কোথাও পাহাড় অরণ্য সমভূমি, আবার কোথাও বা মরুভূমি। পাহাড় সমুদ্র দিয়ে ঘেরা এই দেশ অন্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন—যেন এটা নিজেই একটা স্বতন্ত্র পৃথিবী। ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক ভূমিগঠনের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে আঞ্চলিক মনোভাব গড়ে উঠেছিল। এর ভূ-প্রকৃতি অনুসারে এই দেশ ৩টি প্রধান পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল—(১) উত্তর ভারত (২) দাক্ষিণাত্য ও (৩) সুদূর দক্ষিণ।

৩টি প্রধান ভৌগোলিক অঞ্চল ঃ ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ

১. **উত্তর ভারত** ঃ উত্তর ভারতে সমভূমি অঞ্চলে ভৌগোলিক আনুকূল্যের ফলেই আর্যসভ্যতার প্রথম বিকাশ ও বিস্তার। উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথ দিয়ে আর্যদের আগমন এবং বসতি হতে শুরু ক'রে পৌরাণিক যুগের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, রাজ্যগঠন, আলেকজান্দারের ভারতে প্রবেশ, মৌর্যসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যস্থাপনের জন্য যুদ্ধবিগ্রহ, বিদেশী মুসলিম শক্তির আগমন ও রাজ্যস্থাপন—ইতিহাসের এইসব গুরুত্ব-

পূর্ণ ঘটনা সমভূমি অঞ্চলে ঘটেছে, কারণ মনোরম জলবায়ু, খাদ্যশস্যের প্রাচুর্য, সমভূমিতে সৈন্যসমাবেশ ও অশ্বারোহীবাহিনী পরিচালনার আদর্শক্ষেত্র এখানে বিদ্যমান। এই অঞ্চলে রাজ্য ভাঙাগড়া, সভ্যতার কীর্তিস্থাপন, ধ্বংস ও রক্তপাত যেমন ঘটেছে, তেমনি এখানে জ্ঞানধর্মের পুণ্যকাহিনী ধ্বনিত হয়েছে, মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধের প্রেম ও অহিংসার বাণী প্রচারিত হয়েছে।

সমভূমি অঞ্চল রাজ্য ভাঙ্গা-গড়া ও জ্ঞানধর্মের প্রচারক্ষেত্র

স্থলপথে ভারতে যে বিদেশীর অভিযান ঘটে তার লক্ষ্য ছিল সমভূমি অঞ্চল। পশ্চিম সীমান্তে গোমাল, বোলান ও খাইবার গিরিপথ ভারতের দ্বারস্বরূপ। গোমাল সৈন্য চলাচলের পক্ষে অনুপযুক্ত। বোলান পথ দিতে সিন্ধুর উপত্যকায় উপনীত হওয়া যায় কিন্তু থরমরুভূমি ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশে প্রাকৃতিক বাধা হয়ে দাঁড়ায়। খাইবার গিরিপথ ভারত-অভিযানের পক্ষে প্রশস্ত। এই পথ দিয়ে এসে পাঞ্জাবে প্রবেশ করলেই দিল্লীর কাছে যুদ্ধ চালাবার যোগ্য প্রান্তরে উপনীত হওয়া যায়। আলেকজান্দার থেকে সব বিদেশী আক্রমণকারী এই পথ ব্যবহার করে উত্তর ভারতে হানা দিয়েছিল। সিন্ধুর মাকরান উপকূলের দুর্গম পথ দিয়ে দেশে ফেরার সময় আলেকজান্দারকে নিদারুণ কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল।

খাইবার গিরিপথ বিদেশীর ভারতে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ

সমভূমি অঞ্চলের উত্তরসীমান্তে হিমালয় দুর্ভেদ্য প্রাচীরস্বরূপ। এর ভিতর দিয়ে যে কয়টি সংকীর্ণ গিরিপথ আছে, তা সামরিক অভিযানের পক্ষে উপযুক্ত নয়। এসব পথ দিয়ে যুগে যুগে ভারতের সঙ্গে তিব্বত ও চীনের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে।

হিমালয় উত্তর-সীমান্তে দুর্ভেদ্য প্রাচীরস্বরূপ, এর গিরিপথ সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগের সুযোগ দিয়েছে

সমভূমি অঞ্চলের দক্ষিণে মধ্যভারতের মালভূমি অনুর্বর, পাষাণময়, অরণ্যসংকুল এবং বড় সাম্রাজ্যের লালনভূমি হওয়ার পক্ষে প্রতিকূল। এই অঞ্চল শক্তিমান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দুর্বলের আশ্রয়ভূমিস্বরূপ হয়েছিল। প্রবল মোগলশক্তির বিরুদ্ধে রাজপুত বীর রাণাপ্রতাপ মাথা নত করেন নি; গণ্ডোয়ানার রাণী দুর্গাবতীর ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করতে মোগল সম্রাট আকবরকে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এসব ক্ষেত্রে ভূপ্রকৃতি আক্রমণকারীদের প্রতিকূল এবং আত্মরক্ষাকারীদের অনুকূল ছিল।

মালভূমি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি বহিঃশত্রুর প্রতিকূল, স্থানীয়দের পক্ষে অনুকূল

২. **দাক্ষিণাত্য ঃ** দক্ষিণাত্যের ভূ-প্রকৃতি ভারত ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য দায়ী। পাহাড়ময় উঁচু নিচু অঞ্চল দ্রুত সৈন্য চলাচলের পক্ষে অসুবিধাজনক, পক্ষান্তরে অল্পসংখ্যক সাহসী ও কৌশলী সৈন্যের পক্ষে বিরাট বাহিনীকে প্রতিহত করার অনুকূল। ভৌগোলিক কারণেই আঞ্চলিক স্বাধীনতার প্রতি

লোকেদের ঝোঁক ছিল। দক্ষিণভারতে উত্তর ভারতের মত বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেনি ; উত্তর ভারতের রাজারা দক্ষিণ ভারতে কিছুকাল আধিপত্য করলেও দক্ষিণ ভারত বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরে স্থায়ী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

দাক্ষিণাত্যের ভূ-প্রকৃতি দ্রুত সৈন্যচলাচলের অনুপযোগী ; আঞ্চলিক স্বাধীনতার প্রতি ঝোঁক ; বিন্ধ্য উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতিবন্ধক

আফগানিস্তানসহ সমগ্র ভারত অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত হলেও সুদূর দক্ষিণ ঐ সাম্রাজ্যের বাইরে ছিল। কুষাণ ও গুপ্তসাম্রাজ্য কেবলমাত্র উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। চতুর্দশ শতকে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী ও মহম্মদ-বিন-তোঘলক প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারত এক-সাম্রাজ্যের মধ্যে এনেছিলেন কিন্তু তা নিতান্ত স্বল্প সময়ের জন্য। দাক্ষিণাত্যের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতির সহায়তা নিয়ে শিবাজী মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। সমুদ্রসান্নিধ্য মারাঠাদের নৌশক্তি গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেছিল।

দাক্ষিণাত্যের ভূ-প্রকৃতি দিল্লী সুলতানদিগের দক্ষিণ ভারতে স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার ব্যর্থ করে ; শিবাজীর রাজ্য স্থাপনে সহায়ক ; নৌশক্তি গঠনের অনুকূল

দাক্ষিণাত্যের প্রতিকূল ভূমি-প্রকৃতি উপেক্ষা করে সমগ্র অঞ্চল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে ঔরঙ্গজেব জীবনপাত করেছিলেন, সাম্রাজ্যের পতনেরও কারণ হয়েছিলেন। ভৌগোলিক শিষ্ট্যের কল্যাণে বৈদেশিক আক্রমণের প্রচণ্ডতা, লুঠতরাজ ও ধ্বংসলীলা হতে দাক্ষিণাত্য রক্ষা পায়। তাই এখানে হিন্দুর মন্দির শিল্প ভাস্কর্য ইত্যাদি বিধর্মীর আক্রমণ থেকে কিছুটা নিরাপদ ছিল।

দাক্ষিণাত্য জয়ের চেষ্টায় ঔরঙ্গজেব ব্যর্থ এবং সাম্রাজ্য ধ্বংসের জন্য দায়ী ; দক্ষিণভারতের মন্দির, ধ্বংস হতে রক্ষা পায়

৩ **সুদূর দক্ষিণ** : সুদূর দক্ষিণের আঞ্চলিক অবস্থান ইতিহাসে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেরা সমুদ্রযাত্রায় তৎপরতার পরিচয় দিয়েছে। সমুদ্রপারে বাণিজ্যে প্রচুর ধনরত্ন উপার্জন, চোলদের শক্তিশালী নৌবহর গঠন এবং সিংহলে ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠা প্রাকৃতিক কারণেই সম্ভবপর হয়েছিল। মোগলশক্তি ছিল প্রধানতঃ স্থলশক্তি, ভৌগোলিক কারণেই তারা নৌশক্তির প্রতি অনাগ্রহী ছিল।

সমুদ্রপথে বাণিজ্যে ধনলাভ, চোলদের বিদেশে প্রাধান্য স্থাপনে নৌশক্তি সহায়ক

সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হওয়ার পর ইউরোপীয়রা নৌশক্তি নিয়ে যখন ভারতের উপকূলে উপস্থিত হয়, মোগলরা তাদের প্রতিহত করতে পারেনি। পূর্বের সকল যুগে বৈদেশিক আক্রমণ ঘটেছিল স্থলপথে ; নতুন যুগে বিদেশীর নৌশক্তির পক্ষে ভারতের অরক্ষিত উপকূলভাগ অধিকার করা সহজসাধ্য হয়ে পড়ে। এখানেও ভূগোল ভারত-ইতিহাসের ওপর সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ইউরোপীয় নৌশক্তির পক্ষে ভারতের অরক্ষিত উপকূল অধিকার সহজসাধ্য ; ইতিহাসের ওপর ভূগোলের প্রভাব সুদূরপ্রসারী

(গ) মৌলিক ঐক্য (Fundamental Unity) : ভারতের ভূ-প্রকৃতি,

জলবায়ু, জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্য প্রভৃতি থেকে ঐক্য অপেক্ষা অনৈক্যের দিকটা বেশি চোখে পড়ে। কারণ এখানে—

(i) বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ু, বৃষ্টিপাত ও ভূমিগঠনের পার্থক্য রয়েছে। কোথাও প্রচণ্ড গরম, কোথাও তীব্র শীত, কোথাও প্রচুর বৃষ্টিপাত, (ii) ভূমির উর্বরতা ও উৎপন্ন ফসল সর্বত্র এক প্রকার নয়; (iii) বিভিন্ন গোষ্ঠীর এবং বিভিন্ন ধর্মের লোকের বাস; (iv) বিভিন্ন অঞ্চলে লোকেদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত; (v) বিভিন্ন আঞ্চলিক লোকদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিদ্যমান; (vi) শিক্ষা-সংস্কৃতিতে সকল অঞ্চলের লোক সমপর্যায়ের নয়; (vii) নদী, অরণ্য, পর্বতের বাধা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ও মিলনের অন্তরায়স্বরূপ ছিল।

বৈচিত্র্য : জলবায়ু ও ভূমি গঠনে; ভূমির উর্বরতা ও ফসলে; জনগোষ্ঠীতে: অর্থনৈতিক বৈষম্যে; ভাষা, শিক্ষা সংস্কৃতিতে, যোগাযোগ ব্যবস্থায়

ভারতের আপাতদৃষ্ট বিভেদের অন্তস্তলে, বালুর নিচে স্নিগ্ধ জলধারার মত, ঐক্যের ধারা প্রবহমান। যে উপাদানগুলি ভারতীয় ঐক্য সম্ভবপর করেছে তা হল—

(i) **ভৌগোলিক ঐক্য** (Geographical Unity) **:** ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক গঠনের ফলে ভারতবর্ষ একটি পৃথক সত্তা লাভ করেছে। উত্তরে হিমালয়, পূর্ব ও পশ্চিমে লম্বমান শাখা-পর্বত এবং তিনদিকে সমুদ্রের বেষ্টনী ভারতকে এশিয়ার অন্যান্য অংশ হতে পৃথক করে স্বয়ংসম্পূর্ণতা দান করেছে। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে, 'উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত দেশের নাম ভারত। এর অধিবাসীরা ভারতী সন্ততি।' ভারত নাম দ্বারা দেশের কোন একটি অংশ নয়, সমগ্র দেশকেই বোঝাত।

পৃথক ভৌগোলিক সত্তা

ভারত যে মহা অর্থাৎ বিশাল, তার পরিচয় মেলে মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। সেখানে প্রায় সারা ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ কৌরব অথবা পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকগণ পরস্পরের সঙ্গে নানা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

কুরুক্ষেত্রে প্রায় সমগ্র ভারত উপস্থিত

(ii) **রাজনৈতিক ঐক্য** (Political Unity) **:** আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের অধিপতি হয়ে 'সম্রাট, একরাট বা রাজচক্রবর্তী' উপাধি গ্রহণ শক্তিমান রাজার আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল। মৌর্য ও গুপ্তসম্রাটগণ প্রায় সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যিক ঐক্যবন্ধনে সংহত করার চেষ্টা করেছিলেন। দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী, মহম্মদ-বিন তোগলক এবং মোগল সম্রাটগণও অনুরূপভাবে রাজনৈতিক ঐক্যসাধনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। অবশেষে ব্রিটিশ আমলে এই কাজ সম্পূর্ণ হয়।

সমগ্র ভারত রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করা শক্তিমান শাসকের লক্ষ্য ছিল

(iii) **সাংস্কৃতিক ঐক্য** (Cultural Unity) **:** (ক) রাজনৈতিক ঐক্য অপেক্ষা সাংস্কৃতিক ঐক্যই ভারতীয়দের মধ্যে মিলনবন্ধনের ভাবসূত্ররূপে গুরুত্বলাভ করেছে।

ডক্টর ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলেছেন, 'ভারতীয়দের মৌলিক ঐক্যের বিশেষত্ব এই যে, ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এমন এক সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে যা পৃথিবীর অন্য সব সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।'[১]

সাংস্কৃতিক ঐক্য মিলনের ভাবসূত্র; সামাজিক রীতি ও বিধি: সারা দেশে একই কালে উৎসব অনুষ্ঠান

একই সামাজিকরীতি আচারব্যবহার, আনন্দোৎসবের কাল-নির্ঘণ্ট ইত্যাদির ভিতর দিয়ে ভারতীয় সমাজে ঐক্যবন্ধন দৃঢ় হয়েছে। যেমন, বিবাহ অনুষ্ঠানের পদ্ধতি, মৃতদেহ দাহ করার বিধি, প্রণাম-নমস্কার দ্বারা সৌজন্য প্রকাশ, দেওয়ালী দশহরা, হোলি ও অন্যান্য উৎসব সারা দেশে একই কালে উদ্‌যাপন প্রভৃতি হিন্দুসমাজে অদৃশ্য ঐক্য-অনুভূতি পুষ্ট করে।

রামায়ণ-মহাভারতের আদর্শ চরিত্র, অশোকের 'প্রাকৃত' ভাষায় খোদিত শিলালিপি ও বাণী

সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার বন্ধনে সাংস্কৃতিক বন্ধন গঠিত। রামায়ণ ও মহাভারতের কতকগুলি চরিত্র সর্বভারতীয় সমাজে আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছে। রামের মত প্রজারঞ্জক রাজা, সীতার মত পতিব্রতা পত্নী, লক্ষ্মণের মত অনুগত ভ্রাতা ভারতে প্রবাদে পরিণত। মৌর্যযুগে পাথরে খোদিত প্রাকৃত ভাষায়-লেখা অশোকের অনুশাসন ও ধর্মপ্রচারের বাণী রাজ্যের সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল।

(iv) **ধর্মীয় ঐক্য** (Religious Unity): ভারতের বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যেও ধর্মগত ঐক্যবোধ বিরাজ করে। রাম ও কৃষ্ণের কথা সারা ভারতে পরিচিত; প্রায় সকল হিন্দু গোজাতির প্রতি কোমল মনোভাব পোষণ করে, বিষ্ণু এবং শিব প্রায় সমগ্র ভারতে কোন না কোন প্রকারে উপাসিত৭ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুব্যক্তির পবিত্রজীবন জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই আকৃষ্ট ক'রে মিলনের সেতু প্রস্তুত করে। বস্তুত, সাধুসন্তগণ ধর্মের বহিরঙ্গের বৈষম্য ও ভেদবুদ্ধি দূর করে প্রকৃত 'মানবধর্ম'-আচরণের উপদেশ দিয়ে মানুষে মানুষে প্রীতি ও ঐক্যবোধ বিস্তারে সহায়তা করেন।

ধর্মের বিবিধ মতের অন্তস্তলে ঐক্যবোধ বিরাজিত; সাধু-সন্তের উদারমত মানব-ঐক্য সাধনে সহায়ক

ধর্ম ও তীর্থস্থান: ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ও দুর্গম স্থানে অবস্থিত তীর্থস্থান চিরদিন ভারতবাসীকে আকর্ষণ করে এবং একই উদ্দেশ্যে ভারতের সব প্রান্তের নরনারী ঐ সব স্থানে সমবেত হয়।

ধর্ম ও তীর্থস্থান ঐক্যের সূত্র

---

১. The essential fundamental Indian Unity rests upon the fact that the diverse peoples of India have developed a peculiar type of culture and civilization, utterly different from any other type in the world....
V. A. Smith-Oxford History of India. p. 7

(v) **শাসনতান্ত্রিক ঐক্য** (Administrative Unity): মোগল ও ব্রিটিশ আমলে একই প্রকার শাসনব্যবস্থা, একই প্রকার মুদ্রা, একই ধরনের আইন ও রাষ্ট্রভাষার ব্যবহার ভারতবাসীর ঐক্যবোধ প্রবল করেছিল। ইংরেজ শাসনকালে রেলপথ, টেলিগ্রাফ, সংবাদপত্র প্রভৃতি ভারতবাসীর জাতীয় চেতনা সঞ্চারে সহায়ক হয়। স্বাধীনতা আন্দোলন সারা ভারতবর্ষকে নূতন রাষ্ট্রীয় চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করেছিল।

একই প্রকার শাসন, একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমবেত প্রচেষ্টা ঐক্যের সহায়ক

উপসংহার: ভারত উপমহাদেশের বিস্তার, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর বাস, ভিন্ন ভিন্ন রকম পোশাক পরিচ্ছদ, ভাষা, খাদ্য, ধর্মমত প্রভৃতি দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এখানে অনৈক্যেরই প্রাধান্য। কিন্তু ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সমন্বয়ী মনোভাবের ফলে ভারত অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের (Unity in diversity) সন্ধান পেয়েছে। ডঃ স্মিথের কথায় 'ভারতে নিঃসন্দিগ্ধভাবে মূলগত ঐক্যের ধারা প্রবাহিত রয়েছে। দেশ যদি ভৌগোলিক দিক থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকত কিংবা রাজনৈতিক একক-আধিপত্যের অধীন থাকত তবে সেরূপ ক্ষেত্রে যেরূপ ঐক্য আশা করা যেত, ভারতের মৌলিক ঐক্য তদপেক্ষা অনেক বেশি গভীর।"

ভারতীয় সভ্যতার ঐক্যবদ্ধ রূপ প্রভেদের মধ্যে ও বিদ্যমান

কবি অতুলপ্রসাদ সেন সত্যই বলেছেন—

নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।

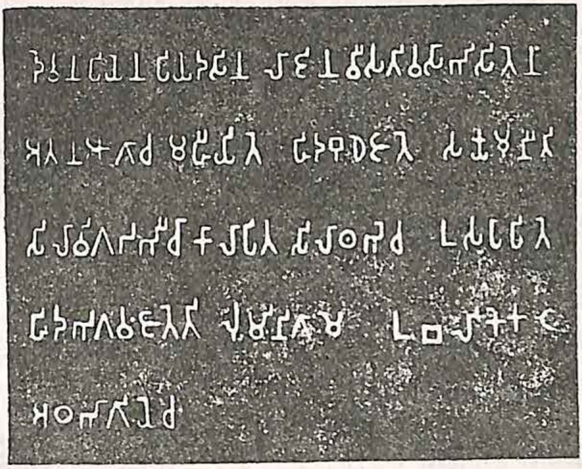
(ঘ) **প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান** (Source of Ancient Indian History): প্রাচীনতম কাল থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সময় ভারত-ইতিহাসে প্রাচীনযুগ বলে স্বীকৃত। এই সময়ের ইতিহাস রচনার মূল উপাদানগুলি মোটামুটি ৬টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—১. লিপি, ২. মুদ্রা, ৩. সৌধ, স্মৃতিস্তম্ভ ইত্যাদি, ৪. প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্র, ৫. প্রাচীন ঐতিহাসিক রচনা ৬. বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বিবরণ।

উপাদান মোটামুটি ৬টি শ্রেণীতে বিভক্ত

১. **লিপি**: পাথর বা কোন প্রকার ধাতুর ওপর খোদাই-করা লেখা ইতিহাসের সর্বোত্তম বিশ্বাসযোগ্য উপাদান, কারণ পাথর তামা বা ব্রোঞ্জের ফলকে খোদিত লেখা প্রায় অবিকৃত এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। ভারতে এখন পর্যন্ত খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের আগেকার কোন লিপি পাওয়া যায় নি। লিপিতে সাধারণত কোন বিশেষ ঘটনা, রাজার আদেশ, দানপত্র, যুদ্ধবিজয় কাহিনী লিখিত হয়ে থাকে। এইসব ফলকে কোন কোন সময় তারিখ দেওয়া না থাকলেও অক্ষরের গড়ন দেখে আনুমানিক তারিখ ঠিক করা যায়। এগুলির আবিষ্কার-স্থান থেকে

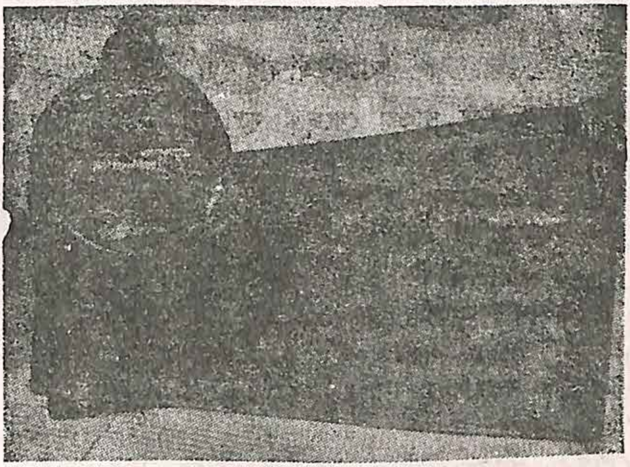
অশোকের অনুশাসন; তাম্র-ফলক; পদ্যে লিখিত প্রশস্তি এলাহাবাদ প্রশস্তি, গোয়ালিয়র প্রশস্তি, আইহোলি প্রশস্তি, মৌর্য যুগে ভাষা প্রাকৃত, পরবর্তী যুগে ভাষা সংস্কৃত

ফলকে উল্লিখিত ব্যক্তি বা রাজার প্রভাবসীমা নির্ধারণ করা চলে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত প্রস্তরস্তম্ভে ও পাহাড়ের গায়ে খোদিত **অশোকের অনুশাসন**



পাথরে-খোদাই অশোকের অনুশাসন

থেকে তাঁর রাজ্যের পরিধি, শাসনরীতি বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের ভাষা ও রাজার চরিত্র সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারা যায়। এগুলি পাথুরে প্রমাণ। পরবর্তীকালে বিজয়ী



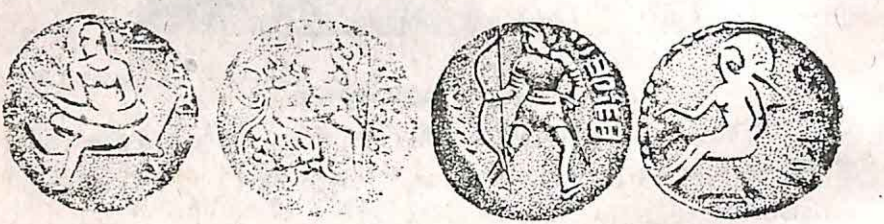
তাম্রফলক

রাজা ও রাজপুরুষদের দান ও অন্যান্য কীর্তি সম্পর্কে গদ্যে ও পদ্যে লিখিত **প্রস্তর ফলক** ও **তাম্রফলক** পাওয়া গেছে। এলাহাবাদে প্রাপ্ত অশোকস্তম্ভের গায়ে খোদিত

কবি হরিষেণ-রচিত সমুদ্রগুপ্তের বিজয়কাহিনী **এলাহবাদ প্রশস্তি** নামে পরিচিত। সংস্কৃত ভাষায় সুলিখিত এই প্রশস্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে। এছাড়া প্রতিহাররাজ ভোজের **গোয়ালিয়র প্রশস্তি**, বিজয়সেনের **দেওপাড়া প্রশস্তি**, দ্বিতীয় পুলকেশীর **আইহোলি প্রশস্তি** প্রভৃতি উত্তম ঐতিহাসিক উপাদান।

গুপ্তযুগের পূর্বেকার লিপিগুলি, যেমন অশোকের অনুশাসন, শতকরা ৯৫ ভাগেরও বেশি **ব্রাহ্মী লিপিতে প্রাকৃত ভাষায়** লিখিত এবং বিষয়বস্তু জৈন ও বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত। গুপ্তযুগের ও পরবর্তীকালের লিপিগুলি প্রায় সবই **সংস্কৃত ভাষায়** লিখিত এবং বিষয়বস্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম-সংক্রান্ত। এ থেকে ঐ যুগের সাধারণ মানুষের ভাষা ও ধর্মের অবস্থা বুঝতে পারা যায়।

২. **মুদ্রা ঃ** প্রাচীনযুগের বিভিন্ন রাজ্য ও বণিকসংস্থা যেসব মুদ্রা প্রচার করেছিল



প্রাচীন মুদ্রা

তার কিছু কিছু নানা স্থানে পাওয়া গেছে। মুদ্রা থেকে রাজার নাম, কালানুক্রম, রাজ্যের বিস্তার, আর্থিক অবস্থার পরিচয়, শিল্প সংস্কৃতির পরিচয় ইত্যাদি জানা যায়। পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত গ্রীক রাজ্যগুলির প্রচারিত মুদ্রা গ্রীক শিল্পের উত্তম নিদর্শন। গুপ্ত সম্রাটদের মুদ্রায় রাজাদের শৌর্য, দেশ-জয়, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, সংগীত ও ললিতকলার প্রতি অনুরাগের পরিচয় মেলে।



সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা

৩. **সৌধ ঃ** প্রাচীন সৌধ প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ, পাথর ও ধাতুনির্মিত মূর্তি, পোড়ামাটির মূর্তি ও পাত্র প্রভৃতির কারুকার্য দেখে ভারতীয় শিল্পের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জানা যায়। **মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত বিবিধ দ্রব্য ভারতীয় সভ্যতার**

অতি প্রাচীনত্ব প্রমাণ করেছে। **তক্ষশিলা, সারনাথ, নালন্দা** প্রভৃতি স্থানের মাটি খননের ফলে প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ ও শিল্পদ্রব্য পাওয়া গেছে। তা থেকে ভারতের প্রাচীনযুগের ধর্ম, সংস্কৃতি শিক্ষা জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারা যায়। **সাঁচীস্তূপ, ইলোরার** পাহাড়-কাটা **কৈলাসমন্দির, অজন্তা ও কার্লের গুহাচিত্র** প্রভৃতি ভারতের শিল্পকলা, ধর্ম ও জাতীয় সমৃদ্ধির নিদর্শন রূপে **ইতিহাসের উৎকৃষ্ট উপাদান**।

মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা, তক্ষশিলা, সারনাথ, নালন্দা, সাঁচী স্তূপ, ইলোরা, অজন্তা উত্তম উপাদান

৪. **প্রাচীন সাহিত্য ঃ** হিন্দুদের প্রাচীন সাহিত্য বেদ, পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত থেকে প্রাচীন ভারতের সমাজ, রাজনীতি ও ধর্মজীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলি পুরাপুরি ইতিহাস নয়। এদের মধ্যে কিংবদন্তী ও ঐতিহাসিক তথ্যের মিশ্রণ ঘটেছে। তবে পুরাণ ও মহাকাব্য, বিশেষ করে পুরাণের কাহিনী অতি প্রাচীন-কালের প্রধান ঐতিহাসিক উপাদান এবং খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর ইতিহাস রচনায় এগুলিই একমাত্র উপাদান।

...ইতিহাস নয়, ঐতিহাসিক তথ্য ও কিংবদন্তীর মিশ্রণ; ...সামাজিক অর্থ নৈতিক অবস্থার প্রকাশক

পরবর্তীকালের **জৈনধর্মশাস্ত্র, বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ, দীপবংশ ও মহাবংশ, পাণিনি পতঞ্জলির ব্যাকরণ, ভাসের নাটক, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র** প্রভৃতি গ্রন্থে তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় মেলে।

৫. **প্রাচীন ঐতিহাসিক রচনা ঃ** গুপ্তযুগ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তীকালে রচিত জীবনচরিত ও স্থানীয় ঐতিহাসিক বিবরণীতে ভারত-ইতিহাসের বহু নির্ভরযোগ্য উপাদন ও উপকরণ মেলে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(১) বাণভট্টের **হর্ষচরিত**—এতে হর্ষবর্ধনের চরিত্র ও রাজত্বকালের বর্ণনা আছে।

(২) বাক্‌পতির **গৌড়বহকাব্য**—এতে মহারাজ যশোবর্মণের গৌড়বিজয় সবিস্তারে বর্ণিত।

(৩) বিহ্লন **বিক্রমাংকচরিত**—চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের কীর্তি-কথাযুক্ত।

(৪) সন্ধ্যাকর নন্দীর **রামচরিত**। দ্ব্যর্থক ভাষায় লিখিত এই কাব্যে এক অর্থে রামায়ণের কাহিনী, অন্য অর্থে পালরাজা রামপালের রাজ্য পুনরুদ্ধার কাহিনী বর্ণিত। (৫) কহলণের **রাজতরঙ্গিণী**—১১৪৯-৫০ খৃস্টাব্দে কাব্যে লিখিত এই গ্রন্থে কাশ্মীরের রাজবংশের ধারাবাহিক বর্ণনা আছে। প্রাচীনভারতীয় সাহিত্যে রাজতরঙ্গিণী প্রকৃত ইতিহাসের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য।

হর্ষচরিত, গৌড়বহ কাব্য, বিক্রমাংকদেব চরিত, রামচরিত, রাজতরঙ্গিণী

৬. **বৈদেশিক পর্যটক ও ঐতিহাসিকদের বিবরণ ঃ**

বিদেশী ভ্রমণকারী ও ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে প্রাচীন ভারতের অনেক তথ্য জানতে পারা যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

(১) প্রাচীনতম গ্রীকলেখক হেরোডোটাস ও টিসিয়াসের বিবরণ। হেরোডোটাসের রচনায় গল্প উপকথার বাহুল্য থাকলেও ভারত সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যও আছে। (২) আলেকজান্দারের সঙ্গে আগত গ্রীকলেখকদের রচনা (৩) সেলুকাসের রাজদূত মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ **'ইণ্ডিকা'**; (৪) টলেমির ভারতের ভৌগোলিক বিবরণ, (৫) অজ্ঞাতনামা মিশর-বাসী গ্রীক নাবিকের **'পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সী'** (৮০ খৃস্টাব্দ) নামক গ্রন্থে ভারতের বন্দর, বাণিজ্যদ্রব্য প্রভৃতি সম্বন্ধে মূল্যবান বিবরণ; (৬) **প্লিনির** ভারতের জীবজন্তু উদ্ভিদ খনিজ দ্রব্য সম্বন্ধে বিবরণ; (৭) আরব নাবিকদের বিবরণ (৮) বিখ্যাত আরব পণ্ডিত আলবিরুনীর গ্রন্থ তহকিক্-ই-হিন্দ্, (An Enquiry into India)-এতে হিন্দুদের আচার-আচরণ, সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আছে। আলবিরুনী একাদশ শতকে সুলতান মামুদের সঙ্গে ভারতে এসে পাঞ্জাবে কিছুকাল বাস করেছিলেন; (৯) চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন (৫ম শতাব্দী) ইৎসিং ও হিউয়েনসাঙের (৭ম শতাব্দী) ভারত বিবরণ নানা তথ্যে সমৃদ্ধ।

হেরোডোটাস ও টিসিয়াসের বিবরণ; আলেকজান্দারের সহগামী গ্রীক লেখকদের বিবরণ, মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' টলেমির ভূগোল। পেরিপ্লাস: আলবিরুনী: চীন ভ্রমণকারী ফা-হিয়েন, ইৎসিং, হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ

২.

ভারতীয় সভ্যতার সূচনা

(ক) **আদি মানব:** ইতিহাস মূলতঃ মানুষের অগ্রগতির কথা, সৃষ্টিমূলক কাজের ভিতর দিয়ে তার সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাহিনী। মানুষই ইতিহাসের মুখ্য বিষয়—কাজেই মানুষ যখন ভারতে প্রথম বসতি শুরু করে তখন থেকেই ভারতের ইতিহাস আরম্ভ করা উচিত।

আদিমানবের বসতি: অনুমান করা হয় যীশুখৃস্টের জন্মের এক লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতেও আদিমমানবের আবির্ভাব হয়েছিল।

পাঞ্জাবের **সোহান** নামক একটি ছোট নদীর উপত্যকায় আদিম মানবের ব্যবহৃত বহু পাথরের টুকরো-জিনিস পাওয়া গেছে। এখানে সেই সময়কার কোন মানুষের অস্থি পাওয়া যায় নি। তবে অন্য দেশের যে সব আদিম মানুষ এই ধরনের পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করত, এখানকার মানুষও আকারে এবং জীবন-যাত্রায় সম্ভবত তাদের মতই ছিল। এই আদিমমানব আমাদের আদি পুরুষ হলেও চেহারায় এরা ঠিক এখানকার মানুষের মত ছিল না। এরা ছিল প্রায় বানরের মত। বিজ্ঞানীর ভাষায় এদের বলা হয় পিথেকানথ্রপাস্ ইরেক্টাস্ (Pithecanthropus erectus), অর্থাৎ 'কপি মানব'। এরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত।

পাঞ্জাবের সোহান উপত্যকায় আদিম মানবের অস্তিত্বের পরিচয় মেলে

প্রাচীন প্রস্তর যুগ (Paleolithic Age): ভারতের দক্ষিণ অংশে মাদ্রাজ অঞ্চলেও প্রাচীন মানবের ব্যবহৃত পাথরের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। এগুলি সোহান উপত্যকার আদি বাসিন্দাদের জিনিস অপেক্ষা কিছুটা উন্নত ধরণের। আফ্রিকা ও ইউরোপের আদিমানবের তৈরী জিনিসের সঙ্গে তুলনা করে বিজ্ঞানীরা স্থির করেছেন, এই জিনিসগুলি কপি-মানবের চেয়ে উন্নত মানুষের দ্বারা প্রস্তুত। বিজ্ঞানীর ভাষায় এদের নাম হোমো স্যাপিয়েনস্ (Homo Sapiens) বা 'আদি মানব'। এরাই মানুষের সত্যকারের আদি পুরুষ। এই যুগকে বলা হয় প্যালিওলিথিক (Paleolithic) যুগ, মানে প্রাচীন প্রস্তর-যুগ। আদি মানব বহু সহস্র বৎসর এইভাবে বসবাস করে ধীরে ধীরে জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

মানুষের আদি পুরুষ হোমো স্যাপিয়েনস্ কপি-মানবের চেয়ে উন্নত

নব প্রস্তরযুগ (Neolithic Age): প্রাচীন প্রস্তরযুগের আদি মানব বনে জঙ্গলে পশু শিকার করে খাদ্য সংগ্রহ করত। তারা ছোট ছোট দলে শিকারের খোঁজে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াত। পশুপালন বা চাষ-আবাদ তাদের জানা ছিল না তবে অরণ্যের ফলমূল এবং হয়ত বুনোঘাস খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করত। পাহাড়ের গুহায় অথবা পশুচামড়া ও ঘাসপাতা দিয়ে ছাওয়া কুটিরে তারা বাস করত। গাছের বাকল বা পশুচামড়া পরে' আর গায়ে দিয়ে শীত নিবারণ করত। স্পষ্ট ভাষা ছিল না। কোন রকম শব্দ করে হয়ত বা মনের ভাব প্রকাশ করত। এইভাবে হাজার হাজার বছর কেটে গেল। কালক্রমে এরা আকস্মিকভাবে আগুনের ব্যবহার শিখে ফেলে। তখন আগুন হয় এদের বড় সহায়। গুহায় আগুন জ্বালিয়ে রেখে অন্ধকারে

জীবনযাত্রা: পশুমাংস ও বন্য ফলমূল খাদ্য, যাযাবর বনচারী জীবন, গুহায় কিংবা পাতার কুটিরে বাস, পশু চামড়া পরিচ্ছদ, স্পষ্ট ভাষা ছিল না

গ্রীক শব্দ **Paleo** = প্রাচীন, পুরাতন ; **lithic** = প্রস্তর।

বন্য পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেত, পশুমাংস কাঁচা না খেয়ে আগুনে ঝলসিয়ে খেত। মাংস ও হাড় টুকরার লোভে বন্য কুকুর এদের বাসস্থানের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করত। আদিমানব **কুকুরকে** প্রথম পোষ মানিয়ে শিকারের সঙ্গী করে নিল। এই প্রথম মানুষ প্রভুত্ব শুরু করল অন্য প্রাণীর ওপর।

আগুনের ব্যবহার, মাংস ঝলসাইয়ে খাওয়া, কুকুর পোষ মানানো

নব প্রস্তর যুগের সভ্যতা : আনুমানিক চারহাজার খৃস্টপূর্বাব্দে ভারতের প্রাচীন মানব বেলুচিস্থান ও সিন্ধু প্রদেশে যাযাবর জীবন ছেড়ে স্থায়ী গ্রাম্যজীবন শুরু করেছিল। এ সময় তারা চাষ-আবাদ করে খাদ্যশস্য উৎপন্ন করত, গরুছাগল প্রভৃতি বন্যজীব পোষ মানিয়ে পালন করত। তারা কাপড় বুনতে শিখেছিল। ধাতুর ব্যবহার শিখবার আগেই এরা মাটির পাত্র তৈরী করে তাতে নক্‌শা ও রঙ করত। তারা প্রথমে হাতে, পরে কুমারের চাকে মৃৎপাত্র তৈরী করত। বাস-গুহার দেওয়ালে শিকার ও নৃত্যের দৃশ্য এঁকে সাজাত, এরা নৌকা বানাত এবং সমুদ্রেও যেত। বড় মাটির পাত্র শবাধার হিসাবে ব্যবহার করা হত।

চাষ আবাদ, গরু ছাগল পোষ মানানো, কাপড় বোনা, নক্‌সা-যুক্ত মাটির পাত্র, গুহায় চিত্রাঙ্কন, নৌকা নির্মাণ ও সমুদ্রযাত্রা, মৃৎপাত্র শবাধার রূপে ব্যবহার

প্রাচীন ও নবপ্রস্তর যুগের মধ্যবর্তীযুগ : (Mesolithic Age)-নব প্রস্তর যুগের মানবের জীবনযাত্রা ও কর্ম পৃথিবীর সর্বত্র প্রায় একই রকম। পণ্ডিতেরা প্রাচীন প্রস্তর ও নব প্রস্তর যুগের মধ্যবর্তী (meso = মধ্যবর্তী ; lithic = প্রস্তর) প্রস্তর যুগের কথা বলেন ; মধ্যবর্তী যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য দুটি—এক, পাথরের অস্ত্রগুলি তখন আকারে খুবই ছোট, মাত্র ইঞ্চিখানেক লম্বা। (গ্রীক শব্দ (micro = ক্ষুদ্র) প্রয়োগ করে এই অস্ত্র microlith অর্থাৎ ক্ষুদ্র প্রস্তর নামে উল্লেখ করা হয়) দুই—প্রাচীন প্রস্তরযুগের কোয়ার্টজাইট বা শক্ত পাথরের পরিবর্তে সিলিকেট ধরণের অন্য প্রকার পাথরে 'ক্ষুদ্রাস্ত্র' নির্মিত হত।

প্রাচীন ও নব-প্রস্তর যুগের মধ্যেকার যুগ 'মেসোলিথিক' যুগ, ক্ষুদ্র অস্ত্র, সিলিকেট ধরনের প্রস্তরে নির্মিত

সভ্যতার পরিচয় (Stage of Cultures) **:** খাদ্যের জন্য পশুশিকারের উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়ানোর পরিবর্তে মানুষ যখন চাষ করে খাদ্য সংগ্রহ করতে শিখল, তখন থেকে সভ্যতার সূচনা। সিন্ধুনদের পশ্চিমের অঞ্চল এখন শুষ্ক মরুভূমির মত। কিন্তু নবপ্রস্তরযুগে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে এ অঞ্চলে গভীর অরণ্য ছিল ; সেখানে ছিল হাতি, গণ্ডার, বাঘ প্রভৃতি প্রাণীর বাস। নদীবাহিত পলিমাটি ভূমিকে করেছিল উর্বর, কৃষির পক্ষে অনুকূল। ব্রাহুই পাহাড়ের উত্তরাংশের উপত্যকায় **ঝোব্‌** এবং দক্ষিণ অংশে **নাল, কুল্লী** প্রভৃতি গোষ্ঠী নিজ নিজ এলাকায় বিশেষ ধরণের সভ্যতার পত্তন করেছিল। ঝোব্‌রা মৃৎপাত্রে সুন্দর লাল রঙ করত। দক্ষিণের লোকেরা করত হলুদ রঙ ; কুল্লীরা মৃতদেহ দাহ করত, নালেরা মৃতদেহ আংশিকভাবে পুড়িয়ে কিংবা ফাঁকা

সিন্ধুর পশ্চিম অঞ্চল কৃষির পক্ষে উপযোগী :

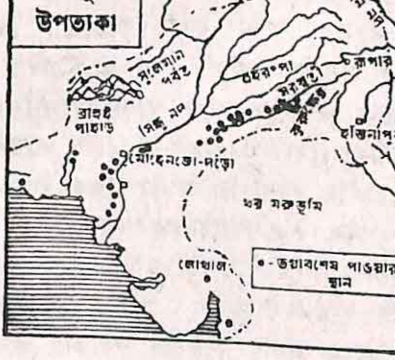
জায়গায় ফেলে রাখবার পর কিছুটা অস্থি সংগ্রহ করে তা কবর দিত।

মৃতদেহ-সৎকারে পার্থক্য থাকলেও সকল গোষ্ঠীর লোকই মাতৃরূপা দেবী ও লিঙ্গ-মূর্তি পূজা করত। মৃৎপাত্রে বৃষের মূর্তি অঙ্কনের প্রচলন ছিল। কুল্লীগোষ্ঠীর লোকেরা কোমল পাথরের নক্‌শাকাটা সুন্দর ছোট ছোট পেটিকা প্রস্তুত করত। সুগন্ধি ও অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্যের পাত্রহিসাবে হয়ত এগুলির ব্যবহার ছিল। মেসোপটেমিয়ার কোন দ্রব্য এখানে পাওয়া যায়নি কিন্তু কুল্লীদের প্রস্তুত কোমল পাথরের প্রসাধন-পেটিকা পাওয়া গেছে এইসব দেশে। এর থেকে অনুমান করা হয়, মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতার যুগে ঐ দেশের সঙ্গে কুল্লীদের সমুদ্রপথে যোগাযোগ ছিল, হয়ত বহির্বাণিজ্যও চলত।

ঝোব্‌, নাল, কুল্লীদের মৃৎপাত্র এবং মৃতদেহ সৎকারে সামান্য পার্থক্য; মাতৃরূপা দেবী ও লিঙ্গমূর্তি পূজা, মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ

নবপ্রস্তর যুগের অবদান ঃ নবপ্রস্তর যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র পাথরের অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রপাতির ব্যবহার নয়। চাষ-আবাদের সূচনা হয়েছিল এই যুগে এবং আদিম-মানব খাদ্য সংগ্রহের জন্য বনে জঙ্গলে ঘুরে পশু শিকারের পরিবর্তে গ্রাম্যজীবন গড়ে তুলতে শুরু করেছিল। খাদ্য সংগ্রাহক মানবগোষ্ঠী হল খাদ্যউৎপাদক। মাটির পাত্র তৈরী এবং তা চিত্রিত করার ভিতর দিয়ে মানুষের শিল্প-বোধের পরিচয় মেলে। তূলা ও পশম সূতা কাটা এবং বস্ত্র বয়ন এদের কৃতিত্ব। বন্য ছাগল, গরু পোষ মানিয়ে গরু দিয়ে লাঙল টানানো এবং কুমারের 'চাকে' মাটির পাত্র গড়ার কৌশল এদের আবিষ্কার।

চাষ-আবাদ শুরু, গ্রাম্য জীবনের সূচনা, মাটির পাত্র, শিল্পরুচি বোধের পরিচয়, সূতাকাটা, বস্ত্রবয়ন, লাঙলটানার কাজে গরু, কুমোরের চাক ব্যবহার



হরপ্পা সভ্যতার বিস্তার

ভারতবর্ষে নবপ্রস্তরযুগের পরিচয় পাওয়া যায় মহেঞ্জোদড়ো হরপ্পা ইত্যাদি অঞ্চলের নব-আবিষ্কৃত ভগ্নস্তূপের মধ্যে।

(খ) হরপ্পা সভ্যতা (Harappan Civilisation) **ঃ** সিন্ধু ও এর উপনদী গুলির অববাহিকায় মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা ও অন্যান্য স্থানে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠেছিল তা হরপ্পাসভ্যতা বা সিন্ধুসভ্যতা নামে পরিচিত।

আবিষ্কার ও বিস্তার ঃ বর্তমান পাকিস্তানের লারকানা জেলার সিন্ধুর খাত ও পশ্চিম নরখালের মধ্যে এক ফালি ভূখণ্ড সাধারণ লোকের কাছে মহেঞ্জোদড়ো অর্থাৎ 'মড়ার ঢিপি' নামে পরিচিত ছিল। এ ঢিপির তলায় চাপা পড়ে ছিল প্রাচীন

সভ্যতার ধ্বংস চিহ্ন। বাঙালি প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২২ খৃস্টাব্দে বর্তমান সিন্ধু প্রদেশে মহেঞ্জোদড়ো নামক স্থানে মাটি খুঁড়ে এই প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেন। দয়ারাম সাহনী, স্যার মর্টিমার হুইলার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ আবিষ্কৃত-দ্রব্যগুলি বিশ্লেষণ করে অতীত যুগের মানুষের জীবনযাত্রার বিশ্বাসযোগ্য চিত্র তুলে ধরেছেন।

মহেঞ্জোদড়ো খননের পূর্বে স্থানটি মড়ার ঢিপি নামে পরিচিত ছিল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আবিষ্কার করেন ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। সিন্ধুউপত্যকায় উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১৫২০ কি.মি. স্থান জুড়িয়া বিস্তার

আরবসাগর মোহনা হতে ৩৫০ কি. মি. দূরে সিন্ধুর পশ্চিমতীরে মহোঞ্জোদড়ো অবস্থিত ছিল। এর ৬২৪ কি. মি. উত্তরে সিন্ধুর উপনদী ইরাবতীর পূর্বতীরে হরপ্পার অবস্থান। **মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা** ছাড়া **রূপার, চান্‌হু দড়ো, লোথাল** প্রভৃতি ছোট ছোট শহরও গ্রামাঞ্চলে সমকালীন সভ্যতার পরিচয় আবিষ্কৃত হয়েছে। নদী উপত্যকার উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১৫২০ কি. মি. স্থান জুড়ে হরপ্পা সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল।

হরপ্পা সভ্যতার বৈশিষ্ট্য (Chief features of Harappan Civilisation) **:** হরপ্পা সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—(১) এই সভ্যতা ছিল নগর-সভ্যতা, ব্রাহুই উপত্যকার ঝোব্, নাল, কুল্লীদের মত গ্রামজীবনভিত্তিক নয়; (২) সমগ্র অঞ্চল জুড়ে সভ্যতার বিকাশে সামঞ্জস্য ছিল; পোড়ান ইটের বাড়িঘর তৈরী করা হয়েছিল, সর্বত্র গৃহের আকার ছিল প্রায় একই রকম; বাড়ির নির্মাণ কৌশলেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হত; (৩) নদীতীরবর্তী সভ্যতার এই লোকেদের স্বস্থানের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। সিন্ধুর বন্যায় নগর বিপন্ন হলেও অধিবাসীরা স্থান ত্যাগ করেনি, পুরাতন বাড়ির ওপরই নূতন বাড়ি তৈরী করেছে; (৪) **হরপ্পাসভ্যতা তাম্রযুগের সভ্যতা**। এ সভ্যতা অবৈদিক ও প্রাক্‌বৈদিক। পোড়ামাটি, পাথর, ব্রোঞ্জ ও তামার নানা দ্রব্য ধ্বংস্তূপের মধ্যে পাওয়া গেছে কিন্তু **লোহার কোন জিনিস পাওয়া যায় নি;** (৫) হরপ্পাসভ্যতা ছিল **সাক্ষর সভ্যতা** (literate civilisation), অধিবাসীরা লেখাপড়া জানত কিন্তু তাদের যে সব লিপির নিদর্শন পাওয়া গেছে এখন পর্যন্ত তার পাঠোদ্ধার করা যায় নি; (৬) অন্তত ২৫০০-৩০০০ খৃস্ট পূর্বাব্দের এই সভ্যতা মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের মত ভারতকেও **প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমির সম্মান** দিয়েছে; (৭) সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এ সভ্যতা দৃশ্যত বিলুপ্ত হলেও তার প্রভাব ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

নগরজীবন, একই ধরনের বাড়ি ঘর, তাম্রযুগের সভ্যতা; স্বস্থানের প্রতি অধিবাসীদের আকর্ষণ; সাক্ষর সভ্যতা। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম। পরবর্তী ভারতীয় সভ্যতার ওপর প্রভাব

হরপ্পা সভ্যতার প্রাচীনত্ব (Antiquity of Harappan Civilisation) **:** প্রধানত দুটি উপায়ে হরপ্পা সভ্যতার কাল বা 'বয়স' নির্ণয় করা হয়। এ উপায় দুটি হ'ল

(১) **সমসাময়িক সাক্ষী** এবং (২) **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি** অনুসরণে প্রাচীনত্ব নিরূপণ।

(১) হরপ্পা সভ্যতার যুগে যে সব সীলমোহর বা মাটি ও নরম পাথরের জিনিসপত্র তৈরী হত তার কিছু কিছু নিদর্শন অ্যাসেরিয়া-ব্যাবিলনীয়ার সভ্যতার নিদর্শনের মধ্যে পাওয়া যায়। এর থেকে এ সভ্যতাকে ঐ সভ্যতার সমকালীন মনে করা যায়। মাটির যে স্তরে এই দ্রব্যগুলি পাওয়া গেছে, প্রত্নতাত্ত্বিকদের হিসাবে তা অনুমান ২৩০০ খৃস্ট-পূর্বাব্দের। হরপ্পা-সভ্যতার উৎকৃষ্ট বস্তুই সেদেশে গিয়েছিল আর যে সভ্যতা তা সৃষ্টি করেছিল তা ২৩০০ খৃস্টপূর্বাব্দে বর্তমান ছিল এবং তার আরম্ভ নিশ্চয়ই আরো কিছুকাল আগে হয়েছিল। এ সব থেকে অনুমান করা যায়, হরপ্পা সভ্যতার কাল ২৫০০-১৫০০ খৃস্টপূর্বাব্দ হতে পারে।

আসেরিয়া-ব্যাবিলনীয়ার সভ্যতার সমসাময়িক ; হরপ্পা সভ্যতার আনুমানিক কাল খৃঃ পূঃ ২৫০০-১৫০০

(২) বর্তমানে কার্বন-১৪ (carbon-14) পরীক্ষার দ্বারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জীবাশ্মের বয়স নির্ণয় করা হয়। হরপ্পা সভ্যতার যুগের নরকংকাল কার্বন-১৪ পরীক্ষা করে এর বয়সকাল খৃঃ পূঃ ২৩৬০ থেকে খৃঃ পূঃ ২১৩০-এর মধ্যবর্তী সময় বলে জানা যায়। দেখা যাচ্ছে, বিদেশী সভ্যতার সমকালীনতা-ভিত্তিক গণনা ও দেশীয় বস্তু ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক গণনা—উভয়ের ফলই প্রায় অনুরূপ। অতএব হরপ্পা সভ্যতাকে ২৩০০ খৃস্টপূর্বাব্দের সভ্যতা বললে ভুল হবে না।

কার্বন-১৪ পরীক্ষায় নির্ণীত সময়কাল খৃঃ পূঃ ২৩৬০ থেকে ২১৬০ খৃ.পূ. পূর্বাব্দ। মোটামুটি ২৩০০ খৃঃ পূঃ

অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ঃ সিন্ধু-উপত্যকায় খননের ফলে তৎকালীন সিন্ধু অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার অনেক তথ্য জানা গেছে। পাথরে খোদাই-করা কোন বিবরণ বা পুঁথি পাওয়া যায় নি বটে কিন্তু তাদের বাড়িঘর, ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও জীবজন্তুর অস্থি ইত্যাদি পরীক্ষা করে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণ এই বিস্মৃত যুগের কাহিনী গড়ে তুলেছেন।

নগর সভ্যতা ঃ মাটির তলা থেকে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা নগরীর যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, তাতে নগর পরিকল্পনার স্পষ্ট পরিচয় মেলে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা পথ দিয়ে শহরে প্রবেশ করা যেত। ৯ থেকে ৩৪ ফুট চওড়া পথগুলি সোজা এবং পোড়ান ইট দিয়ে বাঁধানো ; পথের দুইপাশে ১ থেকে ২ ফুট গভীর ইট বা পাথরের ঢাকনা-দেওয়া নর্দমা, মাঝে মাঝে নর্দমার ভিতর নেমে পরিষ্কার করবার জন্য ফাঁকা জায়গা (manhole) ছিল। কিছুটা দূরে দূরে খুঁটি বসিয়ে পথে আলো দেবার বন্দোবস্ত ছিল। চওড়া পথে শকট ও পথচারী চলাচল করত। নগরের পথঘাটের বিন্যাস এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থায় সুষ্ঠু নগর-পরিচালনার পরিচয় মেলে।

বাড়ীঘর ঃ সিন্ধু-অঞ্চলে আবিষ্কৃত বাড়িঘর তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—(১) বাসগৃহ (২) বৃহৎ ভবন ও (৩) স্নানাগার। সেখানে দুই কক্ষবিশিষ্ট ছোট

ছোট বাসগৃহ থেকে, প্রাসাদের মত বিরাট গৃহও ছিল। প্রতি বাড়িতে ইট বাঁধানো উঠান, প্রশস্ত শয়নকক্ষ ও স্নানকক্ষ ছিল এবং এই স্নানাগার থেকে নর্দমা-পথে জল বের

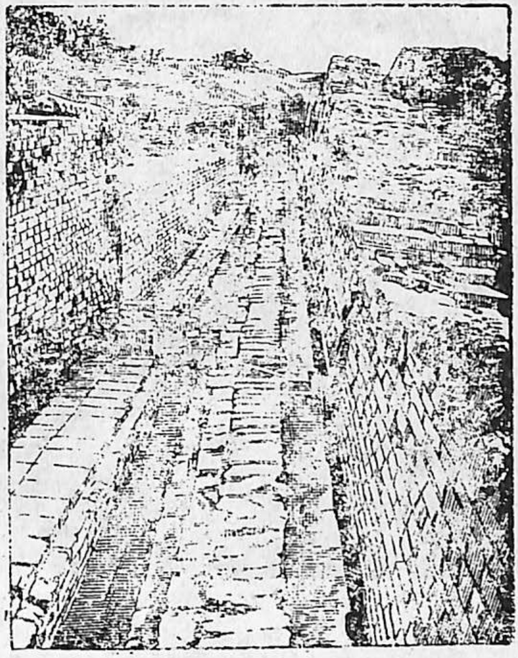


মহেঞ্জোদড়োর পথ

হয়ে রাজপথের বড় নর্দমায় ফেলার ব্যবস্থা ছিল। বাড়িগুলি বড় ও ছোট পথের ধার দিয়ে সাজানো ; বাড়িতে পথের দিকে দেওয়ালে দরজা, জানালা থাকত না, এগুলি থাকত ভিতরের উঠানের দিকে। নগরটি রাজপথ দিয়ে বিভিন্ন পল্লীতে বিভক্ত ছিল। পল্লীর অট্টালিকাগুলি ছোট ছোট প্রকোষ্ঠে ভাগ করা, রাজপথের ধারের অট্টালিকার নিচের তলায় দোকান এবং পাশের গলি থেকে ভিতরে প্রবেশের পথ। বাড়ি একতলা এবং একাধিক তলাবিশিষ্ট হত। গৃহের ছাদ ছিল সমতল ও কাঠ দিয়ে তৈরী। বাড়িগুলি ছিল মজবুত ও বসবাসের পক্ষে আরামদায়ক।

হরপ্পার ১৬৯ ফুট দীর্ঘ ও ১৩৫ ফুট চওড়া ভবনটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এটি শস্য মজুত রাখবার ভাণ্ডার-ভবন বলে অনুমান করা হয়। প্রতি গৃহে কূয়া ও স্নানাগার

ছিল। তা ছাড়া সাধারণের ব্যবহারের জন্য বৃহৎ স্নানগৃহে ৩৯ ফুট × ২৩ ফুট × ৮ ফুট গভীর সাঁতার-পুকুর ছিল। এর চারদিক ১ ইঞ্চি পুরু শিলাজতুর (Bitumen)



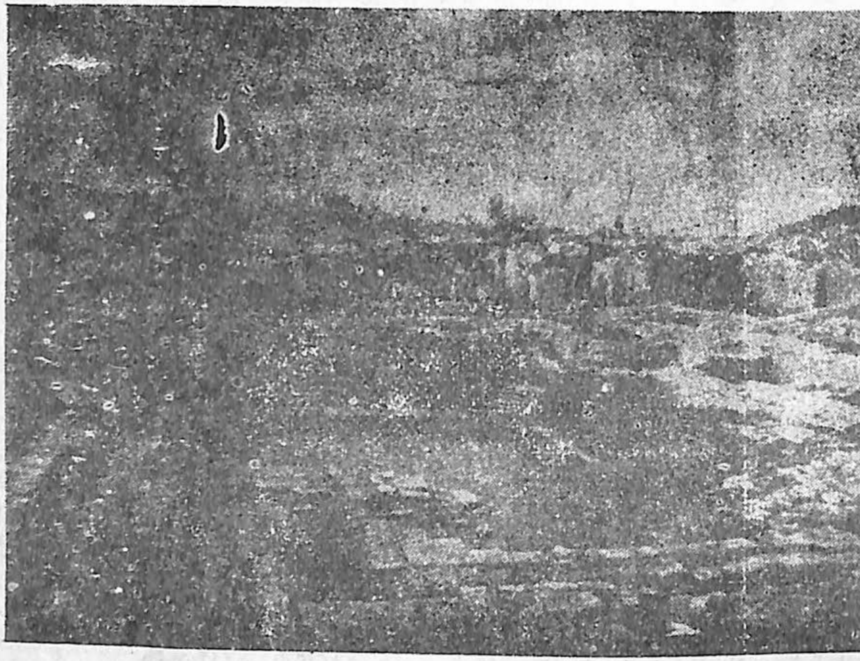
জলনিকাশের নর্দমা

প্রলেপ দিয়ে একসারি মসৃণ ইট গেঁথে এগুলি জলনিরোধক করা এবং শীতল ও উষ্ণ জলে স্নানের ব্যবস্থা হরপ্পা সভ্যতার উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

সমাজ ঃ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত বস্তুসমূহ থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, সেখানকার সমাজের লোক চারশ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যথা—(১) বিদ্বান সম্প্রদায়, (২) যোদ্ধা, (৩) ব্যবসায়ী ও শিল্পকর্মী এবং (৪) শ্রমিক। বিদ্বান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরা হত পুরোহিত, চিকিৎসক, গণক ও যাদুকরকে ; যোদ্ধাদের কাজ ছিল দুর্গ ও দেশ রক্ষা করা ; ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য চালাত ও শিল্পকর্মীরা রাজমিস্ত্রি, তাঁতী, স্বর্ণকার প্রভৃতির কাজ করত। শ্রমিকেরা গৃহভৃত্য, চাষী-মজুর, জেলে, চামড়ার কাজ ইত্যাদিতে নিযুক্ত থাকত।

খাদ্য ও পোশাক পরিচ্ছদ ঃ সিন্ধু অঞ্চলের লোকেরা খাদ্য হিসাবে **গম, যব, ধান,**

খেজুর, শাকসব্জি ব্যবহার করত। এর সঙ্গে থাকত গরু-ভেড়া-শূকর-কুমির, কচ্ছপ ও মুরগীর মাংস, নদীর মাছ, সমুদ্রের শুক্‌না মাছ, দুধ ইত্যাদি। **পশম** ও



সাঁতার পুকুর

সূতীবস্ত্রের ব্যবহার ছিল। মেয়ে ও পুরুষের পোষাকে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। উভয়েই অলংকার পরত। মেয়েদের অলংকারের মধ্যে ছিল সোনা, রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ ও রঙিন পাথরের মালা, ব্রেসলেট, কানের দুল, আংটি প্রভৃতি। মেয়েরা বেণী ও খোঁপা করে চুল বাঁধত, খোঁপায় গুঁজত সোনা কিংবা গজদন্তের চিরুণি। প্রসাধনে কাজল, পাউডার, সুগন্ধি ও ওষ্ঠরঞ্জনী (lip-stick) ব্যবহার করত। কাচের আয়না ছিল না। মসৃণ প্রতিফলনকারী ব্রোঞ্জের ফলক মুকুরহিসাবে ব্যবহৃত হত।

খাদ্য—গম ইত্যাদি শস্য; পরিচ্ছদ-সূতী ও পশমবস্ত্র; অলংকার-সোনারূপা ইত্যাদি ধাতুনির্মিত; প্রসাধন সামগ্রী কাজল ওষ্ঠ-রঞ্জনী আয়না, সুগন্ধি

গৃহস্থালীর সামগ্রী : দৈনন্দিন গৃহস্থলীর কাজে ব্যবহৃত দ্রব্যের মধ্যে ছিল চৌকি-পালংক, ঝিনুক ও তামার প্রদীপ, সূতার সলিতাযুক্ত মোমবাতি, পোড়ামাটির রান্নার বাসনকোসন, সূচ বড়শি, ব্রোঞ্জ ও তামার ছুরি, কাস্তে, করাত প্রভৃতি। এ যুগে

লোহার ব্যবহার জানা ছিল না। পাশা খেলার রেওয়াজ ছিল। ছোটদের জন্য নানারকম সুন্দর খেলনা-পুতুল তৈরী করা হত, যেমন জীবজন্তুর ছোট ছোট প্রতিমূর্তি, চাকাওয়ালা মাটির টানা-গাড়ি ও চেয়ার।

তৈজস সামগ্রী চৌকিপালংক; বাসনকোসন. নানারকম খেলনা; লোহার ব্যবহার অজ্ঞাত

আর্থিক অবস্থা ঃ প্রচুর খাদ্যশস্যের উৎপাদন, নদীকে অবলম্বন করে যোগাযোগ,



পাথরের মূর্তি—হরপ্পা সভ্যতা



মহেঞ্জোদড়োর নর্তকী মূর্তি

জলসেচ ও ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধার জন্য সিন্ধু উপত্যকায় উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠতে পেরেছিল। সিন্ধুর পলি-বিছানো উর্বর মৃত্তিকা ছিল শস্য উৎপাদনে খুবই অনুকূল। বড় বড় শস্য গোলা থেকে অনুমান করা হয়, কর (tax) হিসাবে জমির ফসল গ্রহণ করা হত। ভারতের মধ্যে কাশ্মীর, মহীশূর, ও নীলগিরি এবং বাইরে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া এমন কি সমুদ্রপথে মিশর ও ব্যাবিলনের সঙ্গেও লোকেদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল বলে জানা যায়। বাণিজ্য ছিল সমৃদ্ধির অন্যতম উপায়।

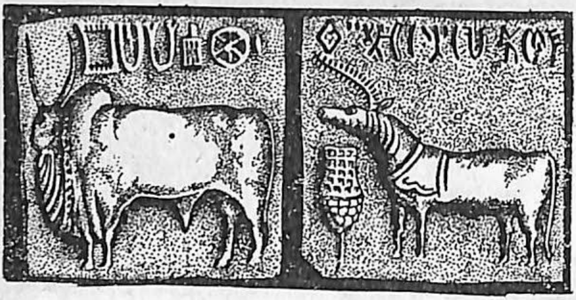
প্রচুর খাদ্যশস্য; বাণিজ্য সম্পদপ্রদ

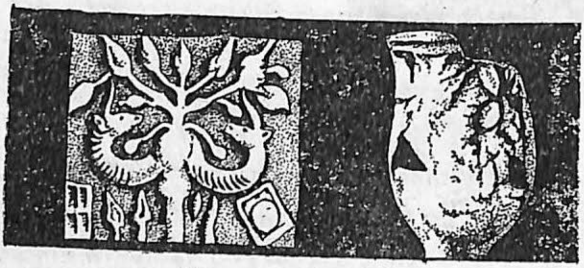
ধর্ম ঃ মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় মন্দির বা দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যায় নি। তবে

সীলমোহর ও পোড়ামাটির ছোট ছোট মূর্তি প্রভৃতি থেকে লোকেদের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। জগন্মাতা প্রকৃতিমাতার সঙ্গে ত্রিমুখ পশুপতি যোগীশ্বর শিবের উপসনা করা হত। এ ছাড়া কতকগুলি প্রতীক চিহ্নথেকে অনুমান করা যায় লিঙ্গপূজারও প্রচলন ছিল। দেবীপূজায় ছাগবলি হত, পাথর জীবজন্তু ও বৃক্ষদেবতারও বন্দনা করা হত বলে মনে হয়। মহেঞ্জোদড়োতে যে ভক্তিবাদ অর্থাৎ ভক্তকর্তৃক ভগবানের উপাসনা প্রচলিত ছিল তারও নিদর্শন মেলে।

মন্দির বা দেবমূর্তি পাওয়া যায় নি, সীলমোহর ও ছোট মূর্তি থেকে ধারণা, জগন্মাতার উপাসনা, পশুপতি শিব ও লিঙ্গ পূজা প্রচলিত ছিল; ভক্তিবাদ

বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ (Relation with Outside World): মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে যে সিন্ধু অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।





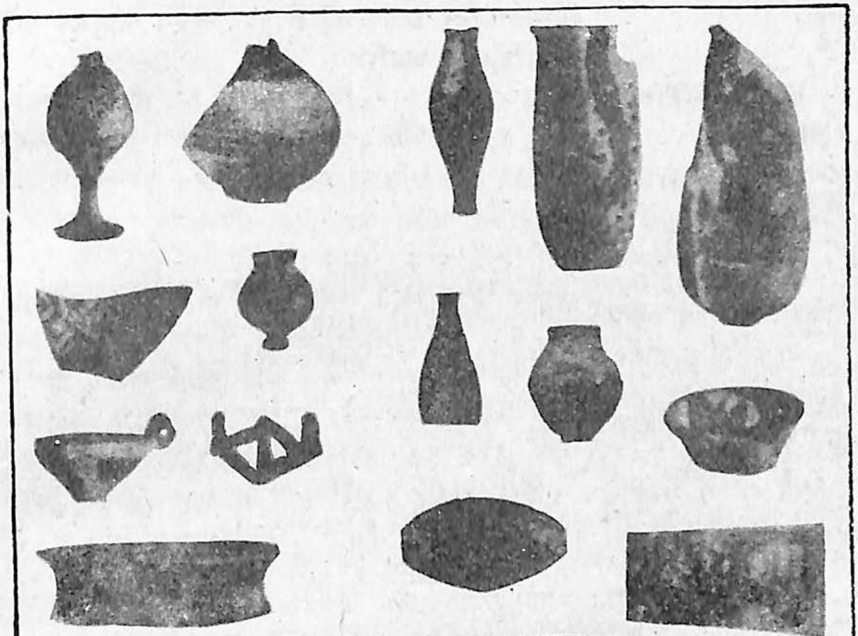
সীল (হরপ্পা সভ্যতা)

মেসোপটেমিয়ার শ্বেতপাথরের সীলমোহর, লালরঙের পাথর, পাথরে খোদাই করা পাত্র, মাটির পাত্র প্রভৃতি সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া গেছে। সিন্ধু উপত্যকার নারীদের কেশবিন্যাস রীতি ও-দেশের নারীদের প্রসাধন রীতিতে লক্ষ্য করা যায়। সুমের ও মেসোপটেমিয়ায় মহেঞ্জোদড়োর মত সীলমোহর পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদড়োতেও ওদেশের চিত্রলিপির নিদর্শন

সুমের ও মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে সিন্ধু অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল

মিলেছে। এ সকল থেকে একটা বিষয় নিশ্চিত যে, এই দুই প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে যোগাযোগ ছিল।

হরপ্পা সভ্যতার স্রষ্টা ঃ কোন্ জাতির লোক হরপ্পা সভ্যতা গড়ে তুলেছিল একথা সঠিকভাবে বলা কঠিন, কারণ নৃতাত্ত্বিক, ভাষাগত বা ঐতিহ্যগত এমন কোন তথ্য



মৃৎশিল্প, মোহেনজোদেড়ো

এখনো পাওয়া যায় নি যার ভিত্তিতে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে পৌছান যায়। করো মতে এখানকার সভ্যতার স্রষ্টারা ছিল সুমারীয়, কারো মতে এরা ছিল দ্রাবিড়। আবার কেউ কেউ বলেন, সুমারীয় ও দ্রাবিড় একই জাতি। এঁদের অনুমান এক সময়ে দ্রাবিড়গণ পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তানসহ সারা ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল। যুক্তিস্বরূপ এঁদের বক্তব্য, আফগানিস্তানের ব্রাহুই জাতির লোকেরা এখনও দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলে।

হরপ্পা সভ্যতার স্রষ্টা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত:

এমন মতবাদও প্রচলিত আছে যে, সিন্ধু উপত্যকার লোকেরা আর্য ছিল তবে এর কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। হরপ্পা সভ্যতা যে বৈদিক সভ্যতা থেকে পৃথক, বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার জন মার্শাল যুক্তিসহকারে তা প্রমাণ করেছেন। বর্তমানে এই মত প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য এবং স্বীকৃত যে, হরপ্পা সভ্যতা ছিল নগরসভ্যতা কিন্তু বৈদিক সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছিল গ্রামীণ সভ্যতারূপে।

কারো মতে দ্রাবিড়গণ এর স্রষ্টা; কেউ বলেন, স্রষ্টা আর্যরা; এ মত স্বীকৃত নয়

বিশেষজ্ঞরা মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত নরকঙ্কাল ও নরমুণ্ড পরীক্ষা করে বলেন, এখানে ককেশীয়, ভূমধ্যসাগরীয়, আলপীয় ও মঙ্গোলীয়—এই চার জাতীয় লোক ছিল। কিন্তু এর দ্বারা এ সভ্যতার স্রষ্টা কোন্ জাতি তা প্রমাণ করা যায় না। সর্ববাদীসম্মত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ধরে নেওয়া যায় যে, ভারতবর্ষেরই কোন অঞ্চলের লোক নদীতীরের অনুকূল পরিবেশে এই সভ্যতার পত্তন করেছিল।

নরকঙ্কাল ও নরমুণ্ড পরীক্ষায় বিভিন্ন জাতির মানুষের অস্তিত্ব জানা যায় ; এ সভ্যতা ভারতের লোকেদেরই-এ মতবাদ প্রচলিত আছে

হরপ্পা সভ্যতার পরিণতি ঃ হরপ্পা সভ্যতা কিভাবে বিলুপ্ত হয় তা সঠিকভাবে জানা যায় না। (১) সিন্ধুনদের উপর নির্ভশীল সভ্যতা সিন্ধুর বন্যায় বিপন্ন হয়েছিল, সন্দেহ নেই। পর পর নয়বার বন্যায় শহর ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবু লোকেরা পুরাতন বাড়ির ওপর নতুন করে বাড়ি তৈরী করেছিল, মাটির স্তর খুঁড়ে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। (২) উপত্যকা অঞ্চলের অরণ্য বিনষ্ট হওয়ায় জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে এবং দেশ মরুসদৃশ হয়ে যায়। গৃহনির্মাণের জন্য ইট পোড়াবার জন্য কাঠ সংগ্রহ করতে বনাঞ্চল বিনাশ করা হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা এবং তার ফলেই জলবায়ুর শুষ্কতা বৃদ্ধি। (৩) সর্বশেষে বিদেশী, সম্ভবত উন্নত-অস্ত্রধারী অশ্বব্যবহারকারী আর্যদের-আক্রমণে আনুমানিক ১৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে হরপ্পা সভ্যতার বিলোপ ঘটে। পরবর্তীকালে আর্যদের ধর্ম ও কর্মজীবনে হরপ্পা সভ্যতার প্রভাব পড়েছিল বলে ঐতিহাসিকেরা প্রমাণ করেছেন।

সিন্ধুনদের বান ; বনাঞ্চল ধ্বংসে হওয়ায় জলবায়ুর শুষ্কতা, উন্নত অস্ত্রধারী শত্রুর আক্রমণ

৩.

বৈদিক যুগ

আর্যগণ-তাঁদের আদি বাসভূমি (The 'Aryans'—Their original homeland) **:** (ক) নৃতাত্ত্বিকগণ বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে ভিন্ন ভিন্ন নামে জাতিবিভাগ করেছেন, যেমন নিগ্রিটো, মঙ্গোলীয়, মেডিটেরানিয়ান প্রভৃতি। 'আর্য' বলে কোন নরগোষ্ঠী নেই। প্রকৃতপক্ষে **আর্য** একটি ভাষাগোষ্ঠীর নাম। ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা দেখেছেন, সংস্কৃত, গ্রীক, জার্মান প্রভৃতি ভাষার মূল আর্যভাষা। তাঁদের ধারণা ভারতীয় আর্য এবং ইউরোপীয় গ্রীক জার্মান প্রভৃতি জাতির লোকের পূর্বপুরুষ আদিতে একই স্থানে বসবাস করত এবং একই ভাষা ব্যবহার করত। এঁরাই আর্য নামে অভিহিত হয়।

আর্য জাতি নয় সংস্কৃত গ্রীক জার্মান প্রভৃতি ভাষাভাষীরা আর্য নামে পরিচিত

আর্যদের আদি বসতি কোথায় ছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, আর্যরা মধ্য ইউরোপ বা মধ্য এশিয়ার প্রান্তরে বাস করত। আবার কারো ধারণা, তারা মেরুদেশের বাসিন্দা ছিল। এখন অবশ্য প্রায় সকলেরই সিদ্ধান্ত এই যে, ইউরোপের পোল্যাণ্ড থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত তৃণভূমি অঞ্চল আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল। তৃণ অঞ্চলে ঘোড়া পোষ মানিয়ে তারা দুই-চাকার গাড়িতে জুড়ে চালাতে শিখেছিল। দু হাজার খৃস্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে এরা পশুচারণভূমির সন্ধানে দলে দলে পূর্বে, পশ্চিমে, দক্ষিণে অগ্রসর হয়। এদের একদল উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। এই অনুপ্রবেশ বহুদিন ধরে ঘটে আর এদের আক্রমণেই ব্রাহুই উপত্যকা অঞ্চলের প্রাচীন গ্রামীণ সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। পরে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর বিলুপ্তি ঘটিয়ে আর্যরা ভারতে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলে।

আর্যদের আদি বসতি সম্বন্ধে মতভেদ। বর্তমানে প্রায় সর্বস্বীকৃত মত এই যে, পোলাণ্ড হতে মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি অঞ্চল আর্যদের আদি বাসভূমি

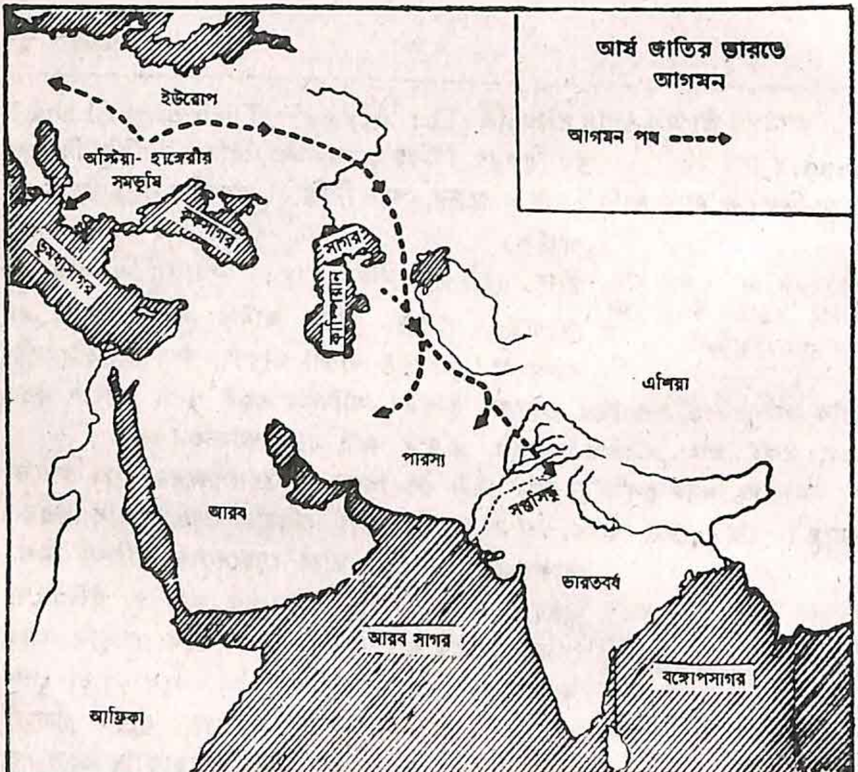
আর্যদের প্রথম সাহিত্য কর্ম—ঋক্‌বেদ

আর্যদের সর্বপ্রধান ধর্মগ্রন্থ **ঋক্‌বেদ** পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মপুস্তক। এই গ্রন্থ

১০২৮টি প্রার্থনা স্তোত্রে সম্পূর্ণ। ঋক্‌বেদ সম্ভবত খৃস্ট পূর্ব ১৫০০ থেকে ৯০০ অব্দের মধ্যে রচিত। ঋক্‌বেদকে বলা হয় অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন মানুষ এর রচয়িতা নন, দ্রষ্টা। আচার্য-শিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে বেদ শ্রুত হয়ে এসেছে। তাই বেদের নাম 'শ্রুতি'। পরবর্তীকালে সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ সংকলিত হয়।

বেদ অপৌরুষেয়া অর্থাৎ কোন ব্যক্তির রচিত নয় ; বেদ শ্রুতি।

ঋক্‌বেদের যে স্তুতিগুলি যজ্ঞের সময় সুর-তালসহযোগে গান করা হত সেগুলি



সামবেদ, যাগযজ্ঞের পদ্ধতি ও মন্ত্রগুলি **যজুর্বেদ,** আর ভূতপ্রেত-দানব ও হিংস্র জীবজন্তু থেকে রক্ষা পাওয়ার মন্ত্রতন্ত্রের সংকলন **অথর্ববেদ**। ঋক্ যজুঃ, সাম—পদ্য, গদ্য ও গীতি, এই তিন প্রকার মন্ত্র **ত্রয়ীবিদ্যা** নামে অভিহিত। অথর্ববেদ অন্য তিনটিবেদের পরে রচিত হয়েছিল, সম্ভবত এর স্থান ছিল অন্যান্য বেদের নিচে।

ঋক, সাম, যজুঃ অথর্ব-চারি বেদ

৩ (খ) বৈদিক সাহিত্য (Vedic Literature)

'বেদ' শব্দ বিদ্ ধাতু (অর্থ 'জানা') থেকে গঠিত। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'জ্ঞান'। বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য বলেন, বেদ থেকে ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহার সম্বন্ধে অলৌকিক উপায় জানা যায়, প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা যে উপায় জানা যায় না, বেদ দ্বারা সেই উপায় লাভ করা যায়।

বেদ অর্থ 'জ্ঞান'

বৈদিকযুগ শেষ হওয়ার আগেই চিন্তাশীল আর্যগণ বহুবিধ বিষয় অবলম্বনে বিস্তৃত সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। মন্ত্র, স্তুতি, প্রাকৃতিক শক্তির অর্চনায় কাব্যময় প্রার্থনাগীতি ছাড়াও পুরাণ, গণিত, অর্থবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রচারিত হয়েছিল। ঋষিরা মানুষের মত করেই নৈসর্গিক শক্তির বা ঘটনাবিশেষের রূপকল্পনা ও নামকরণ করেছেন। নাম-রূপ-সমন্বিত এই সকল শক্তিই বেদের দেবতা বলে পরিগণিত। অধিকাংশ দেবতারই পুরুষ-আকৃতি কল্পিত হয়েছে। স্ত্রী দেবতার স্থান গৌণ।

বৈদিক যুগে বহু বিষয়ক বিস্তৃত সাহিত্য রচিত হইয়াছিল।

সংহিতা : প্রতিটি বেদের চারিভাগ : (১) সংহিতা বা মন্ত্রাংশ ; (২) ব্রাহ্মণ, (৩) আরণ্যক ; (৪) উপনিষদ্। মন্ত্রাংশ হল স্তুতি, আশীর্বাদ ও প্রার্থনামূলক সূক্ত (গাথা) দ্বারা পূর্ণ। এগুলি চারিটি সংহিতায় সংকলনে গ্রথিত। যথা, ঋক্-সংহিতা, সাম-সংহিতা, যজুঃ সংহিতা এবং অথর্ব-সংহিতা। **ঋক্ সংহিতা** বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত স্তুতি প্রার্থনা ইত্যাদি। এই সর্বপ্রধান ভাগ। **হোতা** ঋক্ মন্ত্রের দ্বারা দেবতার আবাহন করতেন। **সামবেদ-সংহিতা** প্রধানত ঋক্‌বেদ থেকে সংকলিত গাথার সমষ্টি। **উদ্‌গাতা** সামগান দ্বারা আহুত দেবতার স্তুতি করতেন। **যজুর্বেদ-সংহিতায়** ঋক্‌মন্ত্রসহ যজ্ঞ সম্পাদনের বিধি নির্দিষ্ট আছে। **অধ্বর্যু** যজুর্মন্ত্র পাঠ করে অগ্নিতে 'হব্য' আহুতি দিতেন। **অথর্ববেদ সংহিতা** রোগমুক্তি, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, ভূত-প্রেতাদি বিতাড়ন প্রভৃতি বিষয়ক মন্ত্রতন্ত্রের সংকলন। এ ছাড়া অথর্ববেদ সংহিতায় জীবধাত্রী বসুমতীর উদ্দেশ্যে রচিত এমন কতকগুলি স্তোত্র আছে যা লালিত্য ও কাব্যসৌন্দর্যে অনবদ্য।

ব্রাহ্মণ : মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই উভয় অংশ নিয়ে বেদ। মন্ত্র বলতে স্তুতি, আশীর্বাদ ও প্রার্থনামূলক সূক্তসমুদয় বুঝায়। বেদের ব্যাখ্যা এবং যজ্ঞের সঙ্গে মন্ত্রগুলির সম্বন্ধ ও তার বিবরণ হল ব্রাহ্মণ। এই গ্রন্থ প্রধানত গদ্যে লিখিত। ব্রাহ্মণগুলিতে তদানীন্তন সভ্যতার বহু তথ্য, যেমন বর্ণাশ্রম, বিবাহ, দাহসংস্কার, খাদ্যপানীয়, নৃত্যগীত, ভূগোল, জ্যোতিষ, পুরাকাহিনী, যুদ্ধবিদ্যা, রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি যথাদৃষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক বেদেরই ব্রাহ্মণ অংশ আছে।

আরণ্যক : আরণ্যক ব্রাহ্মণেরই অংশ বিশেষ। এতে তত্ত্বজিজ্ঞাসু অরণ্যবাসীদের ধ্যান ও উপাসনার বিষয় আলোচিত হয়েছে। এর ভাষা ও রচনাশৈলী ব্রাহ্মণের মতই।

উপনিষদ্ঃ উপনিষদ আরণ্যকের অন্তর্গত। উপনিষদ বেদের অন্তখণ্ড, তাই তার অন্য নাম **বেদান্ত**। এতে ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা ও তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপায় ইত্যাদি উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বসমূহ স্থান পেয়েছে। খৃস্টপূর্ব ৪০০ অব্দের মধ্যে উপানিষদগুলি রচিত হয়েছিল। এ পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় ১১২ খানা উপনিষদ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে কঠ, ঈশ, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রমুখ উপনিষদ ভাব ভাষা ও বিষয়-গৌরবে বিশ্বে তুলনাহীন।

সূত্র ঃ প্রকৃত বৈদিক সাহিত্য বলতে বেদ—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থ, যেগুলি 'শ্রুতির' অন্তর্গত সেগুলিই বোঝায়। ঋষি-দৃষ্ট এইরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞান-চিন্তার প্রকাশ ছাড়াও এক শ্রেণীর রচনা আছে যা বেদাঙ্গ অর্থাৎ বেদের অতিরিক্ত অঙ্গ হিসাবে পরিচিত। বেদাঙ্গ 'শ্রুতির' মত গুরুত্বপূর্ণ নয়। যাদের জ্ঞাননেত্রে বেদের বাণী প্রতিভাত হয়েছিল তাঁদের স্মৃতি বা ঐতিহ্য-পরম্পরা স্মৃতি নামে পরবর্তী প্রজন্মে চলে এসেছে। মনে রাখার সুবিধার জন্য বিষয়গুলি গদ্যে সংক্ষিপ্ত **সূত্র** আকারে প্রচারিত হয়। এর কোন অংশ পরে পদ্যে রূপান্তরিত হয়েছিল।

বেদাঙ্গ ৬টি ঃ (১) শিক্ষা (ভাষার ধ্বনি বিজ্ঞান), (২) কল্প (যজ্ঞের রীতিপদ্ধতি) (৩) ব্যাকরণ, (৪) নিরুক্ত (শব্দ প্রকরণ) (৫) ছন্দ ও (৬) জ্যোতিষ। শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ **প্রাতিসাক্য সূত্র** বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; এর সাহায্যে বৈদিক স্তোত্রের সঠিক উচ্চারণ নির্ধারণ করা হয়। কল্প সংক্রান্ত গ্রন্থ **শ্রৌতসূত্র** যজ্ঞসম্পাদনের বিধি নির্দেশ করে। **গৃহ্যসূত্রে** দৈনন্দিন জীবনে অনুষ্ঠিতব্য ক্রিয়াকর্মের বিধি লিপিবদ্ধ আছে। **ধর্মসূত্রে** আইনকানুন ও প্রশাসন-সংক্রান্ত বিধি সংকলিত। ব্যাকরণ, নিরুক্ত ও ছন্দ বিষয়ে **পাণিনি, যাস্ক** এবং **পিঙ্গলের** গ্রন্থ সর্বজনসমাদৃত।

৩ (গ) (i) আর্যদের সমাজজীবন ঃ

পশুপালন ও আধা-যাযাবর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত আর্যগণ ভারতের নদী-উপত্যকায় উর্বর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে কৃষিনির্ভর শান্ত গ্রামীণ সভ্যতা গড়ে তোলে। তাদের উন্নত চিন্তাধারা ধর্ম, সাহিত্য ও সমাজব্যবস্থাকে নতুন রূপ দিয়েছিল। **পিতৃপ্রধান** পরিবার আর্যদের সমাজজীবনের ভিত্তি ছিল। পরিবারের কর্তাকে বলা হত **গৃহপতি**। তাঁর আদেশ পরিবারের সকলেই মান্য করত। আইনের চোখে নারী স্বাধীন ছিল না। ভরণপোষণের জন্য তাকে পুরুষের আশ্রয়ে থাকতে হত। পত্নী স্বামীর সঙ্গে ধর্মানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন, তিনি ছিলেন সহধর্মিণী। **সমাজে নারীর মর্যাদা ছিল।** মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যেখানে নারী সম্মানিতা সেখানে দেবতা বিরাজ করেন। পুরুষের বহু-বিবাহ প্রচলিত থাকলেও পুরুষ সাধারণত এক বিবাহই করতেন।

পিতৃ-প্রধান পরিবার : নারী পরাধীনা হলেও সম্মানিতা

বর্ণাশ্রম ঃ ভারতে বসতি স্থাপনের প্রথম দিকে আর্যদের জীবন ছিল সরল। ক্রমে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও বসতিবিস্তারের সঙ্গে জীবনযাত্রায় জটিলতা বাড়তে থাকে।

তখন **গুণ এবং কর্ম অনুসারে সমাজের মানুষ চারশ্রেণীতে বিভক্ত হয়।**

গুণ-কর্ম-বিভাগ অনুসারে চার বর্ণ স্বীকৃত;

পূজাপার্বণ ও শাস্ত্র-আলোচনায় ব্যাপৃত লোকেরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। এঁরা সৎচিন্তা ও পবিত্র জীবনযাপনের ভিতর দিয়ে পরমব্রহ্মকে জানার সাধনা করতেন, তাই ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ। এঁরা ছিলেন সমাজের সকলের নমস্য।

যুদ্ধজয়, দেশরক্ষা প্রভৃতি কাছে নিযুক্ত সাহসী ব্যক্তিরা **ক্ষত্রিয়**। অস্ত্রচালনা ও রাজনীতিতে এদের দক্ষ হতে হত।

ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষি ও পশুপালনে নিযুক্ত-ব্যক্তিরা বৈশ্য নামে পরিচিত ছিলেন। এই তিন শ্রেণীর সেবাকার্যে রত লোকেরা শূদ্র।

সমাজ এই চার শ্রেণী বা বর্ণে বিভক্ত থাকলেও প্রথম দিকে এই বিভাগ-বিন্যাস কঠোর ছিল না। এক শ্রেণীর লোক রুচি, মানসিক প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী অন্য বৃত্তি বা কর্ম গ্রহণ করতে পারত। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে, বিশেষত প্রথম তিন শ্রেণীর মধ্যে, বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপনেও বাধা ছিল না।

কিন্তু বৈদিক যুগের শেষ দিকে জাতিপ্রথার কঠোরতা বৃদ্ধি পায়। তখন বৃত্তি-ত্যাগ বা অন্য বর্ণের লোকের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ প্রথা-হিসাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

খাদ্য ও উৎসব ঃ আর্যদের প্রধান খাদ্য ছিল যব, গম, দুধ, ফল-মূল, মাংস, ঘি, দই, মধু ইত্যাদি। উৎসবের সময় ও পারিবারিক আনন্দ-অনুষ্ঠানে মাংস, সোমরস ব্যবহারের প্রচলন ছিল। গো-মাংস অভক্ষ্য ছিল না, তবে ক্রমশ গাভী হত্যায় লোকের বিরূপ মনোভাব দেখা দেয়। সুরাপানও নিন্দনীয় বিবেচিত হত। ঋক্‌বেদে লবণের উল্লেখ নেই। কাজেই লবণ ব্যবহৃত হত কিনা বলা কঠিন।

কার্পাস, মৃগচর্ম বা পশমনির্মিত বস্ত্র বিবিধ রঙে রঞ্জিত করে ব্যবহারের রীতি ছিল। পূর্ণাঙ্গ পোশাক তিন অংশে বিভক্ত হত—**অন্তর্বাস** বা নীবি, এর উপর **বাস** বা পরিধান, সর্বোপরি **অধিবাস** বা উত্তরীয়। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই উষ্ণীষ (পাগড়ি) পরতেন। স্ত্রীলোকেরা দীর্ঘ চুলের বেণী রচনা করতেন নানা ভঙ্গিতে।

পুরুষদের মধ্যে বীরত্বব্যঞ্জক খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদের প্রচলন ছিল। অস্ত্র চালনার প্রতিযোগিতা, রথের দৌড়, যুদ্ধনৃত্য, বন্যজীব শিকার, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, নৃত্য, পাশাখেলা প্রভৃতি ছিল উৎসবের অঙ্গ। মেয়েরাও বাঁশি ও করতালের সঙ্গে নৃত্য করত এবং আমোদ উৎসবে যোগ দিত।

চতুরাশ্রম ঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের আর্যদের জীবন যে চারটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে বা আশ্রমে বিভক্ত ছিল তা চতুরাশ্রম (চতুঃ + আশ্রম) নামে কথিত। এগুলি **ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস।**

প্রথম পর্যায় **ব্রহ্মচর্য** আশ্রম। প্রত্যেক পুরুষকে কৈশোরে উপনয়ন (পৈতা) গ্রহণের পর গুরুগৃহে বাস করে অধ্যয়ন ও ভোগবিলাসহীন সুশৃঙ্খল জীবন-যাপন করতে হত। **দ্বিতীয়** পর্যায় **গার্হস্থ্য** আশ্রম বা সংসারী হওয়ার কাল। বিদ্যাশিক্ষা

অন্তে তরুণকে উপার্জন করে নিজ পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হত। **তৃতীয়** পর্যায় **বানপ্রস্থ** আশ্রম। বার্ধক্যে সাংসারিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ এবং একাকী অথবা পত্নীর সঙ্গে তপস্যা করবার জন্য বনে গমন। **চতুর্থ** পর্যায় **সন্ন্যাস**। সন্ন্যাস কথাটির অর্থ সৎ+ন্যাস অর্থাৎ উত্তম ত্যাগ। সৎ চিন্তা ও জপে-তপে জীবন কাটাবার জন্য সংসার বন্ধন ত্যাগ উত্তম ত্যাগ বলে বিবেচিত হ'ত। এই পর্যায়ে সংসারত্যাগী ব্যক্তি সন্ন্যাসীর মত ঈশ্বরচিন্তায় নিরিবিলিতে জীবন অতিবাহিত করতেন।

আর্যদের পারিবারিক জীবন ঃ পিতামাতা, ভাইবোন ও সম্পর্কিত অন্যান্য পরিজনদের নিয়ে ছিল আর্যদের পরিবার। আর্যদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি ছিল এই পরিবার। পরিবারের লোকেরা একই গৃহে বাস করত। প্রথম দিক কাঠ ও নলখাগড়া দিয়ে বাড়িঘর তৈয়ার হত। প্রতি গৃহে স্ত্রীলোকদের জন্য এবং বসবার জন্য পৃথক কক্ষ ছাড়া থাকত একটি অগ্নিশালা। বাড়ির কর্তাকে বলা হত 'গৃহপতি'। গৃহপতি অন্য সদস্যদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতেন কিন্তু প্রয়োজন হলে তিনি কঠোরও হতেন। এক পিতা অমিতব্যয়ী অসৎ-প্রকৃতির পুত্রকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন—বেদ-এ এমন কাহিনীর উল্লেখ আছে।

পিতৃপ্রধান পরিবার

আর্যদের অর্থ নৈতিক জীবন ঃ গ্রামকেন্দ্রিক আর্যসভ্যতা গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। কতকগুলি পরিবার দিয়ে গঠিত হত গ্রাম, গ্রামের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন **গ্রামণী** বা **গ্রাম-প্রধান**। কৃষি ও পশুপালন ছিল অর্থ নৈতিক জীবনের ভিত্তি। প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব কৃষিজমি ছিল তা ছাড়া প্রতি গ্রামে ছিল **খিল্য** অর্থাৎ সর্বসাধারণের পশুচারণযোগ্য তৃণভূমি। জলসেচ এবং জমিতে সার প্রয়োগের প্রথা জানা ছিল।

গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতা

গৃহপালিত পশু ঃ গোধন ছিল আর্যদের সম্পদ। যমুনার উপত্যকা অঞ্চল গো-সম্পদের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণী ছিল বলদ, ঘোড়া, কুকুর, ছাগল ও মেষ। গান্ধার দেশের মেষ পশমের জন্য বিখ্যাত ছিল।

শিল্পবাণিজ্য ঃ প্রধানত কৃষি ও পশুপালন দ্বারা জীবিকা অর্জন করলেও আর্যরা ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি বিমুখ ছিল না। বাণিজ্য সাধারণত বৈশ্য ও অনার্য 'পণি'দের হাতে ছিল। গরু ও 'নিষ্ক' নামক এক প্রকার স্বর্ণখণ্ড বিনিময়ের মাধ্যমরূপে প্রচলিত ছিল। পরিবহন-যান ছিল বলদে-টানা শকট, ঘোড়ায় টানা রথ ও হাতি। নদীপথে নৌকা ও সমুদ্রপথে জাহাজ যানবাহনরূপে জনপ্রিয় ছিল।

আর্যদের ধর্ম-জীবন ঃ আর্যগণ প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবদেবীরূপে কল্পনা করে উপাসনা করতেন। যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ছিল ধর্মাচরণের অঙ্গ। যজ্ঞে বেদীর উপর হোমাগ্নি জ্বেলে স্তবস্তুতি ও মন্ত্রপাঠের সঙ্গে আগুনে ঘি, দুধ, পিষ্টক, সোমলতার রস প্রভৃতি আহুতি দেওয়া হত। যজ্ঞের সময় পশুবলি দেওয়া ও সোমরস পান করার রীতি ছিল।

প্রাকৃতিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ দেখে ঋষিরা যেমন বিস্ময়ে তাদের স্তবস্তুতি করতেন, কবিতায় এদের জয়গাথা উচ্চারণ করতেন, তেমনি এইসব শক্তির আধারস্বরূপ **এক পরমশক্তির অস্তিত্বও** তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন।। ঋক্‌বেদে বলা হয়েছে, 'ঈশ্বর এক হলেও তাঁকে বহুভাবে বর্ণনা করা হয়।* ঋষিদের উচ্চ দার্শনিক চিন্তা হিন্দু সভ্যতাকে মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট শ্রদ্ধার আসন প্রদান করেছে। তাঁদের প্রজ্ঞা ও কর্মের সমন্বয় বিশ্বের সুধীসমাজে অতুলনীয় সম্পদ বলে সমাদৃত।

আর্যদের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক কার্যকলাপঃ (Political and Administrative Activities) আর্যদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি ছিল পিতৃ-প্রধান পরিবার। কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত হত গ্রাম। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে এক-একটি **বিশ্‌** বা **জন**। বিশ্‌ বা জনের শাসক এবং রক্ষক (গোপা) ছিলেন **রাজন** অর্থাৎ রাজা। রাজা প্রজাদের সর্বময় অধিপতি হলেও বৈদিক যুগের প্রথম দিকে তিনি বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ও জনসাধারণের পরামর্শ নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এ ব্যাপারে **সমিতি** এবং **সভা** নামক রাজ-সহায়ক প্রতিষ্ঠান দুটির ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবার গ্রাম বিশ

রাজার দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ রাজা ছিলেন জাতির জীবন ও সম্পত্তির রক্ষক। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ছিল তাঁর কর্তব্য। শত্রু আক্রমণ করলে রাজা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন, প্রজাদের কেহ অন্যায় করলে বিচার করে তার শাস্তি বিধান করতেন, রাজ্য পরিচালনার জন্য কর্মচারীদের সাহায্য নিতেন। রাজার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন **পুরোহিত**। পুরোহিত রাজার এবং রাজ্যের মঙ্গল কামনা করতেন, রাজাকে সুপরামর্শ দিতেন, যুদ্ধে জয়লাভ করলে রাজার জয়গান করতেন। **সেনানী** ছিলেন সৈন্যবিভাগের প্রধান। যুদ্ধের **প্রধান অস্ত্র** ছিল **তীরধনুক**—কিছু কিছু তীরের মাথায় বিষ মাখানো থাকত, আর কতকগুলি হত লোহা কিংবা তামার ফলকযুক্ত। এছাড়া **বর্শা, তরবারি** ও **কুঠারের** ব্যবহার ছিল। যুদ্ধের সময় নিশান ও সামরিক বাদ্যের প্রচলন ছিল। জনসাধারণের আচরণ এবং অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য রাজা গুপ্তচর নিয়োগ করতেন। বৈদিক সাহিত্যে জনসাধারণকে বলা হয়েছে রাজশক্তির মেরুদণ্ড এবং রাজা জনগণের প্রতিপালক।

৩ (গ) (ii) **বৈদিকযুগের শেষদিকের অবস্থাঃ** বৈদিকযুগের শেষদিকে রাজার শক্তি বৃদ্ধি পায়। কেউ কেউ নিকটবর্তী অন্য রাজ্য জয় করে 'সার্বভৌম রাজা' 'একরাট্‌' বা সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। অশ্বমেধ, রাজসূয়, বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান করে এমন গৌরবসূচক উপাধি ধারণ করা হত। রাজা প্রজাদের নিকট হতে **বলি, শুল্ক** ও **ভাগ**—তিন প্রকার রাজকর আদায় করতেন। বনাঞ্চল পরিষ্কার করে এবং অঞ্চল জয় করে রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করা হতে থাকে ; রাজার ক্ষমতা

---

* একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি (ঋক্‌বেদ ১ম মণ্ডল, ১৬৪ সূক্ত ৪৬ শ্লোক)

বৃদ্ধি পেতে থাকায় অনেকে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেন। রাজা সমর ও বিচার ব্যবস্থার পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন, তিনি হন জনসাধারণের রক্ষক এবং শত্রুদমনকারী।

(ঘ) উপমহাদেশে আর্যসভ্যতার বিস্তার ঃ বৈদিকযুগে আর্যগোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা কাবুল থেকে উচ্চ-গঙ্গা অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করেছিল। এই রাজারা স্থানীয় ভারতের আদিবাসী অ-আর্যদের মধ্যে রাজ্যস্থাপন করে তাদের প্রতিরোধের মুখে নিজেদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। অ-আর্যদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াও আর্যগোষ্ঠীর লোকেরা অনেক সময় নিজেদের মধ্যেও কলহে লিপ্ত হতেন। বৈদিকযুগের শেষদিক রচিত গ্রন্থাদিতে সর্বপ্রথম বিশাল নগরীর উল্লেখ দেখা যায়। রাজশক্তি ও রাজ্যের অঞ্চল বৃদ্ধির সঙ্গে উন্নত নগর নির্মাণ ও সমৃদ্ধ জীবনযাত্রার প্রবর্তন হয়েছিল।

রাজশক্তি বৃদ্ধির ফলে আর্যসভ্যতা পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে বিস্তারলাভ করতে থাকে। রাজ্যের পরিধিবিস্তারে রাজন্যবর্গ এবং পুরোহিতদের ভূমিকা ছিল প্রধান। পরবর্তী বৈদিকযুগ শেষ হওয়ার আগেই গঙ্গা, যমুনা ও সদানীরা (রাপ্তী বা গণ্ডক নদী) প্রবাহিত উর্বর অঞ্চল অধিকার করে আর্যসভ্যতার আওতায় আনা হয়েছিল। আর্যদের জ্ঞান-ধর্ম সভ্যতার কেন্দ্র ভূমি সরস্বতী থেকে গাঙ্গেয় দোয়াব পর্যন্ত বিস্তৃত ধ্রুব মধ্য-দেশ (**ধ্রুবা মধ্যমা দিশ্** 'firm middle country') কুরু, পাঞ্চাল ও অন্য কয়েকটি পার্শ্ববর্তী গোষ্ঠীর অধিকারে এসেছিল। এই অঞ্চল থেকে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা যে-প্রান্ত প্রদেশগুলিতে বিস্তারলাভ করে তা হল—সরযূ ও বরণাবতীর জলধৌত কোশল ও কাশীদেশ, গণ্ডকনদীর পূর্বে বিদেহগণ কর্তৃক অধ্যুষিত জলাভূমি এবং বিদর্ভগণ কর্তৃক অধিকৃত ওয়ার্ধা উপত্যকা। এই আর্য-ভূমির বহির্দেশে বাস করত পূর্ব বিহারের অঙ্গগণের মত মিশ্রগোষ্ঠী, দক্ষিণ বিহারের মগধগণ, উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রদের মত 'দস্যু' বা আদিবাসীগণ, বিন্ধ্যপর্বতের অরণ্য-অঞ্চলের পুলিন্দ ও শবরগণ এবং গোদাবরী উপত্যকার অন্ধ্রগণ। ভারতের এই সকল অঞ্চলে আর্যসভ্যতা বিস্তার করা আর্যদের লক্ষ্য ছিল।

পরবর্তীকালে উপনিষদের যুগে বিদেহরাজ্য ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলনের ব্যাপারে অন্যান্য অঞ্চলকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির পৃষ্ঠপোষক রাজা জনক 'সম্রাট' আখ্যা লাভ করেছিলেন ; তিনি একাধারে রাজা এবং প্রজ্ঞার জন্য ঋষি বলে গণ্য হতেন। রাজর্ষি জনকের সভায় কুরু-পাঞ্চালদেশের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটেছিল। আর্যসভ্যতার এইরূপ উজ্জ্বল কেন্দ্র ভারতের অ আর্য অঞ্চলে আর্য ভাবধারা ও জীবনচর্যা প্রসারে সহায়ক হয়েছিল।

দক্ষিণ ভারতে আর্যসভ্যতার বিস্তার ঃ উত্তর ভারতের নদী উপত্যকায় সমভূমি অঞ্চলে আর্যধর্ম ও চিন্তাধারা প্রসার যেমন সহজ হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে তেমন হয়নি। ঐতিহাসিক অধ্যাপক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী A History of South India গ্রন্থে বলেছেন, দক্ষিণ ভারতে আর্যীকরণ নিঃসন্দেহে কয়েক শতাব্দী ধরে ধীর-

গতিতে চলেছিল। আনুমানিক ১০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে এর সূত্রপাত, খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বৈয়াকরণ কাত্যায়নের সময়ে এর পরিপূর্ণতা ; তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থে সর্বদক্ষিণের তামিল দেশগুলির নাম স্থান পেয়েছে।*

কখন কোন্ পথে আর্যসভ্যতা উত্তর ভারতথেকে দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ ক'রে দেশের সর্বদক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে ঐতিহাসিকগণ তার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ দিয়েছেন। দেখা যায়, খৃষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ পর্যন্ত উত্তর ভারতে রচিত গ্রন্থাদিতে বিন্ধ্য-পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত দেশগুলির কোন কথা বিশেষ নেই, ক্রমে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে পৌরাণিক কাহিনীতে দক্ষিণ দিকে আর্যদের অগ্রগতির আভাস পাওয়া যায়।

একজন আধুনিক ঐতিহাসিকের অভিমত এই যে, অগস্ত্যের কাহিনীর মধ্যে প্রাচীন ইতিহাস-স্মৃতি নিহিত আছে। যে সকল আর্যযোদ্ধা দক্ষিন ভারতে আর্যসভ্যতা বিস্তারে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন অগস্ত্য তাঁদেরই প্রতিভূ। পরবর্তী যুগে অগস্ত্যকে তপস্বীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে কিন্তু বাস্তবে তিনি ছিলেন নিপুণ শিকারী এবং সাহসী যোদ্ধা, সব রকম বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে যিনি অনার্যদের দেশে আর্য-সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। অগস্ত্য বিন্ধ্যপর্বতকে নীচু হয়ে থাকার যেমন নির্দেশ দিয়েছিলেন তেমনি সমুদ্রের জলপান করে সমুদ্র শুকিয়ে ফেলেছিলেন বলেও পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে। এই দুই রূপক কাহিনীর অন্তরালে যে সত্য আছে বলে মনে করা হয়, তা হল বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে আর্যসভ্যতার প্রসার এবং সাগর পার হয়ে সিংহল ও পূর্বভারতীয় দ্বীপসমূহে তার বিস্তার। অধ্যাপক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতে এই ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে শুধু ন্যায়সঙ্গতই নয় অগস্ত্য সম্পর্কে অন্যান্য তথ্যদ্বারা সমর্থিত (--an interpretation not only infrinsically quite plausible, but supported by other fects relating to Agastya........)

অগস্ত্য কাহিনীর মত পরশুরাম কাহিনীও আর্যদের দক্ষিণ ভারতে বসতিবিস্তারের সঙ্গে যুক্ত। কাহিনীতে বলা হয়, পরশুরাম বিশ্বামিত্রের নির্দেশে সমস্ত পৃথিবী ব্রাহ্মণদের দান করেন এবং নিজের বাসের জন্য জলদেবতা বরুণকে তপস্যায় তুষ্ট করে সমুদ্রের ভিতর থেকে কিছুটা স্থলভাগ লাভ করেন ; এখানে ৬৪টি গ্রামে বাইরে থেকে ব্রাহ্মণ এনে বসতি করান। এই বহিরাগত লোকেরা নিজেদের প্রতিষ্ঠান ও আইনকানুন প্রণয়ন করেছিলেন। লোককাহিনীর পরশুরাম কর্তৃক সাগরের কাছ-থেকে প্রাপ্ত ভূমি কেরল দেশ। ১২শ শতকের একটি কানাড়া লিপিতে উল্লেখ আছে, কেরলের উত্তরে

---

* The Aryanization of the South was doubtless a slow process spread over several centuries beginning probably about 1000 B.C., it had reached its completion before the time of Katyayana, the grammarian of the fourth century B. C, who mentions the names of the Tamil countries of the extreme South.

—N. K. Sastri-A Hist of South India, p. 78

সমুদ্র উপকূলের কংকন পরশুরামের বরস্বরূপ প্রাপ্ত দেশ।

এ উপাখ্যানের ভিতর দিয়ে দক্ষিণের অ-আর্যলোকদের উত্তর অঞ্চল থেকে আগত আর্যনায়কদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে।

পূর্বভারতে আর্যসভ্যতার বিস্তার ঃ বৈদিকযুগে বঙ্গদেশ অ-আর্যদের বাসভূমি ছিল। আর্যরা আর্যাবর্ত থেকে ক্রমে পূর্বদিকে সভ্যতা বিস্তার করতে থাকে এবং এদেশের সংস্পর্শে আসে। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে। পুরাণে বলা হয়েছে, বলি রাজার অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সূহ্ম নামে পাঁচটি পুত্র ছিল। তাঁরা নিজেদের নামে নতুন উপনিবেশ-রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু বেদে বঙ্গগণের অর্থাৎ বঙ্গদেশের লোকেদের আখাদ্যভোজী অনাচারী, অপবিত্র বলে নিন্দা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এদেশে কোন ব্রাহ্মণ অল্পকালের জন্য এলেও তাকে ফিরে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে শুদ্ধ হতে হত। বঙ্গদেশবাসী যে সত্যই বর্বর ছিল, তা নয়। আর্যদের আসার আগেই এখানে স্বতন্ত্রভাবে যে সভ্যতা ও আচার-ব্যবহার গড়ে উঠেছিল, তা আর্যদের রীতিনীতি থেকে পৃথক রকমের ছিল, এইমাত্র।

রামায়ণ-মহাভারতের যুগে ঃ রামায়ণে উল্লেখ আছে যে, শ্রীরামচন্দ্রের প্রপিতামহ রঘু দিগ্বিজয় করতে এদেশে এলে বাঙালীরা নৌকা সাজিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রবলবিক্রমে যুদ্ধ করেছিল। মহাভারতের যুগে ভীম দিগ্বিজয় করতে বঙ্গদেশে এসেছিলেন। বঙ্গরাজ অনেক হস্তিসৈন্য নিয়ে কৌরব পক্ষে যোগদান করেছিলেন। বঙ্গদেশের আর একজন রাজা চন্দ্রসেন অশ্বারোহী সৈন্যসহ পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেন। এই সময় পৌণ্ড্রদেশে বাসুদেব নামে এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি মুদ্গগিরির (মুঙ্গেরের) রাজা জরাসন্ধের সঙ্গে মিত্রতা করে পাণ্ডবদের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন এবং কৃষ্ণের হাতে নিহত হন।

বৌদ্ধযুগে ঃ জৈন ও বৌদ্ধদের গ্রন্থে বঙ্গদেশের লোকেদের কথা আছে। জৈন তীর্থংকর মহাবীর ধর্মপ্রচারের জন্য সঙ্গীসহ পথহীন রাঢ়দেশে ভ্রমণ করেন। এখানকার লোকেদের খাদ্য ও আচরণ তাঁদের কাছে রুচিকর মনে হয়নি।

বৌদ্ধদের মহাবংশ নামক পালিগ্রন্থে রাঢ়দেশের বাঙালী রাজপুত্র বিজয়সিংহের কাহিনী আছে। বলা হয়েছে, রাজপুত্র অত্যাচারী হয়ে উঠলে রাজা তাঁকে শাস্তি দেবার জন্য সাতশত সঙ্গীসহ জাহাজে করে সাগরে ভাসিয়ে দেন। জাহাজ লঙ্কাদ্বীপে পৌঁছে। বিজয়সিংহ সেখানকার অধিবাসী যক্ষদের যুদ্ধে পরাস্ত করে নতুন রাজ্য স্থাপন করেন। এ দেশের নাম হয় সিংহল।

আর্যাবর্ত থেকে আরম্ভ করে আর্যসভ্যতা ধীরে ধীরে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে বিস্তারলাভ করে, যদিও কতক দুর্গম অঞ্চলে আর্যপূর্ব বাসিন্দারা নিজেদের উপজাতীয় কৃষ্টি ও রীতিনীতির বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

(ঙ) লৌহযুগের সূচনা (Beginning of the Iron Age) ঃ নবপ্রস্তরযুগের অবসানে তাম্রযুগের সূত্রপাত হয়েছিল। সিন্ধুনদের অববাহিকায় যে হরপ্পা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তা ছিল তাম্র-যুগের সভ্যতা। ভারতের সকল অঞ্চলে একই সময়ে ধাতুর ব্যবহার চালু হয় নি। উত্তর ভারতে পাথরের পরেই তামার যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল। ঐ অঞ্চলে তামার কুড়াল, তরবারি, বর্শার ফলক প্রভৃতি পাওয়া গেছে। তামা ব্যবহারের যুগ তাম্রযুগ নামে পরিচিত। গ্রীক শব্দ ক্যাল্‌কো (Chalco), মানে তাম্র বা ব্রোঞ্জ থেকে যুগের নাম দেওয়া হয়েছে Chalcolithic Age। এর বহুদিন পরে তামার পরিবর্তে লোহার ব্যবহার প্রচলিত হয়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে প্রস্তরযুগের পরেই লৌহযুগ শুরু হয়। মধ্যবর্তীকালীন তাম্রযুগের কোন নিদর্শন সেখানে পাওয়া যায় নি।

উত্তর ভারতে তামার পরেই লৌহ যুগ

দক্ষিণ ভারতে প্রস্তরযুগের পরেই লৌহযুগ ; তাম্রযুগ নেই

ঋক্‌বেদের যুগ হল ভারত ইতিহাসের প্রাচীনতম যুগ যার সম্বন্ধে সাহিত্যিক উপাদান পাওয়া যায়। এই কাল তাম্রযুগের কি লৌহযুগের মধ্যে পড়ে সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। তবে বেশির ভাগ ঐতিহাসিকই মনে করেন, ঋক্‌বেদ রচনা-কালের আগেই ভারতে লৌহযুগ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

৪.

প্রতিবাদ আন্দোলন

আন্দোলনের পটভূমি ঃ বৈদিকযুগের শেষে হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে নানারকম বাহ্যিক আড়ম্বর প্রধান হয়ে উঠেছিল। এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মনে বিরূপ ভাব দেখা দেয়। ঐ সময় কয়েকজন মানবদরদী তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে সৎ জীবনযাপনের পন্থা প্রদর্শন করতে যে ধর্মমত প্রচার করেন তা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলন বা বিদ্রোহস্বরূপ। **হিন্দুধর্ম ও সমাজব্যবস্থার মধ্যেই এই বিদ্রোহের মূল কারণ নিহিত ছিল।**

ধর্ম-সংস্কার বা প্রতিবাদ আন্দোলন বিদেশাগত ধর্মমত নয়; হিন্দুধর্ম ও সমাজের গ্লানি থেকে এর উদ্ভব

(ক) **আন্দোলনের কারণ ঃ** বহুদিনের পুঞ্জীভূত গ্লানি মানুষের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করে। এই ক্ষোভই প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের আকার নেয়। হিন্দুধর্মের কঠোরতা ও আচার সর্বস্বতার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ আন্দোলন হিন্দুসমাজের ভিতর থেকেই মূর্ত হয়ে উঠেছিল, তার মূলে ছিল **সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও ধর্মীয় কারণ।**

সামাজিক কারণ ঃ জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা হিন্দুধর্মকে দুর্বল করেছিল। আর্যসভ্যতার বিস্তারের ফলে আর্যগণ স্থানীয় অনার্য লোকেদের সংস্পর্শে আসে কিন্তু তাদের সমাজে মর্যাদার স্থান দেয়নি। নিম্নবর্ণের লোক, বিশেষ করে শূদ্রদের প্রতি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অবজ্ঞা ও ঘৃণা ছিল প্রকট। মন্দিরে প্রবেশ করা কিংবা উচ্চবর্ণের লোকেদের কূপ থেকে জল সংগ্রহ করা শূদ্রদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। স্বভাবতই তাদের ক্ষুব্ধ মনে এমন ধর্মব্যবস্থার বাসনা জেগেছিল যাতে শ্রেণীবিভেদ নেই, যেখানে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও ঘৃণার পরিবেশের পরিবর্তে প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ বিরাজ করে।

সামাজিক কারণ নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতি উচ্চবর্ণের লোকেদের অবজ্ঞা; বর্ণাশ্রমের কঠোরতা; ব্রাহ্মণোচিত গুণের অবক্ষয়; অথচ ব্রাহ্মণের প্রাধান্য রক্ষার প্রয়াস

প্রথম দিকে আর্যগণ প্রধানতঃ নিরামিষ ভোজী ছিল কিন্তু কালক্রমে পশুবলি ধর্মের অঙ্গ হিসাবে গণ্য হয়। ধর্মাচরণের সঙ্গে পশুহত্যা সমাজের অনেকের মনঃপূত ছিল না।

বর্ণাশ্রমের কঠোরতার কুফলও দেখা দিয়েছিল। বিদ্যা, বিনয়, সৎ জীবন ও অধ্যাত্মচিন্তার জন্য সমাজে প্রকৃত ব্রাহ্মণের সম্মান ও সমাদর ছিল। কিন্তু কালক্রমে

ব্রাহ্মণোচিত গুণ না থাকলেও ব্রাহ্মণের অযোগ্য পুত্রও ব্রাহ্মণ বলেই বিবেচিত হতে থাকে। এর ফলে সমাজের অন্য শ্রেণীর লোকেদের সাধারণভাবে ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস পায়। শাসক ক্ষত্রিয় শ্রেণীর বুদ্ধিদীপ্ত মানুষেরা তথাকথিত ধর্মনায়ক ব্রাহ্মণদের অপেক্ষা নিজেদেরই যোগ্যতর বলে বিবেচনা করতে থাকেন।[১]

অর্থ নৈতিক কারণ: হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠান ব্যয়সাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ধর্মপালন করতে প্রতি হিন্দুর পক্ষে যজ্ঞ সম্পাদন অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান এমন ব্যয়বহুল ছিল যে, কেবলমাত্র ধনীব্যক্তিরাই **পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান** করতে পারতেন, **সাধারণ মানুষের পক্ষে তা সাধ্যায়ত্ত ছিল না**। কাজেই সহজ, সরল, সাধারণ-মানুষের-পক্ষে-পালনযোগ্য, আত্মকল্যাণকর ধর্মবিধির জন্য মানুষ উন্মুখ হয়ে উঠেছিল।

অর্থ নৈতিক কারণ : ব্যয়বহুল ধর্মীয় অনুষ্ঠান সাধারণ মানুষের সাধ্যের অতীত

ধর্মীয় কারণ: হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-আন্দোলনের প্রধান কারণ ছিল ধর্মাচরণে জটিলতা, ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্যবৃদ্ধি ও আচার-অনুষ্ঠানের বাহুল্য। প্রথমে আর্যদের ধর্ম ছিল সহজ, সরল। প্রকৃতির দৃশ্যমান বা অনুভবসাধ্য শক্তির উপাসনা ও ধনধান্য, পুত্র ও আরোগ্য কামনায় যজ্ঞে আহুতি দান ছিল ধর্মের অঙ্গ। তখন সমাজে জাতিভেদ ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে অনার্য সভ্যতার সংস্পর্শের ফলে বৈদিকধর্ম ক্রমশঃ প্রাণহীন বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠান ও পূজাপ্রণালী জটিল হয়, পশুবলি ধর্মানুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। ভক্তি, পবিত্রতা, সংযম ও আত্মোপলব্ধির পরিবর্তে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানই পুণ্যলাভের একমাত্র উপায় বলে বিবেচিত হওয়ায় ব্রাহ্মণের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। কারণ, এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের হাতেই পুণ্যের চাবিকাঠি। চিন্তাশীল মানুষের কাছে বৈদিক ধর্ম ব্যয়বহুল, আড়ম্বরপূর্ণ ও প্রাণহীন আচার-সর্বস্ব প্রথায় পরিণত হয়। সাধারণভাবে **ব্রাহ্মণদের দাম্ভিকতা এবং জাতি ও বর্ণভেদের ব্যাপারে গোঁড়ামি সাধারণ মানুষের মনে নতুন ধর্মমত উদ্ভবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।**[২] হিংসা ও ঘৃণা লালন করে, মানুষের অন্তরাত্মাকে অমর্যাদা করে, কেবলমাত্র যজ্ঞ

প্রচলিত ধর্মের ত্রুটি ; নতুন পথের জন্য মানুষের মন উন্মুখ

১. Intelligent members of the governing classes, who were regarded as Kshatriyas by the Brahmans from the west, were inclined to consider themselves better men than their spiritual guides,

V.A. Smith—Oxford History of India (3rd. edn.), p. 75

২. The pretensions and Caste-exclusiveness of the Brahmans, which were galling to the people in general, had further prepared the ground for new doctrines to germinate.

Rama Sankar Tripathi-History of Ancient India (3rd edn.), p. 97

অনুষ্ঠান ও পশুবলি দ্বারা পুণ্য অর্জন সম্ভব কিনা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির মনে এ প্রশ্ন আলোড়ন তোলে। মুক্তিলাভের উপায় হিসাবে মানুষ নতুন কোন উন্নততর পন্থার জন্য



পার্শ্বনাথ



মহাবীর

আগ্রহী হয়ে ওঠে।[৩] প্রচলিত ধর্মমত ও ক্রিয়াকাণ্ডের অসারতা নতুন মতবাদের মানসিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল।

বিদ্রোহীরা জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদে বিশ্বাসী; বেদ ও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য অস্বীকার করেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি; অহিংসা ও সৎ আচরণের প্রতি গুরুত্ব; মানুষের মর্যাদা দান। প্রচারকগণ ক্ষত্রিয়

বিদ্রোহীর আর্বিভাব ঃ আর্যসমাজে যখন ধর্মের নামে পশুবধ ও অসার ক্রিয়া-কলাপ চলছিল তখন পূর্বভারতে কয়েকজন মানবপ্রেমিক ধর্ম-প্রচারকের আর্বিভাব হয়। এঁরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের ত্রুটিগুলি তুলে ধরে অনুগামী লোকেদের মধ্যে স্ব স্ব চিন্তাধারার প্রচলন করেন। এঁরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের মতো **জন্মান্তরে ও কর্মবাদে** বিশ্বাসী ছিলেন, অর্থাৎ মানুষ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে এবং পূর্বজন্মের কর্মের ফল এ জন্মে ভোগ করে এরূপ বিশ্বাস করতেন কিন্তু **বেদ ও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য অস্বীকার করেন**, পশুবধ অন্যায় বলে ঘোষণা করেন; এমন কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানতেন না। তাঁরা প্রচার করলেন—যাগযজ্ঞ নয়, অহিংসা এবং সৎ আচরণ সংস্কার ও কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি

৩. People sought eagerly for some better path to the goal of salvation desired by all.

V. A. Smith Oxford History of India (3rd edn.), p. 76

লাভের উপায়। এঁরা জাতিভেদ অস্বীকার করে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে মানুষ হিসাবে মর্যাদা দিয়েছিলেন। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী প্রধান ধর্মপ্রচারকগণ ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব—জৈনধর্মের প্রবর্তক কাশীর রাজকুমার পার্শ্বনাথ ও বৈশালীর অভিজাত লিচ্ছবীবংশের বর্ধমান মহাবীর এবং বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক শাক্যবংশের রাজপুত্র গৌতম বুদ্ধ।

(খ) **জৈন ও বৌদ্ধধর্ম ঃ** জৈনদের মতে পর পর ২৪জন তীর্থংকর অর্থাৎ 'মুক্তিপথ নির্মাতার আবির্ভাব হয়েছিল। প্রথম তীর্থংকর ছিলেন ঋষভদেব। ত্রয়োবিংশ তীর্থংকর পার্শ্বনাথ যে ধর্মমত প্রচার করেন, সর্বশেষ (চতুর্বিংশ) তীর্থংকর মহাবীর তার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধন করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। মহাবীরের আমলেই জৈনধর্ম বিশেষ পরিচিতি লাভ করে।

পার্শ্বনাথ মূল প্রবর্তক ; চতুর্যাম; মহাবীর ব্রহ্মচর্য নীতি যোগ করেন—'পঞ্চযাম'

জৈনধর্মের মূলনীতি ঃ জৈনধর্মের মূল প্রবর্তক এই ধর্মের জন্য চারটি মূলনীতি নির্ধারণ করেছিলেন, যেমন (i) **অহিংসা** (ii) **সত্যবাদিতা** (iii) **অচৌর্য** (অর্থাৎ চুরি না করা) এবং (iv) **অনাসক্তি**। এগুলিকে বলা হয় **চতুর্যাম**। মহাবীর এই ৪টি নীতির সঙ্গে **ব্রহ্মচর্য** নীতি যোগ করেন। চতুর্যাম হয় **পঞ্চাযাম**।

জৈন ধর্মমত ঃ সিদ্ধশিলা বা নির্বাণ লাভ করে আত্মাকে পুনর্জন্মের কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া জৈনধর্মের উদ্দেশ্য। সিদ্ধশিলা লাভের **তিনটি পন্থা** নির্দিষ্ট আছে—**সৎ বিশ্বাস, সৎ জ্ঞান** এবং **সৎ আচরণ**। এই তিন পন্থাকে বলা হয় **ত্রিরত্ন**।

সিদ্ধশিলা অর্থাৎ নির্বাণলাভের তিনটি পন্থা—ত্রিরত্ন—সৎবিশ্বাস, সৎজ্ঞান ও সৎ আচরণ; মানুষের আত্মায় সর্বোত্তম, পরিপূর্ণ প্রকাশ নিহিত; জাতি-ভেদ নেই, প্রকৃতির সকল বস্তুই আত্মাযুক্ত বলে বিশ্বাস

জৈনধর্মের সারকথা হল ১. জীবনে অহিংস আচরণ ২. সত্যভাষণ এবং ৩. সৎ ও পবিত্র জীবনযাপন। **অহিংসা নিরীশ্বরবাদ ও আত্মা সর্বব্যাপী এই মতবাদের ওপর জৈনধর্ম প্রতিষ্ঠিত**। সবরকম প্রাণী এমন কি জড়পদার্থের প্রতিও অহিংস আচরণ করা জৈনধর্মের উপদেশ। জৈনদের বিশ্বাস—শুধু মানুষ এবং চলনক্ষম প্রাণীই নয়, গাছপালা, পাথর, জল, বাতাস, আগুন সকলেরই 'জীব' অর্থাৎ আত্মা আছে, বৃদ্ধি আছে এবং কমবেশি অনুভূতি আছে। এঁদের ধারণা, আগুন, বাতাস ও পাথরকেও আঘাত করে ব্যথা দেওয়া যায়।

মহাবীর জগৎ স্রষ্টা হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে মানুষের আত্মায় যে সর্বোচ্চ, সর্বোত্তম ও পরিপূর্ণ প্রকাশ নিহিত আছে, তাই ঈশ্বর। তিনি জাতিভেদ মানতেন না এবং কোন মূর্তিপূজার পক্ষপাতী ছিলেন না।[৪]

---

৪. জৈনধর্মের প্রধান কথা আত্মার ক্রমিক বিকাশের ভিতর দিয়া মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করা। ...জৈনধর্ম সর্বনিয়ন্তা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে স্বীকার করে না। জৈন মতে সৃষ্টি অনন্ত অনাদি। এ জন্য জৈনধর্মে ঈশ্বরোপসনার স্থান নেই। —গণেশ লালওয়ানী ভারতকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃ ৫৫২-৫৩

জৈন ধর্মগ্রন্থ ঃ মহাবীরের মূল উপদেশগুলি **১৪টি প্রধান গ্রন্থে** সংগ্রহীত হয়েছিল। এগুলিকে বলা হত **পূর্ব**। পরে কয়েকটি ধর্মসভা আহ্বান করে ধর্মনীতিগুলি সংকলিত ও লিপিবদ্ধ করা হয়। এই সংকলন অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূলসূত্র প্রভৃতিতে বিভক্ত।

জৈনধর্ম গ্রন্থঃপূর্ব, অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূলসূত্র

মহাবীরের জীবন ও বাণী ঃ মহাবীর (প্রকৃত নাম বর্ধমান) বিদেহ বা উত্তর বিহারের কুণ্ডপুর নামক স্থানের জ্ঞাতৃক-দলপতির পুত্র। পিতার নাম সিদ্ধার্থ এবং মাতা ত্রিশলা দেবী। মহাবীরের জন্মকাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না ; তবে তিনি খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জন্মগ্রহণ করেন এবং গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন।

মহাবীরের সংসার-জীবন সম্বন্ধে শুধু এইমাত্র জানা যায়—তিনি যশোদানাম্নী এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন এবং ত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করে পূর্ব ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। এই সময় তিনি **গোসাল** নামে এক সন্ন্যাসীর শিষ্য হয়ে ৬ বৎসর কাল কঠোর সাধনা করেছিলেন। গোসাল মহাবীরকে পরিত্যাগ করে চলে গেলে তিনি একাকী আরো ৬ বৎসর তপস্যা করেন কিন্তু ১২ বৎসরেও দিব্যজ্ঞান লাভ করতে পারলেন না। অবশেষে সন্ন্যাসগ্রহণের ত্রয়োদশ বর্ষে পূর্ব ভারতে ঋজুপালিকা নদীর তীরে সাধনায় রত হন এবং **কেবল-জ্ঞান** অর্থাৎ পরম অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করেন। তিনি **কেবলীন** অর্থাৎ সর্বোচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন এবং **জিন** অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় ও **'মহাবীর'** অর্থাৎ শক্তিমান পুরুষ।

উত্তর বিহারের জ্ঞাতৃক দলপতির পুত্র ; খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতকে জন্ম, গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক ; সাধনার ত্রয়োদশ বৎসরে দিব্য-জ্ঞানলাভ ; 'কেবলীন', জিতেন্দ্রিয় 'মহাবীর'

ধর্মসম্প্রদায় ঃ মহাবীর নিগ্রন্থ (অর্থাৎ গ্রন্থিহীন, বন্ধনমুক্ত) নামে ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে তাঁর 'জিন' উপাধি অনুসারে এই ধর্ম জৈনধর্ম নামে পরিচিত হয়। মহাবীর সংসার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের জন্য সকল পার্থিব পদার্থ, এমন কি পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত পরিত্যাগ করে চরম অনাসক্তি প্রদর্শনের উপদেশ দিয়েছিলেন। এজন্য যারা তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেছিল তারা **দিগম্বর** (উলঙ্গ) নামে পরিচিত। খৃস্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকে জৈনদের মধ্যে **শ্বেতাম্বর** নামে এক শাখার উদ্ভব হয়। এরা উলঙ্গ না থেকে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করত।

নিগ্রন্থ, 'জিন' ; দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর শাখা

জৈনশিল্পকলা ঃ জৈনধর্ম প্রধানত গুজরাট ও রাজপুতনায় বিস্তার লাভ করেছিল। রাজপুতনার **আবু পাহাড়ে দিলওয়ারা মন্দির** এবং **গুজরাটের গিরনার জৈনমন্দির** শিল্পকলার জন্য প্রসিদ্ধ। ওড়িশায় ভুবনেশ্বরের কাছে **উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি** পাহাড়ে পাথর কেটে অনেকগুলি গুহা নির্মিত হয়েছিল। এখানে পাহাড়ের গায়ে খোদাইকরা কিছু কিছু মূর্তি এখনও বিদ্যমান। বহু ভাস্কর মহাবীরের দিগম্বর ধ্যানীমূর্তি প্রস্তর খোদাই করে নির্মাণ করেছেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং দর্শনীয় ৭০ ফুট ৩ ইঞ্চি

জৈনশিল্পকলা ঃ দিলওয়ারা মন্দিরের অনুপম কারুকার্য গিরনার মন্দির, খণ্ডগিরি, উদয়-গিরির গুহাগৃহ ও মূর্তি ; ইন্দ্রবেটা পাহাড়ের গোমতেশ্বর মূর্তি

উঁচু নগ্ন প্রস্তরমূর্তি। মহীশূর রাজ্যে বর্তমান (কর্ণাটক) হাসান **জেলার** একগ্রামে ইন্দ্রবেটা নামে পাহাড়ের ওপর ৪৭০ ফুট উঁচুতে এই মূর্তি ৯৮৩ খৃস্টাব্দে **চামুণ্ড** রায় কর্তৃক নির্মিত হয়। প্রতি ২৫ বৎসর অন্তর প্রচুর ঘৃত দ্বারা মূর্তির সর্বাঙ্গ মার্জিত করে এর স্নান ও অভিষেক হয় বলে মূর্তিটি সর্বদা নতুনের মত দেখায়। **গোমতেশ্বর** নামে পরিচিত মহাবীরের এই **অপরূপ মূর্তি বলিষ্ঠ ভাস্কর্যের এক অপূর্ব নিদর্শন।**

বৌদ্ধধর্ম : গৌতমবুদ্ধের জীবন ও বাণী

গৌতমবুদ্ধ : বর্তমান নেপাল তরাই-এর অন্তর্গত কপিলাবস্তুর শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থ আনুমানিক ৫৬৬ খৃস্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পরই মাতার মৃত্যু হলে মাসিমা প্রজাপতি গৌতমী সিদ্ধার্থকে লালন-পালন করেন। সিদ্ধার্থ বাল্যকাল থেকেই চিন্তাশীল ও সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। তাঁকে ভোগবিলাসে আকৃষ্ট করার জন্য রাজা গোপা নামে এক সুন্দরী কন্যার সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিবাহ দেন। কিন্তু আনন্দ উল্লাস, নৃত্যগীত সিদ্ধার্থকে সংসারমুখী করতে পারল না।

কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র; বাল্যাবধি চিন্তাশীল: জীবনের অনিবার্য পরিণতি—জরা-ব্যাধি-মৃত্যু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ধারণা—সন্ন্যাসীর শান্ত সৌম্য-মূর্তি দর্শন—গৃহত্যাগের সংকল্প মহানিষ্ক্রমণ

মহানিষ্ক্রমণ : মানুষের জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-দুঃখ শোক দেখে সিদ্ধার্থ ব্যাকুল হলেন এবং এসব থেকে ত্রাণ পাওয়ার উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। অনুক্ষণ তাঁর মনে জাগত একটি চিন্তা—কি করে এই সর্বব্যাপী, অনিবার্য রোগশোক দুঃখ যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করা যায়। শোনা যায়, পুত্রের কোমল মন এবং বিলাসের প্রতি অনাগ্রহ দেখে চিন্তিত পিতা সকল প্রকার বেদনাদায়ক দৃশ্য থেকে রাজকুমারকে আড়ালে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে নগরে ভ্রমণের সময় তিনি বৃদ্ধব্যক্তি, রুগ্ন লোক, মৃতদেহ এবং গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর দর্শন পান। চিন্তাকুল রাজপুত্র সন্ন্যাসীর শান্ত সৌম্য মূর্তিদর্শনে অনুভব করেন, ত্যাগের ভিতর দিয়েই ঐ মহাশয়ব্যক্তি



গৌতমবুদ্ধ

শান্তির সন্ধান পেয়েছেন। সিদ্ধার্থও সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়ার সংকল্প করেন। এই সময় তাঁর রাহুল নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পুত্রের মায়াবন্ধনে সংসারে জড়িয়ে পড়বেন, এই আশঙ্কায় সেই রাত্রিতেই ২৯ বছর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করে চলে যান। মুক্তিলাভের জন্য গৌতমের সংসার ত্যাগকে বলা হয় **মহানিষ্ক্রমণ**।

সাধনা ও বুদ্ধত্বলাভ ঃ গৃহত্যাগের পর গৌতম রোগ-শোক, দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তির উপায় সন্ধানে সন্ন্যাস গ্রহণ করে ৬ বৎসর নানা স্থানে ভ্রমণ করলেন, শাস্ত্রপাঠ যোগ-সাধনা ও কঠোর আত্মপীড়ন করে তপস্যা করলেন কিন্তু দিব্যজ্ঞান লাভ হল না।

কঠোর সাধনা—অবশেষে বোধি বা দিব্যজ্ঞান লাভ

একদিন দুর্বলতার দরুণ অজ্ঞান হয়ে পড়লেন কিন্তু মানুষের দুঃখকষ্ট কিভাবে দূর করা সম্ভব তার সন্ধান পেলেন না। অবশেষে নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান করে আবার ধ্যানের জন্য প্রস্তুত হলেন। এই সময় গ্রাম্যবধূ সুজাতা তাঁকে পায়স নিবেদন করল। ফলে একটু সুস্থ হয়ে সিদ্ধি, না হয় জীবনত্যাগ—অর্থাৎ জ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত আসন ত্যাগ করবেন না এরূপ স্থির সংকল্প নিয়ে বর্তমান বোধগয়ার নিকট এক অশ্বত্থবৃক্ষতলে ধ্যানে বসলেন। এখানেই তাঁর প্রকৃত জ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভ হয়। যে **অশ্বত্থমূলে** গৌতম দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন সেটি বোধিদ্রুম নামে পরিচিত এবং সে স্থানের নাম হয়েছে **বুদ্ধগয়া** বা **বোধগয়া**।

ধর্মপ্রচার—বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতম সারনাথের কাছে মৃগবনে পঞ্চশিষ্যের সামনে প্রথম ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন। ৩৫ বছর বয়সে দিব্যজ্ঞান লাভের পর দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে বিহার, অযোধ্যা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে বুদ্ধ তাঁর ধর্মের বাণী প্রচার করেন এবং বৌদ্ধসংঘ গড়ে তোলেন। তৎকালীন মগধের রাজা বিম্বিসার, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, কোশলের ধনী শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ এবং রাজগৃহের সারিপুত্ত ও মোগ্‌গলন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও ধর্মবিস্তারে সাহায্য করেন। ৮০ বছর বয়সে কুশীনগর নামক স্থানে পূর্ণিমার দিন বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন (আনুমানিক ৪৮৬ খৃঃপূঃ)। বুদ্ধদেবের দেহত্যাগকে বলা হয় **মহাপরিনির্বাণ**।

মৃগদাবে প্রথম ধর্মপ্রচার; শিষ্যবর্গ, ৪৫ বছর ধরে গ্রামে গ্রামে ধর্মপ্রচার ও সংগঠন; ৮০ বৎসর বয়সে কুশীনগরে বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাপরিনির্বাণ

বুদ্ধের জীবনের সঙ্গে বৈশাখী পূর্ণিমা বিশেষ মহিমায় যুক্ত। বৈশাখী পূর্ণিমায় জন্ম, বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধত্বলাভ এবং বৈশাখী পূর্ণিমাতেই জীবনবসান। বৈশাখী পূর্ণিমা তাই বুদ্ধপূর্ণিমা নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

বৌদ্ধধর্মমত ঃ দিব্যজ্ঞান লাভের পর **বুদ্ধ** সারনাথের **মৃগবন** বা **মৃগদাব** উদ্যানে

পঞ্চশিষ্যের কাছে সর্বপ্রথম তাঁর ধর্মের বাণী প্রচার করেন। মানুষের দুঃখে বিগলিত-হৃদয় সিদ্ধার্থ সংসারের ভোগসুখ পরিত্যাগ করে কঠোর তপস্যায় রোগ-শোক, জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন। মানুষের কল্যাণের জন্যই তিনি সেই উপায় প্রচার করেছেন।

বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি চারটি আর্যসত্য দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখমোচন, দুঃখমোচনের উপায়

বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি ছিল চারটি **'আর্যসত্য'** বা মহান সত্য (Noble Truths)। এইগুলি হল—মানুষের দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখমোচন এবং দুঃখমোচনের উপায়। এই সত্যগুলোর স্বরূপ উপলব্ধি করে মানুষকে স্বচেষ্টায় দুঃখমোচনে উদ্যোগী হতে হবে।

১. **দুঃখ ঃ** জগতে দুঃখকষ্ট আছে। মানুষমাত্রেরই বার্ধক্য, রোগশোকজনিত দুঃখ ভোগ করতে হয়। এ ব্যাপারে ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ কোন ভেদ নেই।

২. **দুঃখের কারণ ঃ** প্রত্যেক দুঃখেরই কোন না কোন কারণ আছে। অজ্ঞতা ও বিষয়ে আসক্তি বা তৃষ্ণা থেকে দুঃখের উৎপত্তি।

৩. **দুঃখমোচন ঃ** দুঃখমোচনের জন্য প্রয়োজন অজ্ঞতা ও আকাঙ্ক্ষার বিনাশ।

৪. **দুঃখমোচনের উপায় ঃ** মধ্যপথ ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা আটটি পথ ধরে জীবনযাপন করলে দুঃখ থেকে মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করা যায়।

এখন প্রশ্ন হল, মধ্যপন্থা কি ? নির্বাণ লাভের উপায়ই বা কি ?

গৌতমবুদ্ধ নিজ সাধনজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন, হিন্দুদের জটিল যাগযজ্ঞ, প্রাণহীন পূজা অর্চনা ও ভোগবিলাসের ভিতর দিয়ে যেমন পরম শান্তি বা নির্বাণ লাভ করা যায় না, তেমনি জৈনদের প্রথামত দেহকে অত্যধিক কষ্ট দিয়েও পরমজ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। তিনি যেমন হিন্দুদের পশুবলি, জীবহিংসা, যজ্ঞ অনুষ্ঠান সমর্থন করেন নি, তেমনি গাছ-পাথর, জল, ধাতু সব কিছুর মধ্যেই প্রাণ আছে, জৈনদের এ মতবাদও মানেন নি। **এই দুই ধর্মমতের আতিশয্য বর্জন করে বুদ্ধ তাঁর ধর্মমতকে সাধারণ মানুষের পক্ষে পালনযোগ্য, বাস্তবপন্থী করে তুলেছিলেন। তাই তিনি জীবনে মধ্যপন্থার সমর্থক।**

অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি ? হিন্দুসমাজের পুণ্যকর্মের হিসাবে নির্দিষ্ট ছিল যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান যা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণকে দিয়েই সম্পন্ন করাতে হবে। যজ্ঞে পশুবলি, ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে দক্ষিণাপ্রদান ইত্যাদি ব্যয়সাধ্য শাস্ত্রীয় কর্ম। যারা ব্যয়বহুল যজ্ঞকার্য সম্পাদনে অপারগ তাদের আত্মোন্নতির পথ কি রুদ্ধ হয়ে থাকবে ? মানবদরদী বুদ্ধ সৎ কর্মের জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে মানুষ নিজে কিভাবে নিজের কল্যাণ করতে পারে তারই আটটি পন্থা বা অষ্টাঙ্গিক মার্গের নির্দেশ দিয়েছেন। এই পন্থাগুলি হল—

আটটি পথ বা অষ্টাঙ্গিক মার্গ সৎ দৃষ্টি-সংকল্প-বাক্য-ব্যবহার-জীবন- চেষ্টা স্মৃতি-সমাধি

১. **সম্যক দৃষ্টি**—সংস্কারদ্বারা চালিত না হয়ে প্রকৃত তথ্য জানার চেষ্টা সং বা সম্যক দৃষ্টি, তথ্যানুসন্ধান। ২. **সৎ সংকল্প**—ভাল কাজ করার দৃঢ় বাসনা। ৩. **সৎ বাক্য**—সত্য ও শুভংকর বাক্য প্রয়োগ। ৪. **সৎ ব্যবহার**—অপরের সঙ্গে সং আচরণে অভ্যস্ত হওয়া। ৫. **সৎ জীবন**—সংভাবে জীবনযাপন। ৬. **সৎ চেষ্টা**—সংকল্পকে কার্যে পরিণত করার জন্য একনিষ্ঠভাবে চেষ্টা। ৭. **সৎ স্মৃতি**—মন নির্মল করা, কুচিন্তা পরিহার করা এবং সং বিষয়ের চিন্তার অভ্যাস। ৮. **সম্যক সমাধি**—সং বিষয়ে মনোনিবেশ।

পঞ্চশীল-আত্মসংযম দ্বারা পাঁচটি অন্যায় কর্ম থেকে বিরতি

নিষ্ঠাবান বৌদ্ধের ধর্মসাধনার পথে অষ্টাঙ্গিক মার্গ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক জীবনেও এগুলো ফলপ্রদ। অষ্টাঙ্গিক মার্গ ছাড়া বুদ্ধদেব সাধারণ গৃহস্থ ও উপাসকদের জন্য নিত্য প্রতিপাল্য কতকগুলো শীল বা নীতি বিধান করেছেন। এগুলি **পঞ্চশীল** নামে অভিহিত, যথা:

১. প্রাণিহত্যা থেকে বিরতি ২. অদত্তাদান (চৌর্যবৃত্তি) থেকে বিরতি ৩. ব্যভিচার বা অবৈধভোগ থেকে বিরতি ৪. মিথ্যাভাষণ থেকে বিরতি ৫. নেশাদ্রব্য সেবন থেকে বিরতি।

চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে 'শীল' সহায়ক

বৌদ্ধশাস্ত্রে শীলের অর্থ সমাধান বা কায়-বাক্-মনঃসংযম। একে সমস্ত কুশলকর্মের প্রতিষ্ঠা বা আধার বলা হয়। কায়-বাক্-মনঃসংযমের দ্বারা সমস্ত সদ্‌গুণ আয়ত্ত এবং তদ্বারা মানব-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন হয় বলে এগুলির নাম 'শীল'।

ত্রিপিটক সূত্র পিটক, বিনয়-পিটক, অভিধর্মপিটক;

বৌদ্ধ ধর্ম সাহিত্য: বুদ্ধদেব তাঁর সময়ের কথ্য ভাষা পালিতে শিষ্য ও জনসাধারণকে মৌখিক উপদেশ দিতেন। তাঁর জীবিত-কালে সেগুলি সংকলিত হয়নি। বুদ্ধের দেহত্যাগের পর তাঁর শিষ্যগণ রাজগৃহে মিলিত হয়ে তাঁর ধর্মমত তিনটি পুস্তকে সংকলিত করেন। এই পুস্তক **তিনটি পিটক** (Three Baskets) নামে পরিচিত, যথা—

১. বুদ্ধদেব স্বয়ং যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার নাম **সূত্রপিটক**,

২. বৌদ্ধমঠবাসীদের নিয়মাবলীর নাম **বিনয় পিটক**।

৩. বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক আলোচনাসমূহের নাম **অভিধর্ম পিটক**।

জাতক: ধম্মপদ সংজীবনের পথনির্দেশিকা

পরবর্তীকালে-লেখা বুদ্ধের পূর্বজীবনের কাহিনীগুলি **জাতক** নামে পরিচিত। বুদ্ধ সাধারণ মানুষ ও সংসারত্যাগী শ্রমণদের যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার সংকলন পালিতে লেখা **ধর্ম্মপদ** সং জীবনের পথনির্দেশিকারূপে মূল্যবান গ্রন্থ।

৫.

সাম্রাজ্যিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের যুগ

(ক) ষোড়শ মহাজনপদ ঃ খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠশতকে বুদ্ধদেব যখন উত্তর ভারতে ধর্ম-প্রচার করছিলেন, তখন কাবুল থেকে গোদাবরী পর্যন্ত অঞ্চলে ১৬টি মহাজনপদ (বড় রাজ্য)* ছিল। রাজ্যগুলি একে অপরের অঞ্চল জয় করে বড় হওয়ার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ৪টি রাজ্য প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। এগুলি হল—

১. **অবন্তী ঃ** বর্তমান মালবের উজ্জয়িনীতে ছিল এর রাজধানী ; রাজা প্রদ্যোৎ মহাসেন পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্ররাজ্যগুলি অধিকার করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন।

২. **বৎস ঃ** এলাহাবাদের কাছে কোশাম্বী জেলা নিয়ে ছিল এ রাজ্য। রাজা উদয়ন মগধের রাজপরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। তৎকালীন রোমান্টিক সাহিত্যে তিনি নায়করূপে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

৩. **কোশল ঃ** এখনকার অযোধ্যা ছিল কোশল রাজ্য। রাজধানী অযোধ্যা ; বুদ্ধের সময় রাজা ছিলেন প্রসেনজিৎ।

৪. **মগধ ঃ** রাজধানী গিরিব্রজ। স্বাভাবিকভাবে সুরক্ষিত মগধ গঙ্গার কল্যাণে সুজলা সুফলা, ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে অনুকূল, কাজেই সমৃদ্ধ রাজ্য।

(খ) মগধের উত্থান ঃ রাজ্যশাসন-ব্যাপারে সুশাসন, সমৃদ্ধি ও শক্তি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। মগধের ক্ষেত্রে এই তিনটির সমাবেশ ঘটেছিল। রাজারা রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রজাকল্যাণকর কার্যে উৎসাহী ছিলেন।

বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল

ভৌগোলিক অবস্থান দেশে ধনসম্পদ বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক ছিল এবং উচ্চাভিলাষী শাসকগণ রাজ্যের আয়তন বাড়াতে যুদ্ধবিগ্রহ, বৈবাহিক সম্পর্ক ও কূটনীতি সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন।

সাম্রাজ্যিক ঐক্য গড়ে তোলার সূত্রপাত করেন হর্যাঙ্কবংশের বিম্বিসার—এগিয়ে নিয়ে যান শৈশুনাগ বংশের রাজারা। সাম্রাজ্যস্থাপন ও রাজনৈতিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করেন মৌর্যবংশের চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। একটি ভারতব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয় চারটি রাজবংশের নিরবচ্ছিন্ন উদ্যম ও কর্মতৎপরতার ফলে। ভারত-ইতিহাসে মগধের গৌরব এই যে, সাম্রাজ্যিক ঐক্য সাধনের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছিল এই রাজ্য।

* এই রাজ্যগুলি হ'ল, ১. কাশী, ২ অঙ্গ, ৩. মগধ, ৪. বৃজি যুক্তরাষ্ট্র, ৫. মল্লরাষ্ট্র, ৬. চেদী, ৭. বৎস, ৮. কুরু, ৯. পাঞ্চাল, ১০. মৎস্য ১১. অশ্বক বা অশ্মক, ১২. অবন্তী ১৩, গান্ধার, ১৪. কম্বোজ, ১৫. সুরসেন, ১৬. কোশল

হর্যঙ্ক রাজবংশ ঃ হর্যঙ্কবংশের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রাজা বিম্বিসার মাত্র ১৫ বছর বয়সে সিংহাসন লাভ করেন। প্রথমাবধি তিনি রাজ্য-বিস্তারে উদ্যোগী হন। বিম্বিসার কোশল ও বৈশালী রাজবংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। কোশল রাজকন্যার যৌতুক স্বরূপ তিনি লাভ করলেন কাশীগ্রাম। বৈশালী রাজবংশের সঙ্গে বিবাহ উত্তরদিকে মগধরাজ্য বিস্তারের পথ সুগম করে দিয়েছিল। নৃপতি বিম্বিসার বুদ্ধের রাজশিষ্যরূপে বৌদ্ধসাহিত্যে ও কাব্যে সম্মানের স্থান লাভ করেছেন। অহিংসার বাণী প্রচারক বুদ্ধের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলেও বিম্বিসার সংসারত্যাগী হননি। তিনি ছিলেন অস্ত্রবিজয়ের পক্ষপাতী উচ্চাভিলাষী রাজা। বিম্বিসারকে বলা যায় মগধের গৌরবের ভিত্তিস্থাপয়িতা। রাজ্যক্ষমতালাভে বিলম্বের দরুণ অসহিষ্ণু পুত্র অজাতশত্রু বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করে সিংহাসন লাভ করেন।

অজাতশত্রু ঃ অজাতশত্রু পিতৃহত্যা করে সিংহাসনে বসলেন কিন্তু নিষ্কণ্টকে রাজ্যসুখ ভোগ করতে পারেন নি। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ কাশীরাজ ও উত্তরের গণরাজ্যগুলির সঙ্গে মিলিত হয়ে শক্তিশালী বিরুদ্ধ পক্ষ গড়ে তুললেন। কিন্তু অজাতশত্রু বাহুবলে শত্রুবেষ্টনী চূর্ণ করে নিজশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। মাতুল কোশলরাজকে আক্রমণ করে তাঁর রাজ্য দখল করেছিলেন, কাশীরাজকে পরাজিত করে কাশী অধিকার করলেন, বৈশালীর বৃজিদের সঙ্গে ১৬ বছরব্যাপী যুদ্ধে জয়ী হয়ে তাদের অঞ্চল মগধের অন্তর্ভুক্ত করলেন। বিম্বিসার বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়েছিলেন। অজাতশত্রু সেই ধর্ম অনুসরণ করেন নি, কিন্তু বিম্বিসার মগধের রাজনৈতিক প্রাধান্যের যে সূত্রপাত করেছিলেন, পুত্র অজাতশত্রু পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি জয় করে তা বিস্তৃত করেন। উত্তর ভারতে তখন অজাতশত্রুই সর্বাধিক শক্তিশালী রাজা।

অজাতশত্রু শক্তিমান রাজা

হর্যঙ্করাজবংশের পরিণতি ঃ খৃস্টপূর্ব ৪৬১ অব্দে অজাতশত্রুর মৃত্যু হয়। তারপর পাঁচজন রাজা পর পর সিংহাসনে বসেন এবং প্রত্যেকেই পিতাকে হত্যা করে রাজ্যপাট দখল করেছিলেন। অজাতশত্রু ক্ষমতালোভী হয়ে যে রক্তপাত শুরু করেছিলেন, প্রকৃতির অভিশাপে তাই যেন বংশের রীতি হয়ে দাঁড়ায়। এই অনৈতিক কার্যকলাপে মগধের প্রজারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং পঞ্চম পিতৃহন্তাকে সিংহাসনচ্যুত করে এক দক্ষ রাজকর্মচারীকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে। ইনি **শিশুনাগ। শিশুনাগ বংশ ৯২ বছর রাজত্ব করেন**। মহাপদ্ম নন্দ নামে এক ব্যক্তি শিশুনাগের পুত্র কালাশোককে হত্যা করে মগধে নন্দবংশ নামে এক নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

নন্দবংশ ঃ নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দকে শূদ্রবংশোদ্ভব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাণে বলা হয়েছে, হীনবংশজাত হলেও মহাপদ্ম মহাপরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন এবং সকল ক্ষত্রিয় উৎখাত করে তিনি একচ্ছত্র অধিপতি হয়েছিলেন। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বাসনায় নন্দরাজারা অর্থ ও সৈন্যবল বৃদ্ধি করেছিলেন। মহাপদ্ম নন্দর ৮ জন পুত্র পর পর সিংহাসনে বসেন। শেষ রাজা ধননন্দ করভার বৃদ্ধি করে

প্রজাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। নিজে ছিলেন নীচবংশজাত। আচরণ ছিল উদ্ধত। শাসক হিসাবে ছিলেন প্রজাপীড়ক। এই সুযোগ নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তক্ষশিলার ব্রাহ্মণ কূটনীতিক চাণক্যের সহায়তায় নন্দবংশ ধ্বংস করে মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন (৩২১ খৃঃ পূঃ)।

(গ) মৌর্যবংশ (৩২১-১৮৫ খৃঃ পূঃ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ঃ চন্দ্রগুপ্ত রাজপরিবারের সন্তান ছিলেন না। তিনি ছিলেন 'মোরীয়' গোষ্ঠীর লোক। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ মৌর্য নামে পরিচিত। রোমিলা থাপার প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে মোরীয়রা বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত। নন্দরাজার প্রতি প্রজাসাধারণের বিরূপতার সুযোগে তিনি রাজ্যের প্রান্তদেশে হানা দিয়ে ক্রমে সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়ে নিজের সমর শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং শেষে মগধরাজ্যের অভ্যন্তরে নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে গাঙ্গেয় উপত্যকা নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে চন্দ্রগুপ্ত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অগ্রসর হন। চন্দ্রগুপ্ত দ্রুত সিন্ধু পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করে নিলেন। তাঁর রাজ্য বারাণসী থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত হল। সিন্ধু পার হয়ে আরও পশ্চিমে অগ্রসর হওয়ার আগে চন্দ্রগুপ্ত উত্তর ভারত অধিকার-কাজে মন দিলেন এবং নর্মদার উত্তর তীর পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল নিজের রাজ্যভুক্ত করলেন।

সেলুকাসের সঙ্গে যুদ্ধ (৩০৫ খৃঃ পূঃ) ঃ আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে বিভক্ত হলে সেলুকাস পান পারস্য সাম্রাজ্য, যার পূর্ব সীমানা সিন্ধু ছাড়িয়েও শতদ্রু পর্যন্ত এসেছিল। চন্দ্রগুপ্ত সিন্ধুর পূর্বতীরের যাবতীয় অঞ্চল অধিকার করে নেন। ৩০৫ খৃস্টপূর্বাব্দে সেলুকাস আলেকজান্দারের বিজিত অঞ্চল অধিকার করতে এলে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে যুদ্ধ হল। ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাওয়ায় সেলুকাস এবার পরাজিত, বিজয়মাল্য চন্দ্রগুপ্তের গলায়। শুধু বিজয়মাল্য নয়, বরমাল্যও। পরাজিত সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের হাতে কন্যা সম্প্রদান করে সন্ধি করেন, উপহার পান ৫০০ হাতি ; চন্দ্রগুপ্তকে অর্পণ করেন ৪টি প্রদেশ—কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও বালুচিস্তান। উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ অবধি সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হল।

চন্দ্রগুপ্ত বিজয়ী ;

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর সিংহাসন পান তার পুত্র বিন্দুসার (২৯৭ খৃঃ পূঃ—২৭১ খৃঃ পূঃ)। তিনি পিতৃরাজ্য ও পিতৃপ্রতিষ্ঠিত মিত্রতা বজায় রেখেছিলেন। বিন্দুসারের সভায় ডিমাকস নামে একজন গ্রীক রাজদূত এসেছিলেন। আনুমানিক ২৭৩ খৃস্টপূর্বাব্দে বিন্দুসারের মৃত্যু হয় ; অশোক সিংহাসন লাভ করেন, অবশ্য অভিষেক সম্পন্ন হয় এর চার বছর পরে ২৬৯ খৃঃ পূর্বাব্দে।

অশোক (২৭৩-২৩২ খৃঃ পূঃ) ঃ বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক সিংহাসন লাভ করেন কিন্তু তাঁর রাজ্যাভিষেক হয় ৪ বছর পরে, ২৬৯ খৃঃ পূর্বাব্দে। এর থেকে অনুমান করা হয় যে, অশোক নির্বিঘ্নে সিংহাসন পাননি, ভ্রাতৃবিরোধের ভিতর দিয়ে তাঁকে সিংহাসন অধিকার করতে হয়। বৌদ্ধকাহিনী অনুসারে অশোক তাঁর ৯৯ জন

ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁদের নিঃশেষ করার পর সিংহাসন নিষ্কণ্টক করেন, অভিষেকের বিলম্বের কারণ এই ভ্রাতৃকলহ। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই কাহিনী বিশ্বাস করেন না, কারণ অশোকের শিলালিপিতে তাঁর ভ্রাতাদের পরিবারবর্গের প্রতি সদ্ব্যবহারের উল্লেখ আছে। দ্বিতীয়ত, অশোক প্রথম জীবনে 'চণ্ড' অর্থাৎ দুর্দান্ত ও নৃশংস ছিলেন, বৌদ্ধধর্মের প্রভাবেপ্রশান্ত, ক্ষমাবান হয়েছিলেন—বৌদ্ধধর্মের এইরূপ সুফল প্রচারের উদ্দেশ্যেই অশোকের প্রথম জীবনে নিষ্ঠুরতার কাহিনী অবতারণা করা হয়েছে বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন।


উপাসক অশোক

অশোকের জীবন ও কর্মকাণ্ডকে তিন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা চলে, যথা—(১) রাজ্যবিজেতা অশোক (২) প্রজাপালক অশোক এবং (৩) বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক অশোক।

রাজ্যবিজেতা অশোক ঃ পিতা বিন্দুসারের জীবিতকালে যুবরাজ অশোক তক্ষশিলা ও উজ্জয়িনীর শাসনকর্তারূপে রাজ্যশাসনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তিনি যখন সিংহাসন অধিকার করলেন তখন ভারতের সর্বদক্ষিণ অঞ্চল এবং কলিঙ্গ বাদে বিশাল সাম্রাজ্য তাঁর শাসনাধীন।

কলিঙ্গ যুদ্ধ ঃ সর্ব দক্ষিণের চোল, পাণ্ড্য, কেরল, সত্যপুত্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি মৌর্য সাম্রাজ্যের কোন সমস্যা সৃষ্টি করেনি কিন্তুপূর্ব উপকূলের কলিঙ্গ রাজ্য (পুরী, গঞ্জাম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল) ছিল বিরুদ্ধভাবাপন্ন। এর ফলে উপকূল অঞ্চল দিয়ে সাম্রাজ্যের দক্ষিণ অংশের সঙ্গে যোগাযোগ ও ব্যবসাবাণিজ্যের অসুবিধা দেখা দেয়। অশোক তাঁর অভিষেকের ৮ বছর পরে বংশের ধারা অনুসরণ করেই অস্ত্রবলে কলিঙ্গ জয় করেন কিন্তু এই যুদ্ধে কলিঙ্গবাসীদের জীবনহানি ও দুর্দশা অশোকের মনে তীব্র অনুশোচনা সৃষ্টি করে। তিনি গৌতমবুদ্ধের মানবপ্রেম ও অহিংস নীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। কলিঙ্গ যুদ্ধের আড়াই বছর পরে অশোক **নিষ্ঠাবান বুদ্ধভক্ত হন** এবং **অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধের দ্বারা রাজ্যজয়ের পরিবর্তে ধর্ম-বিজয়ের নীতি প্রবর্তন করেন।** যুদ্ধ, নরহত্যা, নির্বাসন প্রভৃতির মাধ্যমে নতুন অঞ্চল জয় না করে প্রেম, প্রীতি ও সহানুভূতি

ভেরীঘোষ' অর্থাৎ যুদ্ধ-দামামার পরিবর্তে 'ধর্মঘোষ' অর্থাৎ ন্যায়ধর্ম-নীতির প্রবর্তন

দ্বারা মানুষের অন্তর জয় করাই তাঁর কাছে উত্তম জয় বলে বিবেচিত হয়েছিল। বিম্বিসার থেকে আরম্ভ করে বিন্দুসার পর্যন্ত সম্রাটগণ যে রাজসিক ক্ষাত্রগুণোচিত পন্থায় সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, অশোক তা পরিহার করে রাজধর্মে সাত্ত্বিক ভাব প্রবর্তন করলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোন সফল শক্তিমান বিজয়ীর এরূপ অস্ত্রসম্বরণের নজির নেই।

প্রজাপালক অশোক : দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন রাজার কর্তব্য। অশোক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র যেখানে সম্রাটের হাতে ছিল সমগ্র শাসনযন্ত্রের মূল চালন-চক্র। শাসনকার্যে সম্রাট ছিলেন সর্বেসর্বা কিন্তু বিশাল রাজ্যের প্রশাসন সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চলে বিভিন্ন রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়েছিল। সবার ওপরে বিরাজ করত-রাজার সজাগ দৃষ্টি ও প্রজাকল্যাণ কামনা।

রাজ্যশাসন : শাসন কার্যে সুবিধার জন্য মৌর্যসাম্রাজ্য ৪টি **প্রদেশে** বিভক্ত হয়েছিল। যথা :

উত্তরপশ্চিম প্রদেশ : রাজধানী তক্ষশিলা। সিন্ধু, বালুচিস্তান, মাকরান বর্তমান আফগানিস্তান ছিল এই প্রদেশের অন্তর্গত। রাজপুত্র বা রাজপ্রতিনিধি প্রাদেশিক শাসকের পদ লাভ করতেন। সিংহাসন লাভের পূর্বে বরাজ অশোক তক্ষশিলার উপরাজ বা রাজ্যপাল ছিলেন।[১]

জেলা বা **বিষয় :** প্রদেশগুলি কতকগুলি জেলায় ভাগ করা হত। জেলার শাসন দায়িত্ব ছিল **সমাহর্তা** ও **স্থানিক** নামক কর্মচারীর ওপর। জেলা **বিষয়** ও **আহার** নামেও উল্লিখিত হত। কতকগুলি গ্রাম নিয়ে গঠিত হত জেলা। গ্রামের শাসন পরিচালনা করতেন **গ্রামিক** বা কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি (৪ থেকে ১০টি গ্রাম) তদারকির জন্য **গোপ** নামক কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। এঁরা দেখতেন সাধারণ মানুষের অত অভিযোগ ও ন্যায়বিচারের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে কিনা। এছাড়া আরো কিছু উচ্চপদস্থ কর্মচারীর ওপর কতকগুলি বিশেষ কাজের দায়িত্ব ছিল, যেমন— (শিলালিপিতে বলা হয়েছে রজ্জুগাহক) আধুনিককালের সেটেলমেণ্ট অফিসারের মত জরিপ কর্মচারী ; জেলায় বিচারব্যবস্থার ভারও ছিল এঁদের ওপর। রাজস্ব আদায় ও প্রদেশের শান্তিশৃঙ্খলার দায়িত্ব এঁর ওপর ন্যস্ত ছিল।

সুনির্দিষ্ট কর্তব্য পালনের দায়িত্ব যে সব কর্মচারীর ওপর থাকত, তাঁরা প্রজার মঙ্গলের জন্য ঠিকভাবে কাজকর্ম করছেন কিনা তা দেখে রাজার গোচরে আনার জন্য নিযুক্ত ছিল **গুপ্তচরগণ**। রাজা রাজ্যের সর্বত্র সর্বদা উপস্থিত না থাকলেও 'রাজার চক্ষু ও কর্ণ' স্বরূপ গুপ্তচরদের মারফত সব রকম খবর জানতে পারতেন। সাধু, ভ্রমণকারী, গণক, উন্মাদ প্রভৃতির ছদ্মবেশে গুপ্তচররা সংবাদ সংগ্রহ করত, নর্তকীরাও গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত হত। রাজার নির্দেশে গুপ্তচরেরা যে কোন সময়ে, যে কোন স্থানে যেতে পারত, এমন কি অন্তঃপুরেও ছিল তাদের অবাধগতি।

১. পূর্ব প্রদেশ: রাজধানী তোষালি। সম্ভবত কলিঙ্গ ছিল এই প্রদেশের অন্তর্গত। পশ্চিম প্রদেশ : রাজধানী উজ্জয়িনী। দক্ষিণ প্রদেশ : রাজধানী সুবর্ণগিরি।

অপরাধীর শাস্তি ঃ মৌর্যযুগে অপরাধীর শাস্তি ছিল অত্যন্ত কঠোর। শিরশ্ছেদ, হাত কেটে দেওয়া, দূর প্রদেশে নির্বাসন, জরিমানা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। রাজ্যের সর্বত্র যাতে একই প্রকার অপরাধের জন্য সমপরিমাণ শাস্তি দেওয়া হয়। এজন্য **দণ্ডসমতা ও ব্যবস্থার সমতা** স্থাপন করে **আইনের চোখে সকলেই সমান**—এই নীতি চালু করা হয়েছিল।

অশোকের শাসন সংস্কার ঃ চন্দ্রগুপ্ত প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা রীতিমত কঠোর ছিল। রাজার একচ্ছত্র শাসন, দুষ্টের দমনে ভীতিজাগানো শাস্তি, আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রয়োগে শাসনযন্ত্র সচল—এই ছিল অশোক-পূর্ব শাসনব্যবস্থার চিত্র। কলিঙ্গ-যুদ্ধের নরহত্যা ও প্রজার দুর্দশায় ব্যথিতহৃদয় অশোক শাসনযন্ত্রকে উদার, দরদী ও প্রজাকল্যাণধর্মী করার জন্য কতকগুলি উপায় গ্রহণ করেছিলেন। রাজার নির্দেশে প্রাদেশিক, স্থানিক, রাজুক প্রভৃতি পদস্থ কর্মচারী নিজ নিজ এলাকার মধ্যে প্রতি ৩ বা ৫ বছর অন্তর পরিভ্রমণ করে প্রজার জীবনযাত্রার অবস্থা ও তাদের সমস্যা সম্বন্ধে অবগত হতেন এবং তা সমাধানে সচেষ্ট হতেন। এবং তা সমাধানে সচেষ্ট হতেন। অশোক নিজেও এরূপ পরিক্রমা করতেন।

জনকল্যাণ ঃ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে রাজাকে মেঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। নদী ও ছোটবড় জলাশয় থেকে বাষ্পকণার সমষ্টি মেঘ ঐ জল নিজে পান না, করে দেশময় বর্ষণে বিলিয়ে দেয়। অশোকও তেমনি শুধু করভোগী ছিলেন না, প্রজার কল্যাণে তিনি সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করতেন। প্রজাদের সুবিধার জন্য তিনি পথিপার্শ্বে ছায়াবৃক্ষ রোপণ, কূপখনন, জলাধার ও বিশ্রামভবন নির্মাণ, মানুষ ও পশুর জন্যও চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। তাছাড়া ঔষধের উপাদান ভেষজ উদ্ভিদ সংগ্রহ, রোপণ ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে অশোকই বোধহয় প্রথম সম্রাট যিনি শুধু মানুষের জন্য নয়, পশুর জন্যও চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন।

সহিষ্ণু ধর্মমত ঃ অশোক নিজে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হলেও রাজ্যের অন্যধর্মের লোকেদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করেছেন। অশোকের রাজ্যে প্রজারা নিজ নিজ ধর্মমত অনুযায়ী ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান করতে পারত, রাজধর্ম গ্রহণ না করলেও তাদের ওপর অত্যাচার বা অবিচার হত না ; অশোকের মহত্ত্বের এটি একটি বড় উদাহরণ। অশোক শিলালিপিতে বলেছেন—'এক ধর্মীয় সম্প্রদায় কখনই অন্য সম্প্রদায়কে হীন বা তার ওপর দোষারোপ করার চেষ্টা করবে না। অপর ধর্মের প্রতি সম্মানের ভিতর দিয়েই ধর্মের কল্যাণসাধন হয়ে থাকে।'

রাজধানীর শাসনব্যবস্থা ঃ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে গ্রীকরাজদূত মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্র নগরের শাসনব্যবস্থার বিবরণ দিয়েছেন। সাম্রাজ্যের অন্যান্য বড় নগরেও অনুরূপ পৌরসভা ও শাসনপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, অনুমান করা যায়।

নগর-পরিষদ : মৌর্যশাসনব্যবস্থা দেশের সর্বস্তরে ব্যপ্ত হলেও সেযুগের সাহিত্যে স্বায়ত্ত-শাসিত সম্প্রদায় ও নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজধানী পাটলিপুত্রের বাণিজ্যিক, অর্থ নৈতিক প্রভৃতি দিকের পরিচালনার জন্য **৩০ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি নগর-পরিষদ ছিল।** এইসব সদস্যের **প্রতি ৫ জনকে নিয়ে ৬টি বোর্ড বা দল গঠিত হয়েছিল।**

সমরপরিষদ : নগর পরিষদের অনুরূপ ৩০জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল সমরপরিষদ। এর ৫জন করে সদস্যের এক-একটি দল বিশেষ বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করত, যেমন (১) পদাতিক, (২) অশ্বারোহী, (৩) হস্তিবাহিনী, (৪) যুদ্ধরথ, (৫) খাদ্য সরবরাহ ও পরিবহন এবং (৬) নৌবাহিনী।

রাজস্ব : অর্থ রাজার শক্তির মূল। রাজার অর্থের উৎস হল বিভিন্ন প্রকার রাজস্ব, নগদ কর ও ফসল। মৌর্যদের রাজস্ব আসত **ভাগ, বলি, বিক্রয়-কর, জন্ম ও মৃত্যুকর, জরিমানা** প্রভৃতি থেকে। জমির ফসলের $\frac{১}{৬}$ ভাগ রাজার প্রাপ্য ছিল। উৎপন্ন দ্রব্যের $\frac{১}{৪}$ থেকে $\frac{১}{৮}$ পর্যন্ত দেয় কর ছিল **'বলি'**। শহর অঞ্চলে জন্ম ও মৃত্যুকর, জরিমানা, বিক্রয়কর প্রভৃতি থেকে প্রচুর রাজস্ব পাওয়া যেত। এ ছাড়া পশুপালকদের কাছ থেকে পালিত পশু ও ব্যবসায়ীর কাছ থেকে উপঢৌকন ও সেবা কর আদায় করা হত।

বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক অশোক : অশোক প্রথম জীবনে শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন। ২৬১ খৃঃ পূর্বাব্দে কলিঙ্গযুদ্ধের পর তাঁর জীবনে পরিবর্তন আসে। তিনি বৌদ্ধধর্মের অহিংসা ও মানবকল্যাণের নীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে তিনি দেশে এবং বিদেশে বুদ্ধের ধর্মমত প্রচারে উৎসাহী হন। ধর্মপ্রচারে অশোক নিজরাজ্য মধ্যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তা হল :

১. রাজকর্মচারীর মাধ্যমে প্রচার : প্রাদেশিক, রাজুক প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারী নির্দিষ্ট রাজকার্য উপলক্ষে রাজ্যের মধ্যে পরিভ্রমণ করার সময় প্রজার কাছে ন্যায়নীতি প্রচার করতেন।

২. ধর্মমহামাত্র নিয়োগ : নানা বিষয়ক কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের ওপর ধর্মের বাণী প্রচারের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর না করে ধর্মমহামন্ত্র নামে পদস্থ রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন, সকল শ্রেণীর প্রজার কাছে ধর্মের বাণী পৌঁছে দেওয়া ছিল যাঁদের প্রধান কাজ।

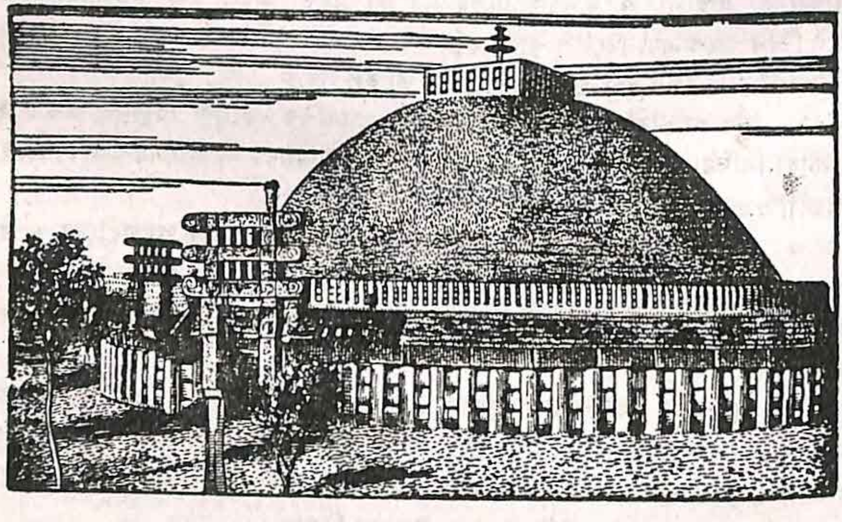
৩. সম্রাটের ধর্মযাত্রা : পূর্ববর্তী নৃপতিগণ 'বিহারযাত্রা' অর্থাৎ রাজ্যের মধ্যে আনন্দ-ভ্রমণ করতেন। তার পরিবর্তে অশোক 'ধর্মযাত্রা' প্রবর্তন করেন। তাঁর রাজ্যাভিষেকের প্রতি ১০ বছর পর এইরূপ ধর্মযাত্রা অনুষ্ঠিত হত। তখন দেশের মধ্যে ভ্রমণ করে সম্রাট প্রজাদের নীতিধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন।

৪. বৌদ্ধতীর্থ দর্শন : অশোক বুদ্ধের জন্ম ও সাধনার সঙ্গে যুক্ত পবিত্র তীর্থক্ষেত্র-গুলি দর্শন করেন যেমন, বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনি উদ্যান, বাল্যের বাসভূমি কপিলাবস্তু,

বুদ্ধত্বলাভের স্থান বোধগয়া, পঞ্চশিষ্যকে যেখানে প্রথম উপদেশ দিয়েছিলেন সেই মৃগদাব সারনাথ, পরিনির্বাণস্থান কুশীনগর। তীর্থযাত্রার ভিতর দিয়ে সম্রাটের ধর্মের প্রতি যে নিষ্ঠা প্রকাশ পায় তা প্রজাদের এই ধর্মগ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছিল। লুম্বিনি গ্রামে তিনি যে শিলাস্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন তাতে ঐ গ্রামকে করমুক্ত করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন।

৫. **ধর্মবিজয় ঘোষণা** : অস্ত্রের দ্বারা দেশ বিজয় রাজাদের চিরাচরিত নীতি। রাজ্যের সীমান্তে কেউ উৎপাত বা শত্রুতা করলে অস্ত্র দ্বারাই তাদের দমন করা হত। কিন্তু অশোক এরূপ ক্ষেত্রেও অহিংসনীতি প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন পূর্বের মত **ভেরীঘোষের** (যুদ্ধকালীন ভেরী দামামার বাজনা) সঙ্গে অস্ত্রপ্রয়োগের **পরিবর্তে ধর্মঘোষের** অর্থাৎ শান্তির বাণী প্রচারের মাধ্যমে শত্রুর হৃদয় জয় করার নীতি গ্রহণ করা হল। অশোক নিজেই শুধু অস্ত্রপ্রয়োগ থেকে বিরত হননি, তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও শান্তির পথ অনুসরণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

৬. **স্তূপ ও শিলালিপি স্থাপন** : অশোক দেশের বিভিন্নস্থানে বুদ্ধের স্মৃতি চিহ্নের ওপর স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। প্রবাদ আছে, আফগানিস্তানসহ ভারতে অশোক ৮৪ হাজার স্তূপ স্থাপন করেন। এর মধ্যে ভূপালে অবস্থিত সাঁচীস্তূপ বিশেষ প্রসিদ্ধ। এছাড়া পাথরের ফলকে, পাহাড়ের গায়ে, শিলাস্তম্ভে জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় ন্যায়নীতি ও উপদেশ খোদাই করে দিয়েছিলেন। এগুলো বর্তমানযুগেও মানুষের বিস্ময় উৎপাদন করে।



সাঁচীস্তূপ

৭. **জনকল্যাণকর কর্ম** : পান্থশালা স্থাপন, পথিপার্শ্বে বৃক্ষরোপণ। জলাধার প্রতিষ্ঠা, জীবহিংসা বারণ মানুষ ও রুগ্ন পশুর জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন, রোগ-

নিরাময়ক লতাগুল্ম বৃক্ষাদি পরিচর্যা ব্যবস্থার মাধ্যমে করুণাঘন রূপটি অশোক প্রজাসাধারণের কাছে তুলে ধরেছিলেন এবং তারাও আকৃষ্ট হয়েছিল।

৮. রাজর্ষির আচরণ : কতকগুলি শিলালিপিতে অশোক ধর্মের অনুশাসন মান্য করার জন্য ধর্মরক্ষকের মত উপদেশ দিয়েছেন। ধর্ম অনুসরণকারী শাসকের নির্দেশ প্রজা ও শ্রমণগণও সম্ভ্রমসহকারে মান্য করতেন অনুমান করা যায়। অশোক রাজর্ষির ভূমিকা পালন করেছিলেন। অশোকের রাজত্বকালে পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধসংগীতি (Buddhist Council) অনুষ্ঠিত হয়।*

বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ

বিদেশে ধর্মপ্রচার : এশিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপ

শুধু নিজ সাম্রাজ্যের মধ্যেই নয়, বিদেশেও ধর্মপ্রচারক পাঠিয়ে অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর প্রচারকগণ বুদ্ধের বাণী বহন করে তাঁর সমসাময়িক সিরিয়ার রাজা **অ্যান্টিয়োকাস** (সেলুকাসের পৌত্র), মিশরের **টলেমি,** ম্যাসিডনের **অ্যান্টিগোনাস,** সাইরিনের **মগস্‌** এবং কোরিন্থের **আলেকজাণ্ডারের** রাজসভায় গিয়েছিলেন। অশোকের শিলালিপিতে এই দেশগুলির রাজার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন, খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি ভারত থেকে রাজদূতেরা এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের রাজাদের সভায় হাজির হয়েছিলেন. এই বিস্ময়কর তথ্য মনের মধ্যে কল্পনার দরজা খুলে দেয়।

এইসব দেশের রাজা বা প্রজারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা নেই কিন্তু সিংহল ও ব্রহ্ম দেশে বুদ্ধের ধর্মমত সাদরে গৃহীত হয়েছিল।

ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে : অশোকে প্রেরিত বৌদ্ধপ্রচারকদল সুবর্ণভূমি অর্থাৎ নিম্নব্রহ্মদেশ ও সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে উপস্থিত হয়েছিলেন। অশোকের ভ্রাতা (মতান্তরে পুত্র) মহেন্দ্র এবং ভগিনী সংঘমিত্রা বোধিবৃক্ষের একটা শাখা সিংহলে নিয়ে রোপণ করেছিলেন। সে বৃক্ষটি এখনও জীবিত আছে। সিংহলের রাজা দেবানাম প্রিয় তিস্য প্রজাবর্গসহ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। অদ্যাপি সিংহলীগণ বৌদ্ধ। ভারতের বাইরের বৌদ্ধগণ ভারতবর্ষকে পরমপুণ্যতীর্থ বলে মনে করে।

ইতিহাসে অশোকের স্থান

প্রাচীন জগতের ইতিহাসে অশোক এক কীর্তিমান পুরুষ। ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেছেন, ভারতীয় নৃপতিদের দীর্ঘ তালিকায় অশোক ও আকবর যে সর্বাধিক

---

* পর পৃষ্ঠায় 'অশোকের ধর্ম' অংশ দ্রষ্টব্য

উল্লেখযোগ্য তাতে সন্দেহ নেই। উভয়েই ধর্মনিরপেক্ষতা ও প্রজাকল্যাণে ব্রতী ছিলেন। আকবর স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করে প্রজার দুর্দশাবৃদ্ধির হেতু হয়েও সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন, অশোক কিন্তু করুণার্দ্র হৃদয়ে অস্ত্রসংবরণ করেছিলেন এবং দেশে দেশান্তরে অহিংসা ও শান্তির বাণী প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বিখ্যাত চিন্তানায়ক ঐতিহাসিক এইচ.জি.ওয়েলস বলেন, ইতিহাসে শতসহস্র রাজামহারাজার নামের মধ্যে কেবল অশোকের নামই একাকী একটি নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করছে। কনস্টানটাইন অথবা শার্লমানের নাম যারা শুনেছিল, তাদের চেয়ে অনেক বেশি জীবিত মানুষ এখন অশোকের স্মৃতি শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে পোষণ করে।

অশোক ইতিহাসে অনন্য কীর্তিমান উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক: মহানুভব পুরুষ বলে সমাদৃত

কে. এম. পানিক্কর অশোকের মহত্ত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন, শক্তির সদম্ভ প্রকাশ নয়, বিশ্বে শান্তি, মানবকল্যাণ ও করুণা স্থাপনই শাসনযন্ত্রের আদর্শ বলে অশোক গ্রহণ করেছিলেন। মানবদরদী কর্ম ও আদর্শের জন্য অশোক মহানুভব বলে সমাদৃত।

অশোকের ধর্ম ঃ ব্যক্তিগত জীবনে অশোক ছিলেন বৌদ্ধধর্ম অনুসরণকারী বুদ্ধের নিষ্ঠাবান ভক্ত। তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে বুদ্ধের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত স্থানসমূহে তীর্থযাত্রায় গিয়েছেন, রাজধানী পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ-সংগীতির অনুষ্ঠান করেছেন কিন্তু প্রজাপালকরূপে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা প লন করেছেন, নিজের ধর্মকে প্রজাবর্গের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেননি। তাঁর পাথরে খোদিত



অশোকের সাম্রাজ্য ও ধর্মপ্রচার

অনুশাসনে বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি, যেমন আর্যসত্য, অষ্টাঙ্গমার্গ, নির্বাণ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা হয়নি। এর পরিবর্তে সকল ধর্মের সার জনসাধারণের অনুসরণের জন্য

প্রচার করা হয়েছে। অশোক-প্রচারিত, সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য 'ধর্ম' হল—পিতামাতা, শিক্ষক ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি, ব্রাহ্মণ শ্রমণ, বন্ধু, ভৃত্য ও বিপন্ন ব্যক্তির প্রতি যোগ্য ব্যবহার। দান, দয়া, সাধুতা, কৃতজ্ঞতা, সত্যবাদিতা, সংযম প্রভৃতি নৈতিক গুণের বিকাশে উৎসাহ এবং ক্রোধ, নৃশংসতা, বর্জন করার আহ্বান জানান হয়েছে। অশোক তাঁর প্রজাদের অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীগণের প্রতি উদারতা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের উপদেশ দিয়েছেন।

(গ) বৈদেশিক আক্রমণঃ পারসিক অভিযান

(।) খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পারস্যের অ্যাকেমিনিয়ান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট **কাইরাস** কাবুলের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বিখ্যাত প্রাচীন নগরী কপিশা অধিকার করে নেন। এই বংশের সম্রাট দরায়ুস ভারতের দিকে আরো অগ্রসর হয়ে সিন্ধুনদের পশ্চিম পাড় পর্যন্ত পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। দরায়ুস স্কাইলাক্স (Skylax) নামে এক নৌসেনাপতির অধীনে এক অভিযাত্রী দল পাঠিয়েছিলেন যা সিন্ধুর দক্ষিণ জলপথ দিয়ে ১৩ মাসে সাগরে গিয়ে পৌঁছেছিল। এই অভিযানের ফলে রাজপুতনার মরুভূমি পর্যন্ত সিন্ধু উপত্যকা পারস্যের অধিকারে যায়। দরায়ুস যে বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করতেন, ভারতীয় অঞ্চল তার **বিংশ প্রদেশরূপে গণ্য** হয়েছিল। এই প্রদেশ পারস্যসাম্রাজ্যের সর্বাধিক জনবহুল এবং সমৃদ্ধ বলে পরিচিত ছিল। এখান থেকে বার্ষিক রাজস্ব হিসাবে ৩৬০ ট্যালেন্ট স্বর্ণরেণু রাজকোষে জমা হত, যার মূল্য ছিল ১০ লক্ষ পাউণ্ডের বেশি। ভারতীয় প্রদেশ শুধু রাজস্বই দিত না, ভারতীয় তীরন্দাজ সৈন্য পারস্য সম্রাট জারেকসেসের সৈন্যদলের অঙ্গ হিসাবে যুদ্ধ করতে গ্রীসে গিয়েছিল। জারেকসেস অবশ্য পরাজিত হয়েছিলেন।

গ্রীক অভিযান

দরায়ুসের আক্রমণের পর প্রায় ২০০ বৎসর ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বিদেশীর আক্রমণ থেকে মুক্ত ছিল। ৩২৬ খৃস্টপূর্বাব্দে ভারতে যে বিদেশীর আক্রমণ ঘটে তা সিন্ধুনদ পার হয়ে, ঝিলাম পার হয়ে পূর্বদিকে এগিয়ে এসেছিল। এবারের অভিযানের নায়ক পারসিক নয়, পারস্যসাম্রাজ্য বিজেতা, গ্রীসের ম্যাসিডনরাজ ফিলিপের পুত্র আলেকজান্দার, যিনি অভূতপূর্ব বীরত্বের জন্য ইতিহাসে 'মহাবীর' আখ্যা পেয়েছেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে তখন অনেক ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। তারা অনেকেই বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেন। বাধা পেলেন ঝিলাম নদীতীরে। পুরু বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেও পরাজিত হলেন। তাঁকে আলেকজান্দারের সম্মুখে আনা হলে গ্রীকবীর তাঁকে জিজ্ঞেস

করেন, তিনি কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা করেন। উন্নত মস্তকে পুরু উত্তর দিয়েছিলেন, 'রাজার মত'। পুরুর শৌর্যে মুগ্ধ হয়ে আলেকজান্দার তাঁর রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দেন এবং বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন। রণবিশারদ আলেকজান্দার বুঝেছিলেন, পুরুর মত নির্ভীক রাজাকে শত্রু হিসাবে পিছনে রেখে দেশের মধ্যে এগিয়ে গেলে বিপদ ঘটতে পারে। তাই পুরুর বন্ধুত্ব তিনি মূল্যবান মনে করেছিলেন।

ঝিলাম যুদ্ধের পর আলেকজান্দার পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে পুরুর রাজ্যের পূর্বসীমানায় চন্দ্রভাগা নদী অতিক্রম করলেন। সে অঞ্চলে কনিষ্ঠ পুরু রাজত্ব করছিলেন। ঐ রাজ্য জয় করে আলেকজান্দার তা পুরুরাজার রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেন। এরপর আরো পূর্বদিকে ইরাবতী পার হয়ে অগ্রসর হলে সকলা (সম্ভবত বর্তমান শিয়ালকোট) নগরে **কাঠই** উপজাতির লোকেরা প্রবল বাধা দিয়েছিল। কাঠইদের প্রতিরোধ চূর্ণ করে আলেকজান্দার তাঁর ভারত অভিযানের সর্ব পূর্বপ্রান্ত শতদ্রু নদীতীরে উপস্থিত হলেন।

আলেকজান্দার নিজে পূর্বদিকে আরও অগ্রসর হতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু স্বদেশ থেকে বহু দূরে আগত রণক্লান্ত সৈনিকরা অজানা অভিযানে এগিয়ে যেতে ঘোরতর আপত্তি জানায়। মগধের নন্দরাজার বিরাট সৈন্যবলের কথাও গ্রীক শিবিরে পৌঁছেছিল। গ্রীকসৈন্যদের দেশের ফেরার ইচ্ছার সঙ্গে অজানা শক্তিমান শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার অনিচ্ছাও যুক্ত হয়েছিল। আলেকজান্দারকে তাই শতদ্রু নদীতীর থেকে ফিরে যেতে হয়। এখানে তাই ভারতের অভ্যন্তরে অগ্রগতি সীমা নির্দেশক ১২টি সুউচ্চ বেদী নির্মাণ করেছিলেন।

ফেরার পথে মালব নামে শক্তিশালী উপজাতির লোকেরা আলেকজান্দারের পথরোধ করে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি ভীষণভাবে আহত হয়েছিলেন। তাঁর একদল সৈন্য আফগানিস্তানের পথে ফিরে যায়, একদল নিয়ে স্বয়ং আলেকজান্দার বালুচিস্তানের মরুভূমি পথে অশেষ কষ্টে প্রত্যাবর্তন করেন। অন্য একদল সেনাপতি নিয়ারকসের অধীনে জলপথে দেশে ফেরে, ফেরার পথে আলেকজান্দার ৩২৩ খৃস্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স ৩৩ বছর পূর্ণ হয়নি।

আলেকজান্দারের অভিযানের ফল

আলেকজান্দারের ভারত অভিযানের ফল দুইভাগে ভাগ করা যায়—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ।

প্রত্যক্ষ ফল ঃ (i) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের **বহু নগর ধ্বংস** ও **নরনারী নিহত** হয়। আলেকজান্দারের ১৯ মাসকাল ভারতে অবস্থান শুধু এক অঞ্চলে যুদ্ধবিগ্রহেই অতিবাহিত হয়েছিল। এরূপ পরিবেশে গ্রীক ও ভারতীয়রা পরস্পরকে

ভালভাবে জানার এবং বোঝার সুযোগ পায়নি। পরন্তু শত্রুরূপে এদেশে আসায় গ্রীকদের প্রতি ভারতীয়দের বিরূপতা ছিল স্বাভাবিক। তবু ঐ অঞ্চলের এবং ভারতের ইতিহাসের ওপর বিশেষ প্রভাব পড়েছিল।

(ii) ভারতের সঙ্গে পাশ্চাত্যদেশের যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত হয়। আলেকজান্দারের আগমন ও প্রত্যাবর্তনে ৩টি স্থলপথ ও ১টি জলপথ ব্যবহার্য বলে বোঝা গেল। স্থলপথ হল—কাবুলের ভিতর দিয়ে খাইবার গিরিপথ, বালুচিস্তানে মুল্লা গিরিপথ এবং গেড্রোশিয়ার পথ। আলেকজান্দারের সেনাপতি নিয়ারকস কিছু সৈন্যসহ সমুদ্রপথে ফিরে গিয়েছিলেন।



আলেকজান্দারের ভারত অভিযান

(iii) পশ্চিম এশিয়ায় কতকগুলি ক্ষুদ্র গ্রীকরাজ্য স্থাপন, যার মাধ্যমে ইউরোপের সঙ্গে ভারতের ভাবধারার বিনিময় সম্ভব হয়েছিল। গ্রীকদের প্রাধান্য ভারতের গভীরে প্রবেশ না করলেও **গ্রীকসভ্যতা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রভাব** সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

পরোক্ষ ফল ঃ ভারতসীমান্তে প্রতিষ্ঠিত ব্যাক্ট্রিয়া গ্রীকরাজ্যগুলির মাধ্যমে শিল্প, বিজ্ঞান ও ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে গ্রীসের যে প্রভাব পড়েছিল, এদেশের নানা কর্মে তার প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন—

(i) **ভাস্কর্যে ঃ** গ্রীক ভাস্কর্যের একটি বৈশিষ্ট্য মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিখুঁত বাস্তবধর্মী করে নির্মাণ। গন্ধার অঞ্চলে গ্রীক ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্যগুলি মূর্তিতে প্রকাশ করে

ভারতীয় শিল্পীরা যে নতুন শৈলী প্রবর্তন করেছিল, তা গান্ধার-শিল্প নামে খ্যাত হয়েছে।

(ii) ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্র গ্রীক চিন্তানায়কদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক শব্দই গ্রীক শব্দ থেকে গৃহীত।

(iii) গ্রীক দেবতাদের চিন্তাধারায় বৌদ্ধ মতবাদ অনেকখানি প্রভাবিত হয়। বুদ্ধের মূর্তির উপাসনা গ্রীক প্রভাবের ফল বলে অনেকে মনে করেন। বৌদ্ধধর্মে মূর্তি পূজার প্রচলনের ফলে হীনযান ও মহাযান মতের উদ্ভব।

(iv) আলেকজান্দারের আক্রমণ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজ্যবিস্তারের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

(v) আলেকজান্দারের অভিযান ভারত ইতিহাসের কালনির্ণয়ে একটি সুস্থির, সঠিক 'কালচিহ্ন' (milestone) রূপে স্বীকৃত। এর পূর্বে ঘটনাসমূহের সঠিক সময় নির্ণয় সম্ভবপর হয়নি।

(vi) আলেকজান্দার নিজে ছিলেন শিক্ষিত, সে যুগের গ্রীসের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক অ্যারিস্টটলের ছাত্র। তাঁর অভিযানে সঙ্গী হয়েছিলেন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, ভূগোলবিদ, সমরনায়ক অনেক বন্ধুব্যক্তি। এঁদের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা ইউরোপে ভারতের প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শ ভারতের পক্ষে কল্যাণকর হয়েছিল।

মৌর্যদের পতনের পর বিদেশীদের অভিযান

ব্যাকট্রিয়ান-গ্রীকদের কথা : আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। সেলুকাসের ভাগে পড়ে পারস্য সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্য ভাঙাগড়ার স্বাভাবিক নিয়মেই সেলুকাসের উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতার সুযোগে সাম্রাজ্যের প্রান্ত প্রদেশগুলি স্বাধীন হয়ে যায়। অশোক যখন ভারতে পূর্ণগৌরবে রাজত্ব করছিলেন তখন ২৫০ খৃস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে সেলুকাসের সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রান্তের দুইটি প্রদেশ—ব্যাকৃট্রিয়া ও পার্থিয়া স্বাধীন হয়ে যায়।

হিন্দুকুশ পর্বত ও অক্ষুনদীর (Oxus) মধ্যবর্তী সমৃদ্ধ ও সুসভ্য অঞ্চল ছিল ব্যাকৃট্রিয়া। এখানে সহস্র শহর ছিল এবং পারস্য সাম্রাজ্যের একটি উন্নত প্রদেশরূপে এর খ্যাতি ছিল। ব্যাকৃট্রিয়ার ক্ষত্রপ (Governor) ডায়োডোটস (Diodotos) স্বাধীনতা ঘোষণা করে এক রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যাকৃট্রিয়ার চতুর্থ রাজা ডেমেট্রিয়স (Demetrios) নিজ বাহুবলে আফগানিস্তান এবং পশ্চিম ভারতে পাঞ্জাবের কিছু অঞ্চল অধিকার করেছিলেন। ব্যাকৃট্রিয়ান রাজা মিনান্দার (Menander) রাজ্যবিজেতা এবং ধর্মতত্ত্বে সুপণ্ডিত নৃপতিরূপে ভারত ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন

করেছেন। ১৬০ থেকে ১৪০ খৃস্টপূর্বাব্দে তিনি পাঞ্জাবে রাজত্ব করেছিলেন।

বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থে মিনান্দার মিলিন্দ নামে উল্লিখিত হয়েছেন। বলা হয়েছে, বৌদ্ধ শ্রমণ নাগসেন মিনান্দারকে শাস্ত্রীয় তর্কে পরাস্ত করলে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। নাগসেনের সঙ্গে মিনান্দারের প্রশ্নোত্তর মিলিন্দ পন্‌হ (মিলিন্দ-প্রশ্ন) নামে খ্যাত।

শক বা সাইথিয়ান ঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক রাজ্যগুলি অধিকার করে নিয়েছিল যে তিনটি বিদেশীজাতি, তারা হল শক, পার্থিয়ান (পহ্লব) ও কুষাণ। শকদের আদি বাসস্থান ছিল মধ্য এশিয়ায়। ইউ-য়ে-চি বা কুষাণদের এক শাখা দ্বারা স্থানচ্যুত হয়ে শকরা আফগানিস্তানে চলে আসে এবং যেখানে বসতি করে তা শকস্থান (বর্তমান সিস্তান) নামে পরিচিত হয়। ক্রমে তারা সিন্ধু উপত্যকা ও পশ্চিম ভারতের দিকে অধিকার বিস্তার করে। শকদের অধিকৃত এই অঞ্চল গ্রীক নাবিকেরা সাইথিয়া বলে উল্লেখ করত।

শকরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাজ্য গড়ে তুলেছিল। এদের প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বলা হত ক্ষত্রপ বা মহাক্ষত্রপ। কালক্রমে ক্ষত্রপগণ নিজ নিজ প্রদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। পশ্চিম পাঞ্জাব, মথুরা ও মালবের উজ্জয়িনী এইরূপ ক্ষত্রপদের অধিকারে ছিল। তবে ভারতের ইতিহাসে এই ক্ষত্রপদের প্রভাব বিশেষ পড়েনি। চস্তন নামক শক নায়ক উজ্জয়িনীতে যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই বংশের মহাক্ষত্রপ **রুদ্রদামন** যোদ্ধা, প্রজাহিতৈষী, শিল্প-সাহিত্যে পারদর্শী সুশাসক বলে ইতিহাসে পরিচিত। জুনাগড় শিলালিপিতে নিজের কীর্তি-কাহিনী উল্লেখ করে রুদ্রদামন বলেছেন, প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি নিজের অর্থব্যয়ে জলাধার সংস্কার করে দিয়েছিলেন। সাতবাহন রাজারা বিদেশাগত শকদের প্রতিরোধ করতে শকক্ষত্রপদের সঙ্গে বহুদিন সংগ্রাম করেছিলেন।

পহ্লব সেলুকাসের সাম্রাজ্যের পূর্বাংশে অবস্থিত ব্যাকট্রিয়া ও পার্থিয়া প্রায় একই সময়ে স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। পার্থিয়ান (পহ্লব)-দের শক্তিমান রাজা ছিলেন মিথ্রেডেটিস (Mithradates) যিনি ব্যাকট্রিয়ানরাজ ডেমেট্রিয়সকে পরাজিত করে সিন্ধু ও ঝিলামের মধ্যবর্তী অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছিলেন। যে পার্থিয়ান রাজারা ভারতের অঞ্চল অধিকার করেছিলেন তাঁরা ইন্দোপার্থিয়ান নামে উল্লিখিত হন। এদের মধ্যে বিখ্যাত হয়েছিলেন গণ্ডোফারনেস (Gondophernes)। তিনি সুশাসন প্রবর্তন এবং উৎকৃষ্ট মুদ্রা প্রচার করেছিলেন যেগুলিতে উন্নত শিল্পরুচির পরিচয় পরিস্ফুট।

ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

উপাদান ঃ মৌর্য ও কুষাণ যুগের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক তথ্যের মূল উপাদান হল মেগাস্থিনিস ও অন্যান্য গ্রীক লেখকদের রচনা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, পাণিনির ব্যাকরণ অষ্টাধ্যায়ী, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, সংস্কৃত ও বৌদ্ধসাহিত্য, সর্বোপরি অশোকের শিলালিপি, ভাস্কর্য ও মুদ্রা। এসব উপাদান থেকে সমাজ ও সংস্কৃতির একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।

উপাদান : মেগাস্থিনিসের বিবরণ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, পাণিনি-পতঞ্জলি। শিলালিপি ভাস্কর্য, মুদ্রা

সামাজিক অবস্থা ঃ আর্যদের ধর্ম ও কিছু সামাজিক বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে মহাবীর এবং বুদ্ধ অভিমত প্রচার করে সমাজে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ও জাতিভেদ প্রথা বিলোপ করতে চেয়েছিলেন। এঁদের জীবিতকালে উচ্চ-নীচ সকল বর্ণের লোকই সমানভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল কিন্তু **বর্ণাশ্রম-কাঠামো ভেঙে পড়েনি।** আত্মজ্ঞান লাভ বা উচ্চ চিন্তায় যাঁরা জীবন অতিবাহিত করতেন, গ্রীকলেখকদের কাছে তাঁরা দার্শনিক (Philosopher) বা Sophist আখ্যা পেয়েছেন। বলা হয়েছে, সোফিস্টদের নির্দিষ্ট কোন জাতিশ্রেণী নেই ; উচ্চ-নীচ যে কোন শ্রেণী থেকে এরূপ লোক আসুক না কেন, তিনি অধ্যয়ন ও গভীর চিন্তাশীলতার জন্য সকলের কাছেই সমাদৃত। সোফিস্টরা সরল জীবনযাপন করতেন, তাঁদের অনেকে ছিলেন বনবাসী, স্বচ্ছন্দ বনজাত ফলমূলভোজী ; বৃক্ষের বল্কল ছিল তাঁদের পরিধান। স্পষ্টতই দেখা যায়, গ্রীকদের উল্লিখিত এই দার্শনিকদের জীবনযাত্রা আর্যদের বানপ্রস্থ আশ্রমের নামান্তর। অশোকের শিলালিপিতেও 'ভ্রমণশীল তাপসদের' উল্লেখ আছে।

ভারতের ভিতরে ও বাইরের আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে আর্যরা বর্ণাশ্রমকে আঁকড়ে ধরল, উদারতা দেখিয়ে শিথিল হতে দিল না। তবু যেসব যোদ্ধাগোষ্ঠী ভারতের নতুন বাসিন্দা হল তাদের ক্ষত্রিয় বলে স্বীকার করতে হল কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ক্ষত্রিয় নয়। যবন, শক, পহ্লব বা পার্থিয়ানদের **মনুর মানবধর্মশাস্ত্রে** 'অধম ক্ষত্রিয়' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও অধম ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে উত্তম ক্ষত্রিয়ের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং মহাভারতের দ্রোণাচার্যের মত ব্রাহ্মণও এযুগে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে সেনাপতির পদ লাভ করেছে।

বিদ্যা ও ধর্মের সমাদর ঃ যুগে যুগে হিন্দু সমাজে বিদ্বান এবং ধর্মাচার্য জাতি-শ্রেণী নির্বিশেষে সাধারণের শ্রদ্ধা লাভ করেছেন। এযুগে চিকিৎসক বিশেষ বিদ্যার জন্য সমাজে সমাদৃত হয়েছেন, বনবাসী ধর্মাচার্যের পরই তাঁর স্থান। বিদ্বান ও পবিত্রজীবনাচার্য আমাদের সমাজে চিরদিনই নমস্য।

চিকিৎসক বিদ্যার জন্য সমাদৃত ; বিদ্বান ও পবিত্র-জীবনাচার্য ভারতীয় সমাজে চিরদিনই নমস্য।

মেগাস্থিনিসের চোখে ঃ গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায়

বহুরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে অবস্থান করেছিলেন। ভারতীয় সমাজের ব্যবহারিক সচলতা দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। তিনি বলেছেন, ভারতের সমাজ-জীবনে ৭টি জাতি বা শ্রেণী বিদ্যমান। এগুলি হল ১. দার্শনিক, ২. চাষী, ৩ পশুপালক ও শিকারী, ৪. ব্যবসায়ী ও কারুশিল্পকর্মী, ৫. সৈনিক, ৬. পরিদর্শক এবং ৭. অমাত্য।

স্পষ্টতই বোঝা যায়, মেগাস্থিনিস চতুবর্ণের পুঁথিগত বিন্যাস আলোচনা করেন নি, বাস্তবে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে জীবিকা অর্জনের জন্য যে যে কাজে ব্যাপৃত দেখেছিলেন, তাই শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। পেশাকেই তিনি জাতিগত কর্ম বলে ধরে নিয়েছেন।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে কৃষিকাজে নিযুক্ত শূদ্রের সমাদর

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে, চাষ-আবাদ, গোপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের লোকদের সাধারণ বৃত্তি। দেখা যায়, জাতিবর্ণ হিসাবে **শূদ্র** সর্বনিম্ন পর্যায়ের হলেও **পেশাগত কাজে তারা বৈশ্যবর্গের লোকেদের সমতুল্য**।

সমাজে নারীর স্থান : মৌর্য ও মৌর্যপরবর্তী যুগে নারী সামাজিক মর্যাদা ও মানবিক গুণের জন্য সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। গ্রীকলেখকদের রচনা ও সমসাময়িক শিলালিপি থেকে এর পরিচয় মেলে। জানা যায়, অনেক রমণী দর্শনচর্চা ও সংযমের জীবনযাপন করে সম্মানিতা হয়েছিলেন। গৌতমবুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের সনিবন্ধ অনুরোধে নারীদের জন্য পৃথক সংঘ স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিলেন। এর ফলে নারী-পুরুষের সমতার পথে বাধা অনেকখানি দূর হয়েছিল। বৌদ্ধসাহিত্যে **ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা**, পটাচারা, আম্রপালী প্রভৃতি বিদূষী বৌদ্ধভিক্ষুণী বা 'থেরী'-দের জীবনকথা সম্ভ্রমের সঙ্গে উল্লেখ করা আছে। অশোকের শিলালিপিতে দেখা যায় দ্বিতীয়া মহিষী **কারুবাকি** সম্রাটের সঙ্গে প্রজাকল্যাণকার্যে অংশগ্রহণ করেছেন।

বিদ্যাচর্চা সংযমের জীবনযাপনের জন্য নারী সম্মানিতা; অভিজাত পুরুষের বহু বিবাহ কখনও নারীরও একাধিক পতি-গ্রহণ; বিদূষী বৌদ্ধভিক্ষু, দানশীলা মহিষী সর্বজন-সমাদৃতা

আবার বিধবা রাজমহিষী **গৌতমী বলশ্রী** সত্যপ্রিয়তা, দানকর্ম, সহনশীলতা ও পবিত্র জীবনচর্যার জন্য সবজনপূজ্যা হয়ে 'রাজর্ষিবধূ' রূপে কিরূপ সমাদৃতা হয়েছিলেন নাসিক লিপিতে তার উল্লেখ আছে। দেহরক্ষী নারীগণ সশস্ত্র হয়ে সম্রাটের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিত।

সমাজে দাসত্বপ্রথা : যদিও মেগাস্থিনিস বলেছেন, সকল ভারতীয় স্বাধীন নাগরিক, তাদের মধ্যে দাস কেউ নেই, কিন্তু ভারতীয় সমাজে দাসপ্রথা শুধু প্রচলিত নয়, নীতিশাস্ত্রেও স্বীকৃত ছিল। অশোকের অনুশাসনে দাস ও ভৃত্যের উল্লেখ আছে। তিনি এদের সকলের প্রতিই সহৃদয় আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

সমাজে আমোদ উৎসব : খেলাধূলা ও আনন্দোৎসব সমাজের জীবনী শক্তির পরিচায়ক। মৌর্যযুগের শিলা অনুশাসনে 'উৎসব' ও 'সমাজের' উল্লেখ আছে। বহুলোক আনন্দ অনুষ্ঠানে সমবেত হত। নাচগান যন্ত্রসংগীতের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ হত

উৎসবে ; দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হত **সমাজ**। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মল্লযোদ্ধারা কুস্তি লড়ত, মানুষে-মানুষে লড়াই খেলা, হাতির সঙ্গে হাতির বা অন্য প্রাণীর এই রকম দ্বন্দ্বযুদ্ধ দর্শকদের আনন্দ দিত। রাজধানী পাটলিপুত্রে বৃষ ও ঘোড়ায় টানা রথের দৌড় প্রতিযোগিতা হত। মানুষ ও প্রাণীদের লড়াইতে অনেক সময় রক্তপাত ঘটত।

'উৎসব' ও 'সমাজ' : অশোক তুচ্ছ সমাজ উৎসবের পরিবর্তে ধর্মমঙ্গল উৎসব পালন করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন

অন্যান্য খেলা : নাটক অভিনয় দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল। পতঞ্জলি 'শৌভিক' বা 'শোভনিক'দের কথা উল্লেখ করেছেন। এরা নাটকে বর্ণিত কাহিনী প্রত্যক্ষ রূপায়ণ (demonstration) করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করত। পাশা ও দাবা খেলা জনপ্রিয় ছিল, নটেরা ভোজবাজি প্রদর্শন করত, সাপুড়েরা সাপ ও বানর নিয়ে খেলা দেখাত। সমাজে সহজ সরল আমোদ ও উৎসব লোকেদের জীবনে আনন্দ ও বৈচিত্র্য নিয়ে আসত।

সমাজে চাষীর অবস্থা : চাষ-আবাদ মানবসভ্যতার আদি ভিত্তি। অরণ্যচারী, ফলমূলাহারী, পশুশিকারী যাযাবর মানুষ কৃষিকাজ শিখে স্থায়ী বসত গড়ে তুলেছিল। তখন সে খাদ্য সংগ্রহ করত না, উৎপাদন করত। খাদ্যের যোগানদার হিসাবে চাষীর মর্যাদা ছিল। আর্যসমাজে দেখি, রাজার হলকর্ষণের উদ্বোধন করে চাষীর সঙ্গে সম্মানিক যোগ-সূত্রের পরিচয় দিতেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে চাষীর প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

খাদ্য-উৎপাদক হিসাবে চাষীর মর্যাদা ছিল

বুদ্ধিবৃত্তিজীবী প্রশাসনকার্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ মানুষ প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—(১) চাষী, (২) পশুপালক ও প্রাণীশিকারী এবং (৩) ব্যবসায়ী ও কারুশিল্পী। চাষীর সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। মৌর্যযুগে চাষী সমাজের হিতকারী বিবেচিত হত, গ্রীকলেখকদের রচনায় তার পরিচয় মেলে। যুদ্ধের সময়কার অস্থিরতার মধ্যেও চাষী যাতে নির্বিঘ্নে কৃষিকর্ম করতে পারে তার ব্যবস্থা ছিল ; যুদ্ধের কাজে চাষীকে নিয়োগ বা সৈন্য চলাচলের দরুন ফসলের কোন প্রকার ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হত। শহর থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলে চাষী বিনা উপদ্রবে আবাদ করত, ফসলের ১/৬ কিংবা ১/৪ অংশ **ভাগ** কর হিসাবে রাজকোষে জমা দিত ; কোন কোন বিশেষ অবস্থায় ভাগ কর এক অষ্টমাংশও করা হত। কয়েক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর পোষণের জন্য বিশেষ অঞ্চলে ধার্য অতিরিক্ত কর, ফসলের ১/৪ অংশকে বলা হতে **বলি**। অশোকের লুম্বিনি শিলালিপিতে বলা হয়েছে, বুদ্ধের জন্মস্থান হিসাবে লুম্বিনি 'উৎবলিক' (বলিমুক্ত) এবং রাজস্ব কমিয়ে অষ্টভাগ করা হয়েছে।

সমাজে চাষীর সংখ্যা সর্বাধিক যুদ্ধবিগ্রহের সময়ও চাষীকে নির্বিঘ্নে কৃষিকর্মের সুবিধা দেওয়া হত ; ভাগ কর ফসলের ১/৬ কিংবা ১/৪ : বলি ১/১ অংশ

চাষীর সহায়তা ঃ প্রকৃতি-নির্ভর চাষীর চিরন্তন সংকট বন্যা, খরা, দাবানল এবং পঙ্গপালের আক্রমণ। প্রাচীন ভারতে চাষীদের এইসব বিপদ সম্বন্ধে **রাজশক্তি সম্পূর্ণ সজাগ** ছিলেন এবং যথোচিত প্রতিকার উদ্ভাবিত হয়েছিল। আবহাওয়াবিদ্‌গণ চাষীদের পূর্বাহ্নে সতর্ক করে দিতেন। শস্যের রোগ প্রতিকারের উপায় জানিয়ে দেওয়া হত, শস্যহানি হলে চাষী এবং জনসাধারণের জন্য **আপৎকালীন শস্যভাণ্ডার** স্থাপিত হত; **বীজশস্য সরবরাহ** করে চাষীদের অভাব পূরণ করা হত। কৃষিকর্মে নিযুক্ত লোকেদের প্রতি দেশের শাসকের সুনজরের কথা গ্রীক লেখকগণ প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

চাষীকে সর্বপ্রকার সহায়তা আবহাওয়ার খবর, আপৎ-কালীন শস্য ভাণ্ডার, বীজশস্য সরবরাহ

বন্য পশুপাখির অত্যাচার থেকে শস্য রক্ষার দায়িত্ব ছিল ব্যাধ ও শিকারীদের ওপর। কৃষিকাজের লাঙ্গল ইত্যাদি যন্ত্রপাতি তৈরি করত কামার, ছুতার প্রভৃতি কারুশিল্পীরা। চাষীর সহায়ক হিসাবে এরা যে শুধু কর থেকে রেহাই পেত তাই নয়, সরকার থেকে ভাতা সাহায্যও লাভ করত।

বন্য পশুপাখির অত্যাচার থেকে শস্যরক্ষক ছিল ব্যাধ ও শিকারীরা; যন্ত্রপাতি উৎ-পাদকরাও ভাতা-সাহায্য পেত

শিল্প বাণিজ্য ঃ মৌর্য আমলে দেশে সুশৃঙ্খল শাসন বিরাজিত, উত্তর-পশ্চিম ভারতের উন্মুক্ত পথ দিয়ে একদিকে ইউরোপ আফ্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত, অন্যদিকে মধ্য এশিয়ার দুর্গম পথ দিয়েও সুদূর চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক লেনদেনের পথ মুক্ত ছিল।

শিল্প সমবায় ঃ দেশের মধ্যে চাষীর পরেই ছিল কারুশিল্পীদের সংখ্যাধিক্য। কর্মকার, সূত্রধর, কুম্ভকার, তন্তুবায়, প্রস্তরছেদক, দক্ষ ভাস্কর, গৃহনির্মাণশিল্পী প্রভৃতি কারিগর দেশের আর্থিক উন্নতি সম্পাদনে অবদান যুগিয়েছিল। বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত কর্মীদের **সমিতি** বা **সমবায়** ছিল যার ফলে এরা সংঘশক্তি ও কর্মকুশলতার সঙ্গে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নিপুণতা ও উৎকর্ষ লাভ করেছিল। ডক্টর রোমিলা থাপার বলেছেন, উত্তর-পশ্চিম ভারত অ-ভারতীয়দের অধিকারে আসায় ভারতীয় বণিকদের কাছে নতুন বাণিজ্য-অঞ্চল উন্মুক্ত হয়েছিল।

চাষীর পরেই কারুশিল্পীদের সংখ্যা; শিল্পীদের সমবায়, উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্যের চাহিদা দেশে এবং বিদেশে; ভারতের বাইরে বাণিজ্য প্রসারের নতুন ক্ষেত্র; প্রচুর অর্থাগম

বাণিজ্য ঃ মৌর্যযুগ রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতের পক্ষে যেমন গৌরবের যুগ, ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় তেমনি আর্থিক সমৃদ্ধিরও যুগ। ভূমধ্য-সাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে, বিশেষ করে রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের যে বাণিজ্য চলত তাতে এদেশে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার উপচিয়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষ একদিকে মালয় ও চীন, অন্যদিকে ইউরোপ—এর মধ্যবর্তী পণ্যসরবরাহ অঞ্চলরূপে বণিকদের স্বর্গভূমিস্বরূপ হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের আরিকামেডু, পশ্চিম উপকূলের ভৃগুকচ্ছ

হয়েছিল কর্মচঞ্চল বাণিজ্য বন্দর। ভারতের মশলা, বিলাস সামগ্রী, মণিমুক্তা, বস্ত্র, বিবিধ কৌতূহলোদ্দীপক প্রাণী যেমন বানর, তোতা ও ময়ূর রোমানদের কাছে খুবই লোভনীয় ছিল। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনির হিসাব মত ভারত পণ্যের মূল্যবাবদ বছরে ৫৫ কোটি দিনার বা মোহর আয় করত।

ব্যবসা বাণিজ্য কিভাবে চলত ঃ ভারতের বাইরের দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত স্থলপথে ও জলপথে। স্থলপথে প্রধান পণ্যবাহী প্রাণী ছিল ঘোড়া, খচ্চর, চমরী গরু, উট প্রভৃতি। জলপথে ব্যবহৃত হত ভারতীয়দের তৈরি কাঠের জাহাজ ও বিদেশী বণিকদের জাহাজ। প্লিনি বলেছেন, ভারতীয় বড় জাহাজ হত ৭৫ টনের। ৩, ৫ এমন কি ৭ শত যাত্রী বহন করত এমন জাহাজের উল্লেখ ভারতীয় সাহিত্যে আছে।

স্থল-বাণিজ্য পথ ঃ (i) বহুব্যবহৃত পথ ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের তক্ষশিলা থেকে কাবুল ; কাবুল থেকে এই পথ নানাদিকে বিভক্ত হয়ে যেত—উত্তরমুখী পথ ব্যাকট্রিয়া, অক্সাস নদী, কাসপিয়ান সাগর হয়ে কৃষ্ণসাগর উপকূল পর্যন্ত।

(ii) কাবুল থেকে হিমালয়ের উত্তরস্থিত মালভূমির ভিতর দিয়ে চীন অভিমুখে পথ, যা **প্রাচীন রেশম** পথ নামে খ্যাত হয়েছিল। এ পথে আকাঙ্ক্ষিত পণ্য রেশম দেশ থেকে দেশান্তরে যেত। পথ ছিল ভয়ংকর, দুর্গম।

(iii) একটি পথ কান্দাহার ও হিরাট হয়ে একবাটানা। (iv) অন্য একটি পথ কান্দাহার থেকে পারস্যের রাজধানী পার্সিপোলিস ও সুসা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

জলপথ ঃ (i) সমুদ্রের উপকূল বরাবর বাণিজ্য জাহাজ আরব সাগর দিয়ে পারস্য উপসাগর হয়ে যেত ব্যাবিলন, কতক বা এডেন, লোহিত সাগর হয়ে বর্তমান সুয়েজ-এর কাছে। সেখান থেকে মালপত্র স্থলপথে যেত আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে, পরে ভূমধ্যসাগর হয়ে ইউরোপের নানা বন্দরে।

(ii) উপকূল দিয়ে জাহাজ চালাতে সময় লাগত অনেক কিন্তু ভারত মহাসাগর পাড়ি দেওয়া সহজ ছিল না। আরব নাবিকেরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে মহাসাগর পাড়ি দেওয়ার অনুকূল বাতাসের সন্ধান পেয়েছিল, যা তাদের ভাষায় 'মৌজিম', এখন মৌসুমী বায়ু নামে খ্যাত। মৌজিম শব্দের অর্থ ঋতু। গ্রীষ্মে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং শীতকালীন উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে একটানা প্রবাহিত হত। তাতে পাল খাটিয়ে বাণিজ্যতরণী ভারতে চলে আসত ; আবার গ্রীষ্মের শেষে উত্তরপূর্ব মৌসুমীর সাহায্যে স্বদেশে ফিরে যেত। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে হিপ্পালাস (Hippalus) নামে এক গ্রীক নাবিক এই নিয়মিত বায়ুস্রোত আবিষ্কার করেন অর্থাৎ আরবদের ব্যবহৃত পাড়ি-জমানো বাতাসের গতি ও চরিত্র নৌ-পরিবহনের কাজে লাগান।

পণ্যদ্রব্য ঃ খৃষ্টীয় যুগের প্রথম দিকে একজন গ্রীক নাবিকের লেখা **পেরিপ্লাস**

অব দি ইরিথ্রিয়ান সী (Periplus of the Erythrian Sea) অর্থাৎ পূর্বসাগরের বৃত্তান্ত নামক সামুদ্রিক ভূগোলে কোন্ পথে বণিকেরা কি প্রকার দ্রব্যের লেন-দেন করত তার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

তথ্যপুস্তক 'পেরিপ্লাস'

ভারত থেকে **রপ্তানি** হত চাল, গম, বস্ত্র, ক্রীতদাসী, তামা, চন্দনকাঠ, সেগুন ও ইবনিকাঠ, বিবিধ মশলা, মসলিন, রেশম, নীল লাপিস-লাজুলাই (উজ্জ্বল নীল পাথর)। বিনিময়ে ভারতে আমদানি হত মুক্তা, উজ্জ্বল রঙ, সুরা, খেজুর, সোনা, ক্রীতদাস, টিন, প্রবাল, দামী পাথর গজদন্ত, স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা, নানা জাতীয় ঔষধ প্রভৃতি। বাণিজ্যে ভারতের লাভের পাল্লা ছিল ভারী।

রপ্তানি দ্রব্য

আমদানি দ্রব্য ; বাণিজ্যে ভারত লাভবান

মুদ্রা : প্রাচীন ভারতে বেচাকেনার জন্য যে মুদ্রাগুলি ব্যবহৃত হত, তা হল সোনার **নিষ্ক, সুবর্ণ** এবং **পল** ; রূপার **শতমন**, তামার **কাকিনি** এবং **সীসার মুদ্রা**। সাধারণের বেশি প্রচলিত **কার্ষাপণ** ; এগুলি চারটি ধাতু দিয়েই তৈরি হত এবং স্বাভাবিকভাবেই ওজন ও আকৃতি অনুযায়ী এদের মূল্যমানের তারতম্য থাকত। পরবর্তীকালে ছোট **কড়ি** বেচাকেনার কাজে ব্যবহার করা হত।

প্রচলিত মুদ্রা-সোনার নিষ্ক, সুবর্ণ পল ; রূপার-শতমন ; তামার-কাকিনি ; সীসার-মুদ্রা ; চার ধাতুর কার্ষাপণ ; কড়ি

জনজীবনে বিদেশী উপাদান (Foreign Elements in the Population) : ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ছিল বিদেশীদের ভারতে প্রবেশের প্রধান দ্বারস্বরূপ। পারসিক ও গ্রীকরা ঐ অঞ্চল দিয়েই ভারতে হানা দিয়েছিল। শকরা পাঞ্জাব, মথুরা ও মালবে রাজ্য গড়ে তুলেছিল। কালক্রমে তারা ভারতীয় সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। শকদের পর হূণরা উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যভারতে স্বল্পকাল রাজত্ব করেছিল তবু ইতিহাসে তাদের গভীর প্রভাব পড়েছিল। এই বিদেশীগণ ভারতে বসতি করে ভারতীয়দের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে। এর ফলে সমাজে **মিশ্রজাতির উদ্ভব** ঘটে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে শক, হূণ, কুষাণদের বসতি ; কালক্রমে হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত

রাজপুত জাতির উদ্ভব : কখন এবং কোথায় রাজপুতদের উদ্ভব, সে সম্বন্ধে নানা মত এবং সংশয় আছে। নবম ও দশম শতাব্দীতে রাজপুতরা রাজনৈতিক প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি অর্জন করে। এদের মধ্যে চারিটি গোষ্ঠী—প্রতিহার, চৌহান, চালুক্য বা শোলাংকি এবং পারমার—বিশেষ কুলীন বলে দাবি করা হয়। কারণ তারা আবু পর্বতে যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড থেকে উদ্ভূত পুরুষের বংশধর। এইজন্য এই চার গোষ্ঠী **অগ্নিকুল** (Fire family)-জাত বলা হয়। এ সমস্ত ব্যবস্থাই রাজপুতদের হিন্দু-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের বাসনার ফল বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন।

ডক্টর রোমিলা থাপার এই প্রসঙ্গে বলেছেন, অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে যেসব

হূণ উত্তর ভারত ও পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল বা যেসব জাতিগোষ্ঠীর লোক হূণ অভিযাত্রীদের সঙ্গে ভারতে এসেছিল, রাজপুতরা তাদেরই বংশধর।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ (Contacts with the outside World): প্রাক্-মৌর্য, বিশেষ করে মৌর্যোত্তর যুগে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। পারস্য সম্রাট কর্তৃক ভারতের উত্তর-পশ্চিমের অংশবিশেষ অধিকার এবং আলেকজান্দারের অভিযানের ফলে ভারত পশ্চিমের দেশগুলির সংস্পর্শে আসে। অশোক বিদেশের রাজাদের নিকট বৌদ্ধধর্মের শান্তির বাণী প্রচারক দূত প্রেরণ করে এই সম্পর্ককে মানবতার মহিমায় উজ্জ্বল করেছিলেন। ইউরোপ আফ্রিকায় ভারতের সংস্কৃতি প্রভাব স্পষ্টভাবে বোঝা না গেলেও এশিয়ায়—সিংহল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম, শিল্প-সাহিত্য সমাদরে গৃহীত হয়েছিল। পারস্য ও গ্রীসের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ভারতের শিল্প-সংস্কৃতি-জীবনে নতুন ভাবধারার প্রবর্তন ঘটে।

শান্তি ও ধর্মপ্রচার যোগাযোগ সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডন, সাইরিন ও কোরিন্থের সঙ্গে; সিংহল ও সুবর্ণভূমি অর্থাৎ নিম্নব্রহ্ম ও সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে; বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থল ও জলপথে—এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে

বহির্জগতের অনেকখানি নতুন অঞ্চল ভারতীয়দের কাছে উন্মুক্ত হওয়ায় বাণিজ্য-প্রসারের মাধ্যমে ভারতে অভূতপূর্ব আর্থিক সমৃদ্ধির সুযোগ আসে। স্থলপথ ও জলপথের মাধ্যমে বিদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ এযুগের অশেষ কল্যাণকর বৈশিষ্ট্য।

মৌর্য শিল্প (Mauryan Art): স্থাপত্য শিল্পের যে বিশেষ উন্নতি হয়েছিল মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে তা জানা যায়। তিনি লিখেছেন, চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদ তখনকার দিনে পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং বিস্ময়কর সৌধ ছিল (finest and grandest in the world)। এর প্রায় সাতশ বছর পর চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন মৌর্যপ্রাসাদ দেখে এর বিরাটত্বে ও সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে বলেছিলেন, এগুলি মানুষের নয়, দেবতার সৃষ্টি বলে বোধ হয়।

মৌর্য রাজপ্রাসাদ সেযুগের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন

পাটলিপুত্রের প্রাসাদ কাষ্ঠনির্মিত ছিল। স্তম্ভগুলি সোনারূপা মণিমুক্তায় খচিত ছিল। মাটি খুঁড়ে প্রাসাদের স্থান নির্ণয় করা হয়েছে; সেখানে শত শত স্তম্ভযুক্ত এক বিরাট সৌধের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ছাড়া পাটলিপুত্র নগরের কাষ্ঠ প্রাচীরের অবশিষ্ট মাটি খুঁড়ে বের করা হয়েছে।

বিরাটত্বে ৭ শত বছর পরেও ফা-হিয়েন বিস্মিত

সম্রাট অশোক সারা রাজ্য জুড়ে বহু স্তূপ নির্মাণ করে বুদ্ধের পূতাস্থি রক্ষা ও অর্চনার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রবাদ এই যে, তিনি ৮৪ হাজার **স্তূপ** নির্মাণ করেন। এসবের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মধ্যভারতের **সাঁচীস্তূপ** এবং **ভারহুত স্তূপ**।

সাঁচী স্তূপ ৭৭২ ফুট উঁচু, ১২১২ ফুট ব্যাসযুক্ত। অশোকের পরবর্তীকালে এই স্তূপের চারদিকে নানা মূর্তি খোদিত পাথরের রেলিং ও তোরণ তৈরি করা হয়েছে। গম্বুজাকৃতি স্তূপগৃহ পরিক্রমার জন্য স্তূপের গা দিয়ে ঘোরান পথ। আজও সাঁচীস্তূপ ভক্ত ও দর্শনার্থীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উৎপাদন করে।

ভারহুত স্তূপের চারদিক ঘিরে যে প্রস্তর দেওয়াল ও তোরণ ছিল তার কিছু অংশ কলকাতা যাদুঘরে রাখা আছে। পাথরের গায়ে বুদ্ধজীবনের নানা কাহিনী খোদাই করা। এগুলি প্রাচীন ভারতের প্রস্তর শিল্পীদের নিষ্ঠা ও নিপুণতার পরিচয় বহন করছে।

অশোক বৌদ্ধভিক্ষুদের মঠ এবং অন্যান্য ধর্মের উপাসকদের জন্য গুহা-আবাস নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। গুহাগুলি শক্ত পাথর কেটে তৈরি কিন্তু দেওয়াল কাচের মত মসৃণ ও উজ্জ্বল। রাজতরঙ্গিণীর লেখক কহ্লণ উল্লেখ করেছেন, অশোক শ্রীনগরের ভিত্তিস্থাপন করেন ; নেপালের দেবপত্তনও অশোক কর্তৃক নির্মিত বলে মনে করা হয়।

উত্তম গুহা-গৃহ ; শ্রীনগর দেবপত্তন নির্মিত ;

ভাস্কর্য : পাথর খোদাই মূর্তি ও অন্যান্য শিল্পকাজে ভারত-ইতিহাসে মৌর্যযুগের তুলনা নেই, সর্বোত্তম উদাহরণ হল অশোকস্তম্ভগুলি ও পশুমূর্তির ভাস্কর্য। ৫০ থেকে ৬০ ফুট দীর্ঘ প্রায় ৫০ টন ওজনের স্তম্ভ এক-প্লাথর থেকে কেটে বের-করা এবং গোড়া মোটা। ওপরের দিকে সুশ্রী-ভাবে ক্রমে-সরু নিটোল আকৃতি কিভাবে দেওয়া হয়েছিল এবং কিভাবে এমন মসৃণ করা হল তা এখনও বিস্ময়ের বিষয়। প্রতিটি স্তম্ভের শীর্ষে হাতি, বৃষ, অশ্ব, সিংহ প্রভৃতি নানা প্রাণীর মূর্তি। **সারনাথ স্তম্ভশীর্ষ** (যেখানে পিঠেপিঠে বসা চারটি অপূর্বসুন্দর সিংহ রাজকীয় মহিমায় বিরাজিত) বিশ্বের এক **অনবদ্য ভাস্কর্য।** ঐতিহাসিক স্মিথ বলেন, প্রাণীভাস্কর্যে এর মত মনোহর শিল্পকর্ম জগতে নেই, এর চেয়ে উত্তম শিল্পের কথা ত ওঠেই না। বাস্তবোচিত রূপায়ণে, প্রতি অঙ্গ সঠিক প্রকাশে এবং পশুরাজের তেজোদীপ্ত মহিমা প্রকাশে সারনাথ সিংহ অতুলনীয়। পদ্মের ওপর ধর্মচক্র, ধাবমান প্রাণী ও সর্বোপরি সিংহের দৃপ্তভঙ্গি।

মৌর্যযুগের ভাস্কর্য বিশ্বে অতুলনীয় ; স্মিথ বলেন, প্রাণী-ভাস্কর্যে সারনাথ স্তম্ভশীর্ষের মত শিল্পকর্ম জগতে নেই।

স্যার জন মার্শাল বলেন, শিল্পশৈলী ও কৃৎকৌশলে সারনাথ স্তম্ভশীর্ষ একটি সর্বোত্তম কর্মনিদর্শন (masterpiece) এবং প্রাচীন জগতের সর্বোৎকৃষ্ট ভাস্কর্য।



মৌর্যভাস্কর্য : সারনাথ স্তম্ভশীর্ষ

অলংকার শিল্প : শুধু বিরাট আকারের শিল্পকাজই নয়, ক্ষুদ্র আয়তনে নিখুঁত সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে মৌর্যযুগের অলংকার-শিল্পে দক্ষতার পরিচয় মেলে। তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কতকগুলি অলংকারের নিদর্শন পাওয়া গেছে যাতে মণিকারের নিপুণতা সুস্পষ্ট।

অলংকার শিল্পে মণিকারের নিপুণতা। শুধু বৃহৎ ভাস্কর্যে নয়, ক্ষুদ্র বস্তু নির্মাণেও কমনীয়তা প্রকাশ

ঙ. কুষাণসাম্রাজ্যের কথা

কুষাণদের পরিচয় : বর্বর হূণ জাতিকে ঠেকানোর জন্য চীন সম্রাট চীনের উত্তর সীমান্ত জুড়ে মহাপ্রাচীর গড়ে তুলেছিলেন। তাদের আক্রমণে স্থানচ্যুত হয়ে ইউয়ে-চি গোষ্ঠীর যাযাবররা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে আসে। এই ইউয়ে-চি গোষ্ঠীর এক শাখা তিব্বতে বসতি স্থাপন করে, অন্য গোষ্ঠী পশ্চিমদিকে এগিয়ে এসে ব্যাকট্রিয়ান, পার্থিয়ান ও শকদের রাজ্যপাট কেড়ে নিয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে স্থায়ী হয়ে বাস করতে থাকে। ইউয়ে-চিরা পাঁচটি উপজাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। কালক্রমে কুষাণ নামে এদের এক শাখা অন্য সবাইকে পরাভূত করে নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। এই শাখার কুষাণ নায়ক ছিলেন কুজল কদফিসিস। কাবুল, কান্দাহার ও আফগানিস্থান অধিকার করে নিয়ে তিনি কুষাণ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

বিম কদফিসিস : কুজল কদফিসিসের পুত্র বিম কদফিসিস যোদ্ধা এবং যোগ্য শাসক ছিলেন। শকক্ষত্রপদের পরাভূত করে তিনি বারাণসী পর্যন্ত নিজের রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি চীনের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু নিদারুণভাবে পরাজিত হয়ে চীন সম্রাটকে বার্ষিক কর প্রদানের অঙ্গীকার করতে বাধ্য হন।

কণিষ্ক : বিম কদফিসিসের উত্তরাধিকারী কণিষ্ক কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন কণিষ্ক ৭৮ খৃস্টাব্দে শকাব্দের প্রচলন করেন। তিনি একমাত্র শক রাজা যিনি অব্দ প্রচলন করেছিলেন এবং যা তাঁর উত্তরাধিকারীরা অনুসরণ করেছিল। শকাব্দ অদ্যাবধি অন্যান্য অব্দের সঙ্গে ভারতে প্রচলিত আছে।

সফল যোদ্ধা, যোগ্য শাসক : কণিষ্ক একজন বিদেশী সাম্রাজ্য-স্থাপক হয়েও ভারতবর্ষকে স্বভূমিরূপে গ্রহণ করে যেভাবে এর ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছিলেন ভারত ইতিহাসে তার অপর দৃষ্টান্ত মেলে না।

কণিষ্ক রাজ্য জয় করে তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধন করেছিলেন। কাশ্মীর জয় করে তিনি সেখানে বহু সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন, কাশ্মীরের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অনেক নগরের পত্তন করেছিলেন। শ্রীনগরের নিকটে কণিসপুর এমনি কণিষ্ক প্রতিষ্ঠিত একটি শহর।

পাঞ্জাব মথুরার শক ক্ষত্রপদের পরাভূত করে কণিষ্ক এসব অঞ্চল নিজ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেন। মগধ আক্রমণ করে পাটলিপুত্র না হলেও বারাণসী পর্যন্ত অধিকার

করেছিলেন। কণিষ্কের বড় সামরিক কৃতিত্ব চীনের সঙ্গে যুদ্ধ এবং চীনের প্রদেশ কাশগড়, ইয়ারখন্দ ও খোটান জয় করে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা। এইভাবে তিনি তাঁর বংশের পূর্ববর্তী রাজার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। কণিষ্কের সাম্রাজ্যের পরিধি মানচিত্রে লক্ষ্য করলে তাঁর সমরশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তরে বোখারা থেকে দক্ষিণে উজ্জয়িনী, পশ্চিমে আফগানিস্থান থেকে পূর্বে বারাণসী; ভারতের পাঞ্জাব, কাশ্মীর, উত্তর প্রদেশ; ভারতের বাইরে আফগানিস্তান ব্যাকট্রিয়া, কাশগড়, খোটান, এবং ইয়ার খন্দ। কণিষ্কের সময় ছাড়া আর কখনই হিমালয়ের উত্তরের অঞ্চল ভারতীয় শাসকের শাসনাধীন হয় নি।



কণিষ্কের ভগ্নমূর্তি

ধর্মের পৃষ্ঠপোষক: কুষাণ বংশের কুজল কদফিসিস শিবের উপাসক ছিলেন কিন্তু কণিষ্ক গৌতম বুদ্ধের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সম্রাট অশোকের মত দেশে ও বিদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

রাজধানী পুরুষপুরে (বর্তমান পেশোয়ার) কণিষ্ক যে বিশাল বৌদ্ধস্তূপ (চৈত্য) নির্মাণ করেছিলেন পরবর্তী অনেককাল পর্যন্ত তা বিদেশী পর্যটকের বিস্ময় উৎপাদন করত। বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের জন্য তিনি বিহার নির্মাণ করে দিয়েছিলেন, বুদ্ধের বহু মূর্তি নির্মাণ করে এবং ধর্ম প্রচারে উৎসাহ দিয়ে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রূপে সমাদৃত হয়েছিলেন। কণিষ্কের উদ্যমে বৌদ্ধসংগীতি (Buddhist Council) সম্ভবত কাশ্মীরের কুণ্ডলবনে অনুষ্ঠিত হয় এবং **মহাবিভাষা** নামে বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রের টীকার সংকলন প্রস্তুত করা হয়। কণিষ্কের সময় বৌদ্ধ ধর্মমত দুই ভাগে, হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ে, ভাগ হয়ে যায় এবং এর ফল হয় সুদূর প্রসারী।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের পৃষ্ঠপোষক: কণিষ্কের রাজত্বকালে সমৃদ্ধি ও সুস্থির শাসনব্যবস্থা শিল্পবিকাশের পক্ষে অনুকূল ছিল। কণিষ্ক নিজে জাঁকজমকশালী নগর গড়ে তুলতে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর অধিকৃত কাশ্মীরে অনেক সুন্দর সৌধ ও নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কণিষ্কের নামের সঙ্গে যুক্ত কণিসপুর এখনও বর্তমান। রাজধানী পুরুষপুর (পেশোয়ার) বহু সুন্দর উদ্যান-অট্টালিকা ও বৌদ্ধমঠে সুশোভিত করা হয়েছিল।

কণিষ্কের সময়ে মহাযান-মত প্রাধান্য পাওয়ায় জনসাধারণের চাহিদা ও আগ্রহ মেটানোর জন্য বহু বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়। মহাযান-মত প্রচলিত হওয়ার আগে বুদ্ধের মূর্তি নির্মিত হত না। ভারহুত, গয়া, সাঁচী প্রভৃতি স্থানের চৈত্যে এবং ভাস্কর্যে বুদ্ধের প্রতীক হিসাবে চক্রশূন্য সিংহাসন, একজোড়া পদচিহ্ন অথবা অশ্বত্থবৃক্ষ দেখানো হত। মূর্তিনির্মাণে যে নিপুণ বাস্তবমুখী রূপায়ণ প্রাধান্য পায় তা গান্ধার শিল্প নামে পরিচিত হয়েছে। গন্ধার প্রদেশে প্রবর্তিত এই ভাস্কর্যে গ্রীক-রোমান প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভাস্কর্যশিল্পের বিশেষ স্ফূরণ ঘটেছিল মথুরায়। এখানকার শিল্পকাজ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য মথুরা-শৈলী (Mathura School) নামে খ্যাত হয়েছে।

সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ঃ কণিষ্ক মনস্বীব্যক্তিদের সম্মান ও আনুকূল্য দেখিয়ে নিজ সভায় স্থান দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন 'বুদ্ধচরিত' রচয়িতা **অশ্বঘোষ,** 'মহাবিভাষা' (বৌদ্ধদর্শনের বিশ্বকোষ) সংকলক **বসুমিত্র**. বৌদ্ধপণ্ডিত **নাগার্জুন** এবং সর্বকালের বিখ্যাত চিকিৎসক **চরক।**

বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ঃ কুষাণরা ছিল মঙ্গোলীয় বা তৎসংশ্লিষ্ট জাত। কুষাণ রাজধানী পুরুষপুর থেকে নিশ্চয়ই লোকজন সর্বদা মঙ্গোলিয়ায় যাতায়াত করত। সেই কারণে বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতি চীন এবং মঙ্গোলিয়ায় পেঁছেছিল। পশ্চিম এশিয়াও এইভাবেই বৌদ্ধ আদর্শ ও চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসেছিল। আলেকজান্দারের সময় থেকেই পশ্চিম এশিয়া গ্রীক শাসনাধীনে ছিল, কাজেই গ্রীকসভ্যতারও আমদানি হয়েছিল সেখানে। সেই গ্রীক এশিয়াটিক সভ্যতা ভারতীয় বৌদ্ধ সভ্যতার সঙ্গে মিশে গেল। চীন আর পশ্চিম-এশিয়ার ওপর ভারতবর্ষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তেমনি ভারতের ওপরও এই দুই দেশের ছাপ পড়েছিল।

পশ্চিমে গ্রীক-রোম-সাম্রাজ্য, পূর্বদিকে চীন, আর মাঝে ভারতবর্ষ—এইরূপ কেন্দ্র-স্থলে অবস্থানের জন্য ভারতবর্ষ ও রোমের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ভারতে যখন কুষাণরাজত্ব, তখন রোমে রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। অনুমান, কণিষ্কের রাজদূত. রোমানসম্রাট ট্রাজানের সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলত। ভারতবর্ষ থেকে নানা সুগন্ধি, রেশম, মসলিন, বহুমূল্য বস্ত্রাদি রোমে চালান দেওয়া হত। রোম থেকে সোনা এদেশে আমদানি হত। বহির্জগতের সঙ্গে বাণিজ্য কুষাণসাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির মূল কারণ।

সাংস্কৃতিক মিলন ঃ কণিষ্ক ছিলেন মহাযান-মতে র বৌদ্ধধর্ম ও গান্ধারশিল্পের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর উদ্যমে চীন, জাপান, তিব্বত ও মধ্য এশিয়ায় ধর্ম ও শিল্পের বিস্তার ঘটেছিল। স্যার অরেল স্টাইন (Sir Aurel Stein) ও অন্যান্য পুরাতত্ত্ববিদগণ প্রমাণ পেয়েছেন যে, চীনা তুর্কিস্তানের খোটান অঞ্চল কণিষ্কের রাজত্বকালে গ্রীক, ভারতীয়, ইরাণী ও চীনাসভ্যতার মিলনক্ষেত্র স্বরূপ হয়েছিল।

অশোকের যুগ ছাড়া প্রাচীন ভারতের অন্য কোন শাসকের সময়ে কণিষ্ক আমলের মত বিদেশের সঙ্গে এমন ব্যাপক এবং সার্থক যোগাযোগ সাধিত হয়নি।

কুষাণ আমলের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব (Cultural importance of the Kushan period in Indian History): কুষাণ আমল ভারত-ইতিহাসে নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কুষাণরাজাদের সময় ৭৮ খৃস্টাব্দে যে **শকাব্দ** প্রচলিত হয়েছিল তা ভারতের জনজীবনে স্বীকৃত হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করেছে। যথার্থ বলতে গেলে কুষাণগণ ঠিক 'শক' ছিল না কিন্তু ভারতবর্ষে কুষাণও ঐ জাতীয় সমস্ত গোষ্ঠীই শক বলে পরিচিত হয়েছিল। কণিষ্কের সময়ে কাশ্মীরের কুণ্ডলবনে যে চতুর্থ বৌদ্ধসংগীতি অনুষ্ঠিত হয় তার ফলে বৌদ্ধধর্মমত **হীনযান** ও **মহাযান** দুই শাখায় বিভক্ত হয়। মহাযান মত ভারতে শিল্প ও বৌদ্ধধর্মে এক নতুন মোড় এনে দেয় যার ফল হয়েছে উল্লেখযোগ্য। মহাযানমতে বুদ্ধের মূর্তিপূজার প্রবর্তন হওয়ায় ভাস্কর্যশিল্পে অভূতপূর্ব স্ফূরণ ঘটে। নতুন আঙ্গিকে শুধু ভাবসমৃদ্ধ নয়, নিখুঁত দেহগঠনযুক্ত মূর্তি নির্মিত হতে থাকে। গ্রীক-রোমান প্রভাবে উদ্বুদ্ধ এই শিল্প গন্ধারে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে **গান্ধারশিল্প** নামে পরিচিত হয়। মহাযান মতের ফলে লোকের ধর্ম ও জীবনাদর্শে একটা পরিবর্তন দেখা দেয় এবং সেটা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে শিল্পে, স্থাপত্যে। দ্বিতীয়ত, বৌদ্ধদের এক অংশের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রবর্তন হওয়ার ফলে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য ছিল তা কমতে থাকে এবং কালক্রমে হিন্দুধর্মের মধ্যে বিলীন হওয়ার পথ প্রস্তুত হয়।

শকাব্দ প্রচলিত

মহাযান শাখার প্রবর্তন—মূর্তি-পূজা—গান্ধার ভাস্কর্য হিন্দু-ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক পার্থক্য হ্রাস, হিন্দুধর্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের বিলীন হওয়ার পথ প্রস্তুত

কুষাণযুগে রাজ্যের বিস্তার ও রাজাদের কর্মতৎপরতার ফলে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটেছিল। এই যোগাযোগ এশিয়া-ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকলা ও চিন্তাধারা বিনিময়ের সুযোগ এনে দেয়। উৎকৃষ্ট ধরণের মুদ্রার প্রচলন এ যুগের একটি বৈশিষ্ট্য। অনেক সভ্য উন্নতজাতির মনন ও কর্মের প্রভাব এ যুগের ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রতিফলিত হয়েছিল।

এশিয়া ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকলা ও চিন্তাধারা বিনিময়ের সুযোগ

সাতবাহন সাম্রাজ্য

(i) **সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি** (its extent): এখন যে-দেশকে অন্ধ্রপ্রদেশ বলা হয় বহু প্রাচীন কাল থেকে সেখানে অন্ধ্র নামে একদল লোক বাস করত। এদের রাজারা ছিলেন সাতবাহন বংশীয়। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা **সিমুক** গোদাবরী নদীর উপত্যকায় একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। খৃস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সাতবাহন বংশ দাক্ষিণাত্যের উত্তর-

সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা সিমুক

পশ্চিম অংশে বর্তমান নাসিক অঞ্চলে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সাতবাহন বংশ অন্ধ্রবংশ নামেও পরিচিত ছিল। অশোকের অনুশাসনে অন্ধ্রদের উল্লেখ আছে। ডক্টর রোমিলা থাপার মনে করেন অন্ধ্রগণ সম্ভবত মৌর্যদের অধীনে প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। মৌর্যসাম্রাজের পতনের পর শুঙ্গগণ প্রাধান্য লাভ করেছিলেন।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর সাতবাহন রাজার সমৃদ্ধি; কৃষ্ণনদী থেকে সমগ্র দাক্ষিণাত্য মালভূমিতে আধিপত্য বিস্তার

দাক্ষিণাত্যে শুঙ্গশাসনের বিলোপ ঘটিয়ে সাতবাহনবংশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সাতবাহনবংশীয় রাজারা কৃষ্ণানদীমুখ থকে সমগ্র দাক্ষিণাত্য মালভূমিতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেন। [পুরাণে বলা হয়েছে সাতবাহন রাজা কান্ববংশের শেষ নরপতিকে হত্যা করে মগধরাজ্য অধিকার করেন কিন্তু কেবলমাত্র ভূপাল অঞ্চল ছাড়া উত্তর ভারতে আর কোন অংশে সাতবাহন-শাসন বিস্তৃত হয়েছিল বলে জানা যায় না।]

(ii) **কৃতিত্ব** (its achievements) ঃ মৌর্যসাম্রাজ্যের পতন হলে উত্তর ভারতে শক, যবন, পহ্লব প্রভৃতি বিদেশী জাতি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। সাতবাহনদের প্রধান কৃতিত্ব, তারা এই বিদেশীদের পরাভূত করে দাক্ষিণাত্যকে এদের অধীনতা-পাশ থেকে রক্ষা করে। সাতবাহনবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী।

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী আনুমানিক ৮২ খৃস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি শকক্ষত্রপ **নাহাপনকে** পরাজিত করে শুধু দাক্ষিণাত্য থেকে বিতাড়িতই করেন

শ্রেষ্ঠ রাজা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ;

নি, নর্মদার উত্তরে অনেকখানি অঞ্চলও অধিকার করে নেন। সৌরাষ্ট্রের শকক্ষত্রপ **রুদ্রদামন** পরে অবশ্য এই অঞ্চল পুনরধিকার করেন এবং সাতবাহনরাজাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপম করেন।

নানঘাট গুহালিপিতে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর দুইবার অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন এবং ব্রাহ্মণদের বহু সংখ্যক গো-অশ্ব-হস্তী, সহস্র স্বর্ণমুদ্রা (কার্ষাপণ) এবং গ্রামদানের কথা

দুইবার অশ্বমেধযজ্ঞ সাম্রাজ্যিক আধিপত্য ঘোষণা; রাজধানী প্রতিষ্ঠান নগর; উজ্জয়িনী অধিকার

উল্লেখ করা হয়েছে। সাতকর্নী অশ্বমেধ যজ্ঞ করে সাম্রাজ্যিক আধিপত্য ঘোষণা করেছিলেন। গোদাবরীর উত্তর তীরে **প্রতিষ্ঠান** (হায়দরাবাদের ঔরঙ্গাবাদ জেলায় বর্তমান পৈথান) সাতকর্ণীর রাজধানী ছিল। প্রাচীন মুদ্রা এবং পুরাণের তথ্য থেকে জানা যায় শাতকর্নী শুঙ্গরাজা পুষ্যমিত্রের কাছ থেকে **উজ্জয়িনী** জয় করে নিয়েছিলেন।

রাজমাতা গৌতমী বলশ্রীর **নাসিক লিপিতে** শক যবন-পহ্লব ধ্বংসকারী বীরপুরুষ বলে গৌতমী পুত্র সাতকর্ণীর প্রশস্তি আছে। এক সময়ে সাতবাহন সাম্রাজ্য

নাসিক-লিপি-শক-যবন-পহ্লব ধ্বংসকারী সাতকর্ণীর প্রশস্তি

কেবল দাক্ষিণাত্যে নয়, উত্তর ভারতেও বিস্তৃত হয়েছিল। খৃষ্টীয় প্রথম দুই শতক ধরে বিদেশীর আক্রমণ প্রতিহত করে সাতবাহনগণ দাক্ষিণাত্যের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি রক্ষা

বিদেশীর আক্রমণ থেকে দাক্ষিণাত্য রক্ষা সাতবাহনদের প্রধান কীর্তি ; রাজারা ব্রাহ্মণ, নৌবাহিনী ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধ

করেছিলেন। ইতিহাসে ইহাই তাদের প্রধান কীর্তি বলে বিবেচিত হয়।

একজন সাতবাহন রাজার মুদ্রাতে জাহাজের প্রতিকৃতি খোদিত দেখা যায়। অনুমিত হয় যে, এই রাজবংশের নৌবাহিনী ছিল। সাতবাহন রাজাদের সময়ে শিল্প ও বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। এই বংশের রাজা **হাল**-এর নামে 'সপ্তশতী' নামক কাব্যগ্রন্থ প্রচলিত আছে। সাতবাহন রাজারা ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু বৌদ্ধধর্মেও তাঁদের ভক্তি ছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে সাতবাহন সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের কথা

গুপ্তবংশের উত্থান ঃ তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন হলে উত্তর ভারতে কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। গুপ্তরা সম্ভবত এই সময়ে এক ক্ষুদ্র অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাদের রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের সুযোগ আসে বৈবাহিক সম্বন্ধের মাধ্যমে। বৈশালীর লিচ্ছবীরা এক সময়ে পরাক্রান্ত ছিল কিন্তু অজাতশত্রু তাদের অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছিলেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর লিচ্ছবীরা আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং কুষাণ রাজাদের আমলে তারা হয়ত মগধ অধিকার করে কুষাণদের অধীনে করদরাজ্যরূপে ক্ষুদ্র অঞ্চল শাসন করছিল। এই লিচ্ছবীবংশের রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তাঁর প্রচারিত স্বর্ণমুদ্রায় নিজের, রাণী কুমারদেবীর এবং লিচ্ছবীদের নাম উল্লেখ করেছিলেন। ৩২০ খৃস্টাব্দ থেকে তিনি গুপ্ত অব্দ চালু করেন। লিপিতে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পিতা ঘটোৎকচ ও পিতামহ শ্রীগুপ্তের নাম উল্লেখ আছে। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত 'মহারাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ২০ বৎসরকাল রাজত্ব করেন।

সমুদ্রগুপ্ত ঃ চন্দ্রগুপ্তের পর সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসন লাভ করেন। তিনি পিতার জ্যেষ্ঠ-পুত্র ছিলেন না। পুত্রদের মধ্যে যোগ্যতম বলে চন্দ্রগুপ্ত তাঁকেই উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেন। সমুদ্রগুপ্ত কর্মের দ্বারা যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। যুদ্ধক্ষমতা, শাসনদক্ষতা, শিল্পকলার প্রতি অনুরাগ ও উদার মানবিক গুণের জন্য সমুদ্রগুপ্ত ভারত ইতিহাসে কীর্তিমান পুরুষ বলে গণ্য। এক ক্ষুদ্র রাজ্যকে তিনি বাহুবলে বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। তাঁর মাতুলকুল লিচ্ছবীদের সহায়তা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে তিনি নিজেকে গর্বের সঙ্গে 'লিচ্ছবী দৌহিত্র' বলে উল্লেখ করেছেন।

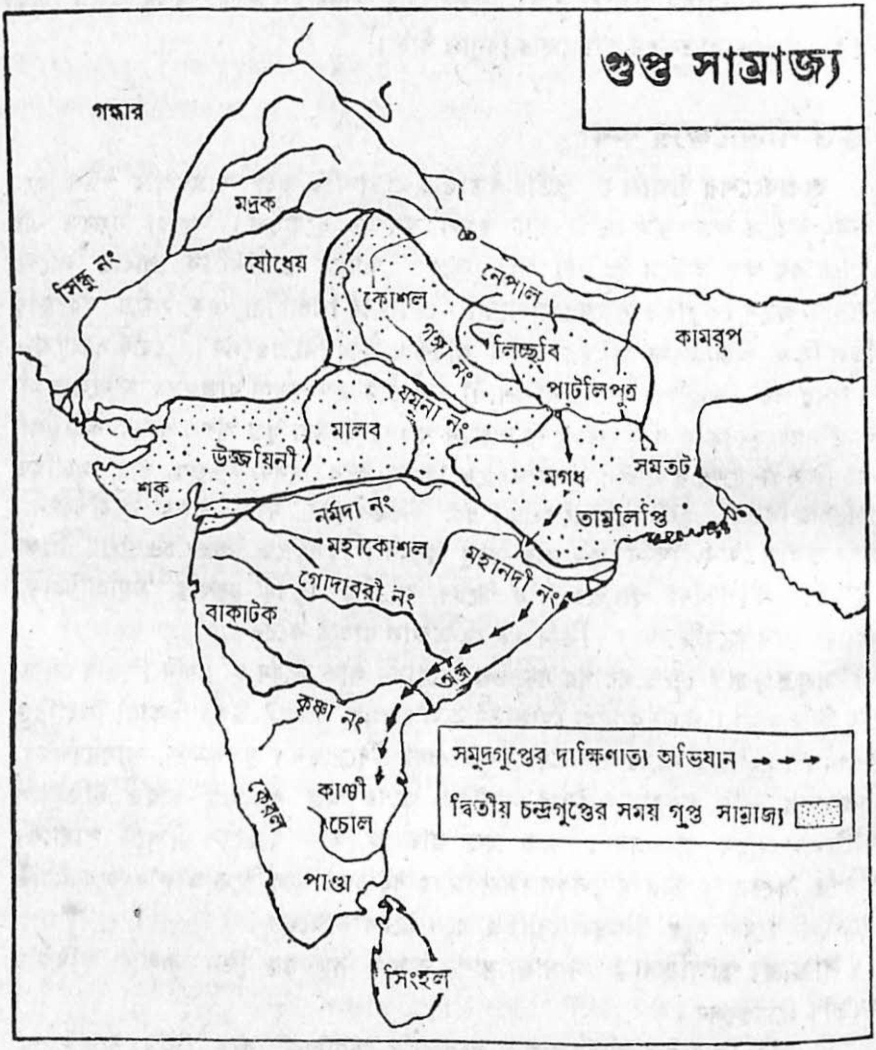
সাম্রাজ্য স্থাপয়িতা ঃ সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সমুদ্রগুপ্ত তিন প্রকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন ঃ

১. গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা অঞ্চলের রাজ্যগুলি 'চূর্ণবিচূর্ণ' করে তিনি হয়েছিলেন **সর্বরাজোচ্ছেত্তা,** সকল রাজার উচ্ছেদকারী। প্রতিবেশী রাজ্যগুলি জয় করে সেগুলি

নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ও সাক্ষাৎ শাসনাধীনে আনেন। এই সমৃদ্ধ ও সুসংহত অঞ্চল সমুদ্রগুপ্তের শক্তির মূলকেন্দ্র।

২. মধ্যভারত ও বিন্ধ্যপর্বতের নিকটবর্তী অঞ্চলের রাজ্যগুলি জয় করে শাসকদের উচ্ছেদ করেন নি। তাদের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন। এখানে সমুদ্রগুপ্ত হয়েছিলেন **সীমান্ত প্রভু**।

৩. উত্তর ও মধ্যভারতে নিজের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করে সমুদ্রগুপ্ত উড়িষ্যার মহানদী থেকে



দক্ষিণ ভারতে কৃষ্ণানদীরতীর পর্যন্ত অঞ্চলে সফল বিজয় অভিযান চালনা করেছিলেন। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে পিঠাপুরমের রাজা মহেন্দ্র, কাঞ্চীর রাজা

বিষ্ণুগোপ, ব্যাঘ্রকান্তারের নায়ক ব্যাঘ্ররাজ প্রভৃতি পরাজিত হয়ে সমুদ্রগুপ্তের আধিপত্য স্বীকার করেন এবং সমুদ্রগুপ্ত তাঁদের রাজ্যপাট ফিরিয়ে দেন। এখানে সমুদ্রগুপ্তের **'দিগ্‌বিজয়ীর'** ভূমিকা। ভারতের ইতিহাসে এরূপ দ্বিতীয় নজির নেই। সমুদ্রগুপ্তের শৌর্য ও যুদ্ধপরিচালনায় নিপুণতার জন্য ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ সমুদ্রগুপ্তকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' নামে অভিহিত করেছেন। নেপোলিয়ন সমুদ্রগুপ্তের মতই ইউরোপের বহু দেশ জয় করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির ফলে গুপ্তসাম্রাজ্য বেশ কিছুকাল স্থায়ী হয়েছিল।

সমুদ্রগুপ্তের দূরদৃষ্টির পরিচয় এই যে, যতখানি রাজ্য নিজের শাসনে রাখা সম্ভব মনে করেছিলেন ততখানিই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। মধ্যভারতের প্রাপ্ত-রাজ্যগুলির অনুগত্য লাভ করে তাদের রেখেছিলেন অনুগত সীমান্ত প্রহরীরূপে। দক্ষিণ ভারতে সমুদ্রগুপ্তের অভিযান শৌর্যপ্রকাশক। পৃথক পৃথকভাবে এখানকার রাজাদের তিনি পরাজিত করেছিলেন কিন্তু স্থায়ীভাবে তাদের পদানত করে রাখা অসম্ভব ছিল। মূল শক্তিকেন্দ্র থেকে দূরে দ্রুত যানবাহনের অভাবের যুগে পরাজিত রাজারা বিজেতার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হলে তাদের দমন করার প্রয়াস ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযানের মত অর্থক্ষয়ী, রক্তক্ষয়ী 'নালিবা' (ulcer) হয়ে দাঁড়াত। রাজনীতিবিশারদ সমুদ্রগুপ্ত নিজের সমরশক্তির পরিচয় দিয়ে ধনরত্ন, উপঢৌকন এবং নতমস্তক রাজন্যবর্গের প্রণতি লাভ করেই সন্তুষ্ট ছিলেন। পৌরাণিক প্রথায় অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করে সমুদ্রগুপ্ত রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যিক ঐক্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য : ভারতের সর্ব দক্ষিণের কয়েকটি ছোট রাজ্য অঞ্চল ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তান অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। অতবড় সাম্রাজ্য হিন্দুযুগে আর হয়নি। অশোকের পর গুপ্তদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন সমুদ্রগুপ্ত। কিন্তু আয়তনে এ সাম্রাজ্য ছিল অনেক ছোট, শুধু উত্তর ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ (কিন্তু কাশ্মীর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল না), দক্ষিণে নর্মদা নদী, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র এবং পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী—এই প্রাকৃতিক সীমার মধ্যে ছিল সমুদ্রগুপ্তের **সাক্ষাৎভাবে কেন্দ্রশাসিত সাম্রাজ্য**। এ ছাড়া পাঞ্জাব ও মালবের উপজাতি-রাজ্যগুলি সমুদ্রগুপ্তের **আশ্রিত রাজ্য** রূপে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। পাঁচটি সীমান্তরাজ্য—**সমতট** (ব্রহ্মপুত্র মোহনা), **ডাবক** (পূর্ববঙ্গ), **কামরূপ** (আসাম) **কর্তৃপুর** (সম্ভবতঃ কুমায়ুন ও গাড়োয়াল) এবং **নেপাল**—ছিল অনুগত করদরাজ্য।

সাক্ষাৎ শাসনাধীন সাম্রাজ্যসীমা উত্তরে কাশ্মীর বাদে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে নর্মদা নদী, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী

আশ্রিতরাজ্য পাঞ্জাব মালবের উপজাতি রাজ্য

করদরাজ্য পাঁচটি সীমান্ত রাজ্য

বৈদেশিক সম্পর্ক : নিজের শাসনাধীন রাজ্য এবং করদ ও আশ্রিত রাজ্য

ছাড়াও সমুদ্রগুপ্তের প্রতিপত্তি সমগ্র ভারতে ও ভারতের বাইরেও ব্যাপ্ত হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের শক কুষাণ শাসকগণ সমুদ্রগুপ্তকে যথেষ্ট সমীহ করতেন। অবশ্য সিন্ধুর ওপারে যে কুষাণরাজগণ রাজত্ব করছিলেন সমুদ্রগুপ্ত তাঁদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন নি। সামরিক শক্তির জন্য সমুদ্রগুপ্তকে এঁরা সম্মানের চোখে দেখতেন। তাছাড়া সমুদ্রগুপ্তের উদার ধর্মমতের জন্য সিংহলরাজ্যের সঙ্গেও প্রীতির সম্পর্ক ছিল। রাজা মেঘবর্ণ উপঢৌকনসহ দূত পাঠিয়ে সমুদ্রগুপ্তের কাছে বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষের কাছে সিংহলাগত বৌদ্ধতীর্থযাত্রীদের জন্য এক মনোরম মঠ নির্মাণ করার অনুমতি পেয়েছিলেন। রণনীতি, রাজনীতি ও উদার ধর্মনীতির জন্য সমুদ্রগুপ্ত সেযুগে এক কীর্তিমান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ বলে গণ্য হয়েছিলেন।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের শক-কুষাণ শাসকদের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক; নিজে হিন্দুধর্মাবলম্বী কিন্তু বৌদ্ধদের প্রতি উদার; সিংহলরাজ বৌদ্ধ মেঘবর্ণকে বোধগয়ায় বৌদ্ধমঠ নির্মাণে অনুমতি

সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব ঃ ভিনসেণ্ট স্মিথের কথায় সমুদ্রগুপ্তের কর্মক্ষমতা এবং বিবিধ গুন ছিল অনন্যসাধারণ। তিনি গীতবাদ্য ও সংগীতে পারদর্শী ছিলেন। পালংকে উপবিষ্ট বীণাবাদনরত সমুদ্রগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রায় রাজার ললিতকলাবিদ্যার পরিচয় মেলে। কাব্যরচনায়ও তাঁর দক্ষতা ছিল। এলাহাবাদ **প্রশস্তিতে** বলা হয়েছে, তিনি কবিদের মধ্যে ছিলেন রাজাস্বরূপ এবং নিজে'কবিরাজ' উপাধি ধারণ করেছিলেন। কবি, দার্শনিক, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের তিনি সমাদরে রাজসভায় স্থান দিয়ে তাঁদের মননশীল সৃষ্টিকাজে উৎসাহ দিতেন। নিজে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি অনুরক্ত হলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত ছিলেন না। বৌদ্ধ লেখক বসুবন্ধুকে যোগ্য মর্যাদা দিয়ে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেছিলেন। অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পাদন করে নিজে একসঙ্গে রাজকীয় গৌরব ও হিন্দুধর্মের মহিমা প্রচার করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের অন্যান্য মুদ্রার নিপুণ শিল্পকর্ম সে যুগের আর্থিক সমৃদ্ধি ও শিল্পোৎকর্ষের পরিচায়ক।

নানা গুণ, কবিত্ব

ধর্মনিরপেক্ষতা

মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পর দ্বিতীয় বার সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন সমুদ্রগুপ্ত। মৌর্যদের পর পাঁচশ বছর ভারতে রাজনৈতিক অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রবল হয়ে উঠেছিল, বিদেশী শক্তি ভারতভূমিতে প্রাধান্য বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছিল। এই অবস্থায় সমুদ্রগুপ্ত ভারতের, বিশেষ করে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক সংহতি, ধর্মীয় প্রভাব পুনরুদ্ধার ও আর্থিক সমৃদ্ধি সাধন করে এক নতুন যুগের সূত্রপাত করেছিলেন।

সাম্রাজ্য দ্বারা রাজনৈতিক ঐক্য

ভারতীয় বিদ্যাভবন থেকে প্রকাশিত ভারত-ইতিহাস গ্রন্থে সমুদ্রগুপ্ত সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

(i) সেনানায়ক ও রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে উজ্জ্বল প্রতিভাধর সমুদ্রগুপ্ত শান্তির-সময়ে-প্রযোজ্য মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের গুণাবলীতে বিভূষিত ছিলেন। (ii) সমুদ্রগুপ্ত নিঃসন্দেহে একটি আকর্ষণীয় এবং অনন্য ব্যক্তিত্ব; ভারতের ইতিহাসে তিনি এক নতুন যুগের উদ্বোধক। (iii) সমুদ্রগুপ্ত দৈহিক শৌর্য ও মানসিক উদ্যমের মূর্তপ্রতীক। পাঁচ শতাব্দীর রাজনৈতিক অবক্ষয় ও বৈদেশিক প্রাধান্যের পর আর্যাবর্ত (উত্তর ভারত) আবার নৈতিক, বৌদ্ধিক ও জাগতিক উন্নতির শীর্ষস্থানে উপনীত হয়েছিল তাঁর আমলে।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত : সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন লাভ করেন এবং আনুমানিক ৩৮০ থেকে ৪১৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সগৌরবে রাজত্ব করেন। কেবলমাত্র নিজ সৈন্যদলের ওপর নির্ভর না করে তিনি বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা বন্ধুত্ব অর্জন করতে মনোযোগী হন। অন্যান্য রাজবংশের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন রাজাদের রাজ্যজয় ও প্রাধান্য বিস্তারের একটি বহু অবলম্বিত উপায়। মগধের রাজা বিম্বিসার ও অজাতশত্রু লিচ্ছবীদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে রাজ্যের আয়তন বাড়িয়েছিলেন। গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্তও লিচ্ছবীবংশের কন্যার পাণিগ্রহণ করে ভাগ্যের উন্নতি ঘটিয়েছিলেন যা স্মরণে রেখে সমুদ্রগুপ্ত নিজেকে গর্বের সঙ্গে লিচ্ছবী-দৌহিত্র বলে উল্লেখ করেছেন।

রাজ্যবিস্তার

বংশের এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজাদের ধারা অনুসরণ করে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মধ্যপ্রদেশের নাগবংশের কন্যা কুবেরনাগাকে বিবাহ করে শক্তিশালী মিত্র লাভ করেন। আবার, দক্ষিণ ভারতের বাকাটকরাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে নিজ কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ দিয়ে অনুগত আত্মীয় লাভের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠার প্রসার ঘটান।

মধ্যপ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যে রাজ সমর্থন

এইভাবে শক্তি সঞ্চয় করে চন্দ্রগুপ্ত মালব ও কাথিয়াবাড় অঞ্চলে শকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। চন্দ্রগুপ্ত শকবংশের শেষ রাজা তৃতীয় রুদ্রসিংহকে পরাজিত করে এই অঞ্চল গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ভারতে বিদেশীয় শাসনের শেষ চিহ্নের বিলোপসাধন করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমল গুপ্তসাম্রাজের যশ ও প্রতিষ্ঠার শীর্ষযুগ।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে কিংবদন্তী : দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করেছিলেন; শকজাতিকে পরাজিত করে তিনি 'শকারি' আখ্যা পেয়েছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর কোন কোন বিবরণীতে তাঁকে উজ্জয়িনী ও পাটলিপুত্রের অধীশ্বর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এদেশে বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজার সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে যে, তিনি শকদের পরাজিত করে শকারি উপাধি লাভ করেছিলেন। তাঁর সভায় নবরত্ন অর্থাৎ কালিদাস বরাহমিহির প্রমুখ নয়জন পণ্ডিত ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে অনেকে মনে করেন, ইনিই জনপ্রবাদে উল্লিখিত বিক্রমাদিত্য। মহাকবি কালিদাস যে তাঁর

কিংবদন্তীর নায়ক বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্ত

রাজসভা অলংকৃত করতেন এরূপ মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

দিল্লী লৌহস্তম্ভে উল্লিখিত চন্দ্র সম্ভবত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

বঙ্গে বিদ্রোহ দমন ঃ দিল্লীতে কুতুমমিনারের নিকট যে লৌহস্তম্ভ প্রোথিত আছে তার গায়ে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় যে চন্দ্র নামক জনৈক রাজা বঙ্গদেশে যুদ্ধার্থে সমবেত শত্রুগণকে পরাজিত করেন এবং যুদ্ধ করতে করতে সিন্ধুর সপ্তমুখ অতিক্রম করে বাহ্লিক পর্যন্ত অগ্রসর হন। অনেকে অনুমান করেন, চন্দ্র নামক এই রাজা গুপ্তবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। এই অনুমান সত্য হলে বলা যায়, বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ সমুদ্রগুপ্তের অধীনতা স্বীকার করে করপ্রদান করলেও পরে বিদ্রোহী হয়েছিল এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এই বিদ্রোহীগণকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। সম্ভবত এই যুদ্ধে বিজয়লাভের ফলে গুপ্তরাজগণ বঙ্গদেশ প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে এনেছিলেন।

চীন বৌদ্ধ ভ্রমণকারী ; দুর্গম পথ অতিক্রম করে আগমন; ৪০৫-৪১১ পর্যন্ত ৬ বৎসর অবস্থিতি; তাম্রলিপ্তি থেকে জলপথে প্রত্যাবর্তন

ফা-হিয়েন ঃ চীনের বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতের পবিত্র বৌদ্ধতীর্থগুলি দর্শনের উদ্দেশ্যে ৩৯৯ খৃস্টাব্দ নাগাদ চীনদেশ থেকে যাত্রা করেন এবং স্থলপথে দুর্গম ও বিপদসংকুল মরুপথ অতিক্রম করে এশিয়ার অন্যতম বৌদ্ধ সংস্কৃতিকেন্দ্র খোটানে উপস্থিত হন। এখানে কিছুকাল অতিবাহিত করে তিনি তাঁর সঙ্গীসহ অনুমান ৪০৫ খৃস্টাব্দে ভারতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রে আগমন করেন। ফা-হিয়েন ভারতে ৬ বৎসরকাল অবস্থান করেছিলেন, তার মধ্যে ৩ বৎসর পাটলিপুত্রে এবং ২ বৎসর তাম্রলিপ্তিতে (বর্তমান তমলুক) যাপন করেন। তিনি তাম্রলিপ্তি থেকে সমুদ্রপথে ভারতীয় জাহাজে যাত্রা করে সিংহল, যবদ্বীপ ও সুমাত্রা হয়ে ৪১৪ খৃস্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি এদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর বিবরণ সেকালের ইতিহাস সংগ্রহের এক নির্ভরযোগ্য উপাদান।

পাটলিপুত্রের অবস্থা দুইটি বিশাল বৌদ্ধমঠ; অশোকের প্রাসাদ-অংশ তখনও বিস্ময় উদ্রেক করত; হাসপাতালে বিশ্রামভবন ; বুদ্ধের সম্মানে শোভাযাত্রা

পাটলিপুত্র ঃ ফা-হিয়েন লিখেছেন, গুপ্তসাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্র একটি বৃহৎ নগরী এবং জ্ঞান ও ধর্মের কেন্দ্র। এখানে দুইটি বৃহৎ সুরম্য বৌদ্ধমঠ ছিল সেখানে ছয় সাতশো বৌদ্ধ ভিক্ষু দেশবিদেশ থেকে আগত ছাত্রদের শিক্ষাদানে রত ছিলেন। পাটলিপুত্রে অবস্থিত মৌর্যসম্রাট অশোকের বিশাল প্রাসাদ দেখে ফা-হিয়েন বিস্মিত হয়েছিলেন। ছয় সাতশো বছর পরেও এই রাজপ্রাসাদ তাঁর কাছে মানুষের নয়, অতিমানবের নির্মিত বলে মনে হয়েছিল। পাটলিপুত্রে অনেকগুলি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। রাজধানী ছাড়াও অন্যান্য বড় বড় শহর ও রাজপথের ধারে ভ্রমণকারী ও বণিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিশ্রামভবন নির্মিত ছিল।

ফা-হিয়েন বলেছেন, প্রতি বছর অষ্টম মাসের দ্বিতীয় দিবসে ভগবান বুদ্ধের স্মরণ-সম্মানে পাটলিপুত্রে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হত।

রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অবস্থা ঃ ফা-হিয়েন গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনকার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়—(i) গুপ্ত শাসনব্যবস্থা যথেষ্ট মৃদু এবং উদার ছিল ; প্রজাবর্গের গতিবিধিতে বিশেষ কোনরূপ বাধা-নিষেধ আরোপ করা হত না তারা স্বচ্ছন্দে রাজ্যের মধ্যে চলাফেরা করতে পারত।

(ii) আইনে অপরাধীর শাস্তির কঠোরতা ছিল না ; সাধারণত, জরিমানাই যথেষ্ট মনে করা হত। অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডের বিধান ছিল না। বারংবার গুরুতর অপরাধ করতে থাকলে তার ডান হাত ছেদন করে দেওয়া হত।

(iii) রাস্তাঘাটে লোকে এবং বণিকেরা নিরুপদ্রবে চলাচল করত। করভার হাল্কা ছিল ; প্রজারা অনায়াসে তা বহন করতে পারত।

(iv) সরকারি কর্মচারীদের নগদ টাকায় নিয়মিত ও যথেষ্ট বেতন দেওয়া হত, উৎকোচ গ্রহণের অভিশাপ থেকে মুক্ত ছিল।

(v) উৎপন্ন শস্যের $\frac{1}{8}$ ভাগ রাজস্ব হিসাবে আদায় করাই ছিল রাজকোষের মূল উৎস। ফা-হিয়েন নিজে রাজ্যের বহু স্থানে ভ্রমণ করেছেন। কিন্তু কোথাও কখনও দুষ্কৃতকারীর দেখা পাননি অথচ এর দুশো বছর পরে চীনদেশীয় শ্রমণ হিউয়েন-সাঙ পথ চলতে তিনবার দুবৃত্তের হাতে পড়েন এবং একবার তাঁর পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত লুণ্ঠিত হয়েছিল।

সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা ঃ ফা-হিয়েনের বিবরণ গুপ্তযুগের সামাজিক অবস্থার ওপর আলোকপাত করেছে। (i) দেশের জলবায়ু ছিল মনোরম এবং তুষারমুক্ত। জনগণ ছিল ধনী এবং সমৃদ্ধ। তারা ছিল সৎ ও বিশ্বাসভাজন আর উচ্চনৈতিক মান-সম্পন্ন। জনসাধারণের মধ্যে দান ও উদারতা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা চলত। (ii) দেশের বহু স্থানে বিশ্রাম-ভবন ও দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল, সেখানে ভ্রমণকারী এবং দরিদ্র ব্যক্তিরা বিনামূল্যে বিবিধ সুবিধা পেয়ে থাকে। (iii) ভারতবর্ষের বেশির ভাগ লোক জীবহিংসা থেকে বিরত এবং নিরামিষভোজী। তারা কোনপ্রকার উত্তেজক পানীয়, সুরা পেয়াজ-রসুন গ্রহণ করে না। তারা বাড়িতে শূকর বা মুরগী পালন করে না। বাজারে কসাইখানা বা সুরার ভাঁটিখানা নেই। (iv) চণ্ডাল, পশুশিকারী, মৎস্যজীবী ইত্যাদি নিম্নবর্ণের লোকেরা নগরের বাইরে বাস করত। তখন অস্পৃশ্যতা ছিল। (v) জিনিসপত্র বেচাকেনায় কেবলমাত্র কড়ি ব্যবহার করা হত। গুপ্তযুগে যে 'সুবর্ণ', 'দিনার' প্রভৃতি স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল তা অন্যান্য উপাদান থেকে জানতে পারা যায়।

ধর্মীয় অবস্থা ঃ ফা-হিয়েন নিষ্ঠাবান ধার্মিক। তাই তাঁর বিবরণে সেকালের ধর্মীয় অবস্থার সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে।

(i) পাঞ্জাব, বঙ্গদেশ ও মথুরায় বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় ছিল। বৌদ্ধশ্রমণগণ সর্বত্র

সম্মানিত হতেন ; বৌদ্ধমঠগুলি উদার রাজানুকূল্য লাভ করত। (ii) তাঁর বিবরণ থেকেই বোঝা যায় 'মধ্যদেশে' হিন্দুধর্ম অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। মধ্যদেশের প্রধান শহরগুলিতে ভ্রমণ করে তিনি একটি কি দুটি মঠ দেখতে পেয়েছিলেন, দেশের রাজা ছিলেন ভক্তিমান বৈষ্ণব ; পরধর্মসহিষ্ণু।

ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে গুপ্তযুগের আর্থিক সমৃদ্ধি ও বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের পরিচয় মেলে। ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দর থেকে চীন, সিংহল, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও বহু ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চলত। ভারতীয়দের জাহাজ পরিবহনে ব্যবহৃত হত। ফা-হিয়েন নিজে বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্তি বন্দর থেকে ভারতীয় জাহাজে প্রথমে সিংহলে, পরে জলপথেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক

প্রথম কুমারগুপ্ত : ৪১৫ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করে প্রায় ৪০ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। কুমারগুপ্ত কোন নতুন রাজ্য জয় করেননি তবে শাসনগুণে তিনি সাম্রাজ্য অটুট রেখেছিলেন। কুমারগুপ্তের রাজত্বকালের শেষদিকে পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে হূণজাতির উপদ্রব শুরু হয়।

স্কন্দগুপ্ত : কুমারগুপ্তের পুত্র স্কন্দগুপ্ত ছিলেন গুপ্তবংশের শেষ পরাক্রান্ত সম্রাট। সিংহাসন লাভের পূর্বেই তিনি বিদেশী আক্রমণকারীদের প্রতিরোধে নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মধ্য এশিয়া থেকে শ্বেতহূণ নামে এক উপজাতি গন্ধাররাজ্য দখল করে রাজ্যের সর্বত্র নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা চালায়। এদের বিতাড়িত করে স্কন্দগুপ্ত গুপ্তসাম্রাজ্য ও ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। সগৌরবে তিনি 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন।

ঐতিহাসিক পানিক্কর বলেছেন—ভারতবর্ষ যে সর্বকালে বিদেশীর আক্রমণের কাছে নত হয়নি, স্কন্দগুপ্তের হাতে হূণদের পরাজয় তার উজ্জ্বল নিদর্শন। তিনি ছিলেন যোগ্য শাসক ও ভারতত্রাতা।

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের কারণ : মৌর্য সাম্রাজ্যের পর গুপ্তসাম্রাজ্যের মত এত শক্তিমান কেন্দ্রিয়শক্তি ভারতে আর সংগঠিত হয়নি। তবু খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে এই সাম্রাজ্যের গৌরব-গরিমা বিলুপ্ত হয়। ঐতিহাসিকদের মতে তার প্রধান কারণগুলি হল :—

১. সাম্রাজ্যের বিশাল ব্যাপ্তি সেকালের পক্ষে অনুপযোগী ছিল। দ্রুত যানবাহনের অভাবে প্রান্তীয় শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ দমন অসম্ভব হ'ত। শাসকের দৃঢ়তা কম হলেই হল স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব। ফলে উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতায় সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

অতি বিস্তৃতি

২. স্কন্ধগুপ্তের পর থেকে গুপ্ত উত্তরাধিকারীরা ছিল দুর্বল। শাসকের যে ব্যক্তিত্বও শৌর্য্যের ওপর রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভর করে, তা এদের ছিল না। এই

অযোগ্য শাসকেরা পতন রোধ করতে পারেন নি।

৩ গুপ্ত সম্রাটদের পারিবারিক উত্তরাধিকার বিধি সুনির্দিষ্ট ছিল না। ফলে পারিবারিক সংঘাত ও রাজসভার ষড়যন্ত্র রাজ্যের পতনকে ঘনিয়ে আনে।

৪. বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে অহিংসার নীতি জাতীয় পরাক্রম ও সামরিক তৎপরতাকে স্তিমিত করেছিল। ফলে গুপ্তরা অন্তর্বিদ্রোহ ও বিদেশী অভিযান প্রতিরোধ ক্ষমতা হারায়।

৫. স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী গুপ্তেরা সীমান্তের প্রতি অবহেলা দেখিয়ে বিদেশী আক্রমণে সুযোগ করে দিয়েছে।

৬ বারংবার সীমান্ত প্রতিরোধ করতে গিয়ে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের রাজকোষ শূন্য হয়ে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়।

৭. এইভাবে অন্তঃসারশূন্য গুপ্তসাম্রাজ্য শেষ পর্যন্ত হূণ আক্রমণে ভেঙ্গে পড়ে।

গুপ্তযুগের সংস্কৃতি (Distinctive features of the Gupta Culture) : গুপ্তযুগে আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের দরুণ দেশের মধ্যে প্রচুর ধনাগম ঘটেছিল। গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা ঐশ্বর্যের সাক্ষী। গুপ্তরাজারা সুশাসন প্রবর্তন করে মানুষকে নিরুদ্বেগচিত্তে জ্ঞান-চিন্তা ও সৃষ্টি-মূলক কাজে আত্মনিয়োগের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সারাদেশে শান্তি বিরাজিত। প্রজাবর্গ নিরুপদ্রবে নিজ নিজ বাঞ্ছিত কর্মে নিযুক্ত এই অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যিনি রাজ্যময় ভ্রমণ করে কোথাও আইনবিরুদ্ধ কোন কাজ দেখতে পাননি। এই সমৃদ্ধি ও শান্তি গুপ্তযুগের সাংস্কৃতিক দিগন্ত বিকাশে সুযোগ্য পরিমণ্ডল রচনা করেছিল।

আর্থিক সমৃদ্ধি ও শৃঙ্খলা

শিক্ষা ও সাহিত্য : গুপ্তরাজারা শিক্ষা-শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তদুপরি তাদের পৃষ্টপোষকতায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রাণ চঞ্চলতায় ভরপুর ছিল। সারাদেশে বহু পাঠশালা ছাড়া নালন্দা, তক্ষশিলা, সারনাথ, অজন্তায় ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা চর্চার সুব্যবস্থা ছিল। দেশ এবং দেশান্তরের বহু বিদ্যার্থী জ্ঞানার্জনের আগ্রহে এসব শিক্ষাকেন্দ্রে সমবেত হত। শিক্ষাই সমস্ত সুস্থ সংস্কৃতির প্রাণশক্তি।

পাঠশালা ও উচ্চ শিক্ষাচর্চার স্থান—

ঐ পরিমণ্ডল এবং সর্বস্তরে শিক্ষার সুযোগ গুপ্তযুগের সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ জন্য গুপ্তযুগকে গ্রীসের গৌরবময় পেরিক্লিসের যুগ ও ইংলণ্ডের এলিজাবেথের যুগের সঙ্গে তুলনা করা হয়। গুপ্তরাজাদের সভায় সংস্কৃত ছিল প্রচলিত ভাষা, এ যুগের সাহিত্যস্রষ্টাদের মধ্যে আছেন—**মহাকবি কালিদাস,** যিনি বিশ্বের মহাকবি ও নাট্যকার শেক্সপীয়ারের সঙ্গে একাসনে সমাদৃত। শকুন্তলা, মেঘদূত, কুমারসম্ভব প্রভৃতি কালিদাসের অমর রচনা, এছাড়া **বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস** নাটক, অভিধানকার অমরসিংহের **অমরকোষ,** ভারবির **কীরাতার্জুনীয়,** শূদ্রকের

গুপ্তযুগ গ্রীসের পেরিক্লিসের যুগ ও ইংলণ্ডের এলিজাবেথের যুগের সঙ্গে তুলনীয়

মৃচ্ছকটিক, আনন্দদায়ক নীতিকাহিনীর আকর **পঞ্চতন্ত্র** গুপ্তযুগের কালজয়ী সাহিত্য। বিবিধ পুরাণ এবং মহাভারত ও মনুস্মৃতি এই যুগে বর্তমানের আকার ও বিষয়-বিভাগে বিন্যস্ত হয়েছিল। গুপ্তযুগ সাহিত্য সম্পদের জন্য অবিস্মরণীয়। **এলাহাবাদ প্রশস্তি** কবি হরিষেণ কর্তৃক সুললিত সংস্কৃতে লিখিত হয়। তিনি সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন।

বিজ্ঞান ঃ বিজ্ঞানে গুপ্তযুগে যে মনীষার প্রকাশ ঘটেছিল তার দীপ্তি এখনও উজ্জ্বল। প্রথমে উল্লেখ করতে হয় অসাধারণ গণিতবিদ্ ভারতীয় সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ-শাস্ত্রের (Scientific Astronomy) প্রতিষ্ঠাতা **আর্যভট্ট**-এর কথা। আর্যভট্টই সর্বপ্রথম দিনরাত্রি ভেদের কারণ স্বরূপ পৃথিবীর আহ্নিকগতির কথা প্রচার করেন। তাঁর শিষ্যমণ্ডলীও যোগ্য উত্তর সাধক। বিখ্যাত শিষ্যদের মধ্যে আছেন লাটদেব, প্রথম ভাস্কর এবং লল্ল। গুণ-গ্রাহীদের কাছে আর্যভট্ট সর্বসিদ্ধান্ত গুরু নামে পূজিত হয়েছিলেন। আর্যভট্টের গ্রন্থের নাম **আর্যভট্টীয়**। মাত্র ১২১টি শ্লোকে সম্পূর্ণ সংস্কৃতে লেখা।

আর্যভট্ট প্রথম দিনরাত্রির কারণ ব্যাখ্যাতা;

গুপ্তযুগের অপর বিজ্ঞানীদের মধ্যে আছেন **ব্রহ্মসিদ্ধান্ত** রচয়িতা **ব্রহ্মগুপ্ত,** জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভা **বরাহমিহির** যাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক **পঞ্চসিদ্ধান্তিকা** ও জ্যোতিষগ্রন্থ **বৃহৎসংহিতা** বিখ্যাত।

ভাস্কর্য ঃ গুপ্তযুগ মূর্তিশিল্পে চরম উৎকর্ষের যুগ। এযুগের প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর নয়নলোভন মূর্তি। বারাণসীর নিকট সারনাথের বুদ্ধমূর্তি ভারতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত। মথুরা ও অন্যান্য স্থানের পাথর ও ব্রোঞ্জনির্মিত বুদ্ধমূর্তি, ঝাঁসী জেলার দেওগড়ে দশাবতার মন্দিরে পাথরে খোদাই শিব, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতার মনোরম মূর্তি এই যুগে নির্মিত হয়। এগুলি ভারতের শিল্পকলার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সুচারু গড়ন, মনোহর দেহভঙ্গি, লাবণ্য ও দেবমহিমামণ্ডিত ভাব—সব কিছু মিলিয়ে মূর্তিগুলিতে অপূর্ব সুষমার প্রকাশ।

বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর নয়নলোভন মূর্তি; শিল্পকলার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন সারনাথ বুদ্ধমূর্তি

ঢালাই শিল্প ঃ গুপ্তযুগে লৌহ ও ব্রোঞ্জ ইত্যাদির ঢালাই শিল্পও বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করেছিল। হিউয়েন-সাঙ নালন্দায় ৮০ ফুট উঁচু তামার এক বুদ্ধমূর্তি দেখে-ছিলেন। বিহারের সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত ৭½ ফুট উঁচু ব্রোঞ্জ মূর্তি ভাস্কর্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মূর্তিটি বর্তমানে বার্মিংহাম মিউজিয়ামে রক্ষিত।

৮০ ফুট উঁচু বুদ্ধের তাম্রমূর্তি; সুলতানগঞ্জ ব্রোঞ্জ মূর্তি

দিল্লীর লৌহস্তম্ভটি গুপ্তযুগের প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছিল। কাচের মত মসৃণ, মরিচাবিহীন, ঢালাই করা এই বিশাল স্তম্ভ বর্তমান উন্নত বিজ্ঞানের যুগেও বিস্ময়-কর শিল্পকাজ বলে প্রশংসিত। বিদেশী ঐতিহাসিকদের মতে এটি বিশ্বের বিস্ময়, এর নির্মাণ কৌশল একটি বিলুপ্ত শিল্প (lost art)।

মসৃণ, মরিচাবিহীন ঢালাই লৌহস্তম্ভ; বিলুপ্ত শিল্পকলা

চিত্রশিল্প ঃ গুপ্তযুগের চিত্র বর্ণসুষমায়, অঙ্কননৈপুণ্যে ও বিষয়বস্তুর মনোহারিত্বে ভারতের গৌরবের বস্তু। মহারাষ্ট্র রাজ্যে অবস্থিত অজন্তা গুহা ঔরঙ্গাবাদ ও মধ্য-ভারতের বাঘগুহার চিত্রগুলি অধিকাংশই গুপ্তযুগের সৃষ্টি। চিত্রগুলিতে বুদ্ধের জীবনের ঘটনা, তৎকালীন রাজসভা ও সমাজের কিছু কিছু দৃশ্য ও মানুষের জীবনযাত্রার কাহিনী শিল্পীর তুলির টানে জীবন্ত হয়ে আছে। প্রায় দেড় হাজার বছর আগেকার ছবিগুলি এখনও দর্শককে মুগ্ধ করে। এগুলি ভারতীয় চিত্রকলার চরম উৎকর্ষের নিদর্শন। অজন্তা গুহার ছবির সঙ্গে কিছু প্রস্তরমূর্তিও দর্শনীয়।

অজন্তা গুহাচিত্র—প্রাচীন জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকলা

মুদ্রা ঃ গুপ্তসম্রাটদের স্বর্ণমুদ্রায় যে চিত্র অঙ্কিত তা যেমন অনুপম, এসবের গঠন ও পারিপাট্যও উৎকৃষ্ট শিল্পকলার পরিচায়ক।

মুদ্রায় নিপুণ শিল্পকলার পরিচয়

৬.

প্রাধান্য লাভের সংগ্রাম

(ক) উত্তর ভারত

হূণদের কথা ঃ হূণরা ছিল মধ্য এশিয়া তৃণ-অঞ্চলের দুর্ধর্ষ যাযাবর জাতি। কৃষিকাজ ও স্থায়ী বসতি গড়ে তোলার চেয়ে পররাজ্যে হানা দিয়ে লুঠতরাজ করায় এদের বেশি আগ্রহ ছিল। চীন সম্রাটগণ চীনের উত্তর-সীমান্ত জুড়ে প্রাচীর তুলে বর্বরদের আক্রমণ রোধ করার ব্যবস্থা করলে হূণরা (১) সদলবলে পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধ প্রদেশ এবং (২) ভারতে গুপ্তসম্রাটদের অঞ্চলে প্রবেশ করে। পঞ্চম শতাব্দীতে (৪৫৫ খৃঃ) গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্তের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের দরুণ হূণরা তখন সাম্রাজ্যের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। কিন্তু স্কন্দগুপ্তের পরে গুপ্তসাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে পশ্চিম ভারত হূণদের অধিকারে চলে যায়।

মধ্য এশিয়ার বর্বর যাযাবর জাতি

চীনে হাজার অসুবিধা : ভারতে ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে প্রবেশ

ভারতে হূণশক্তি প্রতিষ্ঠার এই কৃতিত্ব ছিল যে দুজন হূণনায়কের তারা হলেন **তোরমান** ও তাঁর পুত্র **মিহিরগুল**। মিহিরগুল কাশ্মীর জয় করেছিলেন কিন্তু মান্দাসোরের রাজা যশোধর্মণ

ভারতে হূণ নায়ক তোরমান ও মিহিরগুল ও মালবে প্রতিরোধ

'অনমিতমস্তক' মিহিরগুলকে পরাজিত করে মালব হূণশাসন থেকে মুক্ত করেন। মিহিরগুলের মৃত্যুর পর ভারতে হূণশক্তি আর কখনও প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি।

হূণ আক্রমণের ফল

হূণ আক্রমণের ফল ঃ হূণরা যদিও ভারতে স্বল্পকাল রাজত্ব করেছিল এবং যদিও তারা উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারত ছাড়া অধিকার বিস্তার করতে পারেনি তবু ভারত ইতিহাসে তাদের গভীর প্রভাব পড়েছিল। ভিন্সেণ্ট স্মিথের কথায় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে হূণদের অভিযান উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছিল।

শশাঙ্ক ঃ প্রথম বাঙ্গালী নৃপতি

গৌড়ের উত্থান ঃ হূণ আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের শক্তি ক্ষয় হলে পূর্ব ভারতে এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্য গড়ে ওঠে। এই সাম্রাজ্যের বীজপুরুষ শশাঙ্ক। শশাঙ্ক (৬০৬-৬৩৭ খৃঃ) প্রথমে সম্ভবত গুপ্তরাজাদের অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন। গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করে তিনি এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন যা **গৌড়রাজ্য** নামে পরিচিত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণ (বহরমপুর শহরের ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বর্তমান রাঙ্গামাটি) শশাঙ্কের রাজধানী ছিল। শশাঙ্ক প্রথম বাঙালী নৃপতি যিনি নিজ বাহুবলে বঙ্গদেশের বাইরেও রাজ্য জয় করেছিলেন।

সাহসী, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কূটনীতিক

এই সময়ে উত্তর ভারতে রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য থানেশ্বর-কনৌজ-কামরূপের রাজারা মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। একে প্রতিহত করতে শশাঙ্ক পাল্টা জোট গঠন করেন মালবরাজ দেবগুপ্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। রাজায় রাজায় মেলবন্ধনে যুক্ত হয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করার চেষ্টা সব যুগের ইতিহাসেই দেখা যায়। সেই নীতি গ্রহণ করে শশাঙ্ক প্রমাণ করেন যে দূরদৃষ্টি ও কূটনীতি প্রয়োগে তিনি তাঁর প্রতিযোগীদের চেয়ে পিছিয়ে ছিলেন না।

থানেশ্বর কনৌজ কামরূপ মৈত্রীসজ্ঞের বিরুদ্ধে গৌড়-মালব বন্ধুত্ব

থানেশ্বর-গৌড় সংঘর্ষ ঃ সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্কের রাজত্বকালে গৌড় ভারতে এক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। এর মূলে ছিল শশাঙ্কের সাহস, রাজনৈতিক বুদ্ধি ও রণদক্ষতা। উত্তর ভারতে প্রাধান্য লাভের চেষ্টায় মালবের রাজা দেবগুপ্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তিনি থানেশ্বরের পুষ্যভূতিবংশের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে যুদ্ধে নিহত করলে শশাঙ্ক সম্ভবত মল্লযুদ্ধে তাঁকে নিহত করেন। এ বিষয়ে সঠিক বিবরণ জানা যায় না। থানেশ্বরের সভাকবির কথায়—'গৌড়রাজ রাজ্যবর্ধনকে ছলনায় ভুলিয়ে একাকী এবং নিরস্ত্র অবস্থায় নিজ শিবিরে নিয়ে হত্যা করেন।' আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেন।

এর ফলে কনৌজ এবং থানেশ্বর—উভয় রাজ্যের সিংহাসন শূন্য হয়। রাজ্যবর্ধনের

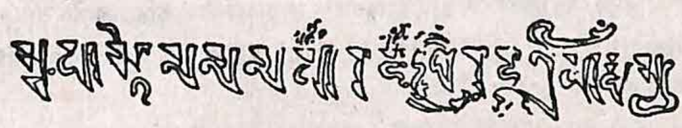
কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন দুই রাজ্যেরই সিংহাসন লাভ করে শশাঙ্ককে শাস্তি দিতে চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁর জীবিতকালে হর্ষবর্ধন গৌড়ের কোন ক্ষতি করতে পারেন নি। ৬১৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত শশাঙ্ক প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেছিলেন এবং দক্ষিণে ওড়িশার গঞ্জাম পর্যন্ত তাঁর আধিপত্য বিস্তৃত হয়। ৬১৯ থেকে ৬৩৭ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধনের মিত্র কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেন।

হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের প্রবল শত্রু কিন্তু কোন ক্ষতি করতে পারেন নি

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য ঃ প্রভাকরবর্ধনের পুত্র এবং রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন ৬০৬ খৃস্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন এবং ৬১১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত যুবরাজ **শিলাদিত্য** নামে রাজত্ব করেন। ভগিনীপতি গ্রহবর্মার মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন থানেশ্বর ও কনৌজ যুক্তভাবে শাসন করতে থাকেন ; রাজধানী থানেশ্বর থেকে কনৌজে স্থানান্তরিত হয়।

শিলাদিত্য





ঘটনাচক্রে হর্ষবর্ধন রাজ্যলাভ করেন এবং প্রধান শত্রু শশাঙ্ককে দমন করার জন্য কূটনৈতিক পন্থায় মিত্রলাভের ব্যবস্থা করেন। বলভীর (বর্তমান সৌরাষ্ট্র) রাজা ধ্রুবভট্ট হর্ষবর্ধনের নিকট পরাজিত হলেও হর্ষবর্ধন তাঁর রাজ্য অধিকার করে নেননি। বরং তিনি নিজ কন্যাকে ধ্রুবভট্টের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে পশ্চিম অঞ্চলে অনুগত আত্মীয় লাভ করলেন। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা ও মগধের ক্ষুদ্র রাজা মাধবগুপ্তের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে তিনি নিজ শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। তবু শশাঙ্কের কোন ক্ষতি করতে পারেন নি। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর কামরূপরাজের

হর্ষবর্ধনের কূটনৈতিক জোট গঠন

গৌড়ের পতন

সহায়তায় তিনি গৌড়ের পতন ঘটান।

চীনাদের বিবরণ থেকে জানা যায়, ৬১৮ থেকে ৬২৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে প্রচণ্ড যুদ্ধবিগ্রহ চলেছিল এবং শিলাদিত্য হর্ষবর্ধন চতুর্দিকের নৃপতিদের যথাযোগ্য শাস্তি বিধান করেছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি দক্ষিণ দিকে নর্মদা নদী পর্যন্ত অভিযান করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের বাতাপীবংশের দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রতিরোধে নর্মদাতীরে তাঁর গতি রুদ্ধ হয়। কিন্তু উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে নর্মদা নদী এবং পূর্বে বঙ্গদেশসমেত গঞ্জাম (কলিঙ্গ) থেকে পশ্চিমে বল্লভী পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁর প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হর্ষবর্ধন দক্ষিণ ভারতে কোন রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। প্রায় ৪০ বৎসর রাজত্ব করার পর ৬৪৬ কিংবা ৬৪৭ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রতিরোধ

হর্ষবর্ধনের রাজ্যসীমা

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে আর এক বৌদ্ধ চীনা পরিব্রাজক ভারতে আসেন। তিনি আত্মগুণে শ্রীহর্ষের বন্ধু ছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকে সে সময়ে লোকের জীবনযাত্রা কেমন ছিল জানা যায়: সাধারণের পোষাক ছিল অন্তর্বাস এবং তার উপর সেলাইবিহীন উত্তরীয়। তারা ছিল পরিচ্ছন্ন। তাদের প্রধান খাদ্য ছিল দুধ, ঘি, চাল, তরকারি। পেঁয়াজ-রসুন কদাচিৎ ব্যবহার হত। মাংসের ব্যবহার ছিল আরও কম। সাধারণত ইটের বাড়ি, চূণকাম করা; ছাদ খড় দিয়ে তৈরি, কাঠের সিলিং-এর উপর পোড়া বা আপোড়া টালি; ঘরের মেঝে গোময় মার্জিত এবং অভ্যন্তর পুষ্পে সজ্জিত। সাধারণের ব্যবহারযোগ্য হলঘর এবং বৌদ্ধমঠ ইত্যাদির গঠন ছিল বিশেষ আকর্ষণীয়।

হিউয়েন সাঙের বিবরণ

পোষাক ও খাদ্য

বাসগৃহ

সত্যবাদিতা, বদান্যতা অতিথিপরায়ণতা ভারতবাসীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কসাই মৎস্যজীবী, ঝাড়ুদার প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা নগরের বাইরে বাস করত।

নৈতিক জীবন

পর্দা প্রথার প্রচলন ছিল না কিন্তু সতীদাহ অনুষ্ঠিত হত। হর্ষবর্ধনের জননী যশোমতী দেবী সতীর মৃত্যু বরণ করেছিলেন। ভগিনী রাজ্যশ্রী স্বামীর মৃত্যুর পর চিতায় আরোহণ করতে যাওয়ার সময় নাটকীয়ভাবে হর্ষবর্ধন তাঁকে রক্ষা করেন। চাষ-আবাদ, পশুপালন, ব্যবসাবাণিজ্য, কুটিরশিল্প ছিল লোকের উপজীবিকা। স্থল ও জলপথে প্রতিবেশী দেশগুলির (চীন, পারস্য) সঙ্গে বাণিজ্য চলত। লেনদেনের মাধ্যম ছিল সোনা ও রূপার মুদ্রা এবং কড়ি।

জীবিকা, মুদ্রা

হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায়, মন্দির ও বৌদ্ধমঠে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে

বসবাসকারী ছাত্ররা বিদ্যাভ্যাস করত। উচ্চশিক্ষার জন্য তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, গয়া ও নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশবিদেশের শত শত ছাত্র জ্ঞানার্জন করত। বহু বিষয় এবং ঐসবের কৃতবিদ্য অধ্যাপকদের খ্যাতি বিদেশেও বিস্তৃত হয়েছিল।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

হর্ষবর্ধন নিজে ছিলেন কবি ও নাট্যকার। সংস্কৃতে লেখা তাঁর নাটক **রত্নাবলী প্রিয়দর্শিকা** ও **নাগানন্দ** এখনও সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়ে দর্শকের মনোরঞ্জন করে। হর্ষবর্ধনের অনুরাগী কবি সাহিত্যিক ছিলেন 'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী' রচয়িতা বাণভট্ট ; অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন মাতঙ্গ, ভর্তৃহরি, জয়সেন প্রভৃতি।

প্রতিহার ও পালসাম্রাজ্য

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর এবং হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়লে বাংলায় প্রায় একশ বছরেরও বেশি কাল ধরে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। একজন শক্তিমান ন্যায়পরায়ণ শাসকের একান্ত প্রয়োজন উপলব্ধি করে তারা **গোপাল** নামে এক স্থানীয় নেতাকে বাংলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করল। অন্যান্য ক্ষুদ্র আঞ্চলিক নেতারা গোপালের নেতৃত্ব মেনে নিল। বাংলার সিংহাসনে এভাবে গোপালের মনোনয়ন বাংলার ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করল।

প্রজাগণ কর্তৃক গোপাল রাজা নির্বাচিত

পালবংশ প্রতিষ্ঠা ঃ প্রজাগণ-কর্তৃক নির্বাচিত গোপাল যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তা **পালবংশ** নামে খ্যাত। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে এই বংশ চারশ বছর বাংলা, বিহার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। মৌর্য ও গুপ্ত-সম্রাটদের মত পালসম্রাটগণ বঙ্গদেশকে আর্যাবর্তের এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন।

প্রতিহার সাম্রাজ্য ঃ গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে যেসব জাতি প্রবেশ করেছিল, তাদের মধ্যে একদলের নাম ছিল প্রতিহার। এরা পশ্চিম ভারতে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে। তারা পরে উত্তর ভারতে প্রাধান্য লাভের জন্য পালেদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন। এই দ্বন্দ্ব ৮ম, ৯ম শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

প্রথম সংঘর্ষ ঃ পাল ও প্রতিহার উভয় রাজাদেরই কনৌজের ওপর প্রাধান্য স্থাপনের লক্ষ্য ছিল। কনৌজ অধিকার করা নিয়ে ধর্মপাল ও বৎসরাজের মধ্যে প্রথম সংঘর্ষ বাধে উত্তর ভারতের গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে। এই যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হন কিন্তু বৎসরাজ জয়ী হয়েও ফলভোগ করতে পারলেন না ; দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব অকস্মাৎ আক্রমণে বৎসরাজকে পরাজিত ও রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। তিনি গঙ্গা-যমুনা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে ধর্মপালকেও যুদ্ধে পরাস্ত করেন কিন্তু বিজিত রাজ্য নিজ অধিকারে রাখার চেষ্টা না করে দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব স্বরাজ্যে ফিরে গেলে

ফল ধর্মপালের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা

ধর্মপাল আবার কনৌজ অধিকার করে অনুগত চক্রায়ুধকে সিংহাসনে স্থাপন করলেন। প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত ধর্মপালের প্রাধান্য মেনে নিল।

দ্বিতীয় সংঘর্ষ : যে প্রতিহাররাজ রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করে উত্তর ভারতে প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে বৎসরাজের মতই ধর্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করে নাগভট্ট মুদ্গগিরিতে (মুঙ্গেরে) ধর্মপালকে পরাজিত করেন। এবারেও রাষ্ট্রকূটরাজ বিজয়ী প্রতিহার-নৃপতির উত্তর ভারতে প্রাধান্য লাভের স্বপ্ন ভেঙে দিলেন। বিপন্ন ধর্মপালের আহ্বানে তৃতীয় গোবিন্দ সসৈন্যে এসে নাগভট্টকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন এবং ধর্মপালের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করে স্বরাজ্যে ফিরে যান। এরপর উত্তর ভারতে ধর্মপালের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিমান কোন নৃপতি রইল না।

ধর্মপালের আহ্বানে তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্য

তৃতীয় সংঘর্ষ : প্রথম ও দ্বিতীয় সংঘর্ষের ফল প্রতিহাররাজের অনুকূলে যায়নি, যদিও উত্তর ভারতের দুই প্রতিযোগীর মধ্যে প্রথম দিকের সাফল্য ছিল প্রতিহারদের দিকে। প্রতিহারবংশের রাজারা তাই এই পরাজয় সহজে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

প্রতিহারদের পূর্বদিকে অগ্রগতি রুদ্ধ

প্রতিহাররাজ প্রথম ভোজ (আঃ ৮৩৬-৮৮৫ খৃঃ) কনৌজের কিছু অঞ্চল জয় করেন কিন্তু ধর্মপালের পুত্র দেবপালের নিকট পরাজিত হয়ে তিনি আর পূর্বদিকে অগ্রসর হতে পারেনি।

ত্রিমুখী দ্বন্দ্বের ফলাফল : হর্ষবর্ধনের পর ভারতে রাজরাজড়াদের আত্মপ্রতিষ্ঠার কলহ সে সময়কার রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিচয় দেয়। পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকূট দ্বন্দ্বে কোন পক্ষই নিরংকুশ বিজয় লাভ করে বিস্তৃত অঞ্চলকে ঐক্যবন্ধনে বাঁধতে পারেনি। আত্মকলহে রত ভারতের রাজনৈতিক দুর্বলতা বিদেশী শত্রুর আক্রমণের পথ প্রস্তুত করেছিল। তবে এই কলহের মধ্য দিয়েই অল্পকালের জন্য হলেও বাংলার পালশক্তি বাংলার বাইরে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পেয়েছিল।

সংহতি বিনষ্ট

কৃতি পাল ও সেনরাজাদের কথা (Important Pala and Sena Rulers) :

ধর্মপাল : (আনুমানিক ৭৭০-৮১০ খৃস্টাব্দ) : পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেবের পুত্র ধর্মপাল শৌর্যে ও সুশাসনে দেশের শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন। উত্তর ভারতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ত্রিমুখী প্রতিযোগিতায় প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার ফলে ভাগ্যক্রমে তিনি উত্তর ভারতে নিজ ক্ষমতা বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব বৎসরাজ ও ধর্মপালকে পরাজিত করে দক্ষিণ ভারতে ফিরে গেলে ধর্মপাল মগধ,

উত্তর ভারতে ধর্মপালের প্রাধান্য স্বীকৃত

বারাণসী, কান্যকুব্জ অধিকার করে পশ্চিমে সিন্ধুনদ ও উত্তরে হিমালয়ের পাদভূমি পর্যন্ত জয় করেন। এরপর কান্যকুব্জে মহাসমারোহে রাজ্য অভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিভিন্ন রাজ্যের সামন্ত নৃপতিগণ তাঁকে সার্বভৌম সম্রাট বলে স্বীকার করেন।

ধর্মপাল প্রথম বাঙালী সম্রাট

ধর্মপাল প্রথম বাঙালী সম্রাট। তিনি বঙ্গদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি। প্রায় চল্লিশবর্ষব্যাপী রাজত্বকালে বঙ্গদেশকে তিনি উত্তর ভারতের প্রধান রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন এবং পাটলিপুত্রের প্রাচীন গৌরব অনেকাংশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

দেবপাল ঃ ধর্মপালের মৃত্যুর পর (সম্ভবত ৮১৬ খৃস্টাব্দে) পুত্র দেবপাল সিংহাসন লাভ করেন। তিনি পিতার মতই উচ্চাভিলাষী এবং দিগ্বিজয়ী হতে ইচ্ছুক ছিলেন। গুর্জর প্রতিহার ও দক্ষিণের দ্রাবিড়দের সঙ্গেও যুদ্ধ করেছিলেন। ঐতিহাসিক তথ্য অনুসারে বলা যায়, উত্তরে কম্বোজ অঞ্চল থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত অবধি দেবপালের প্রতিপত্তি-সীমা বিস্তৃত ছিল।



পালযুগের ভাস্কর্য

দেবপালের মৃত্যুর পর পাল-রাজগণের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রতিহাররাজ মহেন্দ্রপাল (আনু: ৮৮৫-৯১০ খৃঃ) পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। দেবপালের পরবর্তী রাজাদের পরাজিত করে তিনি মগধের অধিকাংশ অঞ্চল এবং উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুর পর্যন্ত অধিকার করেছিলেন। প্রথম দুই সংঘর্ষের পরাজিত প্রতিহারশক্তি তৃতীয় সংঘর্ষের ফলে জয়ী হয়ে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল।

সামন্ত দমন; প্রজাহিতকর কর্ম; লোকের মুখে মহীপালের গুণকীর্তন

মহীপাল ঃ দেবপালের মৃত্যুর পর রাজ্যের অবনতি শুরু হয়। পরবর্তী রাজাদের বিক্রম ও উদ্যমের অভাবে পালশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে। পাল রাজ্যের যখন এই রকম দুর্গতি, তখন প্রথম **মহীপাল** প্রবল বিক্রমে শত্রুকে প্রতিরোধ করে এবং সামন্তদের দমন করে পালশক্তির পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছিলেন।

প্রথম মহীপালের গৌরব বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। তাঁর পৌত্র দ্বিতীয় মহীপালের সময় রাজ্যে ঘোরতর দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। দ্বিতীয় মহীপালের দুই ভ্রাতা ছিলেন শূরপাল ও রামপাল। ভ্রাতারা তাঁকে রাজ্যচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, এই ধারণার বশে মহীপাল দুজন ভ্রাতাকে কারারুদ্ধ করে রাখলেন। বরেন্দ্রের সামন্তরা **দিব্য** নামক এক কৈবর্ত নায়কের নেতৃত্বে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। দ্বিতীয় মহীপাল এই বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। দিব্য বরেন্দ্রে এক নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ও দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। দিব্যের পর রুদোক রাজা হন। পরবর্তী রাজা রুদোকের পুত্র **ভীম** শাসন গুণে দেশে সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভীম কৈবর্ত বংশের শেষ রাজা।

কৈবর্ত নায়ক দিব্যের বিদ্রোহ ও রাজ্যগঠন

সুশাসক রাজা ভীম

রামপাল : দিব্যের যুদ্ধের সুযোগে রামপাল ও শূরপাল কারাগার থেকে পলায়ন করেন। প্রথমে শূরপাল মগধের সিংহাসন আরোহণ করেন। তখন বিহারের সামান্য অঞ্চল রাজার অধীনে ছিল, রাজ্যের অন্যান্য অংশে সামন্তরাই ছিল প্রধান। শূরপালের পরে রামপাল মগধের রাজা হন।

রামপাল মগধের রাজা

রাজ্য উদ্ধার : রামপাল রাজা হয়ে বরেন্দ্র উদ্ধারের চেষ্টা করেন, কিন্তু দিব্যের প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে তিনি একাকী সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। রামপাল এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায় প্রতিবেশী রাজা ও সামন্তদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। অনেকদিনের চেষ্টায় অজস্র অর্থ ও ভূমিদানের বিনিময়ে রামপাল এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করেন। গঙ্গার উত্তর তীরে ভীমের সঙ্গে রামপালের তুমুল যুদ্ধ হয়। ভীম যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। রামপাল কৈবর্ত রাজবংশের বিলোপ ঘটিয়ে বরেন্দ্র পুনরুদ্ধার করেন এবং বর্তমান মালদহের নিকট রামাবতী নগরে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

রামপাল কর্তৃক রাজ্য উদ্ধার

সেন রাজত্ব : প্রধান সেনরাজাদের কথা : আদি বাসভূমি-সেনবংশীয় লোকেরা দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট প্রদেশের অধিবাসী। তাঁরা নিজেদের ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিয়েছেন। এই বংশের সামন্তসেন কর্ণাট অঞ্চলে যোদ্ধা হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বৃদ্ধ-বয়সে তিনি গঙ্গাতীরে বসবাসের উদ্দেশ্যে রাঢ়দেশে এসে বাসস্থাপন করেন। সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্তসেন সম্ভবত রামপালের অধীনে সামন্ত রাজা ছিলেন।

রাজা রামপালের অধীনে সামন্ত

বিজয় সেন : হেমন্তসেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিজয়সেন পিতৃপদ লাভ করেন। তিনি সম্ভবত কৈবর্তরাজ ভীমের বিরুদ্ধে অভিযানে রামপালের সহায়তা করেছিলেন। পালবংশের দুর্বলতা ও অশান্ত অবস্থার সুযোগে তিনি রাজ্যবৃদ্ধি করেন এবং স্বাধীনভাবে রাজ্য-শাসন করতে থাকেন। রামপালের মৃত্যুর পর পালরাজ্য যখন ভেঙে পড়তে লাগল

সেন রাজত্ব স্থাপন

বিজয়সেন তখন পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ অধিকার করেন এবং সমগ্র দেশে এক শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

বল্লালসেন ঃ বিজয়সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বল্লালসেন আনুমানিক ১১৫৮ খৃস্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন। তিনি অস্ত্রবিদ্যা ও শাস্ত্রবিদ্যা উভয় বিষয়েই পারদর্শী ছিলেন। পিতৃরাজ্য তিনি শুধু অক্ষুণ্ণই রাখেন নি, গৌড় ও মিথিলা জয় করে রাজ্যের আয়তনও বাড়িয়েছিলেন।

বল্লালসেন বেদ, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং 'অদ্ভুতসাগর' ও 'দানসাগর' নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। বঙ্গদেশে তিনি কৌলীন্য প্রথার প্রচলন করেন। শেষ বয়সে তিনি যোগ্যপুত্র লক্ষ্মণসেনের হাতে রাজ্যভার দিয়ে প্রাচীনকালের রাজর্ষিদের মত সংসার ত্যাগ করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন এবং ত্রিবেণীর নিকট গঙ্গাতীরে সস্ত্রীক শান্তির জীবনযাপন করেন। কারো মতে তিনি পত্নীসহ স্বেচ্ছায় গঙ্গায় প্রবেশ করে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন।

'অদ্ভুতসাগর' 'দানসাগর' শাস্ত্র গ্রন্থ রচয়িতা

লক্ষ্মণসেন ঃ পিতা বল্লালসেনের নিকট থেকে রাজ্যভার নিয়ে লক্ষ্মণসেন ১১৭৬ খৃস্টাব্দে প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। নিজ বাহুবলে তিনি গৌড়দেশ সম্পূর্ণ জয় করে গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করেন। শুধু গৌড়ে নয়, লক্ষ্মণসেন বঙ্গের বাইরেও যুদ্ধজয়ের গৌরব অর্জন করেছিলেন। যৌবনে তিনি কলিঙ্গ দেশ জয় করেন। মাধাইনগর তাম্রশাসনে তাঁকে বীর চক্রবর্তী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর পুত্রদ্বয়ের তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে তিনি পুরী, বারাণসী ও প্রয়াগে 'সমরস্তম্ভ' স্থাপন করেন।

সমুদ্রতীরে ও গঙ্গাতীরে 'সমর-স্তম্ভ' স্থাপন

লক্ষ্মণসেন নিজে সুলেখক ও কবি ছিলেন। ধোয়ী, জয়দেব প্রভৃতি কবিকে সমাদর করে তিনি রাজসভায় স্থান দিয়েছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি যখন গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে শাস্ত্রচর্চায় দিন অতিবাহিত করছিলেন সেই সময় ইক্তিয়ার উদ্দীন মহম্মদ নামে এক তুর্কী সেনানায়ক আনুমানিক ১২০২ খৃস্টাব্দে অতর্কিত আক্রমণে নবদ্বীপ অধিকার করেন; লক্ষ্মণসেন নৌকাযোগে নবদ্বীপ ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে চলে যান।

মুসলিম আক্রমণ: নবদ্বীপ ত্যাগ

খ. দাক্ষিণাত্য

বাদামির চালুক্যবংশ ঃ কাঞ্চীর পল্লবদের চিরশত্রু চালুক্যগণ ষষ্ঠ শতাব্দীতে কর্ণাট অর্থাৎ কাডি ভাষী অঞ্চলে প্রাধান্যলাভ করেন। বর্তমান বিজাপুর জেলায় বাতাপী বা বাদামিতে তাঁদের রাজধানী অবস্থিত ছিল। বাদামি রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠান ছিলেন **প্রথম পুলকেশী**। রাজশক্তিবৃদ্ধি করে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। তাঁর পুত্রদ্বয় প্রথম কীর্তিবর্মন ও মঙ্গলেশ প্রতিবেশী রাজ্যগুলি জয় করে সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেছিলেন। কঙ্কনের মৌর্যগণ, বৈজয়ন্তীর কদম্ব এবং মহারাষ্ট্র ও মালবের কলচুরিদের

কর্ণাট অঞ্চলে বাদামির চালুক্যবংশ

প্রথম পুলকেশী প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা

অঞ্চল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে চালুক্যগণ প্রভূত শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। কীর্তিবর্মনের পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী ছিলেন চালুক্যবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি।

দ্বিতীয় পুলকেশী : দ্বিতীয় পুলকেশী প্রায় দীর্ঘ ৩৩ বছর (৬০৯-৬৪২ খৃঃ) রাজত্ব করে কেবলমাত্র মহারাষ্ট্রেই নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেননি—নর্মদা থেকে কাবেরী নদীর দক্ষিণ অঞ্চল পর্যন্ত অধিকার করেছিলেন। সাতবাহনরাজ গৌতমীপুত্র সাতকর্নী'র মত তিনি চালুক্য-সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগের স্রষ্টা। কনৌজের হর্ষবর্ধন দাক্ষিণাত্য অভিযানে অগ্রসর হলে পুলকেশী তাঁকে প্রতিহত করেন। হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করলেও আর দাক্ষিণাত্য বিজয়ের চেষ্টা করেননি। পুলকেশী কাঞ্চীর মহেন্দ্রবর্মনকে পরাভূত করেন। গোদাবরী জেলায় পিষ্টপুরম অধিকার করে নিজ ভ্রাতা কুব্জ বিষ্ণুবর্ধনকে তার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

দ্বিতীয় পুলকেশী চালুক্যবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি; হর্ষবর্ধন নর্মদাতীরে প্রতিহত; নর্মদা নদী থেকে কাবেরীর দক্ষিণ অঞ্চল পর্যন্ত অধিকৃত

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ ৬৪১ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি পুলকেশীর রাজ্যে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, পুলকেশীর দোর্দণ্ড প্রতাপে প্রতিবেশী রাজারা কম্পমান থাকতেন; চালুক্যরাজ্যের জনসাধারণ সরল ও সৎপ্রকৃতির, বিদ্যানুরাগী ও কৃতজ্ঞ কিন্তু শত্রুর প্রতি নির্মম ও প্রতিহিংসাপরায়ণ।

দোর্দণ্ড প্রতাপ অন্য রাজাদের ভীতি ও সম্ভ্রম উদ্রেক করত। রাজ্যে হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ

রাষ্ট্রকূটবংশ : দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূটগণ মহাভারতে উল্লিখিত যাদব নায়ক সাত্যকির বংশধর বলে দাবি করেন। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের সামন্তরূপে **দন্তি দুর্গ** গুজরাটে আরব আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং ক্রমে মালব মধ্য ও দক্ষিণ গুজরাট এবং সমগ্র মধ্যপ্রদেশ ও বেরার অধিকার করেন। সামন্ত দুর্গ রাষ্ট্রকূট রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

দন্তি দুর্গ রাজবংশ প্রতিষ্ঠাতা

রাষ্ট্রকূট বংশের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে উত্তরে গঙ্গা যমুনা উপত্যকায় অভিযান চালিয়ে সাফল্য লাভ করেন। তাঁরা সমগ্র দাক্ষিণাত্যে এবং ভারতের সুদূর দক্ষিণ প্রান্তেও কর্তৃত্ব করেছিলেন। উত্তর ভারতে রাষ্ট্রকূট-প্রতিহার-পালবংশীয় রাজাদের মধ্যে যে ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব চলেছিল তাতে রাষ্ট্রকূটেরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জয়লাভ করেন। রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্য জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ৭৭২ খৃস্টাব্দ থেকে প্রায় ৯৭৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করেছিল।

রাষ্ট্রকূটগণ বিদ্যা এবং শিল্পের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজা প্রথম **অমোঘবর্ষ** একজন গ্রন্থকাররূপে খ্যাত হয়েছিলেন। তিনি বলিষ্ঠ শিল্পকর্মেও উৎসাহ দিতেন। দন্তি দুর্গের খুল্লতাত রাজা **প্রথম কৃষ্ণ** ইলোরার বিখ্যাত কৈলাস মন্দির নির্মাণ করেন। প্রথম কৃষ্ণের পুত্র **ধ্রুব** উত্তর ভারতের ত্রিমুখী রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়ে বৎসরাজ প্রতিহার এবং গৌড়ের রাজা ধর্মপালকে পরাস্ত করেন।

রাজা প্রথম কৃষ্ণ ইলোরা কৈলাসনাথ মন্দির নির্মাতা

তৃতীয় গোবিন্দ ঃ ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ অপরাজেয় যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর সময়ে রাষ্ট্রকূটরা কাঞ্চীর পল্লবদের পরাজিত করে তাঁদের করপ্রদানে বাধ্য করেন ; দক্ষিণ গুজরাটের সিংহাসনে রাষ্ট্রকূট বংশের এক রাজকুমারকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তৃতীয় গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র **তৃতীয় কৃষ্ণ** রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ যোগ্য নৃপতি। তাঁর রাজ্য বাঘেলখন্দের জুরা থেকে কাবেরী উপত্যকায় তাঞ্জোর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ৯৭৩ খৃস্টাব্দে তৃতীয় কৃষ্ণের সামন্ত দ্বিতীয় তৈল রাষ্ট্রকূট বংশের পতন ঘটান।

রাজ্যবিস্তার কাবেরী থেকে তাঞ্জোর পর্যন্ত

কল্যাণের চালুক্য বংশ ঃ দ্বিতীয় তৈল নিজাম রাজ্যের কল্যাণ নামক স্থানে পরবর্তী চালুক্য রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের বিখ্যাত রাজা ছিলেন প্রথম সোমেশ্বর। তিনি কল্যাণে একটি নতুন রাজধানী স্থাপন করেন এবং একে একটি সমৃদ্ধ শহরে পরিণত করেন। ১০৬৮ খৃস্টাব্দে নিরাময়-অযোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়েছেন জেনে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তুঙ্গভদ্রা নদীতে প্রবেশ করে জীবন বিসর্জন দেন।

ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ঃ রাজা সোমেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় সোমেশ্বর সিংহাসন লাভ করেন। তাঁর অত্যাচারে প্রজাগণ অতিষ্ঠ হলে সোমেশ্বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রমাদিত্য কিছু সংখ্যক অনুচরসহ রাজধানী ত্যাগ করে তুঙ্গভদ্রার দিকে প্রস্থান করেন। পথে সামরিক কৌশল প্রদর্শন করে তিনি কঙ্কনের শাসক জয়কেশী এবং দক্ষিণাঞ্চলের আরও অনেক সামন্তকে পরাজিত করেন। এর পর বিক্রমাদিত্য চোলরাজ বীর রাজেন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ এবং সন্ধি করে রাজকন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করেন। রাজা বীর-রাজেন্দ্রের মৃত্যু হলে চোল রাজ্যে অশান্তি দেখা দেয় এবং তাঁর আত্মীয় (শ্যালক)-কে সাহায্য করার জন্য তাঁকে দ্রুত কাঞ্চীতে যেতে হয়। ঐ সময় বেঙ্গীর রাজা প্রথম কুলোত্তুঙ্গ বিক্রমাদিত্যের শ্যালককে হত্যা করেন এবং বিক্রমাদিত্যের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য দ্বিতীয় সোমেশ্বরের সাহায্য গ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্য উভয়ের মিলিত শক্তি পরাভূত করেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সোমেশ্বরকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে রাষ্ট্রকূট রাজপদ গ্রহণ করে ১০৭৬ খৃস্টাব্দ থেকে **চালুক্যবিক্রম** নামে নতুন অব্দ প্রচলন করেন।

সোমেশ্বর অত্যাচারী রাজা ; বিক্রমাদিত্য

১০৭৬ খৃঃ 'চালুক্য-বিক্রম' অব্দ প্রচলন

সুদূর দক্ষিণে ঃ

(১) **কাঞ্চীর পল্লব রাজবংশ কতিপয় কীর্তিমান নৃপতির কথা ঃ** প্রাকৃত ভাষায় লিখিত তৃতীয় ও চতুর্থ খৃস্টাব্দের তিনটি তাম্রপত্র থেকে বপ্পদেব, শিবস্কন্দবর্মন, বুদ্ধ্যাংকুর ও বীরবর্মনের নাম জানা যায়। অনুমান করা হয় বপ্পদেব পল্লব রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পুত্র শিবস্কন্দবর্মণ দক্ষিণে রাজ্যবিস্তার করে অশ্বমেধ, বাজপেয় ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ সম্পাদন

বপ্পদেব পল্লব রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা

করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের পূর্ব উপকূলে কৃষ্ণানদীর তীরে পল্লবদের রাজ্য অবস্থিত ছিল। গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যে বিজয় অভিযানে এসে পল্লবরাজ বিষ্ণুগোপকে পরাজিত করেও রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন (আনুমানিক ৩৩৫-৭৬ খৃঃ)।

পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে সিংহবিষ্ণু কর্তৃক নেল্লোর গুণ্টুর অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র পল্লবরাষ্ট্র গঠিত হয়। তিনি চোল, পাণ্ড্য ও মালবদেব পরাজিত করে দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

চালুক্য পল্লব প্রতিদ্বন্দ্বিতা : সিংহবিষ্ণুর পুত্র মহেন্দ্রবর্মন (১ম) উচ্চাকাঙ্ক্ষী নৃপতি ছিলেন। এই সময় চোল, পাণ্ড্য ও কেরল দেশের নরপতিগণ পল্লবরাজের লঘুমিত্র ছিলেন। বাদামির চালুক্যবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশী পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মনকে পরাজিত করে কিছুকালের জন্য পল্লবরাজ্য অধিকার করতে সমর্থ হন। তাঁর 'অইহোলি-লিপিতে' পল্লবরাজকে পরাভূত করার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র নরসিংহবর্মন (আনুমানিক ৬৩০-৬৩৮ খৃঃ) পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেন। তিনি পুলকেশীকে পরাজিত ও নিহত করে রাজধানী বাদামিসহ চালুক্যসাম্রাজ্যের দক্ষিণাংশ অধিকার করেন। তখন তিনি বাতাপিকোণ্ড অর্থাৎ বাতাপি-বিজেতা উপাধি ধারণ করেছিলেন। দীর্ঘ ১৩ বছর পরে পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য পিতৃরাজ্য শত্রুকবলমুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রথম মহেন্দ্রবর্মন ও প্রথম নরসিংহবর্মনের সময় পল্লবরাজ্যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রভূত উন্নতি হয়। মহেন্দ্রবর্মন দক্ষিণ ভারতে বৃহৎ প্রস্তর খোদাই করে মন্দির নির্মাণের পদ্ধতি প্রচলন করেন।

প্রস্তর খোদাই ভাস্কর্যের প্রবর্তন

সিংহলের রাজপুত্র মানবর্মা নরসিংহবর্মনের সহায়তায় রাজ্যোদ্ধার করতে সমর্থ হন। চালুক্য-পল্লবের বংশগত শত্রুতা বহুদিন দুইটি রাজবংশ অনির্বাপিত আগুনের মত পুরুষানুক্রমে মনে পোষণ করেছে এবং সর্বদা একে অন্যের ওপর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ সন্ধান করেছে। পিতা পুলকেশীর মত চালুক্যরাজ প্রথম বিক্রমাদিত্য কিছুকালের জন্য পল্লবসাম্রাজ্য অধিকার করেছিলেন। কিন্তু পরিশেষে প্রথম নরসিংহবর্মনের পৌত্র প্রথম পরমেশ্বরবর্মন (আনুমানিক ৬৬৯-৭০০ খৃঃ)বিক্রমাদিত্যকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে শত্রু-রাজধানী বাদামি পর্যন্ত অগ্রসর হন। এখানেই এঁদের বিরোধ শেষ হয়নি। একবার পল্লবরাজ চালুক্যদের পরাজিত করলে কিছুকাল পরে নতুন চালুক্যরাজা, দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য পূর্ব-পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পল্লবরাজ্য আক্রমণ করে কাঞ্চী অধিকার করেন (৭৩৩-৪৫ খৃঃ)।

পুরুষানুক্রমে শত্রুতা

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য কর্তৃক কাঞ্চী অধিকার

ফলাফল : দীর্ঘকালব্যাপী পল্লব-চালুক্য বিরোধের ফলে উভয় রাজবংশই হীনবল হয়ে পড়ে। তাই রাষ্ট্রকূটবংশীয় দন্তিদুর্গ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মনকে পরাজিত করে দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।

তাঞ্জোরের চোলগণ (The Cholas of Tanjore): মাদ্রাজ প্রদেশের তাঞ্জোর ও তিরুচ্চিরাপল্লী অঞ্চলের চোলরাজবংশ অতি প্রাচীন। অশোকের শিলা দেখে (খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী চোলগণের উল্লেখ দেখা যায়। চোলেরা এক সময়ে) কাঞ্চীর পল্লবসম্রাটদের সামন্ত ছিলেন। চোলবংশের আদিপুরুষ **বিজয়ালয়** তাঞ্জোর অধিকার করেন। তাঁর পুত্র আদিত্য পল্লবরাজ অপরাজিতের পক্ষে পাণ্ড্যরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পাণ্ড্যরাজকে পরাজিত করেন কিন্তু তিনিই পরে ৮৯৩ খৃস্টাব্দে অপরাজিতকে পরাজিত করে পল্লবরাজ্য অধিকার করেন। এইভাবে চোলসাম্রাজ্যের পত্তন হল।

পল্লবরাজাদের সামন্ত বিজয়ালয় চোলবংশের প্রতিষ্ঠাতা; আদিত্য চোলরাজ অপরাজিতকে পরাজিত করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন

প্রথম রাজরাজ চোল (৯৮৫-১০১৬ খৃঃ): প্রথম রাজরাজ এবং তাঁর পুত্র রাজেন্দ্রের শাসনকাল (১০২২-৪৪ খৃঃ) চোলসাম্রাজ্যের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ। রাজরাজ তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণদিকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চোল আধিপত্য সুদৃঢ় করেছিলেন। তাঁর সময়ে বেঙ্গী ও কলিঙ্গরাষ্ট্রে চোলপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়; সিংহল দ্বীপের উত্তরাংশ চোলসাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। [সমুদ্রের ১২ হাজার প্রাচীন দ্বীপ তিনি অধিকার করেছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়; এগুলি সম্ভবত মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ। সিংহলের কিছু অংশ জয় এবং সমুদ্রস্থিত দ্বীপসমূহ অধিকার করে রাজরাজ চোল-নৌশক্তির দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।] তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তর তীরে চালুক্যদের রাজ্যেও তিনি বহুবার অভিযান চালিয়েছিলেন। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার শৈলেন্দ্র সম্রাটদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। শৈলেন্দ্রবংশীয় মারবিজয়োত্তুঙ্গ বর্মাকে তিনি নাগপত্তনে একটি বৌদ্ধবিহার স্থাপন করতে সাহায্য করেছিলেন। ১০১২ খৃস্টাব্দ থেকে তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র তাঁকে রাজ্যশাসনে সাহায্য করতে থাকেন।

চোলসাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগ রাজরাজ ও রাজেন্দ্রচোলের আমল, চোলসাম্রাজ্যের বিস্তার তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে; সিংহলের উত্তরাংশ চোলপ্রদেশ ১২,০০০ দ্বীপ অধিকার; শৈলেন্দ্র সম্রাটদের সঙ্গে বন্ধুত্ব; বৌদ্ধ-বিহার স্থাপনে সহায়তা।

রাজেন্দ্রচোল: প্রথম রাজরাজচোলের পুত্র রাজেন্দ্রচোল (১০১৪-১০৪৪ খৃঃ) ভারতের ইতিহাসে একজন দিগ্বিজয়ী পুরুষ বলে পরিগণিত। তিনি পিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত সাম্রাজ্য যে কেবল সুদৃঢ় করেছিলেন তাই নয়, তিনি এর আয়তন ও গৌরব উভয়ই বৃদ্ধি করেছিলেন। পশ্চিম অংশের চালুক্যদের শক্তি তিনি খর্ব করেন, সমগ্র সিংহল অধিকার করেন। মধ্যভারতে অভিযান চালিয়ে তিনি গণ্ডোয়ানার শাসককে বশ্যতাস্বীকার করতে বাধ্য করেন। তারপর তিনি ওড়িশা অতিক্রম করে বঙ্গদেশে গঙ্গার দক্ষিণতীর পর্যন্ত অগ্রসর হন। এইরূপে গঙ্গাতীর পর্যন্ত চোলপ্রভাব বিস্তার করে রাজেন্দ্র 'গঙ্গৈকোণ্ড' (গঙ্গাবিজয়ী) উপাধি ধারণ করেছিলেন।

দিগ্বিজয়ী পুরুষ

'গঙ্গৈকোণ্ড' উপাধি ধারণ

ভারতের স্থলভাগে বিজয় অভিযান পরিচালনা অপেক্ষা নৌবাহিনীর সাহায্যে দেশ জয় তাঁর অধিকতর স্মরণীয় কীর্তি। তিনি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ এবং মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চলস্থিত বহুসংখ্যক জনপদ অধিকার করেন। শৈলেন্দ্রবংশীয় সংগ্রামবিজয়োত্তুঙ্গ বর্মাকে পরাজিত করে তিনি পেনাঙের নিকট কেডা এবং সুমাত্রার দক্ষিণে অবস্থিত শ্রীবিজয় (বর্তমান পালেম্বং) অধিকার করেছিলেন।

নৌবাহিনীর সাহায্যে আন্দামান ও নিকোবর জয়; দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় প্রাধান্য বিস্তার

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রতি অনুরাগ ঃ রাজেন্দ্রচোল কেবল সাহসী সমরনায়ক ছিলেন না, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। এক নতুন রাজধানী নির্মাণ করে নিজের নাম অনুসারে তার নামকরণ করেন গঙ্গৈকোণ্ড-চোলপুরম (বর্তমান গঙ্গাকুণ্ডপুরম্)। জাঁকজমকশালী বিশাল প্রাসাদ, মনোহর মন্দির, অপরূপ ভাস্কর্য, বিরাট কৃত্রিম হ্রদ প্রভৃতি দ্বারা তিনি রাজধানী সুশোভিত করেছিলেন। রাজেন্দ্রচোলের রাজত্বকালকে চোলদের 'সুবর্ণযুগ' বলে অভিহিত করা হয়।

চোলদের 'সুবর্ণযুগ'

৭০

৭ম থেকে ১২শ শতাব্দীর সমাজ ও জীবন

(ক) সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

পালরাজাদের আমল ঃ আনুমানিক ৭৫০ খৃস্টাব্দ থেকে ১১৬১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ৪০০ বছরের অধিককাল পাল রাজবংশ বাংলায় রাজত্ব করেছিলেন। এ সময়ে শুধু বাংলা নয়, বিহারও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ওপর ও পালরাজাদের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়েছিল। পাল রাজাগণ ছিলেন বাঙালী এবং বৌদ্ধ। পালযুগ বাংলার ইতিহাসে গৌরবের যুগ। এই যুগে ধর্ম ও বাঙালীর শিল্পসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটে। পালযুগের অন্যতম প্রধান গুরুত্ব হল বহির্বিশ্বের সঙ্গে পূর্ব ভারতের তথা বাংলার যোগাযোগ।

পাল রাজত্বকাল প্রায় ৪০০ বছর

১. সমাজ ঃ ভারতীয় সমাজে চিরকাল বিদ্যা ও ধর্মের সমাদর। যে শাসক বিদ্যার প্রসারে যত্নবান এবং নিরপেক্ষভাবে ধর্মের পৃষ্ঠপোষক তিনি প্রজাসাধারণের আনুগত্য ও প্রশংসা পেয়ে থাকেন। পাল রাজাগণ বিদ্যাচর্চা ও ধর্মচর্চা উভয় ব্যাপারেই উৎসাহী ছিলেন। বৌদ্ধবিহারগুলি ছিল ধর্মতত্ত্ব ও বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র। পালযুগে **ওদন্তপুরী, সোমপুর** ও **বিক্রমশীলা** বৌদ্ধবিহার নির্মিত হয়েছিল।

রাজারা বিদ্যাচর্চা ও ধর্মচর্চায় উৎসাহী

ওদন্তপুরী (উদন্তপুর, উদ্দন্তপুর)-বর্তমান বিহার সরিফের অনতিদূরে ও নালন্দার সন্নিকটে জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্ররূপে এই বিহার অবস্থিত ছিল। তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথের মতে রাজা গোপাল (রাজ্যকাল আনুমানিক ৭৫০-৭৫ খৃঃ) অথবাদেবপাল-এর প্রতিষ্ঠাতা। অন্যমতে, ধর্মপাল এই বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্রগর্ভনামে এক বাঙালী যুবক এখানে বৌদ্ধাচার্য শীলরক্ষিতের নিকট শিক্ষালাভ করে 'শ্রীজ্ঞান' নামে অভিহিত হন। পরে ইনি তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে **দীপংকর শ্রীজ্ঞান অতীশ** নামে চিরস্মরণীয় হয়েছেন।

ওদন্তপুরী, সোমপুর, বিক্রমশীলা বৌদ্ধবিহার

সোমপুর মহাবিহার ঃ বর্তমান বাংলাদেশের রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর নামক গ্রামে পালবংশীয় ধর্মপালের সময়ে এই বিশাল ধর্মায়তন নির্মিত হয়। পালযুগে এই স্থানের নাম ছিল সোমপুর। সোমপুর মহাবিহার ভারতবর্ষের বৌদ্ধবিহারগুলির মধ্যে বৃহত্তম। এখানে অনুপম ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানে উমা, মহেশ্বর ও গণেশের মূর্তির সঙ্গে অষ্টভুজা তারামূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে। বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি থেকে প্রমাণিত হয় সোমপুর মহাবিহারবাসী ভিক্ষুগণ বজ্রযানপন্থী হয়েছিলেন। এখানে দীপংকর শ্রীজ্ঞান অতীশ দীর্ঘকাল যাপন করেন। দীপংকরের গুরু রত্নাকর শান্তি এখানে স্থবির ছিলেন।

সোমপুর মহাবিহার ভারতে বৃহত্তম

এখানে ভিক্ষুগণ বজ্রযানপন্থী

বিক্রমশীলা ঃ খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে পালসম্রাট ধর্মপাল বর্তমান ভাগলপুরের নিকট গঙ্গাতীরে পাথরঘাট পর্বতের ওপর এই বৌদ্ধবিহার ও বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন। ১০৮ জন পণ্ডিত এর তত্ত্বাবধান করতেন। ধর্মপালের পর পালবংশীয় নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি ঘটে। কথিত আছে সে সময়কার প্রসিদ্ধ শিল্পী ধীমান ও বীতপাল এই বিহারের পরিকল্পনা করেছিলেন। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল এবং তিব্বত থেকেও বহু বিদ্যার্থী এখানে আসত। নালন্দার পরেই বিক্রমশীলা ছিল সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে তন্ত্রশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, চিকিৎসা ও ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা হত। এখানে অনেক সংস্কৃত পুস্তক তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। ধর্মপালের সময় বুদ্ধ জ্ঞানপাদ ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক। অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন আচার্য রত্নাকর শান্তি, কাশ্মীরবাসী পণ্ডিত

প্রসিদ্ধ শিল্পী ধীমান ও বীতপাল বিক্রমশীলার নির্মাণ শিল্পী

রত্নব্রজ, বাগীশ্বর কীর্তি, দীপংকর শ্রীজ্ঞান অতীশ প্রভৃতি। বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়কদের সাধারণ উপাধি ছিল মন্ত্রবজ্রাচার্য। এখানে প্রথম অধিনায়ক ছিলেন বুদ্ধ জ্ঞানপাদ। তিব্বতী লেখক তারানাথ বলেন, ধর্মপাল ৫০টি ধর্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

পালযুগে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য বিহারগুলির মধ্যে বাংলার জগদ্দল ও বিক্রমপুরী বিহার উল্লেখযোগ্য। অনেকের মতে রাজা রামপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রামাবতী নগরের (মুন্সীগঞ্জের রামপাল নামক গ্রাম) কাছে জগদ্দল অবস্থিত ছিল। এই বিহারে অনেক বড় বড় বৌদ্ধপণ্ডিত থাকতেন, তাঁদের মধ্যে বিভূতিচন্দ্র ছিলেন প্রধান। তিব্বতের লোকেরা এই বিহারের অন্তর্গত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করত।

বাংলার জগদ্দল বিহার উল্লেখযোগ্য

২ ধর্ম: পালরাজাদের আমলে দেশে প্রচলিত মহাযান মতের বৌদ্ধধর্মে মূর্তিপূজার প্রবর্তন হয়। এর ফলে হিন্দুদের পূজাপদ্ধতির সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম আচরণের পার্থক্য অনেকখানি কমে যায়। বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হয়নি। পালযুগের শেষ দিকে বৌদ্ধধর্মের অবনতি ও বৈষ্ণবধর্মের প্রসার লক্ষ্য করা যায়। পাহাড়পুরের ভাস্কর্য থেকে মনে হয় কৃষ্ণকাহিনী সমাজে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়

বৈষ্ণব ধর্মের জনপ্রিয়তা

৩ অর্থ নৈতিক অবস্থা: পালযুগে চিরাচরিত পদ্ধতিতে কৃষিকাজ চলত, রাজারা চাষীর সহায়তার জন্য সেচপুকুর খনন করে দিতেন; দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্যের জন্য জলপথ ও স্থলপথ ব্যবহার করা হত। স্থলে গোশকট ছিল প্রধান বাহন। কোন কোন অঞ্চলে হাতিও ব্যবহার করা হত। বাংলার তাম্রলিপ্তি বন্দর থেকে বাণিজ্যপোত সিংহল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে যাতায়াত করত। ব্যবসাবাণিজের কল্যাণে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটেছিল। পণ্যদ্রব্য ছিল মশলা, সুগন্ধি, নীল, মূল্যবান পাথর, ওষধি, মসলিন, রেশম ও সুতীবস্ত্র ইত্যাদি।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য অর্থের মূল উৎস

পণ্যদ্রব্য মশলা, নীল, সুগন্ধি, রেশম ও সুতীবস্ত্র

পালদের রাজত্বে রাজস্ব আদায় করার জন্য গ্রামপতি ও দশগ্রামিকের অধীনে যথাক্রমে একটি ও দশটি গ্রামের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকত।* আদায়কারীদের বেতন হিসাবে ভূমি দেওয়া হত, এই জমি ছিল তাদের অধীনস্থ জমির ক্ষুদ্র অংশমাত্র। গ্রামের শাসন সাধারণত নিয়মিত রাজকর্মচারীদের হাতে থাকত না, বরং সামন্তদের হাতে থাকত। খাদ্যবস্ত্র ও নিত্য-প্রয়োজনীয় সাধারণ বস্তুসামগ্রীর ব্যাপারে গ্রামবাসীরা স্বনির্ভর ছিল। শহর বন্দরের ধনী ও অভিজাত ব্যক্তিরা সমৃদ্ধ আরামের জীবনযাপন করতেন।**

গ্রামপতি ও দশগ্রামিকের ওপর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব

---

* রামশরণ শর্মা: ভারতের সামন্ততন্ত্র, পৃ. ৯০

** Romila Thapar. A History of India. p. 151

৪. **শিল্প ও সাহিত্য ঃ** বিদ্যা ও শিল্পের প্রতি পাল সম্রাটদের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। **ধীমান** ও **বীতপাল** ছিলেন পালযুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর ও স্থপতি। তাঁদের নির্মিত পাথরের ও অষ্টধাতুর চমৎকার দেবদেবীমূর্তি এখনও বিদ্যমান আছে। এ যুগে সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' কাব্য এবং কবিরাজ চক্রপাণি দত্ত চরক ও সুশ্রুতের টীকা লিখে যশস্বী হয়েছেন। এগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা।

৫. **বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঃ** পালযুগ বাংলা ভাষার উৎপত্তির যুগ। এই সময় মাগধী প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ থেকে প্রাচীন বাংলার ভাষা বিকাশ লাভ করে। ১০ম থেকে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত 'বৌদ্ধগান' ও 'দোহা' এইরূপ প্রাচীন বাংলায় লিখিত। এগুলি চর্যাপদ বা চর্যাগীত নামে পরিচিত।

বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তির যুগ ; দোহা, চর্যাপদ

শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ যুগের অবদান বাঙালীর কাছে স্মরণীয়। পালযুগে বাঙালী মনীষী বিদেশে জ্ঞানের আলো বিতরণ করেছেন যেমন, বৌদ্ধ পণ্ডিত কুমারঘোষ যবদ্বীপের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণের গুরু ছিলেন, বৌদ্ধ আচার্য শান্তিরক্ষিত, পদ্মসম্ভব এবং শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে বৌদ্ধ-মতবাদ প্রচার করেন ; বাঙালী কবি সস্কৃত কাব্য রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন, বাঙালী চিকিৎসক আয়ুর্বেদশাস্ত্রে নতুন ঔষধ প্রয়োগের উপায় দেখিয়েছেন। বাংলা ভাষার উৎপত্তি এই যুগে। এসব থেকে পালযুগকে বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা চলে।

বিদেশে জ্ঞানের আলো বিতরণ ; বাংলার ইতি স্বর্ণযুগ

সেন যুগে বাংলার ধর্ম ও সমাজ

ক. ধর্ম ঃ ১১শ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে ১৩শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ২০০ বৎসর বাংলার সেনযুগ। পালরাজত্বের শেষ দিকে বৌদ্ধধর্মে নানা রকম অনাচার প্রবেশ করেছিল। সেন রাজারা এদেশে বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং বেদপাঠ, হোম, নানা যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন তিথিতে পূজাপার্বণের প্রচলন হয়। বৃদ্ধ বয়সে সেন রাজারা যেখানে বাস করতেন, সেখানে বেদপাঠ, হোমাগ্নিধূম, হরিণকুলের নিঃশঙ্ক বিচরণে প্রাচীনকালের তপোবনের মত পরিবেশ সৃষ্টি হত। সেন রাজাদের অনুগ্রহপুষ্ট পণ্ডিতরা হিন্দুশাস্ত্র ব্যাখ্যা করে অনেক বই লিখেছিলেন। সমাজে সাধারণ লোকের মধ্যে শৈব ও বৈষ্ণব উভয় মতের উপাসকই ছিল।

আদিতে দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ অধিবাসী
ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি গ্রহণ
হিন্দু পূজা পার্বণের প্রচলন

রাজা বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন বাংলার সমাজে কৌলিন্যপ্রথা প্রবর্তনের জন্য

বিখ্যাত হয়ে আছেন। সমাজের মানুষ যাতে সদাচার পালন করে এবং শুদ্ধ জীবনযাপন করে কৌলিন্যপ্রথা প্রবর্তনের এইটিই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর ফলে সমাজে কৃত্রিম ভেদবুদ্ধি এবং কতকগুলি কু-প্রথার সৃষ্টি হয়। যেমন, কুলীন ভিন্ন অকুলীনে কন্যা সম্প্রদান অবাঞ্ছিত হওয়ায় বহু কুলীনকন্যা চিরকুমারী থাকতে বাধ্য হয়, অনেকক্ষেত্রে কুলীন বরের সঙ্গে নামমাত্র বিবাহের অনুষ্ঠান করে বিবাহিতা কন্যাকে পিত্রালয়েই রেখে দেওয়া হয় ইত্যাদি।

কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তন

খ. সাহিত্য: সেনরাজারা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এবং সাহিত্যচর্চায় উৎসাহী ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের রাজসভা সে যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও কবিদের দ্বারা অলংকৃত হয়েছিল। এঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণসর্বস্ব নামক শাস্ত্রগ্রন্থ রচয়িতা হলায়ুধ সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় যে পঞ্চকবি থাকতেন তাঁরা হলেন জয়দেব, উমাপতিধর, শরণ, গোবর্ধনাচার্য ও ধোয়ী। তৎকালীন রীতি অনুসারে এরা সংস্কৃত ভাষায় কবিতা লিখতেন। জয়দেবের প্রসিদ্ধ 'গীতগোবিন্দ' কাব্যগ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের লীলা সুললিত ভাষায় বর্ণিত। বেদ পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বল্লালসেন 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

বিদ্যাচর্চায় উৎসাহী
লক্ষ্মণসেনের সভায় পঞ্চকবি
জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'
বল্লালসেনের শাস্ত্র গ্রন্থ

সেন আমলে বাংলার জনজীবন ও জ্ঞানচিন্তাকর্মের ক্ষেত্রে যে শান্ত প্রবাহ ধীরগতিতে চলছিল, অকস্মাৎ মুসলিম আক্রমণের ফলে তাতে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের হল। সমাজ, ধর্ম, দেশ-শাসন—সকল ক্ষেত্রেই নতুন সমস্যা উপস্থিত হল, ভারতের একপ্রান্তস্থিত বাংলা উত্তর ভারতের রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতার মঞ্চ হয়ে উঠল।

গ. চালুক্য কালে সমাজ-জীবন

চালুক্য শিল্প ও সাহিত্য: চালুক্য রাজগণ কেবল দক্ষ শাসক ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন না, শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টিতেও তাঁদের অনুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। তাঁরা ছিলেন হিন্দু এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নামে উৎসর্গিত বহু সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তাঁদের নির্মিত মন্দিরের কতক নিরেট প্রস্তরস্তূপ খোদাই করে তৈরি, কতক বা ইটের।

শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক

চালুক্যদের মন্দিরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল বাদামি ও অইহোলের বিষ্ণুমন্দির এবং পট্টদাকলের শিবমন্দির। চালুক্যসাম্রাজ্যের প্রায় প্রত্যেক শহরই মন্দির দ্বারা শোভিত ছিল. চালুক্যদের মন্দির স্থাপত্য ও শিল্প কর্মের বৈশিষ্ট্য এই যে, মন্দিরের সকল অংশই কারুকার্য ও সূক্ষ্ম ভাস্কর্যে অলংকৃত। চালুক্যরাজাদের রাজ্যে অবস্থিত অজন্তা গুহার কিছু চিত্র চালুক্য আমলে অঙ্কিত হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন।

বাদামি ও অইহোলের বিষ্ণু-মন্দির
নিখুঁত সূক্ষ্ম কারুকার্য দ্বারা

চালুক্য নৃপতিগণ সাহিত্য সৃষ্টিতে গুণিজনের উৎসাহদাতা ছিলেন। রবিকীর্তি-রচিত অইহোল লিপি অইহোল বিষ্ণুমন্দিরে স্থাপিত হয়েছিল। এতে দ্বিতীয় পুলকেশীর বিজয় কাহিনীর উল্লেখ আছে। 'বিক্রমাংক চরিত' রচয়িতা **বিহ্লন** এবং 'মিতাক্ষরা'-র টীকাকার **বিজ্ঞানেশ্বর** চোলরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের পুত্র সোমেশ্বর (১১২৬-৩৮ খৃঃ) 'মানসোল্লাস' নামক গ্রন্থের লেখক।

'অইহোল লিপি ; বিহ্লনের বিক্রমাংকচরিত সংস্কৃত রচিত কাব্যগ্রন্থ ; সোমেশ্বর রচিত মানসোল্লাস ; বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরা' টীকা

'বিক্রমাংক চরিতে' কবি বিহ্লন বিক্রমাদিত্যের রাষ্ট্রকূট ও চোলরাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ ও তাঁর প্রণয়কাহিনী সবিস্তারে সংস্কৃত কাব্যে বর্ণনা করেছেন। বাণভট্টের হর্ষচরিতের মত বিক্রমাংকচরিত ঐতিহাসিক উপাদান বলে গৃহীত। বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য অংশে হিন্দু আইন বিধি 'যাজ্ঞবল্ক্য সূত্র' প্রচলিত যাজ্ঞবল্ক্য সূত্রের বিখ্যাত টীকা 'মিতাক্ষরা প্রণেতা বিজ্ঞানেশ্বর ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে কল্যাণে বাস করতেন। বর্তমানের হিন্দু-আইন রচনায় 'মিতাক্ষরা'র বিশেষ ভূমিকা আছে। বঙ্গদেশে হিন্দু আইনের ব্যাপারে রঘুনন্দনের 'দায়ভাগ' অনুসরণ করা হয়, ভারতের অন্যত্র বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরা' অনুসৃত।

চালুক্যরাজারা ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডে বৈদিক বিধি পালন করতেন। রাজা প্রথম পুলকেশী অশ্বমেধ, বাজপেয়, পুণ্ডরীক প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। চালুক্যদের স্থাপত্যকীর্তি এবং সেই আমলের সাহিত্য ও হিন্দু-আইনবিধি এখনও স্মরণীয় হয়ে আছে।

বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান

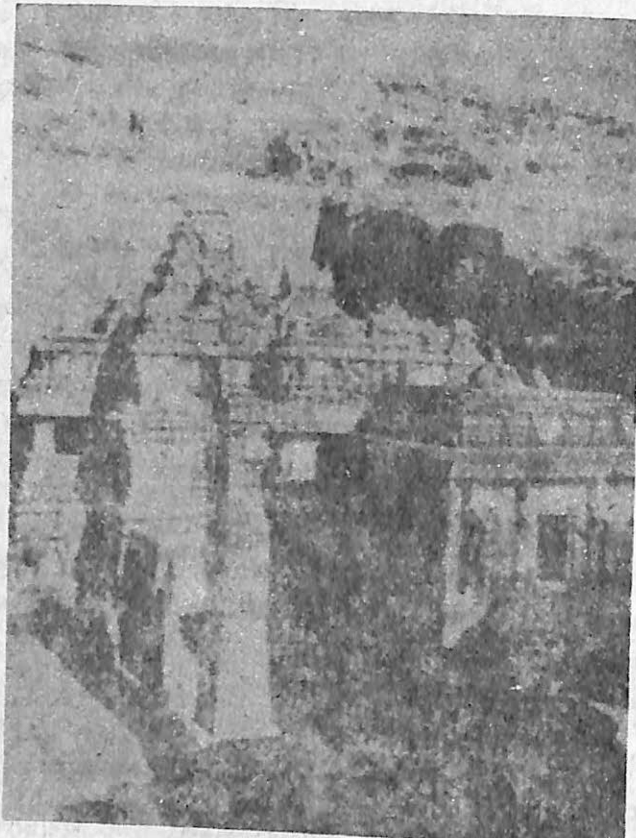
ঘ. রাষ্ট্রকূটদের কালে সমাজজীবন

রাষ্ট্রকূট নৃপতিগণ প্রায় দুই শতাব্দীকাল দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করেন। তাঁদের স্থাপত্যশিল্প ও ভারত ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর ভারতে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিজয়ীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সামরিক জয় অপেক্ষা শিল্প সাহিত্যের কীর্তি যে অধিকতর স্থায়িত্ব লাভ করে এই বংশের শিল্পরসিক রাজাদের কীর্তি তার প্রমাণ।

ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দির ঃ রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণ (আনুঃ ৭৫৬-৭৭৩ খৃঃ) কর্তৃক নির্মিত ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দির এক অতুলনীয় কীর্তি। বর্তমান ঔরঙ্গাবাদ থেকে ১৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ইলোরায় একটি সমগ্র পাহাড় কেটে অপূর্ব কারুকার্য সমন্বিত মন্দির তৈরি করা হয়েছে। প্রথমে একটি পাহাড়ের শীর্ষ ও পাশের পাথর কেটে ফেলে ২৭৬ ফুট দীর্ঘ, ১৫৪ ফুট চওড়া এবং ১০৭ ফুট উঁচু একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড বের করা হয়। তারপর সেই বিশাল প্রস্তরখণ্ডের ওপরের অংশ থেকে পাথর

ইলোরার পাহাড় কাটা মন্দির বিস্ময়কর শিল্পকর্ম পাথরের কথায় অপূর্ব নিদর্শন

কাটতে কাটতে মন্দিরের চূড়া, অলিন্দ, স্তম্ভ, অভ্যন্তর গৃহ নির্মিত হয়। ডঃ ভিনসেণ্ট



রাষ্ট্রকূটদের পাহাড়-কাটা (ইলোরার) কৈলাসনাথ মন্দির

স্মিথের কথায় ইহা মানব শ্রমসাধিত শিল্পকর্মের এক অপূর্ব নিদর্শন (One of the most marvellous works of human labour.*

তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র অমোঘবর্ষ যোদ্ধা, বিদ্যানুরাগী এবং কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং 'কবিরাজমার্গ,' শীর্ষক কাব্য সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

কাব্যসমালোচনা গ্রন্থ 'কবিরাজমার্গ'

* V. Smith. The Oxford Hist. of India, p. 216

ঙ. চন্দেল্লদের কালে সমাজ-জীবন

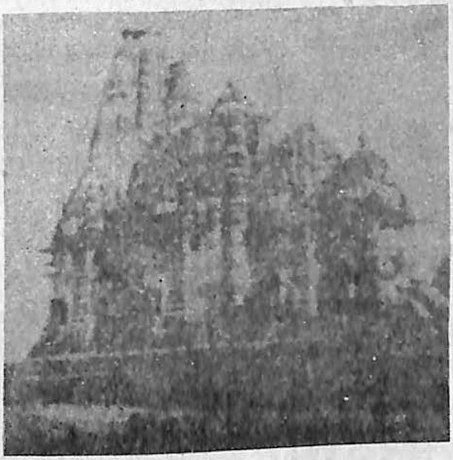
মধ্য ভারতের বুন্দেলখন্দের চন্দেল্লগণ সম্ভবত কনৌজের রাজা ভোজের অধীনে করদরাজ্য শাসন করতেন। এবং দশম শতাব্দীতে স্বাধীনতা লাভ করেন। এই বংশের বিখ্যাত নৃপতি ধিঙ্গ মুসলিম আক্রমণকারী সবুক্তিগীনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হিন্দুসংঘে যোগ দিয়েছিলেন। এই বংশের রাজা গন্দ পরবর্তীকালে সুলতান মামুদকে প্রতিহত করতে অন্যান্য হিন্দুরাজাদের সহযোগী হয়েছিলেন। চন্দেলরাজ কীর্তিবর্মন সাহিত্যানুরাগী ও লোকহিতকর কাজে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর রাজসভায় 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নামক যে, রূপক নাটক অভিনয় করিয়েছিলেন তার ভিতর দিয়ে বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যা অভিনব পন্থায় প্রদর্শিত হয় (১০৬৫ খৃঃ)।

কীরাতসাগর জলাধার

কীর্তিবর্মন বুন্দেলগন্দের অরণ্যে আচ্ছাদিত পাহাড়ময় উপত্যকা অঞ্চলে বাঁধ দিয়ে বিরাট জলাধার-হ্রদ নির্মাণ করেছিলেন। মহোবা-র নিকট **'কীরাত সাগর'** নামে এই মনোরম হ্রদ রাজা কীর্তিবর্মনের কীর্তির স্মারক হয়ে আছে।

চন্দেল্লদের অপর কীর্তি অপরূপ মন্দির স্থাপত্য। চন্দেল্লরাজ যশোবর্মন (৯৩০-৫৯ খৃঃ) কনৌজেশ্বর দেবপালকে পরাজিত করে তাঁর অতি সম্ভ্রমের বিষ্ণুমূর্তি নিজ রাজধানীর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর এই বিগ্রহকে কেন্দ্র করে বহু মন্দির নির্মিত হয়। এইসব মন্দিরের সৌন্দর্য ও শিল্পকলা হিন্দু স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। একটি মন্দিরের মূর্তিসংখ্যা ৮০০-র বেশি। ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় ৩০টি মন্দির আছে। এদের মধ্যে

কন্দারিয়া মহাদেব মন্দির উত্তম স্থাপত্য নিদর্শন



সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ খাজুরাহো-র **কন্দারিয়া মহাদেব মন্দির**। খাজুরাহো-র মন্দিরগুলির

বহির্ভাগ ও অভ্যন্তর নানা দেবদেবীর মূর্তি, লীলারত সুরসুন্দরী, জীবজন্তুর প্রতিকৃতি, মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম, নৃত্যগীত ইত্যাদির অজস্র প্রতিচ্ছবিতে শোভিত। একজন শিল্পী সমঝদারের মতে রূপের পূজারী শিল্পী এখানকার মন্দিররাজিতে জীবনরসের প্রবাহ ঢালিয়া স্বর্গমর্ত্য একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন, রাখিয়া গিয়াছেন অকৃপণভাবে শিল্প নৈপুণ্যের অপূর্ব নিদর্শন।*

মন্দিররাজিতে মানব জীবন-প্রবাহ প্রতিফলিত;

মন্দির শিল্পের ইতিহাসে চন্দেল্লদের অবদান খাজুরাহো-র মন্দিররাজি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে; এখানে মধ্যভারতীয় মন্দির শিল্পের শ্রেষ্ঠ পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। মন্দির স্থাপনের ভিতর দিয়ে চন্দেল্লরাজাদের ধর্মে উদারতার পরিচয় মেলে। বিষ্ণু, শিব, বরাহমন্দিরের সঙ্গে পার্শ্বনাথ ও আদিনাথ জৈনমন্দিরও বিদ্যমান, জৈনমন্দিরের গাত্রেও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি বিরাজমান দেখা যায়।

চন্দেল্লরাজাগণ ধর্মে উদার; হিন্দুমন্দিরের পাশে জৈনমন্দির এবং তার গাত্রে হিন্দুদেবদেবীর মূর্তি খোদিত

চ. গঙ্গ-যুগে সমাজ জীবন

স্থাপত্যশিল্প: চোড়গঙ্গ রাজাদের রাজত্বকালে ৮ম থেমে ১৩শ শতাব্দীর মধ্যে উড়িষ্যায় বহু মন্দির নির্মিত হয়। এর মধ্যে ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির এবং পুরীর বিষ্ণু-জগন্নাথ মন্দির ভুবনবিখ্যাত।

উড়িষ্যার অধিকাংশ মন্দিরের মত **লিঙ্গরাজ** মন্দিরে চারটি কক্ষ পর পর সংলগ্ন, এদের বলা হয় ভোগমন্দির, নাটমন্দির, জগমোহন ও দেউল। পুরীর জগন্নাথ মন্দির ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ দেবায়তন। নির্মাণ-শৈলীতে উড়িষ্যার মন্দিরগুলি বিশেষত্ব আছে। মন্দিরের বহিরঙ্গে ভাস্কর্যের প্রচুর অলংকরণ কিন্তু অভ্যন্তরভাগ অনলংকৃত। মন্দিরে স্তম্ভ নেই, পাশের দেওয়ালের ওপর খিলান ছাতের আচ্ছাদন, মূল মন্দিরের গড়ন দীর্ঘাকৃতি ও সুদৃশ্য, শীর্ষে গোলাকার আমলক, তার ওপর কলস ও শিখর।

ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির ও পুরীর জগন্নাথ মন্দির

'রেথ' ও 'ভদ্র' দেউল;

কোণারক-এর বিখ্যাত সূর্যমন্দির গঙ্গরাজ প্রথম নরসিংহের অতুলনীয় কীর্তি। উঁচু ভিতের ওপর মূল মন্দির ও জগমোহন, সম্মুখের দুইটি কক্ষ ভোগমন্দির ও নাটমন্দির লিঙ্গরাজ মন্দিরের মত পরস্পর সংলগ্ন নয়। পৃথক পৃথক ভাবে সামনের দিকে স্থাপিত। কোণারক মন্দিরের বিশেষত্ব হল। ইহা সূর্যদেবের রথের আকারে পরিকল্পিত। সপ্তাশ্ববাহিত রথে সূর্যদেব আকাশ পরিক্রমা করছেন—এইভাবে শিল্পী মন্দির গঠনের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

মন্দির সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যদেবের রথের আকারে পরিকল্পিত

---

* দেবলা মিত্র ভারতকোষ ৩য় খণ্ড, পৃ: ২

মন্দিরের সমস্ত গাত্র কারুকার্যখচিত। কোণারকের পাথর কেটে মূর্তিনির্মাণ (তক্ষণ শিল্প) ও স্থাপত্যের তুলনা পাওয়া ভার। নির্মলকুমার বসু বলেন, সূর্যদেব জীবনের দেবতা। সমগ্র মন্দির নানাবিধ জীবনপ্রবাহের চিত্রে যেন সচল হইয়া উঠিয়াছে। জীবজন্তুর নানা বিচিত্র লীলা। মানবমনের বহুবিধ (বিশেষতঃ রাজসিক) রসপ্রকাশ, সংগীত, নৃত্য সমস্ত মিলিয়া যেন ষোড়শদল পদ্মের মত মন্দির অলংকারে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

তক্ষণশিল্প ও স্থাপত্য অপূর্ব

ছ. পল্লবদের সমাজ-জীবন

১. **পল্লব শিল্প ঃ** পল্লবদের সময়ে দক্ষিণ ভারতে এক নতুন ধরনের স্থাপত্যরীতি প্রসার লাভ করে। পাহাড় খোদাই করে রথ মন্দির বড় বড় জীবজন্তু প্রভৃতি নির্মাণে পল্লবদের প্রতিভার পরিচয় মেলে। মহাবলীপুরমে এক একটি বিরাট পাথর কেটে 'রথ মন্দির' নির্মিত হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত পাথরের খোদাই গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণ দৃশ্যটি শিল্পসুষমার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

পাহাড়-খোদাই রথ মন্দির

নরসিংহবর্মনের রাজত্বকালে হিউয়েন-সাঙ পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চীনগরে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, ৫০টি জৈন মন্দির ও বহু সুশ্রী অট্টালিকায় রাজধানী শোভিত ছিল। এসব থেকে সে আমলের শিল্পসংস্কৃতির পরিচয় মেয়ে। ডঃ ত্রিপাঠীর মতে পল্লবদের সৌধরাজি নিঃসন্দেহে দক্ষিণ ভারতে সর্বোত্তম অট্টালিকাসমূহের মধ্যে গণ্য হয়।*

কাঞ্চীনগরে বহু সুশ্রী অট্টালিকা ও মন্দির

২. **পল্লব সাহিত্য ঃ** পল্লবরাজাগণ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। অল্প কিছু বাদে সমস্ত রাজকীয় অনুশাসন সংস্কৃতে রচিত হত। পল্লবরাজ্যে অবস্থিত ব্রাহ্মণদের বেদপাঠ ও অধ্যাপনায় উৎসাহ দেওয়া হত। রাজধানী কাঞ্চী ছিল বিদ্যাচর্চার প্রধান পীঠস্থান। কিরাতার্জুনীয় রচয়িতা কবি **ভারবি,** কাব্যসমালোচক **দণ্ডী**। দিগ্‌নাগ, ময়ুরশর্মা প্রভৃতি গুণীব্যক্তি পল্লবরাজসভা অলংকৃত করতেন। রাজা মহেন্দ্রবর্মা নিজে 'মত্তবিলাস প্রহসন' নামক হাস্যরসাত্মক গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন।

কাঞ্চী বিদ্যাচর্চাকে প্রধান পীঠস্থান; ভারবি, দণ্ডী

৩. **ধর্ম ঃ** পল্লবদের সময়ে দক্ষিণ ভারতে ভক্তিধর্মের বিকাশ ঘটেছিল। শিবের ভক্তগণ **নায়নার** এবং বিষ্ণুর উপাসকগণ **আলবার** নামে পরিচিত ছিলেন। এঁরা শাস্ত্রবিদ ছিলেন না, সরল-হৃদয় ভক্ত। আরাধ্য দেবতার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করে সহজ কবিতায় ও গানে হাজার হাজার মানুষের মনে প্রেম-ভক্তির জোয়ার এনেছিলেন। কবিতাগুলির সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

ভক্তিধর্ম ভিত্তিক সাহিত্যের বিকাশ

---

* Their edifices are doubtless among the noblest monuments in South India—R. N. Tripathi, Hist of Ancient India, p. 455

ধর্মীয় দার্শনিক ঃ ভাবপ্রবণ শৈব ও বৈষ্ণব ভক্তগণ (নায়নার ও আলবার) ছাড়াও কয়েকজন ধর্মীয়-দর্শনের প্রবক্তা সব ভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কুমারিল ভট্ট, শংকরাচার্য, রামানুজ, বসব ও মাধবাচার্য।

জ. চোলদের কালে সমাজ-জীবন

১. চোলদের স্থাপত্যশিল্প ঃ শক্তিশালী চোলসম্রাটগণ দেশে বিদেশে বিজয় অভিযান পরিচালনা করেছেন। ব্যবসাবাণিজ্যের ফলে দেশে প্রচুর ধনাগম ঘটেছে, রুচিসম্পন্ন নৃপতিগণ বিশাল সৌধ নগর ও মন্দির নির্মাণ করে রাজকীয় ঐশ্বর্যের পরিচয় দিয়েছেন। মহান রাজরাজাচোল প্রতিষ্ঠিত **তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বর শিবমন্দির** চোলস্থাপত্যের সর্বোত্তম নিদর্শন। পিরামিডের আকারে ১৩টি স্তরে ধাপে ধাপে ১৯০ ফুট উঁচুতে উঠেছে এর শিখর ; শীর্ষে রয়েছে ২৫ ফুট উচ্চ প্রায় ৮০ টন ওজনের একখণ্ড বিশাল প্রস্তর। এর বহিরঙ্গে চতুর্দিকে অজস্র ভাস্কর্যের অলংকরণ।

বিখ্যাত রাজরাজেশ্বর মন্দির

কথিত আছে, এই প্রকাণ্ড শিলা মন্দির শীর্ষে তোলার জন্য চার মাইল দীর্ঘ ঈষৎ ঢালযুক্ত এক বিশেষ পথ নির্মাণ করা হয়েছিল। রাজরাজাচোলের যোগ্যপুত্র প্রথম রাজেন্দ্রচোল গঙ্গৈকোণ্ড-চোলপুরম্ নামে নতুন রাজধানী (ত্রিচিনোপলী জেলায়) নির্মাণ করে একে বিশাল মন্দিরে শোভিত করেছিলেন। ডঃ স্মিথ বলেন, এই মন্দিরগুলির 'ডিজাইন নয়নসুখকর' (Their design pleases the eye....) চোলদের বিরাট শিল্পকর্মের নিখুঁত রূপায়ণ দেখে শিল্পসমালোচক ফার্গুসন বলেছেন, চোলশিল্পীরা পরিকল্পনা করেছিলেন দৈত্যের মত, কাজ সম্পন্ন করেছেন মণিকারের মত।

ডিজাইন নয়ন সুখকর

চোলগণ ঢালাইশিল্পের উৎসাহ দিয়েছিলেন। ঐ সময় ধাতুর যে সকল পূর্ণাবয়ব দেবমূর্তি এবং নৃপতিদের প্রতিকৃতি নির্মিত হয়েছিল তা সৌষ্ঠবে ও বলিষ্ঠতায় অপূর্ব।*

সৌষ্ঠবে ও বলিষ্ঠতায় অপূর্ব

চোলরাজারা বহু নগর নির্মাণ করে মন্দির ও সৌধে সেগুলি মনোরম করে তুলেছিলেন। এইসব মন্দির কেবল ধর্মক্ষেত্র নয় বিদ্যা ও সংস্কৃতির আলয় বলেও জনপ্রিয় হয়। মন্দিরগুলি বেদ পুরাণ ব্যাকরণ মহাকাব্য ধর্মশাস্ত্র জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতির পাঠ ও চর্চার স্থানরূপে গণ্য হয়। উৎসবের দিনে এখানে নাটক অভিনয় ও নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হত। এইরূপ সংস্কৃতি চর্চা ও অনুশীলনের ভিতর দিয়ে মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসী ব্যবস্থার প্রবর্তন। আদিতে মন্দিরের দেবদাসীরা ছিলেন শুদ্ধা ভক্তিমতী নৃত্যগীত পটিয়সী পূজারিণী। পরবর্তীকালে দেবদাসী প্রথার নানা অনাচার ঘটে।

দেবদাসী ব্যবস্থার প্রবর্তন

* The Cholas encouraged plastic art and the metal and stone images cast in their time are exquisitely executed and display a wonderful Vigour dignity and grace. R. K. Tripathi. Hist of Ancient India. p 479

(খ) বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ (Commercial and cultural contacts with the outside world) :

তিনদিকে স্থল আর একদিকে সাগর দিয়ে ঘেরা ভারতবর্ষ একরকম বাইরের সংস্পর্শে থেকে আড়াল করা। কিন্তু ভারত প্রাচীনতম কাল থেকে আজ পর্যন্ত নিজেকে কখনই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারেনি। স্থলপথে ও জলপথে যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়েছিল, অভিযাত্রীদের উদ্যমে পাহাড় পর্বত ভেদ করে আসার গিরিপথ আবিষ্কৃত হয়েছিল, সাগরজলে ডিঙা ভাসিয়ে শুরু বাণিজ্যপণ্য নয়, উচ্চমানের অমূল্য সামগ্রীও গিয়েছিল সাগরপারের দেশে। কিভাবে কোথায় গিয়েছিল ?

সিংহল : ভারতের দক্ষিণ স্থলপ্রান্ত থেকে অল্প দূরে সাগরের মধ্যে পদ্মকোরকের আকারের যে দ্বীপ বিরাজিত ভারতের মানচিত্রে তাকে না দেখলে যেন চিত্রটি অসম্পূর্ণ মনে হয়। সিংহলের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতীয় মনের মিল আছে, তবু সামুদ্রিক ব্যবধানের জন্য সিংহল পৃথক দেশ। রামায়ণ মহাকাব্যের কল্যাণে লঙ্কার কথা ভারতবাসীর কাছে আনন্দবেদনার কাহিনীতে নিবিড়ভাবে জড়িত। মহাকাব্য বাদ দিলেও ইতিহাস ভারতের সঙ্গে সিংহলের আত্মীয়তা সানন্দে ঘোষণা করছে। সিংহলী ইতিহাস **দীপবংশ** অনুসারে খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দ নাগাদ বিজয় সিংহ নামে ভারতের এক রাজপুত্র ৭০০ অনুচরসহ সিংহলে গিয়ে রাজ্যস্থাপন করে। এই হল ভারত-সিংহল যোগাযোগের সূত্র।

পৌরাণিক যুগে

অশোকের কালে ও পরে

মৌর্যসম্রাট অশোকের সময় মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা বোধিদ্রুম-শাখাসহ সিংহলে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধের ললিতবাণী প্রচার করেন, রাজা দেব্যনামপিয় তিষ্য তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করে ভগবান বুদ্ধের ধর্মমত গ্রহণ করেন। আজ অবধি সিংহলের প্রধান ধর্মমত বৌদ্ধ। বুদ্ধের অস্থি (দন্ত) সংরক্ষিত **দন্তমন্দির** সিংহলীদের কাছে পরম পবিত্র স্থান। শুধু ধর্ম নয়, সিংহলের ভাষা সাহিত্য শিল্প স্থাপত্যরীতি ইত্যাদিতেও ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধ্যানধারণার প্রভাবসুস্পষ্ট।

ব্রহ্মদেশ : ভারতের পূর্বে বঙ্গোপসাগরের পূর্ব-উপকূল ঘেঁষে বড় নদী ও পাহাড়ময় দীর্ঘ ভূখণ্ড ব্রহ্মদেশ। ভারতের পূর্ব সীমান্ত থেকে অরণ্য-পাহাড় ডিঙিয়ে স্থলপথে ব্রহ্মদেশে যাওয়া যায়। [এই পথেই নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারত সীমান্তে কোহিমা পর্যন্ত এসেছিল।] কিন্তু এ পাহাড়ী নদী বনজঙ্গলে ভরা পথ বড় দুর্গম।

পিউসের ব্রহ্ম অভিযান

অতি প্রাচীনকালে তবু স্থলপথেই ভারত থেকে দুঃসাহসী অভিযাত্রী মানুষ ব্রহ্মদেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল। হিন্দু ভাবাপন্ন পিউস নামে এক উপজাতি ব্রহ্মের শ্রীক্ষেত্র (প্রাচীন প্রোম) রাজ্য স্থাপন করে এবং নবম শতাব্দী পর্যন্ত তারা এখানে রাজত্ব করে। শ্রীক্ষেত্রের প্রাচীন স্থান খননের ফলে ছোট বড় বহু বুদ্ধমূর্তি, সংস্কৃত, পালি ও পিউস ভাষায় লেখা

শিলালিপি পাওয়া গেছে। এসবের ভেতর দিয়ে ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের পরিচয় মেলে।

ব্রহ্মের উপকথার ভারত

ব্রহ্মদেশের প্রবাদ ও উপকথায় ভারতের রাজপরিবার ও বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সম্পর্কের অনেক কাহিনী আছে। ব্রহ্মদেশের লোকেদের কাছে ভারতের সঙ্গে ধর্মীয় ও আত্মীয়তার সম্পর্ক গৌরবের বিষয় বলে গণ্য হত। ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত, সমাজে বৌদ্ধভিক্ষুদের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। ব্রহ্মের সর্ববৃহৎ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ মন্দির সোয়ে ডাগন বা স্বর্ণ প্যাগোডা (৩৬৮ ফুট উঁচু), বুদ্ধের মূর্তি নানা অলংকরণে সুসজ্জিত। অন্যান্য দেশের বৌদ্ধদের মত বর্মীরা ভারতবর্ষকে পুণ্য তীর্থস্থান মনে করে।

ইন্দোচীনের পরিচয়

ইন্দোচীন ঃ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে টংকিং, আনাম, কোচিন-চীন, কম্বোজ ও লাওস—একত্রে ইন্দোচীন নামে পরিচিত। আধুনিককালে নামের কিছু পরিবর্তন হয়েছে। কিছু অংশ একত্রিত হয়ে একটি দেশ হয়েছে। যেমন বর্তমানের উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম আগের দিনের আনাম ও চম্পা। কম্বোজের নতুন নাম কাম্পুচিয়া, লাওস আগের নামেই বহাল আছে।

অতি প্রাচীনকালে

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে সঙ্গে ইন্দোচীনের লোকেদের যোগাযোগ ছিল। ওদেশের লোককথায় আছে—খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে কৌণ্ডিন্য নামে এক ভারতীয় ব্রাহ্মণ এসে মেকং নদীর কাছাকাছি অঞ্চলে এক রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল স্থানীয় নাগ বংশের সোমা নামে এক রাজকুমারীর সঙ্গে। সোমা পরাজিত হয়ে কৌণ্ডিন্যকে বিবাহ করেন। রাজ্যে হিন্দু সভ্যতার পত্তন হয়। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। ভারতের বণিকেরা এদেশে বাণিজ্য করতে আসত, নিয়ে যেত প্রচুর সোনা। সেই থেকে 'সোনা অর্জনের' দেশ বলে ইন্দোচীনের নামই হয়ে গেল **সুবর্ণভূমি।** বাণিজ্যের মাধ্যমে যোগাযোগ, আর সেই যোগাযোগেই ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তার। ইন্দোচীনে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, ভারতীয় পদ্ধতিতে মঠ মন্দির প্রভৃতি নির্মিত হয়।রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী লোকের সাহিত্য ও চিন্তাধারায় প্রভাব ফেলেছিল।

সুবর্ণভূমি নামের কারণ

সাহিত্যে স্থাপত্য ও ধর্মে প্রভাব

ব্রহ্মদেশ, শ্যাম (থাইল্যাণ্ড), কম্বোজের লোকেরা এখনও ধর্মে বৌদ্ধ। পালি তাদের ধর্মগ্রন্থের ভাষা। স্থানের নাম ও মানুষের মনে সংস্কৃত শব্দ অনেক, তবে সেগুলো উচ্চারণে এমন পরিবর্তিত হয়েছে যে চেনাই দায়। যেমন সোয়েকর্ন (সুকর্ণ) নরোদম সিহানুক (নরোত্তম সিংহানুক), বুমিবল (ভূমিবল) ইত্যাদি। কম্বোডিয়া, ভিয়েৎনাম প্রভৃতির রূপকথা হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের গল্পের ছায়া অবলম্বনে লেখা, ভারতের অনেক নগর বন্দরের কথাও তাতে স্থান পেয়েছে। কাম্বোডিয়া রাজ্যের প্রাচীন রাজধানীর নাম ছিল নগরধাম।

স্থানীয় ভাষায় অপভ্রংশ হয়ে **আংকোর থোম** রূপ পায়। আংকোর থোমের কাছে বিরাট বিষ্ণু মন্দির **আংকোর বট**-এর পাথরের দেওয়ালে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী খোদাইকরা;২১৩ ফুট মন্দির দক্ষিণ ভারতের দীর্ঘচূড় মন্দিরের মত দেখায়।

সুমাত্রা : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত সুমাত্রা ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র এবং বৌদ্ধশাস্ত্র ও ধর্মচর্চার পীঠস্থান ছিল! সুমাত্রার শ্রীবিজয় রাজ্যের বাণিজ্য জাহাজ সুমাত্রা ও ভারতের মধ্যে যাতায়াত করত। শৈলেন্দ্র বংশের রাজারা শ্রীবিজয় রাজ্য জয় করে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শৈলেন্দ্র রাজারা ভারতের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজাদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখতেন। শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রদেব পালরাজা দেবপালের কাছে দূত পাঠিয়ে নালন্দা বিহারের জন্য পাঁচখানি গ্রাম দান নিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক সম্পর্ক

জাভা : শৈলেন্দ্র সম্রাটগণ প্রভূত ধনশালী ছিলেন এবং এমন ভাস্কর্য ও স্থাপত্য সৃষ্টি করেছিলেন যা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলে গণ্য হত। এই বিখ্যাত ভাস্কর্য-স্থাপত্য হল জাভার **বরবুদুর বৌদ্ধস্তূপ**। ১১৮ ফুট উঁচু স্তূপ ঘিরে বুদ্ধের মূর্তি দিয়ে সুশোভিত মন্দির। তার কারুকার্য এমন নিখুঁত যে ভারতে কেন, বিশ্বের কোথাও তার তুলনা মেলে না। স্থাপত্য বিশারদদের অভিমত, বাংলার পাহাড়পুর স্তূপ-মন্দিরের পরিকল্পনায় এটি নির্মিত এবং এর কাজ সম্পূর্ণ হতে ৭০০ বছর লেগেছিল।

স্থাপত্যে ভারতীয় প্রভাব

মধ্য এশিয়া : হিমালয়ের ওপারের দেশের কথা মনে হলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে তুষারঢাকা প্রাচীর আর প্রচণ্ড শীতের রাজ্য। তাই বলে হিমালয় কিন্তু নিরেট পাষাণ প্রাচীর নয়, উপত্যকা আছে, গিরিখাত আছে। সংকীর্ণ ও দুর্গম হলেও তার ভিতর দিয়ে সাহসী মানুষ আর পাখিদের যাতায়াত। শীতে আমরা কলকাতার চিড়িয়াখানায় সাইবেরিয়ার সারসের দেখা পাই। যুগ যুগ ধরে এরা এদেশে শীত কাটাতে আসছে। কালিদাসের কালেও হিমালয়ের 'ক্রৌঞ্চরন্ধ্র' দিয়ে পাখিদের চলাচলের কথা জানা ছিল। হিমালয়ের ওপারে এখন শুকনো মরুভূমি তাকলা মকান পথিকের কাছে ভীতিকর। কিন্তু চিরদিন এমন ছিল না। হিমালয়ের ওপার দিয়ে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের পথ প্রসারিত হয়েছিল তক্ষশিলা, কাবুল হয়ে। চীনের রেশমবস্ত্র বাণিজ্যপণ্যে প্রাধান্য পেত, তাই পথের নাম হয়েছিল **প্রাচীন রেশম পথ** (Old Silk Route)। বর্তমানে যে অঞ্চল রুশ তুর্কীস্থান ও চীন তুর্কীস্থান, তার আগের নাম সেরিন্দিয়া। এখানে এককালে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে আগত লোকেদের মাধ্যমে ভারত ও চীনের সভ্যতার মিলন ঘটেছিল। এখানকার লোকেরা ভারতীয় বর্ণমালা, ভারতের ধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করে ভারতীয় ব'নে গিয়েছিল।

চিরন্তন সংযোগ

রেশম পথ

লুপ্ত সংস্কৃতি-কেন্দ্র : মধ্য এশিয়ায় এখন যেখানে তকলা-মকান মরুভূমি এককালে জলবায়ুর কারণে সেখানে সমৃদ্ধ সভ্যতাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার অরেল স্টাইন (Sir Aurel Stein) তকলা-মকান মরুভূমির বালি খুঁড়ে বৌদ্ধস্তূপ, মঠ, বৌদ্ধমূর্তি, হিন্দু দেবতার মূর্তি ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা পুঁথি আবিষ্কার করেছেন। শুষ্ক আবহাওয়ায় প্রাচীন দ্রব্যগুলি বিনষ্ট হয়নি। এইসব প্রাচীন বস্তু নিদর্শন থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে এককালে হিমালয়ের ওপারের অঞ্চল দিয়ে চীন, ভারত ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। মধ্য এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় বৌদ্ধশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল **গোমতী বিহার।** অনেক চীনা তীর্থযাত্রী ভারতে আসার পরিবর্তে গোমতী বিহারেই শিক্ষালাভ করতেন। এখানে কিছু সংখ্যক ভারতীয় পণ্ডিত বাস করতেন। এখানে যে স্তূপ নির্মিত হয়েছিল তার সঙ্গে ভারতীয় বৌদ্ধস্তূপের গঠনগত সাদৃশ্য ছিল।

প্রাচীন সাংস্কৃতিক সংযোগের প্রমাণ

তিব্বত : হিমালয়ের ওপারে পৃথিবীর উচ্চতম মালভূমি তিব্বত প্রাচীনকালে **বোদ** নামে পরিচিত ছিল। ভারতে তিব্বতকে বলা হত ভোট দেশ। তিব্বতের অতি-প্রাচীন কাহিনী বিশেষ জানা যায় না। প্রবাদ এই যে, একজন ভারতীয় সর্বপ্রথম তিব্বতে রাজ্য স্থাপন করে শাসনব্যবস্থা চালু করেছিলেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে স্রং-সন গাম্‌পো বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং ভারতের লিপির অনুরূপ লিপি দেশে প্রবর্তন করেন। তার আগে তিব্বতীদের লিখিত ভাষা ছিল না।

বৌদ্ধধর্মের সংযোগের ফলে ভারতের সঙ্গে তিব্বতের ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এদেশের বিখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত রাজার আমন্ত্রণে তিব্বতে গিয়ে ধর্মের সংস্কার করেছিলেন। রাজধানী লাসায় ভারতীয় বৌদ্ধ-বিহারের অনুকরণে একটি বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। শান্তি রক্ষিত হন তার অধ্যক্ষ। ১০৩৮ খৃস্টাব্দে অতীশ দীপংকর তিব্বতে আমন্ত্রিত হন এবং অপরিমেয় সমাদর লাভ করেন।

ধর্মীয় সংযোগ

চীন : প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে কয়েকটি যুগের ঐতিহাসিক উপাদান আমরা পাই চীন বৌদ্ধশ্রমণদের ভ্রমণ কাহিনীতে। এঁরা হলেন ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ, ইৎসিং প্রভৃতি জ্ঞানী ধর্মনিষ্ঠ পর্যটক। এঁরা সবাই এসেছিলেন গৌতমবুদ্ধের জন্মস্থান ও বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দর্শন করতে। শুধু দর্শন করা নয়, ভারতীয় পণ্ডিতদের পদপ্রান্তে বসে ধর্মের ব্যাখ্যা শুনতে ও ধর্মগ্রন্থ এবং বৌদ্ধধর্মসংক্রান্ত পবিত্র স্মারক সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে।

পরিব্রাজক

প্রাচীনকাল থেকেই চীনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের যোগাযোগ ছিল। বাণিজ্যমাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদানও ঘটে থাকে। চীনাদের বিবরণ থেকে জানা যায়, ৬৫ খৃস্টাব্দে চীনের হ্যান মিংতি স্বপ্নে এক সোনালি মানুষ দেখে সম্রাট তাঁর

সভাসদদের কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তাঁরা বলেন ঐ স্বর্ণবর্ণ পুরুষ বুদ্ধদেব। এরপর সম্রাট ভারতে দূত পাঠিয়ে দুইজন বৌদ্ধপণ্ডিত চীনদেশে নিয়ে যান। এঁরা হলেন ধর্মরত্ন ও কাশ্যপ মাতঙ্গ। এই বৌদ্ধভিক্ষুগণ বহু ধর্মগ্রন্থ এবং বুদ্ধজীবনের স্মারকনিদর্শন একটি সাদা অশ্বের পিঠে চাপিয়ে চীনদেশে নিয়ে যান। বৌদ্ধশ্রমণদের চীনদেশে প্রথম পদার্পণের স্মৃতিস্বরূপ ভিক্ষুদের জন্য রাজধানীতে এক বিহার নির্মাণ করে তার নাম দেওয়া হয় **শ্বেত-অশ্ব-বিহার**। ধর্মরত্ন ও কাশ্যপ মাতঙ্গ সারাজীবন চীনদেশে বাস করে ধর্মপ্রচার ও ধর্মগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন।

ধর্মের প্রভাব

শুধু ধর্মের বাণীই নয়, ভারতীয় চিত্রকলারও অনুকরণ করা হয়েছিল চীনদেশে। চীনের পশ্চিম সীমান্তে তুন হুয়াং (Tun Huang) শৈলমালায় **সহস্রবুদ্ধের গুহা** নামে বৌদ্ধদের গুহামন্দির নির্মিত হয়েছিল। অজন্তাগুহার অনুরূপ এই গুহামন্দিরগুলি বুদ্ধের জীবনবিষয়ক চিত্রে শোভিত হয়েছিল। স্যার অরেল স্টাইন তুন হুয়াং পাহাড়ে প্রায় ৫০০ গুহা আবিষ্কার করেন। ভারতের ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব চীনদেশ থেকে কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে প্রসারলাভ করেছিল।

চিত্রে ও শিল্পে

বহির্ভারতে সংস্পর্শের ফল :

ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশগুলির ওপর ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির কিরূপ প্রভাব পড়েছিল বলতে গেলে একথাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ ভারতের চোলদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা ছাড়া ভারত কখনই অন্য দেশ জয় করতে যায়নি। কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায়, ভারতের কোন কোন রাজপুত্র বিদেশে গিয়ে অঞ্চল অধিকার করে বসবাস করতে করতে সে-দেশের বাসিন্দাই হয়ে গিয়েছিলেন। এদের মাধ্যমে এবং বণিক ও ভ্রমণকারীদের যোগাযোগের ফলে ঐসব দেশে ভারতের ধর্ম, সাহিত্য, ভাষা, শিল্পকলা, স্থাপত্যরীতি প্রসারিত হয় এবং তথাকার শিল্প ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়ক হয়। ফরাসী ও ইংরেজ ঐতিহাসিক ভারতের জ্ঞান ও ধর্মপ্রসারী ভূমিকায় ভূয়সী প্রশংসা করে ভারতকে সভ্যতার বাণীবহ (Messenger of Culture) দূত বলে অভিহিত করেছেন।

বৃহত্তর ভারত : ভারত সীমানার বাইরে ভারতীয় উপনিবেশ ও সভ্যতার বিস্তারের দরুন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অঞ্চলসমূহে ভারতীয় ভাবধারার এমন প্রসার ঘটে যে, ঐ অঞ্চল বৃহত্তর ভারত নামে পরিচিত হয়। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে—ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বিভিন্ন জাতির লোকেদের জীবন গভীরভাবে প্রভাবিত করে অনেককে আদিম বর্বরতার পর্যায় থেকে উন্নত পর্যায়ে আসতে সাহায্য করেছিল। এইভাবে ভারত তার প্রকৃতি-নির্ধারিত ভৌগোলিক সীমার বাইরে, পাহাড়সাগর ডিঙিয়ে, এশিয়ার এক বিস্তৃত অংশে তার সংস্কৃতির প্রভাব বিকিরণ করেছিল।

প্রাচীন গ্রীস ইউরোপের ওপর যতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, এশিয়ায় সভ্যতার আলো ছড়িয়ে দিতে ভারতের কৃতিত্ব তার চেয়ে বেশি।

ঐতিহাসিকের কথায়—'In short, the people were lifted to a higher plane of civilization. A Greater India was established by a gentle fusion of races, which richly endowed the original inhabitants with the spiritual heritage of India.'

এক কথায়, ভারতের' 'আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার' লাভ করে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলির অধিবাসীরা 'সমৃদ্ধ' হয়েছিল।

———

চিরন্তন ভারত

(মধ্যযুগ)

[১৭০৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত]

১.
মধ্যযুগের ভারত

(১) **মধ্যযুগ নামকরণ কেন?ঃ** আধুনিক যুগ ও প্রাচীনযুগের মধ্যবর্তী যুগকে বলা হয় মধ্যযুগ। ভারতে প্রাচীনযুগের শেষে মুসলিমদের আগমন ঘটে এবং এর ফলে শাসন, সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি—সকল ক্ষেত্রেই নানা পরিবর্তন দেখা দেয়; কিছু অঞ্চলের মুসলিম-প্রাধান্য স্থাপিত হয়। এই কারণে কতক ঐতিহাসিক এই যুগকে মুসলিম যুগ আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু এই সংজ্ঞা সঠিক বলা যায় না। কারণ সমগ্র ভারতবর্ষে একই সঙ্গে কখনই মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভারতীয় সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি কখনই আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে বিদেশাগত রীতিনীতি ও জীবনধারার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়নি। দুইটি সভ্যতার মিলনে কোনটিই লুপ্ত হয়নি। বরং পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করায় উভয়ের মধ্যে নতুন ভাবধারার সঞ্চার হয়েছে।

প্রশ্ন হল, কখন থেকে মধ্যযুগের শুরু। স্থানের দূরত্ব মাপার জন্য যেমন মাইলপোস্ট থাকে, কালমাপক এমন কোন চিহ্ন নেই। এরূপ ক্ষেত্রে এমন কোন বিশেষ ঘটনাকে নির্দেশ করা হয় যার পর থেকে নতুন নতুন ঘটনা-পরম্পরা সমাজে এবং মানুষের জীবন ও চিন্তায় ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই বিচারে ভারত-ইতিহাসে কোন্ সময়কালকে 'মধ্যযুগ' বলা হবে? ঐতিহাসিকগণ খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দীকে মধ্যযুগের সূচনা এবং অষ্টাদশ শতাব্দীকে মধ্যযুগের শেষকাল বলে নির্ধারণ করেছেন। কারণ অষ্টম শতাব্দীতে ভারতের সমাজে এমন কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে যার প্রভাব দেখা দেয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, সামাজিক নিয়ম-কানুনে! ধর্ম, ভাষা, শিল্পে—এক কথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে। কাজেই আমরা বুঝতে পারি, ভারত ইতিহাসে এক নতুন পর্যায় শুরু হয়েছে। একথা বলা যায়, এই পরিবর্তনের সূত্রপাত মোটামুটি অষ্টম শতাব্দী থেকে। তেমনি অষ্টাদশ শতকে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ও ইংরেজদের আগমন দেশে বহু পরিবর্তন নিয়ে আসে। কাজেই অষ্টাদশ শতাব্দীকে আমরা মধ্যযুগের অন্তকাল বলে ধরে নিই। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ভারতের মধ্যযুগকে দুইভাগে ভাগ করে দেখার পক্ষপাতী—অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতক এর প্রথম অংশ, শেষ অংশ ত্রয়োদশ শতক থেকে বর্তমান যুগের সূচনা পর্যন্ত।

পরিবর্তনঃ আমরা এখন আধুনিককালে বাস করছি। আমাদের কাছে প্রাচীন যুগ অপেক্ষা মধ্যযুগ কাছেকার সময় বলে মনে হয়। তার কারণ মধ্যযুগে যেসব ঘটনা ঘটেছে তার সঙ্গে আমরা বেশি পরিচিত এবং তার ফল আমরা ভোগ করে চলেছি। আমরা এখন যে-ভাষা ব্যবহার করি, তার বিকাশ ঘটেছে মধ্যযুগে, আমরা যে-খাদ্য ও পরিচ্ছদ ব্যবহার করি, তা জনপ্রিয় হয়েছিল মধ্যযুগে, আমাদের অনেক ধর্ম-বিশ্বাসের মূল মধ্যযুগের ধর্মীয় আন্দোলন ও

চিন্তা ভাবনার মধ্যে নিহিত। আমাদের সংগীত ও শিল্পকলার অনেক নতুন আঙ্গিকের উদ্ভব বা বিকাশ ঘটেছে মধ্যযুগে। সময়ের দিক থেকে মধ্যযুগ আমাদের কাছে নিকটতর, এযুগের অনেক ঐতিহাসিক উপাদান বিদ্যমান যার ফলে এ যুগের একটা সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।

(২) সুলতানী আমলের ঐতিহাসিক উপাদান (Types of sources : The Sultanate period) : মহম্মদ ঘোরীর দিল্লী বিজয় থেকে প্রথম পানিপথ যুদ্ধ পর্যন্ত সময় (১১৯২—১৫২৬ খৃস্টাব্দ) দিল্লী সুলতানী আমল। এই যুগে ইতিহাস রচনার দিকে নানা মুসলিম শাসক এবং ঐতিহাসিকের বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। এই কালে লেখা পুস্তকগুলি ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণে পূর্ণ।

সুলতানদের সভাসদ ইতিহাস-লেখক ছাড়াও পৃষ্ঠপোষিত কবি দার্শনিক প্রভৃতির রচনায় যুগচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। সুলতানী আমলের পরে লেখা হলেও এমন কতকগুলি পুস্তক আছে যাতে সুলতানীযুগের অনেক ঘটনা ও তার ফলাফল লিপিবদ্ধ আছে, যা থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য অবগত হওয়া যায়। বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ সে যুগের ওপর নিরপেক্ষ আলোকপাত করেছে। এইসব ঘটনার পরিপূরক হিসাবে স্থাপত্য ও মুদ্রা বাস্তব উপাদান বলে গণ্য হয়। সুলতানী আমলের ঐতিহাসিক উপাদান মোটামুটি আট ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—(i) রাজসভার সরকারী বিবরণ, (ii) সমসাময়িক ইতিহাস, (iii) বৈদেশিক ভ্রমণ কাহিনী, (iv) আত্মচরিত, (v) বিদেশীর রচনা, (vi) কাব্য ও লোকসাহিত্য, (vii) সাধুসন্তের বাণী, (viii) স্থাপত্য ও মুদ্রা।

সরকারী দলিল-দস্তাবেজ ; পরিসর অল্প, তবু মূল্যবান, কিন্তু নানা কারণে বিনষ্ট

রাজসভার সরকারী বিবরণ : রাজ্যশাসন ও যুদ্ধবিগ্রহাদির বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। এঁদের সংকলিত তথ্য সুলতানী আমলের ইতিহাস রচনার প্রধান উপকরণ, তবে এগুলি প্রধানত রাজসভা ও বিশেষ করে সুলতানকে কেন্দ্র করেই লিখিত হত, এই পরিধির বাইরের বিষয় বেশি স্থান পেত না। কিন্তু যুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব, দলিল-দস্তাবেজ সুরক্ষিত রাখার অভাব ইত্যাদি কারণে এইসব মূল্যবান আকর-উপাদান অধিকাংশই বিনষ্ট হয়েছে।

সমকালীন ইতিহাস-তবকাৎ-ই-নাসিরি ; তারিখ-ই-ফিরোজ-শাহী ; ফতেহি-ই-জাহানদারী ; তারিখ ই-আলাই ; তারিখ-ই-ফিরোজশাহী ;

সমসাময়িক ইতিহাস : মিনহাজ-উস-সিরাজের **তবকাৎ-ই-নাসিরি** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ; ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি লেখা। এতে ভারতে মুসলিম শক্তির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে লেখকের সমসাময়িক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত বিবরণ আছে। অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ হল জিয়াউদ্দীন বরানির **তারিখ-ই-ফিরোজশাহী**, ও **ফতেহি-ই-জাহানদারী ;** আমীর খসরুর

গুলসান-ই-ইব্রাহিমী; মুন্তাখাব-ই-তারিখ; তারিখ-ই-মুবারকশাহী

তারিখ-ই-আলাই ; শামস্ সিরাজ আফিফের তারিখ-ই ফিরোজ-শাহী, ফিরিস্তার **গুলসান-ই-ইব্রাহিমী** এবং আব্দুল কাদির বদাউনীর **মুন্তাখাব-ই-তারিখ** ও গোলাম ইয়াহিয়া-বিন্-আহমদের **তারিখ-ই-মুবারকশাহী।**

নিকোলো কন্টি-বিজয়নগরের সামরিক ও সামাজিক অবস্থার চিত্র

বৈদেশিক ভ্রমণকাহিনী ঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইউরোপীয় পর্যটক **মার্কো পোলো** ভারত ও এশিয়ার অন্য কোন কোন অংশে পরিভ্রমণ করেন। তাঁর বিবরণীতে রাজনৈতিক কাহিনীর বিশেষ উল্লেখ নেই। আফ্রিকার মুসলমান পর্যটক **ইবন-বতুতা** সম্রাট মহম্মদ তোগলকের রাজসভায় কিছুকাল ছিলেন। ২৫ বৎসর যাবৎ বিদেশ ভ্রমণের পর ১৩৪৯ খৃস্টাব্দে তিনি স্বদেশে ফিরে যান। তিনি ভ্রমণকালীন যাবতীয় কাজের বিবরণ লিখে রাখতেন, তাঁর বিবরণ চিত্তাকর্ষক।

ইতালী দেশীয় ভ্রমণকারী **নিকোলো কন্টি** বিজয়নগরে এসেছিলেন। তাঁর বিবরণে রাজধানীর সুরক্ষিত অবস্থা ও সামাজিক রীতিনীতির পরিচয় মেলে।

নিকিতিন, বাহমনী রাজ্যের কথাই বেশি

অ্যাথানাসিয়ান নিকিতিন ১৪৭০—১৪৭৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বাহমনী রাজ্যে পর্যটন করেছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকে রাজ্যের ঐশ্বর্য এবং জনসাধারণের দুঃস্থ জীবন যাত্রার পরিচয় জানা যায়। দক্ষিণ ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চলের মধ্যেই তাঁর ভ্রমণ সীমাবদ্ধ ছিল। উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি সম্পর্কে বিশেষ কিছু তিনি লিপিবদ্ধ করেন নি।

আব্দুর রজ্জাক-বিজয়নগর রাজ্যের অতুলনীয় সম্পদের কথা বর্ণিত

হিরাটের **আব্দুর রজ্জাক** তৈমুরের পুত্র সমরখন্দের সুলতান শাহরুখের রাজসভা থেকে দূত হিসাবে ১৪৪৩ খৃস্টাব্দে কালিকটের জামোরিনের রাজসভায় এসেছিলেন। ঐ সময় তিনি বিজয়নগর পরিদর্শন করেন। তাঁর বিবরণী থেকে রাজ্যের অতুলনীয় সমৃদ্ধির কথা জানা যায়।

ডোমিঙ্গোজ পায়েজ ও নুনিজ; বিজয়নগরের অভিজাত শ্রেণীর বিলাসিতার জীবন ও সাধারণ মানুষের দুরবস্থার বিবরণ মেলে

ডোমিঙ্গেজ পায়েজ (১৫৫২ খৃঃ)—কৃষ্ণদেবরায়ের রাজত্বকালে পর্তুগীজ পর্যটক **ডোমিঙ্গোজ পায়েজ** বিজয়নগরে এসেছিলেন। তখন রাজ্যের চরম উন্নতির যুগ। এর ১৩ বছর পরে ১৫৬৫ খৃস্টাব্দে **নুনিজ** নামে একজন পর্তুগীজ বিজয়নগর পরিদর্শন করে রাজ্যের সম্পদ, কৃষকের দুরবস্থা ও আইনশৃঙ্খলার কঠোরতার বিবরণ দিয়েছেন।

বাবরের আত্মচরিত বাবর-নামা

আত্মচরিত ঃ সুলতানী আমলের কোন শাসক বা রাজপুরুষের আত্মচরিত পাওয়া যায় না। তবে সুলতানী আমলের পতন ঘটিয়ে যিনি মোগল সাম্রাজ্যের পত্তন করেন, সেই যোদ্ধা-কবি-শিল্পরসিক বাবরের **আত্মচরিত** থেকে সেযুগের পরিবেশ সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

বিদেশীর রচনা ঃ খৃস্টীয় অষ্টম শতক থেকে আরবলেখকদের রচনায় ভারতের যথেষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। সিন্ধু প্রদেশের কতক অঞ্চল এই সময় আরবদের অধিকারে আসে। আরবীয়দের মধ্যে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় সুপণ্ডিত আলবিরুনীর গ্রন্থের নাম **তহ্-কিক্-ই-হিন্দ** (ভারত অনুসন্ধান—An Enquiry into India)। এতে হিন্দুদের আচার-ব্যবহার সাহিত্য দর্শন, গণিত, বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের মূল্যবান আলোচনা ও বিবরণ আছে। সুলতান মামুদের সৈন্যদলের সঙ্গে তিনি ১০০০ খৃস্টাব্দে ভারতে আসেন এবং এখানে কিছুকাল বাস করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। ভারতীয় ইতিহাসের দিক থেকে বইটির প্রধান ত্রুটি এই যে, আলবিরুনী এদেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নি; দ্বিতীয়তঃ, তাঁর বিবরণ নিজের পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতাসম্ভূত নয়, ভারতীয় পুঁথিপত্র পড়ে লেখা।

আলবিরুনীর তহকিক্-ই-হিন্দ্; বহু বিষয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা, কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা বা সমাজচিত্র এতে প্রতিফলিত হয়নি, নিছক দর্শন বিষয়ক কথা

চীনা বিবরণ ঃ ভারতের মধ্যযুগ সম্বন্ধে কিছু চীনাউপাদান টাউং পাও (Toung Pao XVI) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবোধচন্দ্র বাগচি-কৃত এর অনুবাদ বিশ্বভারতী পত্রিকায় (Viswa Bharati Annals, I, 117-27) প্রকাশিত হয়েছে।

চীনা রচনা **টাউং পাও** পত্রিকায় প্রকাশিত

কাব্য ও লোকসাহিত্য ঃ স্থানীয় ভাষায় লিখিত জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ হিসাবে পৃথ্বীরাজের সভাকবি চাঁদ বরদাই রচিত **পৃথ্বিরাজ রাইসা** ঐ যুগের ভাবনা-চিন্তা ও বীর পূজার মানসিকতার কাব্যিক দৃষ্টান্ত। এতে প্রায় ১,২৫,০০০ শ্লোক সন্নিবিষ্ট হয়েছে। রাজস্থানে এই ধরনের আরও অনেক লোককাব্য প্রচলিত ছিল।

চাঁদ বরদাই রচিত **পৃথ্বিরাজ রাইসা**

জেমস্ টড (১৭৮২—১৮৩৫ খৃঃ) বহু পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের ফলে Annals and Antiquities of Rajasthan নামক বিখ্যাত গ্রন্থে রাজপুত জাতির ঐতিহ্য ও ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। তথ্যাদির অসম্পূর্ণতা ও ভ্রান্তি থাকলেও ভারতীয় ইতিহাসের অনুসন্ধানী পাঠকের কাছে এ গ্রন্থটি যথেষ্ট মূল্যবান।

টডের Annals and Antiquities of Rajasthan **রাজস্থানইতিবৃত্ত**

সাধুসন্তের বাণী ঃ মধ্যযুগে ইসলামের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে হিন্দু ধর্ম ও সমাজে যে নতুন চিন্তাভাবনার উন্মেষ ঘটে, উভয় সম্প্রদায়ের সাধু ব্যক্তিদের জীবনে তার প্রতিফলন দেখা যায়। এ যুগে সুফীদের **রচনা**, কবীরের **দোহা** এবং গুরু নানকের বাণীর সংকলন **আদিগ্রন্থ** থেকে ঐ সময়কার সমাজ ও ধর্ম-চিন্তার স্বরূপ জানা যায়।

সুফীদের **রচনা**, কবীরের **দোহা**, **আদিগ্রন্থ**

স্থাপত্য ও মুদ্রা : স্থাপত্য থেকে যেমন যুগের শিল্প কুশলতা ও শিল্পীর মান ও নির্মাণশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়; তেমনি প্রাপ্ত মুদ্রার ধাতু ও তার উৎকর্ষ দেখে শাসকের ধর্ম ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা যায়। এগুলি যুগের বাস্তব সাক্ষী হিসাবে মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান। **P. Brown—Indian Architecture-Islamic** গ্রন্থে মুসলিম স্থাপত্যের স্বরূপ ও গুণবিচার করেছেন। **S. Lane-Poole-এর The Coins of The Sultans of Delhi** গ্রন্থে সুলতানী আমলের মুদ্রার উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা আছে। একটা যুগের সম্পূর্ণ চিত্র পেতে হলে শিল্প সংস্কৃতি, আর্থিক অবস্থা সব কিছুই জানা দরকার।

P. Brown-এর Indian Architecture-Islamic, Lane Poole-এর Coins of the Sultans of Delhi সহায়ক গ্রন্থ

(৩) ভারতে মুসলিমদের আগমন : এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম অংশে রয়েছে আরব নামে এক বিরাট দেশ। ভারতের মত শস্যশ্যামল নদীমাতৃক দেশ নয়, বিস্তীর্ণ বালুর মরুভূমি, মাঝে মাঝে ছোট ছোট টিলাপাহাড় ও মরুদ্যান আর অল্প কিছু জায়গায় উর্বর উপত্যকা। লোকসংখ্যা কম। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে জীবন ধারণ করতে হয় বলে অধিবাসীরা কষ্ট সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। দেশের পশ্চিম উপকূল থেকে কিছুটা ভেতরে পবিত্র শহর মক্কা। এখানে ৫৭০ খৃস্টাব্দে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করেন এবং সমাজে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণীপ্রচার ক'রে দেশের লোকের মধ্যে সংঘশক্তি ও প্রচণ্ড তেজ সঞ্চার করেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণ মুসলমান বা মুসলিম নামে পরিচিত। ৬৩২ খৃস্টাব্দে হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে যাঁরা দেশের শাসন ও মুসলিমদের প্রধান ধর্মগুরুর পদ গ্রহণ করেন তাঁদের বলা হত **খলিফা**। প্রথম চারজন খলিফার রাজত্বকালে ইসলাম ধর্ম অভূতপূর্ব বিস্তারলাভ করে। আরবগণ সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, মিশর এবং পারস্য জয় ক'রে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। পশ্চিম দিকে আফ্রিকার উত্তর অংশ থেকে মুসলমান স্পেন অধিকার করে। পূর্বে কাবুল, হিরাট, গজনী তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক গিবন (Gibbon) বলেছেন, মহম্মদের মৃত্যুর পর একশ বছরের মধ্যেই খলিফাগণ হয়েছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিমান একচ্ছত্র শাসক (the most potent and absolute monarchs of the world)। খলিফা প্রথম ওয়ালিদের শাসনকালে সিন্ধুতে মুসলিম আক্রমণ ঘটে।

আরব দেশে ইসলামের উত্থান

(৪) মুসলিম শাসনের সূত্রপাত

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা : হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর ৭ম থেকে ১২শ শতক পর্যন্ত উত্তর ভারতে কতকগুলি রাজপুত রাজ্য নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত ছিল।

বিদেশীদের আক্রমণের মত জাতীয় বিপদ দেখা দিলেও এরা সম্মিলিতভাবে শত্রুকে প্রতিহত করতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। মুসলিম আক্রমণের কালে পাঞ্জাবে শাহীবংশ, দিল্লীতে চৌহান বংশ, কনৌজে রাজপুত, মালবে পারমার রাজপুত, মেবারে শিশোদিয়া রাজপুত বংশ, বাংলা ও বিহারে সেন এবং পালবংশ রাজত্ব করছিলেন। কোন সার্বভৌম শাসক না থাকায় পরস্পর ঈর্ষাজর্জরিত রাজ্যগুলির দুর্বলতা প্রকট হয়েছিল। সমভূমি অঞ্চলে দ্রুতগামী অশ্বারোহী আক্রমণকারীবাহিনীকে প্রতিরোধ করা ভারতীয় মন্থরগতি হস্তিবাহিনী ও পদাতিক বাহিনীর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

উত্তর ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আত্মকলহে লিপ্ত

সমভূমিতে অশ্বারোহী অপ্রতিরোধ্য

সুলতান মামুদ

তুর্ক-আফগান শক্তির উত্থান ঃ মহম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে আরবগণ যখন সিন্ধুদেশ জয় করে তখন খলিফার অধীনে সমগ্র মুসলমান সাম্রাজ্য সুসংহত ও শক্তিশালী ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে প্রদেশগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে এবং বিভিন্ন অঞ্চল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়। মধ্য এশিয়ায় আগেই ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল ; সেখানকার তুর্কী জাতি কালক্রমে প্রবল হয়ে ওঠে এবং কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবেই সিন্ধুবিজয়ের আড়াইশো বছর পরে আফগানিস্তানের গজনীতে এক ক্ষুদ্র নতুন তুর্কীরাজ্য স্থাপিত হয়। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলপ্তিগীন। আলপ্তিগীনের মৃত্যু হলে ৯৭৭ খৃস্টাব্দে তাঁর ক্রীতদাস সবুক্তিগীন সিংহাসন অধিকার এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জয় করে রাজ্যবৃদ্ধির দিকে মন দেন। এইভাবে পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের শাহীবংশের রাজা জয়পালের সঙ্গে সবুক্তিগীনের যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

প্রথম তুর্কী অভিযান : সবুক্তিগীন যখন আফগানিস্তানে নিজ রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী, তখন পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজপুতগোষ্ঠীর শাহী বংশ রাজত্ব করছিল। রাজা জয়পাল পার্শ্ববর্তী রাজার শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে তার অতি-বৃদ্ধি রোধ করার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু পরাজিত হয়ে ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রচুর অর্থ দেওয়ার অঙ্গীকার করতে বাধ্য হন। পরে রাজ্যে ফিরে ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার-করেন এবং দ্বিতীয়বার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। দ্বিতীয়বারও তিনি পরাজিত হন এবং সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরের অঞ্চল গজনীরাজ সবুক্তিগীন অধিকার করেন। এই যুদ্ধের ফল সম্পর্কে ঐতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেছেন, সিন্ধুর পশ্চিম তীরের ভূমি অধিকার করে মুসলিমগণ ভারতের উর্বর প্রান্তরে আসার পথ অধিকার করল।

সবুক্তিগীনের সঙ্গে শাহীবংশের জয়পালের সংঘর্ষ

ভারতে আসার পথ অধিকার

সবুক্তিগীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মামুদ গজনীর সিংহাসন অধিকার করেন। বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে তিনি স্বাধীন শাসকরূপে রাজত্ব করতে থাকেন।

সুলতান মামুদের কথা : ভারতে স্থায়ী রাজ্যস্থাপনের জন্য নয়, শুধু ধনরত্নের লোভে ভারতে এসেছিলেন সুলতান মামুদ, তৈমুরলঙ, নাদিরশাহ, আহমদশাহ আবদালী। এঁদের মধ্যে সুলতান মামুদের নামই বেশি পরিচিত।

হিন্দুমন্দির ধ্বংস, ধন লুণ্ঠন

ভারত অভিযান : ১০০০ খৃস্টাব্দ থেকে ১০২৬ খৃস্টাব্দের মধ্যে মামুদ ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন। পাঞ্জাবের রাজা জয়পাল সবুক্তিগীনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যে রাজ্যাংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, সবুক্তিগীনের মৃত্যুর পর তিনি তা পুনরুদ্ধার করতে চেষ্টা করেন। ফলে ১০০১ খৃস্টাব্দে পেশোয়ারের কাছে সুলতান মামুদের সঙ্গে তাঁর ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে প্রায় ১৫ হাজার হিন্দু সৈন্য নিহত হয়। জয়পাল কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনসহ মামুদের হাতে বন্দী হলেন। প্রায় ২০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ক্ষতিপূরণ ও মুক্তিপণ দিয়ে তিনি মুক্তিলাভ করেন। রাজপুত রাজা জয়পালের এই পরাজয়ের অপমান অসহ্য বোধ হল। জ্বলন্ত চিতায় স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দিয়ে তিনি আত্মসম্মান রক্ষা করলেন। ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দীন বলেছেন, জয়পাল ছিলেন 'সমসাময়িক হিন্দের মহত্তম নরপতি।'

জয়পাল স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দিলেন

আনন্দপালের সঙ্গে যুদ্ধ : জয়পালকে পরাজিত করার পর মামুদ কয়েক বছর ছোট ছোট অঞ্চল জয় করতে অতিবাহিত করলেন। এদিকে জয়পালের পুত্র আনন্দপাল মামুদের পরবর্তী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য হিন্দুরাজাদের এক মিলিত সংঘ গড়ে তুললেন। এতে যোগ দিলেন উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর, কনৌজ, দিল্লী ও আজমীরের রাজারা। বিদেশির আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষার জন্য এমন উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল যে, দূরদূরান্তের হিন্দুরমণীরা নিজেদের অলঙ্কার বিক্রি করে যুদ্ধের কাজে ব্যবহারের জন্য অর্থ পাঠিয়েছিলেন। ঈশ্বরী-প্রসাদের কথায়, হিন্দুর সংস্কৃতি ও সভ্যতা রক্ষার জন্য জাতি, ধর্ম ও স্বদেশপ্রেমের শক্তি মামুদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছিল।

১০০৮ খৃস্টাব্দে পেশোয়ারের কাছে সুলতান মামুদের সঙ্গে আনন্দপালের মিলিত মিত্রবাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। প্রথম দিকে হিন্দুসৈন্যদের আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে মামুদ রণভঙ্গ দিয়ে পালানোর কথা চিন্তা করছিলেন এমন সময় অকস্মাৎ আনন্দপালের হাতি ভয় পেয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ছুটে পালায়। এর ফলে আনন্দপাল পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন মনে করে হিন্দুবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে ইতস্তত পালাতে থাকে। নিছক ভাগ্যবলে মামুদ আসন্ন পরাজয়ের হাত

থেকে রক্ষা পেয়ে হিন্দু সৈন্যদল বিধ্বস্ত করে দেন। ভারতের মধ্যযুগে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে হিন্দুদের এমন বিপুল সৈন্য সমাবেশ, সংকল্পবদ্ধ সংগঠন ও জাতীয় উদ্যম আর দেখা যায়নি।

এই একটি মাত্র যুদ্ধে জয়ের ফলে সুলতান মামুদ পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম ভারতে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি আরও অনেকবার ভারত অভিযান করেছেন এবং প্রতিবারই ভারতীয় নগর ধ্বংস, নরহত্যা ও ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে নিজরাজ্য গজনীতে ফিরে গেছেন।

মামুদের ষোড়শ অভিযান পরিচালিত হয় কাথিয়াবাড়ের সোমনাথ মন্দির অভিমুখে (১০২৫ খৃঃ)। সে যুগে ধনরত্নের জন্য বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির লুঠ করে মামুদ প্রচুর মণিমুক্তা স্বদেশে নিয়ে যান। বিদেশ থেকে বহু মূল্যবান দ্রব্য সংগ্রহ করে তিনি নিজ রাজধানী মনোরম করে সাজিয়েছিলেন কিন্তু বিজিত অঞ্চলে সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে শক্তিশালী স্থায়ী রাজ্য গড়ে তুলতে পারেননি।

আল্ বিরুনী (৯৭৩-১০৪৮ খৃঃ): সুলতান মামুদের রাজসভার অন্যতম রত্ন ছিলেন মহামনীষী আল্‌বিরুনী। মধ্য এশিয়ার তুর্কীস্থানের অন্তর্গত খোয়ারিজ্ম (বর্তমান খিভা) অঞ্চলে তাঁর জন্ম। জাতিতে তিনি পারসিক, তুর্কপ্রভাবিত ফারসী ছিল তার মাতৃভাষা। সুলতান মামুদ পাঞ্জাবের কিছু অংশ অধিকার করলে তিনি ভারতের ঐ সকল অঞ্চল পরিদর্শন করার সুযোগ পান। স্বাভাবিক জ্ঞান স্পৃহার অনুপ্রেরণায় তিনি গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্ত্র, ভূবিদ্যা, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। নিজ মাতৃভাষা ছাড়া তিনি আরবী, হিব্রু, সিরিয়াক, সংস্কৃত এবং সম্ভবত পাঞ্জাব অঞ্চলের কথ্য ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করে তিনি হিন্দুশাস্ত্র ও ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করেন। কপিলের সাংখ্যদর্শন ও পতঞ্জলির যোগদর্শন বিষয়ক বই তিনি আরবীভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর শ্রেষ্ঠগ্রন্থ **তহকিক্-ই-হিন্দ্** বা তারীখ্-উল্-হিন্দ্ (ভারতবর্ষের ইতিহাস)। এতে তিনি ৮০টি অধ্যায়ে হিন্দুদের ধর্মতত্ত্ব, সমাজব্যবস্থা, সাহিত্য, দর্শন, গণিত, আচার-অনুষ্ঠান, প্রভৃতি বিষয় গভীর পাণ্ডিত্য ও সহানুভূতির সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

আলবিরুনী অনন্য প্রতিভাবান জ্ঞানসাধক

আলবিরুনীর গ্রন্থপাঠে একাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। প্রাচীন ভারতের মনীষীদের জ্ঞান ও বিজ্ঞতা সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করলেও আল্‌বিরুনী তাঁর সমসাময়িক ভারতীয়দের মানসিক সংকীর্ণতা ও চিন্তার অস্বচ্ছতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ভারতীয়রা বিশ্বাস করে তাদের দেশ ছাড়া আর দেশ নেই। তাদের জাতির মত জাতি

ভারতীয় চরিত্রের দোষ প্রদর্শন

নেই, তাদের ধর্মের মত ধর্ম নেই, তাদের বিজ্ঞানের মত বিজ্ঞান নেই। অপরকে তাদের জ্ঞানের অংশ দিতে তারা কুন্ঠিত, নিজের লোকেদের মধ্যেই অন্য শ্রেণীর মানুষকে তারা বিদ্যার অংশীদার করে না, বিদেশীর তো কথাই নেই।*

আলবিরুনী ছিলেন একজন মহামনস্বী জ্ঞানসাধক। ভারতের জ্ঞান সম্পদ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল কিন্তু তৎকালীন ভারতবর্ষের উচ্চবর্ণের মানুষের মননশক্তির অবক্ষয় ও উন্নাসিকতায় তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। রোমিলা থাপার বলেন, আলবি'নী এমন এক সময়ে ভারতে এসেছিলেন যখন জ্ঞানের ভাটা চলছিল (when knowledge was at low ebb.)। তিনি যদি চার শতাব্দী আগে ভারতে আসতেন, তাঁর দীপ্ত অনুসন্ধিৎসু মন এখানে যোগ্য মনীষার সাক্ষাৎ পেত।

(৫) অভিযান থেকে সাম্রাজ্য গঠন ঃ সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতার জন্য গজনা রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। ঘুর রাজ্যের শাসক আলাউদ্দীন হোসেন বিদ্রোহ করে গজনী লুণ্ঠন করলেন এবং সাতদিন সাত রাত ধরে নগর জ্বালিয়ে ধ্বংস করে ফেললেন। এই অগ্নিকাণ্ডের জন্য আলা দ্দীন 'জাহান সুজ' অর্থাৎ 'বিশ্ব-দাহক' (World Burner) উপাধি লাভ করেন। আলা দ্দীনের বংশধর গিয়াসুদ্দীন মহম্মদ ১১৭৩ খৃস্টাব্দে গজনী অধিকার করে তাঁর ভ্রাতা মইজউদ্দীন মহম্মদ বা মহম্মদ ঘোরীকে ঐ প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। সুলতান মামুদের শেষ বংশধর গজনী থেকে বিতাড়িত হয়ে লাহোরে ক্ষুদ্র অঞ্চল শাসন করতে থাকেন। লাহোর অধিকার করার উদ্দেশ্যে মহম্মদ ঘোরী ভারত অভিযান করলে ভারত ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

তরাইনের প্রথম যুদ্ধ (১১৯১ খৃস্টাব্দ) ঃ গজনীর শাসনকর্তা মহম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করলে থানেশ্বরের কাছে তরাইনের প্রান্তরে পৃথ্বীরাজ চৌহান বিরাট বাহিনী নিয়ে বাধা দেন। যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরী নিদারুণভাবে পরাজিত হলেন।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১১৯২ খৃস্টাব্দ) ঃ প্রথম যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে মহম্মদ ঘোরী পরের বছর (১১৯২ খৃস্টাব্দে) আবার ভারত আক্রমণ করেন। তরাইনের প্রান্তরে আবার পৃথ্বীরাজের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। মহম্মদ এবার যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন করে তীরন্দাজ অশ্বারোহী বাহিনী সম্মুখে রেখে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। মহম্মদ ঘোরীর ক্ষিপ্রগতি অশ্বারোহী বাহিনীর চক্রবেষ্টনীর মত আক্রমণ কৌশলে পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হন। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ভারতে মুসলিম অধিকারের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

মহম্মদ ঘোরী ভারতে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন নি। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতবউদ্দীন আইবককে বিজিত ভারতীয় অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করে

* Quoted in Romila Thapar's A Hist. of India, p 239

নিজ রাজ্যে ফিরে যান। কুতবউদ্দীনকে রাজ্যবিস্তারের স্বাধীনতাও দিয়েছিলেন। ১১৯২ থেকে ১২০৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কুতবউদ্দীন মহম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধি (ভাইসরয়) রূপে ভারতীয় অঞ্চল শাসন করেন। ১২০৬ খৃস্টাব্দে অপুত্রক মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যু হলে তাঁর সাম্রাজ্য সেনাপতি, আত্মীয়স্বজন ও পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। কুতবউদ্দীন তাঁর শাসনাধীন ভারতীয় অঞ্চলে নিজেকে স্বাধীন স্থলতানরূপে ঘোষণা করে ১২০৬ থেকে ১২১০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

দাসবংশ : ১২০৬-১২৯০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীতে যাঁরা রাজত্ব করেছেন, তাঁদের অনেক রাজাই প্রথম জীবনে দাস ছিলেন। সেইজন্যে এই বংশের নাম দাসবংশ।

কুতুবউদ্দীন আইবক : কুতবউদ্দীন ছিলেন সাহসী সৈনিক ও সফল সেনাপতি। তাঁর সাহায্য ছাড়া মহম্মদ ঘোরী ভারতে রাজ্যবিস্তার করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। তিনি যখন মধ্য এশিয়ায় যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন, কুতবউদ্দীন দিল্লী, মীরাট, বেনারস, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করে মুসলিম শাসনের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। স্থশাসক ও ন্যায় বিচারক হিসাবে কুতবউদ্দীনের খ্যাতি ছিল। তিনি শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন।

ইলতুৎমিস : দাসবংশের তৃতীয় স্থলতান ইলতুৎমিস ছিলেন দাস বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। তাঁকেই সাধারণত ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের আসল প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। কুতবউদ্দীন আইবকের মৃত্যুর পর তাঁর অযোগ্য অকর্মণ্য পুত্রকে উপেক্ষা করে অমাত্যগণের অনুরোধে ইলতুৎমিস সিংহাসন গ্রহণ করেন। কিন্তু হঠাৎ একজন শক্তিমান শাসকের অভাব হলে যেমন হয়ে থাকে, সত্যস্থাপিত রাজ্যের মধ্যে চারদিক থেকে বিদ্রোহ দেখা দিল। ইলতুৎমিস ধৈর্য, সাহস ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সবরকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষা করলেন। ইলতুৎমিসের মত তৎপর নায়ক না থাকলে মুসলিম সাম্রাজ্য শৈশবেই বিনষ্ট হওয়ার আশংকা ছিল। শুধু পূর্বে অধিকৃত অঞ্চল রক্ষাই নয়, ইলতুৎমিস সমৃদ্ধ মালবরাজ্য জয় করে নিজ রাজ্যের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন।

ইলতুৎমিস ছিলেন স্থশাসক ও সংগঠক। মহম্মদ ঘোরী এবং কুতবউদ্দীন যে সকল অঞ্চল জয় করেছিলেন সেগুলো স্থশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার আওতায় আনার সময় পাননি। ফকর-উল-মূলক ও মহম্মদ জুনাইদি-র মত যোগ্য মন্ত্রীর সহায়তায় ইলতুৎমিস স্থনিয়ন্ত্রিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও কল্যাণকর সংস্কার প্রবর্তন করেন। নতুন রাস্তা নির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, সোনার ও রূপার মুদ্রা প্রবর্তন প্রভৃতি ইলতুৎমিসের কৃতিত্ব। তিনি প্রথম নির্দিষ্ট মানের রূপার টংকা (টাকা) প্রচলন করেন। ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

ইলতুৎমিসই ছিলেন দিল্লী স্থলতানির প্রকৃত স্থাপয়িতা। পূর্ববর্তী মুসলমান শাসকেরা—স্থলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরী এবং কুতবউদ্দীন—লাহোরকে তাঁদের ভারতীয় অঞ্চলের রাজধানীরূপে গণ্য করতেন। ইলতুতৎমিস-ই প্রথম রাজধানী

লাহোর থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেন এবং তারপর থেকে সমগ্র মুসলিম আমলে দিল্লী ভারতের রাজধানীর গৌরব বহন করে।

ইলতুৎমিস কূটনীতি ও দূরদর্শিতারও প্রমাণ দিয়েছিলেন। তাঁর কূটবুদ্ধির ফলে মধ্য এশিয়ার খিবা অঞ্চলের শাসক জালালউদ্দীন ও দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নায়ক চেঙ্গিস খাঁর আক্রমণ থেকে ভারত রক্ষা পায়।

ইলতুৎমিসের শিল্পকীর্তি ভারতের গর্বের বস্তু হয়ে আছে। কুতবউদ্দীনের আরব্ধ কুতুবমিনার ইলতুৎমিস সম্পূর্ণ করেন। এছাড়া কুতবী মসজিদও তাঁর সময়ে নির্মিত হয়। ইলতুৎমিসের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা শিল্প দক্ষতার পরিচয় দেয়। তিনিই প্রথম মুদ্রায় আরবী হরফ প্রবর্তন করেন।

ইলতুৎমিস সাহিত্যের সমাদর করতেন। মিনহাজ-উস-সিরাজ, রুসানি, উসমানি, তাজউদ্দীন রাজেব প্রভৃতি কবি-সাহিত্যিক তাঁর উৎসাহ ও সমাদর লাভ করেছিলেন। মিনহাজ-উস-সিরাজের লেখা তবকাত-ই-নাসারি-তে ইলতুৎমিস ও তাঁর সময়কার ঘটনাবলীর বিবরণ আছে। মিনহাজ বলেছেন, 'ইলতুৎমিস ছিলেন এমন একজন উদার ও মানবদরদী নরপতি যিনি স্বচেষ্টায় সাম্রাজ্য পত্তন করেছিলেন।'

গিয়াসুদ্দীন বলবনঃ দাসবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসকরূপে গিয়াসুদ্দীন বলবন ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। বিদ্যা ও ধর্মচর্চায় নিরত সুলতান নাসিরউদ্দীন তাঁর প্রধান মন্ত্রী গিয়াসুদ্দীন বলবনের ওপর শাসন দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিত ছিলেন। বলবন দীর্ঘ ২০ বছর প্রধান মন্ত্রীরূপে যোগ্যতার সঙ্গে প্রশাসনকার্য পরিচালনা করেন। নাসিরউদ্দীনের ৪০ জন মুখ্য দাসের দল বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। বলবনও দাসদের একজন ছিলেন। নাসিরউদ্দীনের মৃত্যুর পর (১২৬৬ খৃঃ) বলবন সিংহাসন অধিকার করেন, কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী আমীর ওমরাহ এবং প্রভাবশালী দাসগণ বলবনের প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে রুষ্ট হয়ে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। রাজ্যের ভিতর হিন্দু সামন্ত নৃপতিগণ দিল্লীর সিংহাসনে অদলবদলের সময় অশান্তি ও শাসনে দুর্বলতা দেখ



গিয়াসুদ্দীন বলবন

দিলেই বিদেশির অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে ; আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সঙ্গে বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশংকা দেখা দেয় এবং ভারতে মুসলিম শাসন বিপন্ন হয়ে ওঠে। এইরূপ সংকটজনক পরিস্থিতিতে বলবন অত্যন্ত কঠোর হস্তে সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা দমন করে দিল্লী সাম্রাজ্য রক্ষা করেছিলেন।

মেওয়াটি দমন

দিল্লীর আশেপাশে যুদ্ধপ্রিয় মেওয়াটিরা লুঠপাট করে জনসাধারণের জীবন বিপন্ন করত। বলবন নির্মম অভিযান চালিয়ে ১২ হাজার মেওয়াটিকে হত্যা করে জনজীবনে শান্তি আনার ব্যবস্থা করেছিলেন।

কঠোর শাসন
মঙ্গোলদের প্রতিরোধ

মঙ্গোল আক্রমণ প্রতিরোধ: ইলতুৎমিসের আমলে চেঙ্গিস খাঁর অভিযানের সময় থেকে সিন্ধুনদের পশ্চিমে মঙ্গোলরা বসবাস শুরু করেছিল। এরা মাঝে মাঝেই পাঞ্জাবে আক্রমণ চালাত। ১২৪৫ খৃস্টাব্দে বলবন মঙ্গোলনায়ক মংগুকে নিদারুণভাবে পরাজিত করে মঙ্গোল আতংক থেকে সাম্রাজ্য রক্ষা করেন। মঙ্গোলদের ভবিষ্যৎ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তিনি সীমান্ত বরাবর কতকগুলো দুর্গ নির্মাণ করে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করেন। তিনি উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সকল ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে মঙ্গোলগণ বারংবার চেষ্টা করেও ভারতে বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করতে পারেনি।

বাঙলায় বিদ্রোহ দমন: বৃদ্ধ সুলতান মঙ্গোল অভিযান প্রতিরোধ করতে বিব্রত থাকার সুযোগে বাঙলার শাসনকর্তা (গভর্নর) তুঘরিল খাঁ ১২৭৯ খৃস্টাব্দে দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। এই বিদ্রোহ দমনে বলবন যে ভয়ংকর শাস্তি দিয়েছিলেন, ভারতবাসী তা আগে বা পরে কখনও দেখেনি। পলাতক তুঘরিলকে হত্যা করে ছিন্নমুণ্ড আনা হয় বলবনের সামনে। বলবনের নির্দেশে বাঙলার রাজধানী লক্ষ্মণাবতী বাজারের দুই মাইল দীর্ঘ পথের ধারে সারি সারি শূল স্থাপন করে তাতে তুঘরিলের পরিবারের লোকজন এবং অনুচরদের সকলকে প্রকাশ্যে শূলে চড়িয়ে মারা হয়। ঐতিহাসিক স্যার উলসলি হেইগ (Sir Wolseley Haig) বলেছেন—

On either side of the principal bazar, a street more than two miles in length, a row of stakes was set up and the family and the adherents of Tughril were impaled upon them. None of the beholders had ever seen a spectacle so terrible and many swooned with terror and disgust. (The Cambridge Hist. of India, vol III, p-81.)

ন্যায়বিচার

নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার: রাজ্যের নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলারক্ষার ব্যাপারে বলবন কঠোর শাস্তি প্রদান করতে কুণ্ঠিত হতেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিষ্ঠুর নৃপতি ছিলেন না। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে তিনি ছিলেন সদাজাগ্রতদৃষ্টি।

শিল্প-সাহিত্যের সমাদরঃ মঙ্গোল আক্রমণ, বিদ্রোহী কর্মচারী ও দস্যু-তস্করের উপদ্রব দমন করতেই বলবনের বহু সময় অতিবাহিত হত। তবু শিল্প ও সাহিত্য তিনি উপেক্ষা করেননি। কবি ও বিদ্বান ব্যক্তিদের সাহচর্যে তিনি আনন্দলাভ করতেন। বিখ্যাত পারসিক কবি আমীর খসরু বলবনের সমসাময়িক এবং রাজপুত্র মহম্মদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন। বলবন কবি আমীর হাসানকেও রাজদরবারে সমাদরে স্থান দিয়েছিলেন।

শিল্প ও সাহিত্যের সমাদর

১২৮৬ খৃস্টাব্দে বলবনের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কেউই রাজ্য পরিচালনার যোগ্য ছিলেন না। অরাজক অবস্থা উপস্থিত হলে সেনাপতি জালালউদ্দীন খিলজী সিংহাসন অধিকার করে খিলজীবংশের প্রতিষ্ঠা করেন (১২৯০ খৃঃ)।

দাসবংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান কে? : দাস-সুলতানদের মধ্যে প্রকৃত শক্তিমান নরপতি ছিলেন তুজন—ইলতুৎমিস ও বলবন। এ তুজনের মধ্যে কাকে প্রথম স্থান দেওয়া হবে, সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মতভেদ আছে।

ঐতিহাসিক **Sir** Woolseley **Haig** এবং **Dr. K. Datta** মনে করেন ইলতুৎমিসই দাসবংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান। তাঁদের যুক্তিঃ মুসলিম সাম্রাজ্যের শৈশব অবস্থায় বিদ্রোহী নায়কদের দমন করে, মঙ্গোল অভিযান দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিবলে প্রতিহত করে, মালবরাজ্য জয় করে এবং শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করে তিনি ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য শুধু রক্ষাই করেননি, এর স্থায়িত্ব ও বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতাও বলা যায়।

অপর পক্ষে **Dr. S. R. Sharma** এবং **Dr. Ishwari** Prasad -এর মতে বলবনই দাসবংশের শ্রেষ্ঠ শাসক। তাঁদের যুক্তিঃ ইলতুৎমিস যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, বলবনের সময়ে তা হয়েছিল অনেক বেশি গুরুতর এবং বলবন সেগুলো অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করেছিলেন। বারংবার মঙ্গোল অভিযান, ঈর্ষাপরায়ণ 'চল্লিশ দাসের' ষড়যন্ত্র, দস্যুদের বেপরোয়া লুঠতরাজ, প্রাদেশিক শাসকের বিদ্রোহ বলবনের মত শক্ত মানুষের অভাবে মুসলমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দিত। শুধু বলবনের 'রক্তাক্ত অস্ত্রনীতি' (**blood and iron policy**) অতীব দুঃসময়ে সাম্রাজ্য বজায় রাখতে সহায়ক হয়েছিল। ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেছেন—যোদ্ধা এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে বলবন মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসে চিরদিন কীর্তিত হবেন।

বলবনের কার্যকলাপে দিল্লীসুলতানীর ভিত্তিমূল দৃঢ় হয়

(৬) খিলজী সাম্রাজ্যবাদ

খিলজীবংশ (১২৯০-১৩২০)ঃ দাসবংশের প্রভাবশালী সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের মৃত্যুর পর তাঁর অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কলহ শুরু হলে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা জালালউদ্দীন খিলজী ওমরাহদের সহায়তায় দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে যে নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করলেন তা খিলজীবংশ নামে পরিচিত।

খিলজীবংশের প্রথম সুলতান জালালউদ্দীন খিলজী শান্ত, ভদ্র এবং নরম প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনের অবসান শান্তির মধ্যে ঘটেনি। তাঁর ভাইপো এবং জামাতা ছিলেন একই ব্যক্তি—নাম আলাউদ্দীন খিলজী। তিনি কারা ও অযোধ্যা অঞ্চলের শাসকও ছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রকে পরাজিত করে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে আসেন। একারণে স্নেহপ্রবণ বৃদ্ধ সুলতান জামাতাকে অভিনন্দন জানাতে গেলে আলাউদ্দীনের ইঙ্গিতে সুলতানকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে মাথা কেটে ফেলা হয়। 'যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন তার পায়ের কাছে পড়ে তাঁর শুভ্রকেশগুচ্ছ ও খণ্ডিত মস্তক।' ভালো মানুষ সুলতানের এমনি ভাবে জীবনান্ত ঘটে।

যেসব আমীর-ওমরাহ রাজকার্য পরিচালনায় জালাউদ্দীনকে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের সকলকে, এমন কি তাঁদের পরিবারের নারী ও শিশুদেরও হত্যা করে উচ্চাকাঙ্ক্ষী আলাউদ্দীন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন (১২৯৬)।



আলাউদ্দীন খিলজী

খিলজীবংশের এই দ্বিতীয় সুলতানই রাজ্য জয়, শাসনসংস্কার, কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা প্রবর্তন ও বিদেশির আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

এসব কারণে মধ্যযুগের ইতিহাসে আলাউদ্দীন খিলজী এক উল্লেখযোগ্য নাম। আফ্রিকার পর্যটক ইবন বতুতা (যিনি তোগলকদের সময়ে ভারতে এসে কিছুকাল দিল্লীতে বাস করেছিলেন) বলেছেন, 'আলাউদ্দীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান রূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য।' সমসাময়িক ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরণী বলেন, আলাউদ্দীন অত্যাচারী নিষ্ঠুর ফারাও অপেক্ষা বেশি নিরীহ ব্যক্তির রক্তপাত ঘটিয়েছেন। আধুনিককালের

ঐতিহাসিক ডক্টর ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, অসাধারণ সমরনায়ক এবং যোগ্য রাজ্য-শাসকের গুণাবলীর বিরল সমন্বয় ঘটেছিল আলাউদ্দীনের মধ্যে।

আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের কৃতিত্বগুলি চারটি দিক থেকে আলোচনা করা চলে—১. দেশরক্ষা ২. রাজ্যবিস্তার ৩. শাসনসংস্কার ৪. শিল্প-সংস্কৃতি।

দেশরক্ষা : কিছুকাল আগে থেকেই ভারতে বারংবার মঙ্গোল অভিযান ঘটতে থাকে। দাসবংশের সুলতান বলবন মঙ্গোলদের প্রতিরোধের জন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দুর্গ স্থাপন ও সৈন্য মোতায়েন রেখেছিলেন। কিন্তু জালালউদ্দীন খিলজীর দুর্বল শাসনকালে একদল মঙ্গোল দিল্লীর সন্নিকটে বসতি স্থাপনের অনুমতি পায় এবং ইসলামধর্ম গ্রহণ করে 'নবমুসলমান' নামে পরিচিত হয়। এরাও সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় আলাউদ্দীন মঙ্গোলদের আক্রমণের আশঙ্কা থেকে ভারতকে রক্ষা করতে : (ক) সীমান্তের দুর্গগুলো সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করেন, (খ) সীমান্ত প্রদেশগুলোতে বেশি সংখ্যায় সৈন্য মোতায়েন ও যোগ্য সেনানায়ক নিয়োগ করে মঙ্গোলদের দেশের ভেতরে আসা বন্ধ করার ব্যবস্থা নেন, (গ) উন্নত ধরণের অস্ত্র নির্মাণের ব্যবস্থা করেন, (ঘ) হাজার হাজার 'নবমুসলমান' মঙ্গোল স্ত্রী-পুরুষ-শিশু হত্যা করে শত্রুর বংশ নির্মূল করেন। এর ফলে আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে মঙ্গোলরা আর ভারত আক্রমণে সাহসী হয়নি।

রাজ্যবিস্তার

উত্তর ভারত : আলাউদ্দীন মঙ্গোল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ৪,৭৫,০০০ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী সমরবিশারদ সুলতান সারা ভারত জয় করে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা করেন।

গুজরাট (১২৯৭) : গুজরাটের উর্বর ভূমি এবং প্রভূত ধনসম্পদ সুলতানকে লুব্ধ করেছিল। সেনাপতি উলুঘ খাঁ এবং নসরৎ খাঁ বিরাট সৈন্যদল নিয়ে রাজ্যটি অধিকার করেন। মুসলিমগণ গুজরাটের প্রধান বন্দর কাম্বে ও বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করে প্রচুর ধনরত্ন হস্তগত করে।

রণথম্বোর (১৩০১) : প্রকৃত নাম রণস্তম্ভপুর রাজপুতনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ। উলুঘ খাঁ ও নসরৎ খাঁ এ দুর্গ অবরোধ করলে রাণা হামীরের নেতৃত্বে রাজপুতগণ মুসলিমদের প্রতিহত করেন ও নসরৎ খাঁ নিহত হন। পরে সুলতান স্বয়ং আক্রমণ পরিচালনা করে দুর্গ অধিকার করেন। রাণা হামীর যুদ্ধে নিহত হন এবং তাঁর পরিবারের রমণীগণ আগুনে ঝাঁপ দিয়ে 'জহরব্রত' পালন করেন।

চিতোর (১৩০৩) : রণথমবোর অধিকার করার পর আলাউদ্দীন সমগ্র মেবার জয় করতে মনস্থ করেন। তিনি রাণা রতন সিংহের পত্নী পদ্মিনীর রূপলাবণ্যের জনশ্রুতিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মেবার আক্রমণ করে চিতোর অবরোধ করা

হয়। রাজা মুসলিম সৈন্যের হাতে বন্দী হলে রাণী পদ্মিনী স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবেন এই অজুহাতে ৭০০ ডুলির্তে ৭০০ সহচরীর পরিবর্তে বাছা বাছা রাজপুত সৈন্য নিয়ে গিয়ে রাণাকে উদ্ধার করে আনেন। পরে ছলনা ধরা পড়লে মুসলিম সৈন্যদলের প্রচণ্ড আক্রমণে চিতোর অধিকৃত হয়, কিন্তু ১৩১১ খৃস্টাব্দে রাণা রতন সিংহ পুনরায় চিতোর অধিকার করেন।



মালব (১৩০৫)ঃ চিতোরের পর আলাউদ্দীন মালব জয় করেন।

দেবগিরি (১৩০৬—১৩০৭)ঃ আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর দেবগিরি আক্রমণ করে রাজা রামচন্দ্রকে পরাজিত করে দিল্লীতে সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দেন। আলাউদ্দীনকে কর প্রদান করবেন এই শর্তে রামচন্দ্রকে

সামন্তরাজা স্বীকার করে রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়। **বরঙ্গল** (১৩০৯) : এরপর মালিক কাফুর দুর্গম অঞ্চল অতিক্রম করে তেলেঙ্গনার রাজধানী বরঙ্গল অবরোধ করেন। কাকতীয় বংশীয় রাজা প্রতাপরুদ্র দেব রাজকোষের সমস্ত অর্থসহ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। মালিক কাফুর এমন বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন দিল্লীতে নিয়ে আসেন 'যা বহন করতে ১ হাজার উট গুরুভারে কাতর হয়েছিল!' ১৩১০ খৃস্টাব্দে মালিক কাফুর গভীর নদী পাহাড় ও উপত্যকা অতিক্রম করে দ্বারসমুদ্র আক্রমণ করলেন। হয়সাল-রাজ বীরবল আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি ৩৬টি হাতি এবং সোনারূপা মণিমুক্তার প্রচুর সম্পদ হস্তগত করলেন। বহুমন্দির লুঠপাঠ করে ধ্বংস করে ফেলা হল। **মাদুরা** (১৩১১) : মালিক কাফুর দ্বারসমুদ্র থেকে দক্ষিণে পাণ্ড্যরাজ্য আক্রমণ করেন। এই বিজয় স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটি সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়। এখান থেকে প্রাপ্ত সম্পদের হিসাব দিয়েছেন আমীর খুসরু : ৫১২টি হাতি, ৫০০০ অশ্ব, প্রচুর পরিমাণে মরকত মণি ও চুনী। মাদুরা থেকে মালিক কাফুর ভারতের সর্বদক্ষিণ প্রান্ত রামেশ্বর পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করেন এবং সফল অভিযান শেষে প্রচুর ধনসম্পদ আহরণ করে দিল্লীতে ফিরে আসেন। ১২৯৭ থেকে ১৩১২ খৃস্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ ১৫ বছরে আলাউদ্দীন সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে দিল্লীর প্রাধান্য স্থাপন করে অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করেন।

আলাউদ্দীনের শাসন-সংস্কার

আলাউদ্দীনের শাসনসংস্কার তিন ভাগে আলোচনা করা যায় : ১. রাজনৈতিক-সংস্কার ২. সামরিক সংস্কার ৩. অর্থ নৈতিক সংস্কার।

রাজনৈতিক সংস্কার : আলাউদ্দীনের সিংহাসন লাভের পর তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও অমাত্যরা পর পর চারবার বিদ্রোহ করে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত ও হত্যা করার চেষ্টা করে। সাহস ও বুদ্ধিবলে বিদ্রোহগুলি দমন করে সুলতান সিংহাসন নিরাপদ করার জন্য এমন কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যার ফলে অমাত্যদের সুলতানের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়ার বা এককভাবে বিরোধিতা করার পথ বন্ধ হয়ে যায়। অমাত্যদের খর্ব ও সহায়হীন করে রাখার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দীন যে রাজনৈতিক-সংস্কার প্রবর্তন করেন, তা হল :

১. নানা অজুহাতে আলাউদ্দীন এদের কাছ থেকে অর্থ আদায় ও জাগীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেন। ঐতিহাসিক **Lane Poole** বলেছেন—জীবিকা অর্জন করতেই এরা এমন বিব্রত হয়ে পড়েছিল যে, বিদ্রোহের কথা চিন্তা করার আর অবসর ছিল না।

২. আলাউদ্দীন আমীরদের সামাজিক উৎসব বন্ধ করে দেন, এমন কি সুলতানদের পূর্ণ অনুমতি ছাড়া তাদের পরস্পরের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনও নিষিদ্ধ হয়। জিয়াউদ্দীন বরণী বলেছেন পান-ভোজন-আতিথেয়তা বন্ধ হয়ে

যায়। অমাত্যরা একে অপরের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ না রেখে একান্ত শান্তভাবে জীবনযাপন করতে থাকে।

৩. সুরাপানোৎসবে অমাত্যরা পরস্পর মেলামেশা ও ষড়যন্ত্র করার সুযোগ পেত। সুলতান সুরাপান করা নিষিদ্ধ করে দেন।

৪. অমাত্য, রাজকর্মচারী ও প্রজাবর্গের গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্য ব্যাপক গুপ্তচর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

৫. সুলতান নিজে গোঁড়া মুসলমান হলেও রাজ্যশাসন ব্যাপারে ইসলাম ধর্মের উলেমা-মৌলবীদের প্রভাব বিস্তার করতে দেননি।

রাজ্যের অন্য সম্প্রদায়ের চেয়ে হিন্দুদের বেশি কর দিতে হত এবং নানা প্রকার আর্থিক শোষণে বিপন্ন হিন্দুগণ যাতে দীনভাবে বসবাস করতে বাধ্য হয় সুলতান সেরকম ব্যবস্থা করেছিলেন।

রাজস্ব ব্যবস্থা ঃ আলাউদ্দীনই প্রথম মুসলিম শাসক যিনি রাজ্যের সমস্ত জমি জরিপ করিয়ে রাজস্ব নির্ধারণ করে দেন। রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা হয় যাতে তারা উৎকোচ নিতে প্রলুব্ধ না হয়। কেউ সামান্যতম উৎকোচ গ্রহণ করলে তার কঠিন সাজার ব্যবস্থা ছিল। আলাউদ্দীন রাজস্বের হার উৎপন্ন ফসলের ⅓-এর পরিবর্তে ½ ধার্য করেন। বরণী বলেছেন, সুলতানের রাজস্বনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু অথবা সকল প্রজাকেই দারিদ্র্যের স্তরে দুর্বল করে রাখা।

সুলতানের রাজনৈতিক-সংস্কার প্রকৃতপক্ষে অমাত্য, কর্মচারী, প্রজাসাধারণ সকলকে অর্থনীতিক দিক থেকে দুর্বল, সামাজিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন এবং প্রশাসনিক দিক থেকে নতমস্তক করে রেখে স্বৈরাচারী শাসন বজায় রাখার জন্য পরিকল্পিত হয়েছিল।

সামরিক সংস্কার ঃ আলাউদ্দীনের শাসন ছিল সামরিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল স্বৈরাচারী শাসন।

১. সামরিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় আলাউদ্দীন এক বিরাট সৈন্য-বাহিনী গড়ে তোলেন ;

২. সেনাবাহিনী সুশৃঙ্খল, উপযুক্ত অস্ত্রে সজ্জিত এবং অনুগত রাখার জন্য সুলতান কতকগুলি সংস্কার সাধন করেন। যেমন ঃ প্রতি অশ্বারোহীর বার্ষিক ২৩৪ টংকা বেতন নিয়মিত দেওয়া ; (১ টংকা বর্তমান টাকার ১⅓) ;

৩. অশ্বারোহী নিজস্ব দুটি অশ্ব ব্যবহার করলে অতিরিক্ত ৭৮ টংকা পেত ;

৪. সৈন্যদলের অশ্ব দাগচিহ্নিত করা ; প্রতি সৈন্যের বিবরণ সহ হাজিরা খাতা রাখা ;

৫. কারখানায় উন্নতমানের অস্ত্র তৈরি করে সৈন্যদের সরবরাহ করা ;

৬. সীমান্তের দুর্গ সংস্কার ও নতুন দুর্গ নির্মাণ ; তরুণ সৈন্য ও অভিজ্ঞ সেনাপতি দ্বারা সীমান্ত রক্ষার বন্দোবস্ত।

আলাউদ্দীন কতকগুলো সম্পূর্ণ নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলন করেন। এগুলি হল ঃ

১. সরকারিভাবে যাবতীয় সাধারণ ভোগ্য পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। খাদ্যবস্তু, ফল, তেল, জুতো, চিরুনি, সূচ প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্য মূল্য তালিকায় ধরা হয়েছিল। নির্দিষ্ট মূল্যের অতিরিক্ত কেউ যাতে না নিতে পারে সেদিকে কড়া নজর ছিল ;

[সে যুগে আলাউদ্দীন কোন জিনিসের কি দর নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তার কয়েকটি জিনিসের নির্ধারিত মূল্য উল্লেখ করা হল। তখনকার ১ টংকা এখনকার **১ টাকা ৩৩ পয়সা ; ১ জিতাল = ৩ পয়সা।**]

দ্রব্য	পরিমাণ	মূল্য
গম	প্রতি মণ	৭½ জিতাল
যব	,,	৪ ,,
ধান	,,	৫ ,,
ডাল	,,	২ ,,
চিনি	প্রতি সের	১½ ,,
মাখন	প্রতি ২½ সের	১ ,,
লবণ	প্রতি মণ	২ ,,
একজন দাসী		৫-১২ টংকা
একজন দাস-মজুর		১০-১৫ ,,
একটি ঘোড়া		৬৫-১২০ ,,

২. যাবতীয় দ্রব্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য রাজধানীর একশ মাইলের মধ্যে সব উৎপাদক চাষীকে নিজের খরচের জন্য ১০ মণ শস্য বাদে সমস্ত ফসল সরকারের কাছে বিক্রি করতে হত ;

৩. খাদ্যদ্রব্য মজুত করে রাখার জন্য বহু গুদাম ও শস্যভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছিল ; এই ব্যবস্থা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক **Moreland** বলেছেন, আলাউদ্দীন এক ধরণের রেশন ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। এর ফলে খাদ্যশস্যের এমন সরবরাহ ছিল যে, খরার সময়েও দিল্লীর লোকেরা অভাব বোধ করেনি ;

৪. ব্যবসায়ীগণ যাতে দূববর্তী অঞ্চল থেকে বিবিধ সামগ্রী নিরাপদে রাজধানীতে নিয়ে আসতে পারে সেজন্য সুষ্ঠু পরিবহনের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল ;

৫. বিপণি অধ্যক্ষ (শাহনা-ই-মণ্ডি) যাবতীয় পণ্য দ্রব্যের তালিকা, বিক্রেতার নাম ঠিকানা, দ্রব্যের পরিমাণ, ওজন ইত্যাদির ওপর কড়া নজর রাখতেন। ওজন কম দিলে শাস্তি ছিল বিক্রেতার দেহ থেকে সেই পরিমাণ মাংস কেটে নেওয়া।

শিল্প সংস্কৃতি ঃ আলাউদ্দীন নিজে নিরক্ষর হলেও শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজদরবারে গুণী ব্যক্তিদের মধ্যে আমীর খুসরু কবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও গদ্যলেখক হিসাবে বিশেষ পরিচিত। আমীর খুসরু 'তোতি-ই-হিন্দ্', হিন্দুস্থানের তোতা নামে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচনা থেকে আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের অনেক ঘটনার বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়া ও শেখ রুকুনউদ্দীন ধর্মপরায়ণ দরবেশরূপে সম্মানিত হতেন। এখনও এঁরা মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র।

আলাউদ্দীন শিল্পসৌন্দর্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি দিল্লীতে 'সীরি' নামে এক নতুন শহরের পত্তন করেছিলেন। কুতুবমিনারের কাছে এক উচ্চতর মিনার নির্মাণ শুরু করেন এখনও যার ভগ্নস্তূপ দেখা যায়। কুতুবমিনারের চত্বরে আলাউদ্দীন নির্মিত বিশাল তোরণ **আলাই দরওয়াজা** নামে পরিচিত। এছাড়া তিনি দিল্লীতে **হাউজ খাস** নামে এক প্রকাণ্ড দীঘি খনন করেছিলেন যা এখন বনভোজনের যোগ্য স্থান বলে বিবেচিত হয়।

খিলজী বংশের পতন ঃ আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর বিশাল রাজ্য শাসন করার মত তাঁর যোগ্য কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। সিংহাসন অধিকারের কলহে দাক্ষিণাত্য বিজয়ী সেনাপতি মালিক কাফুর অন্য সকলকে অপসারিত করে রাজক্ষমতা অধিকার করেন। কিন্তু ষড়যন্ত্র ও নিষ্ঠুরতার জন্য তিনি সকলের বিরাগভাজন হন এবং আলাউদ্দীনের মৃত্যুর ৩৬ দিন পরেই তিনি আমীরদের হাতে নিহত হন।

তোগলকবংশ (১৩২০-১৪১৪)

গিয়াসউদ্দীন তোগলক তোগলক-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। আলাউদ্দীন খিলজীর আমলে গিয়াসউদ্দীন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শাসক ছিলেন। আলাউদ্দীনের বিশ্বস্ত কর্মচারী, ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ গিয়াসউদ্দীন আলাউদ্দীনের পরবর্তী অকর্মণ্য শাসক খুসরো খাঁকে হত্যা করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। জাঠ মাতা এবং তুর্কী পিতার সন্তান গিয়াসউদ্দীনের পূর্বনাম ছিল গাজী তোগলক।

মহম্মদ তোগলক (১৩২৫-৫৯)

তোগলকবংশের দ্বিতীয় সুলতান মহম্মদ তোগলক ইতিহাসের এক বিতর্কিত পুরুষ। তাঁর চরিত্র ও আচরণে বিরুদ্ধ দোষ-গুণের সমাবেশ দেখা যায়। একদিকে বিদগ্ধ পণ্ডিত কিন্তু অনেক সময় আচরণ চরম মূর্খের মত; সাহসী যোদ্ধা, আবার কখনও ভীরুর মত ব্যবহার; ধার্মিক ও দয়ালু, আবার অনুদার ও নিষ্ঠুর।

মহম্মদ তোগলকের কয়েকটি কর্ম-পরিকল্পনা (১৩২৬)

দোয়াব অঞ্চলে করবৃদ্ধিঃ গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী উর্বর শস্যপ্রসূ অঞ্চলে করবৃদ্ধি মহম্মদ তোগলকের প্রথম প্রশাসনিক ব্যবস্থা। প্রজাসাধারণের অপারগ অবস্থা সুলতানের আদেশের বিরোধিতা মনে করে চাষীর ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালান হয়। **Lane-Poole** বলেন, কর অনাদায়ে ক্রুদ্ধ হয়ে সুলতান অসহায় হিন্দুদের বুনো প্রাণীর মত হত্যা করেন ; জঙ্গলের মধ্যে তাদের ঘিরে ফেলে বাঘ-ভালুক যেমন মারা হয় তেমনি হাজারে হাজারে নিধন করা হয় তাদের।

ঐতিহাসিক বরণী বলেছেন, সমগ্র অঞ্চল ধ্বংস হয়ে যায়। চাষ আবাদ ব্যাহত হয়, চাষীর মেরুদণ্ড যায় ভেঙে। অবশেষে সুলতান নিজের ভুল বুঝতে পেরে কৃষি-ঋণ দিয়ে এবং কূপ খনন করে চাষীকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেন কিন্তু শুভ বুদ্ধি এবং সহায়ক ব্যবস্থা হয় অনেক বিলম্বে।



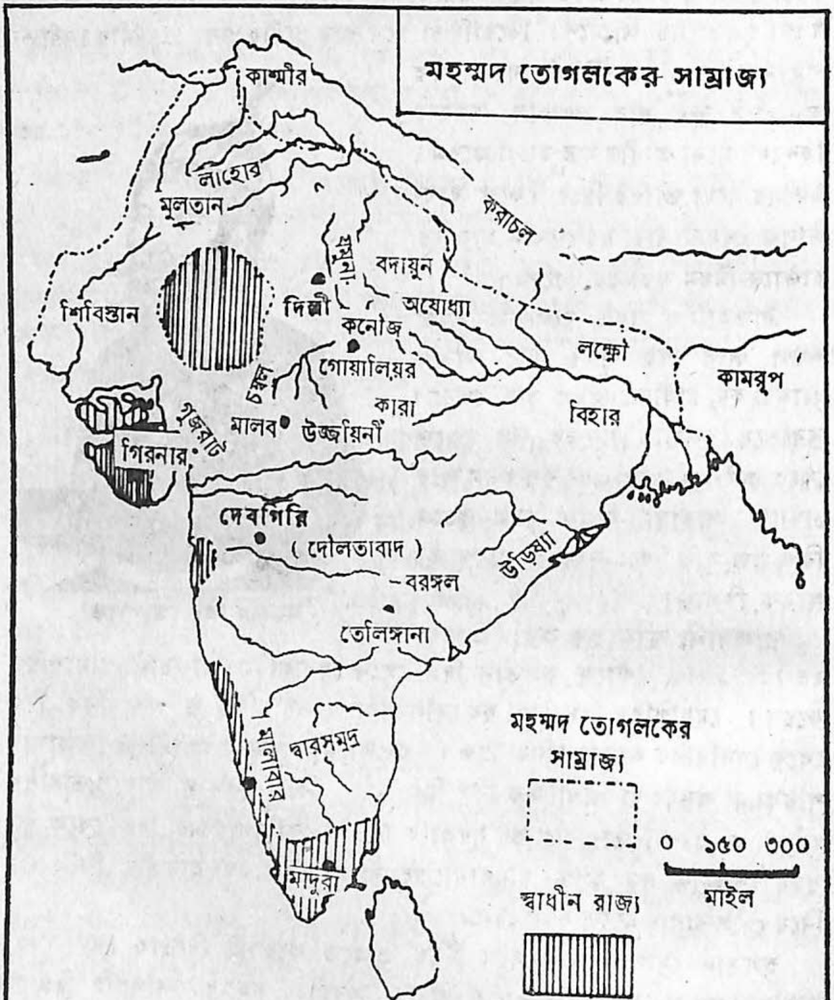
মহম্মদ বিন তোগলক

রাজধানী স্থানান্তর করা (১৩২৬-২৭): ১৩২৬ খৃস্টাব্দে সুলতান দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। দেবগিরির নাম রাখা হয় দোলতাবাদ। সামরিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে দেবগিরির অনেক সুবিধা ছিল। সুলতানের নতুন রাজধানী গড়ে তোলার পরিকল্পনা অন্যায় বা অযৌক্তিক কিছু ছিল না। কিন্তু সুলতান তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অধৈর্য ও হঠকারিতার বশে শুধু সরকারি দপ্তর ও কোষাগার নয়, দিল্লী থেকে স্ত্রী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ, রুগ্ন সমস্ত অধিবাসীকেই তাদের সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্র নিয়ে দোলতাবাদ যেতে হুকুম দেন।

সুলতান দোলতাবাদে গেলে উত্তর ভারতে কয়েকটি বিদ্রোহ দেখা দেয়। মঙ্গোলরা ঘন ঘন আক্রমণ চালাতে থাকে। অবশেষে মহম্মদ তোগলক দিল্লীতে ফিরে যাওয়া মনস্থ করেন এবং ৮ বছর পর আগের মতই দুর্ভোগের ভিতর দিয়ে বাসিন্দাদের ফিরে আসতে বাধ্য করেন। **Lane-Poole** বলেন, দোলতাবাদ ভ্রান্ত উদ্যমের এক বিরাট নজির—**Daulatabad** was **a monument of misdirected energy.**

তামার নোট প্রবর্তন (১৩৩০): অর্থসংকট মেটানোর জন্য তামার নোট প্রবর্তন সুলতান মহম্মদ তোগলকের এক অভিনব ব্যবস্থা। রাজ্যের মধ্যে সোনা

ও রূপার বিভিন্ন মানের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। সুলতান অল্পমূল্যের ধাতুতে বিভিন্ন অঙ্কের ছাপ দিয়ে প্রতীক মুদ্রা চালু করতে চেয়েছিলেন। কাগজের ওপর টাকায় পরিমাণ ছাপ দিয়ে যদি ছোট বড় পরিমাণের টাকা চালান যায়, তবে তামার



ওপর অঙ্ক চিহ্ন দিয়ে মুদ্রা প্রচলনের যুক্তি অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেকালে অপরের পক্ষে অননুকরণীয় ধাতু-মুদ্রা তৈরির যান্ত্রিক কৌশল জানা না থাকায় প্রচুর সংখ্যায় নকল তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হতে থাকে। বাধ্য হয়ে সুলতান মুদ্রা চালানোর আদেশ বাতিল করেন।

বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা : নিজের শক্তি সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণার ফলে মহম্মদ তোগলক পারস্যের খোরাসান জয়ের পরিকল্পনা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। এক বছর ধরে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার সৈন্যের বেতন দিয়ে ভরণ-পোষণ করার পর সুলতান এ অভিলাষ পরিত্যাগ করেন এবং সৈন্যদল ভেঙে দেন। বিক্ষুব্ধ সেনারা দেশের মধ্যে লুঠপাঠ, অশান্তি সৃষ্টি করে। এরপর সুলতান মালিক নিকপাই নামে এক সেনাপতির অধীনে ১ লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্যের একদল তিব্বত জয় করার উদ্দেশ্যে হিমালয় অঞ্চলে পাঠান। কাংড়া উপত্যকা পার হয়ে যাওয়ার পথে পাহাড়ী লোকেদের আক্রমণে সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয়ে যায় ; সেনাপতি নিকপাই, ২ জন কর্মচারী এবং ১০ জন অশ্বারোহী জীবিত অবস্থায় দিল্লীতে ফিরে আসে।

শুধু যে সেনাবাহিনী ধ্বংস ও রাজকোষ নিঃশেষ হয়েছিল তাই নয়, সুলতানের খ্যাতি এমনভাবে ক্ষুণ্ণ হয় যে, অত্যাচারে নিপীড়িত রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং সুলতানের পক্ষে আর বড় সৈন্যদল গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

মহম্মদ তোগলক তাঁর পূর্ববর্তী যে কোন সুলতান অপেক্ষা বৃহত্তর সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রদেশগুলিতে বিদ্রোহ শুরু হয় এবং সাম্রাজ্যের ভাঙন দেখা দেয়। বঙ্গদেশ ও গুজরাট ছাড়া দক্ষিণ ভারতে বিজয় নগর নামে একটি হিন্দুরাজ্য স্বাধীন হয়ে যায়। সিন্ধুদেশে বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে সুলতান অসুস্থ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। মুসলমান ঐতিহাসিক বদায়ুনী বলেছেন—মরে সুলতান বাঁচলেন, প্রজারাও তাঁর কবল থেকে বাঁচল।

ফিরোজ তোগলক (১৩৫১-১৩৮৮) : বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে সিন্ধুতীরে মহম্মদ-বিন তোগলকের মৃত্যু হলে তাঁর সৈন্যদল শত্রুর আক্রমণে বিপন্ন হয়। তখন সৈন্যদলস্থিত প্রধানদের অনুরোধে মহম্মদের পিতৃব্যপুত্র ফিরোজ সিংহাসন গ্রহণ করেন এবং সৈন্যবাহিনী নিরাপদে দিল্লীতে ফিরিয়ে আনেন।

শিল্পের প্রতি অনুরাগ : শিল্প-সৌন্দর্যের প্রতি ফিরোজ শাহের বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি হিসারফিরোজ ও জৌনপুর নামে দুটি শহর, বহু মসজিদ, দুর্গ, শিক্ষালয় ও জলসেচখাল নির্মাণ করেছিলেন। রাজধানী সাজানোর জন্য তিনি আম্বালা জেলা ও মীরাট থেকে অশোকস্তম্ভ দিল্লীতে এনে স্থাপন করেন। ইতিহাসে সুলতানের আগ্রহ ছিল।

শাসন ব্যবস্থা : শাসনকার্যে ফিরোজ শাহ মহম্মদ তোগলকের থেকেও কঠোরতার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি রাজস্বের হার কমিয়ে দেন এবং অপরাধীর ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার ও অঙ্গহানি নিষিদ্ধ করে দেন। কিন্তু ধর্মান্ধ মুসলমান হিসাবে তিনি হিন্দুর মন্দির ও দেববিগ্রহ ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ নীতি বলে গ্রহণ করেছিলেন। পূর্বে হিন্দুদের ওপর যে জিজিয়াকর নির্ধারিত ছিল

তাকে ব্রাহ্মণদের রেহাই দেওয়া হত কিন্তু ফিরোজ শাহ ব্রাহ্মণদের ওপরও কর ধার্য করেন। ৪০, ২০ ও ১০ টংকা—এই তিন শ্রেণীর কর ছিল। হিন্দুরা ইসলামধর্ম গ্রহণ করলে তাদের কর দিতে হত না।

মহম্মদ তোগলকের আমলের বিশৃঙ্খলা ও প্রজার ওপর ভয়াবহ অত্যাচার কিছু পরিমাণে হ্রাস পেলেও ফিরোজ তোগলক নিরপেক্ষ সুশাসন প্রবর্তন করতে পারেননি। ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর অযোগ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কলহ শুরু হয়। সেই অরাজক অবস্থার সুযোগে তৈমুরলঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন।

তৈমুরের ভারত আক্রমণ (Invasion of Timur): তৈমুরলঙ্গ (১৩৩৬-১৪০৫ খৃঃ) ১৩৩৬ খৃস্টাব্দে সমরখন্দের নিকট কেশ নামক ক্ষুদ্র শহরে তৈমুরের জন্ম। বাল্যে এক দুর্ঘটনায় এক পা হারিয়ে তিনি তৈমুরলঙ্গ (খঞ্জ তৈমুর) নামে পরিচিত হন। তিনি ছিলেন চাঘতাই তুর্কীদের নেতা। ১৩৬৯ খৃস্টাব্দে সমরখন্দের সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি পারস্য, আফগানিস্তান ও মেসোপটেমিয়া জয় করেন এবং ভারতের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করেন।

১৩৯৮ খৃস্টাব্দে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে তৈমুর ভারত আক্রমণ করেন। ঐতিহাসিক স্মিথ বলেন, এই অভিযানের জন্য কোন অজুহাতের প্রয়োজন ছিল না। দিল্লী-সুলতানের দুর্বলতা, ভারতের ধনরত্নের প্রাচুর্য এবং এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই পৌত্তলিক—এগুলিই তাঁকে ভারত আক্রমণে প্রলুব্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ১৩৯৭ খৃস্টাব্দের শেষ দিকে তৈমুরের পৌত্র পীর মহম্মদ অগ্রগামী বাহিনী নিয়ে উচ এবং মুলতান অধিকার করেন (১৩৯৮)। শরৎকালে তৈমুরলঙ্গ নিজে ৯০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ তলম্ব, দীপালপুর, ভাতনীর প্রভৃতি জনপদ লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করে দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হলেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে প্রায় ১ লক্ষ বন্দী হিন্দু ছিল। পাছে তারা বিদ্রোহী হয় এই আশংকায় তৈমুর তাদের হত্যা করলেন এবং তোগলক বংশের শেষ সুলতান নাসিরুদ্দীন মামুদকে পরাজিত করে দিল্লী অধিকার করলেন। নাগরিকদের প্রতিরোধে ক্ষিপ্ত হয়ে তৈমুর পাঁচ দিন ধরে দিল্লীতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন চালান এবং রাজধানীর যাবতীয় ধনরত্ন হস্তগত করেন। তাছাড়া বহুসংখ্যক বন্দী নরনারী এবং তাঁর রাজধানী সমরখন্দ শিল্পশোধে সজ্জিত করার জন্য দিল্লীর যাবতীয় দক্ষ শিল্পী সঙ্গে নিয়ে ১৩৯৯ খৃস্টাব্দে ভারত ত্যাগ করেন, পিছনে রেখে যান অরাজকতা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী।

তৈমুরের ভারত আক্রমণের ফল: তৈমুলঙ্গের আক্রমণের ফলে ভারতে বিশেষ অপূরণীয় রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক ক্ষতি সাধিত হয়, যথা—

(১) **দিল্লী সাম্রাজ্যের বিপর্যয়:** দিল্লীর নিকটে তোগলক বংশের শেষ সুলতান নাসিরুদ্দীন মামুদের পরাজয় তোগলক সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করে।

সাম্রাজ্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলা শুরু হয় এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ একের পর এক স্বাধীনতা ঘোষণা করতে থাকে, ফলে জরাজীর্ণ তোগলক সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে।

(২) **ব্যাপক ধ্বংস লীলা :** তৈমুর ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন ও ব্যাপক ধ্বংস সাধন করে সমৃদ্ধ নগর ও জনজীবনের অশেষ ক্ষতি করেছিলেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নির্মম হত্যাকাণ্ড ও মানুষের সঞ্চিত অর্থ অপহরণ নাগরিক জীবন বিষণ্ণ, দরিদ্র ও বিপন্ন করেছিল। মুসলিম ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরানির কথায়, এই সময় দিল্লীতে এমন দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর আবির্ভাব হল যে, শহর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল ; যে নাগরিকেরা অবশিষ্ট রইল তারাও মৃত্যুমুখে পতিত হল ; দুই মাসের মধ্যে দিল্লীতে একটি পাখিকেও ডানা মেলে উড়তে দেখা গেল না।

(৩) **হিন্দু-মুসলমানে তিক্ততা সৃষ্টি :** তৈমুর হিন্দুদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করেন। তিনি লুঠপাট করে লাখে লাখে তাদের হত্যা করেছেন। দিল্লীতোরণের কাছে একই দিনে ১ লক্ষ বন্দী হিন্দুকে হত্যা করা হয়। এর ফলে হিন্দুদের মনে সাধারণভাবে মুসলমানদের প্রতি বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

(৪) **বিদেশে ভারতীয় শিল্পের প্রসার :** তৈমুর ভারতে শিল্পসম্পদ ধ্বংস করেন কিন্তু দক্ষ শিল্পীদের নিজ রাজ্যে নিয়ে যান তাদের শিল্প কর্মদ্বারা নিজ রাজধানীর সৌন্দর্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। এইভাবে প্রকারান্তরে বিদেশে ভারতীয় শিল্পধারার প্রসারলাভ ঘটে।

(৫) **দিল্লীতে নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা :** ভারত ত্যাগের পূর্বে তৈমুর খিজর খাঁকে লাহোর, মূলতান ও দীপালপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে যান। খিজর খাঁ ও তাঁর উত্তরাধিকারী তিনজন হজরত মহম্মদের বংশের সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি করতেন এবং 'সৈয়দ' নামে পরিচিত হন। ইতিহাসে এই বংশ **সৈয়দবংশ** বলে উল্লিখিত হয়।

(৬) **বাবরের আক্রমণের পথ সুগম :** তৈমুরের আক্রমণের ফলে দিল্লী সুলতানের শাসনযন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে। এই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল অবস্থা বাবরকে ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করেছিল। অধিকন্তু তৈমুরের উত্তরাধিকারীরূপেও তিনি দিল্লী সিংহাসনের দাবিদার হয়েছিলেন।

সৈয়দ বংশ (১৪১৪-১৪৫০ খৃঃ) : তৈমুরলঙ্গ ভারত ত্যাগ করে গেলে তোগলক বংশের শেষ সুলতান মামুদ রাজধানী দিল্লীতে ফিরে আসেন কিন্তু পাঞ্জাবের শাসনকর্তা খিজর খাঁ তাঁকে শান্তিতে থাকতে দেননি। ১৪১২ খৃস্টাব্দে মামুদের মৃত্যু হলে তোগলক বংশের অবসান ঘটে। এর দুই বছর পর খিজর খাঁ দিল্লীতে সৈয়দবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

খিজর খাঁ হজরত মহম্মদের বংশসম্ভূত বলে দাবি করতেন তাই তাঁর বংশ **সৈয়দবংশ** নামে পরিচিত হয়। খিজর খাঁ ও তাঁর তিনজন উত্তরাধিকারী ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। অর্থনৈতিক সংকট ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় জনজীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। এই সময় বহলূল লোদী পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি দিল্লী অধিকার করে লোদীবংশের পত্তন করেন।

লোদীবংশ (১৪৫১-১৫২৬ খৃঃ) : লোদীবংশের প্রতিষ্ঠাতা বহলুল লোদী জাতিতে আফগান। তিনি দিল্লীর ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন ; জৌনপুর ও উত্তর প্রদেশের প্রায় সমস্ত অঞ্চল অধিকার করে তিনি পাঞ্জাব থেকে বারাণসী পর্যন্ত দিল্লী সুলতানের শাসনাধীনে আনেন। শাসক হিসাবে বহলুল লোদী যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেন। ১৩৮৮ খৃস্টাব্দে বহলুলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দর লোদী সিংহাসন লাভ করেন।

সিকান্দার লোদী (১৪৮৮-১৫১৭ খৃঃ) : বহলুল লোদীর পুত্র সিকান্দার লোদী লোদীবংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান। ২৮ বৎসর রাজত্বকালে তিনি সুলতানের শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। আগ্রায় তিনি নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। রাজ্যের দস্যুতস্করের উপদ্রব বন্ধ করে, পথঘাট যাত্রীদের পক্ষে নিরাপদ করে, চাষীর কাজে উৎসাহ দিয়ে এবং খাদ্যবস্তুর মূল্য কমিয়ে তিনি জনসাধারণের জীবনে স্বস্তির ভাব ফিরিয়ে এনেছিলেন। সিকান্দার নিজে কবি এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন কিন্তু জীবনের শেষ দিকে ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং হিন্দুবিদ্বেষ তাঁকে হিন্দুদের কাছে অপ্রিয় করে তুলেছিল। ১৫১৭ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-১৫২৬ খৃঃ) : সিকান্দার লোদীর মৃত্যুর পর রাজ্যের ওমরাহগণ সিকান্দারের দুই পুত্রের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দেন। ইব্রাহিম হন দিল্লীর সুলতান এবং তাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা জালাল খাঁকে দেওয়া হয় জৌনপুর রাজ্য। কিন্তু এ ব্যবস্থা ইব্রাহিমের মনঃপূত হয়নি। তিনি যুদ্ধে জালাল খাঁকে হত্যা করে জৌনপুর অধিকার করেন। এর পর তিনি গোয়ালিয়র দখল করেন এবং মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ইব্রাহিম তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং অমাত্যবর্গের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে চলতে পারেন নি। ফলে সকলেই তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠেন। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলৎ খাঁ লোদী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ইব্রাহিমের খুল্লতাত আলম খাঁ সুলতানের রোষ থেকে আত্মরক্ষা করতে পাঞ্জাবে গিয়ে আশ্রয় নেন। এইরূপ অসহনীয় পরিবেশে ইব্রাহিমের অত্যাচার থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে দৌলৎ খাঁ এবং আলম খাঁ কাবুলের শাসক বাবরকে ভারত আক্রমণ করতে আমন্ত্রণ জানান। প্রথম পানিপথ যুদ্ধে (২১ এপ্রিল, ১৫২৬ খৃঃ) বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। এর ফলে দিল্লী সুলতানীর অবসান এবং ভারতে মোগল রাজত্বের সূচনা হয়।

কতকগুলি আঞ্চলিক রাজ্যের উত্থান

(ক) **ইলিয়াস শাহী শাসনাধীনে বাংলা ঃ** ইক্তিয়ার উদ্দীন নবদ্বীপ অধিকার ও লুণ্ঠনের পর লক্ষ্মণাবতী অধিকার করেন এবং গৌড় মুসলমানদের রাজধানী হয়ে ওঠে। নবদ্বীপ ত্যাগ করে লক্ষ্মণসেন অল্প কয়েক বছর মাত্র রাজত্ব করেছিলেন। তারপর তাঁর তিন পুত্র মাধব, বিশ্বরূপ ও কেশবসেন অনেকদিন পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেন। ক্রমে মুসলমানেরা তাঁদের রাজ্য অধিকার করে নেয় এবং সমগ্র বঙ্গদেশে মুসলমানের রাজত্ব আরম্ভ হয়।

সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ঃ তোগলক রাজবংশ যখন দিল্লী শাসন করছিল সেই সময় বঙ্গদেশ দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে স্বাধীনতা অবলম্বন করে। এজন্য বাংলার সুলতানকে দিল্লীর সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এই যুদ্ধে যিনি অপরাজিত থাকার কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তিনি সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ।

ইলিয়াসের পূর্ব নাম হাজী ইলিয়াস। ইনি গৌড়ের সুলতান আলী শাহকে অপসারিত করে সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ নাম ধারণ করেন। তাঁর সিংহাসন অধিকার করার আগে পূর্ববঙ্গ পৃথকভাবে স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। তিনি পূর্ববঙ্গ জয় করে সমগ্র বঙ্গদেশের অধিপতি হন।

বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধ ঃ ইলিয়াসকে দমন করার জন্য দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে গৌড় আক্রমণ করেন। ইলিয়াস গৌড় ত্যাগ করে একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। ফিরোজ শত চেষ্টা করেও একডালা অধিকার করতে পারলেন না। বর্ষাকালে সম্রাটের সৈন্য বিপন্ন হবে এই আশংকায় তিনি ফিরে যেতে বাধ্য হন। ইলিয়াস শাহের সেনাপতি ছিলেন হিন্দু সহদেব। হিন্দু রাজারা এবং হিন্দু পাইক-সৈন্যগণ ইলিয়াস শাহের পক্ষে যুদ্ধ করে বঙ্গের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিলেন। ইলিয়াস শাহ বিখ্যাত ইলিয়াসশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই রাজবংশ দীর্ঘকাল গৌরবের সঙ্গে বঙ্গদেশ শাসন করেছিল।

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ ঃ ইলিয়াস শাহী বংশের তৃতীয় সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ নানা গুণের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি পিতৃভক্ত ছিলেন, অথচ বিমাতার চক্রান্তে পিতার সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পিতা তাঁর কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি পুত্রকে ক্ষমা করে আশীর্বাদ করেছিলেন।

গিয়াসুদ্দীন ফার্সীতে কবিতা লিখতে পারতেন। একবার তিনি কবিতার একটি চরণ লিখে সিরাজ সহরে কবি হাফেজের কাছে পাঠিয়ে পরের চরণ মিল করে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। হাফেজ তাঁর অনুরোধ রেখেছিলেন।

ন্যায়বিচার: গিয়াসুদ্দীন ন্যায়বিচারক ছিলেন। একবার তাঁর তীরের আঘাতে এক বিধবার পুত্র নিহত হয়। বিধবা কাজীর কাছে নালিশ করলে কাজী সুলতানকে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বিধবার ক্ষতিপূরণ করতে নির্দেশ দেন। সুলতান বিধবাকে অর্থদানে সন্তুষ্ট করেন। তখন পোশাকের নীচে থেকে তরবারি বার করে তিনি কাজীকে বলেন, ন্যায়বিচার না করলে তিনি কাজীর মাথা কেটে ফেলতেন। কাজীও আসনের তলা থেকে চাবুক বার করে সুলতানকে দেখান এবং বলেন, তাঁর আদেশ অমান্য করলে তিনি চাবুক মেরে তাঁকে বাধ্য করতেন। সুলতান কাজীর ন্যায়বিচারে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করেন।

হিন্দু-বিদ্বেষের ফল: মুসলমান সুলতানরা প্রথম দিকে যোগ্য হিন্দুকে রাজকার্যে নিযুক্ত করতেন। এতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও বিশ্বাসের ভাব থাকত। কিন্তু গিয়াসুদ্দীন রাজত্বের শেষ দিকে দরবেশদের পরামর্শে অতিমাত্রায় হিন্দুবিদ্বেষী হয়ে ওঠেন ও সমস্ত হিন্দু কর্মচারী বিতাড়িত করেন। রাজা গণেশ এতদিন ইলিয়াসশাহী সুলতানদের সমর্থক ছিলেন। গিয়াসুদ্দীনের হিন্দুর প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের জন্য গণেশ চক্রান্ত করে গিয়াসুদ্দীনকে হত্যা করে নিজে শাসনক্ষমতা অধিকার করেন।

রাজা গণেশ: রাজা গণেশ উত্তরবঙ্গে ভাতুড়িয়ার শক্তিমান জমিদার ছিলেন। হিন্দুবিদ্বেষী গিয়াসুদ্দীনকে অপসারিত করে পর পর দুজন অকর্মণ্য সুলতানকে সিংহাসনে বসানো হয়, কিন্তু গণেশই রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। পরে সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে সিংহাসন দখল করে ১৪১৫ খৃস্টাব্দে তিনি রাজা হন। এই সময় চীন সম্রাটের এক দূত নানারকম উপহার নিয়ে গণেশের রাজসভায় এসেছিলেন।

ইব্রাহিম শর্কীর সঙ্গে যুদ্ধ: গণেশ গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করলে কিছুদিনের মধ্যেই মুসলমান সম্প্রদায়ের এক অংশ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। দরবেশগণ এই বিধর্মী রাজার বিরুদ্ধে মুসলমান প্রজাদের উত্তেজিত করেছিলেন। গণেশ কয়েকজন দরবেশকে শাস্তি দেন। এরপর দরবেশদের নেতা জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে গৌড়ে এসে গণেশকে উচ্ছেদ করার জন্য আবেদন জানান। বহু সৈন্যসামন্ত নিয়ে ইব্রাহিম গৌড় অভিমুখে অগ্রসর হলেন। গণেশ সে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে অসমর্থ হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করেন। তাঁর পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহ নাম ধারণ করে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

গণেশ বেশিদিন ক্ষমতাচ্যুত হয়ে থাকেন নি, অল্পকাল পরেই তিনি পুত্রকে অপসারণ করে পুনরায় সিংহাসন গ্রহণ করেন এবং দনুজমর্দনদেব নাম ধারণ পূর্বক প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করতে থাকেন। গণেশ সম্ভবতঃ পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে

যদুকে পুনরায় হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করিয়েছিলেন। সাহস, বুদ্ধি, কূটনীতি ও শাসন দক্ষতায় সে সময়ে গণেশের সমকক্ষ কেউ ছিল না।

হোসেন শাহ: হোসেন শাহের বাল্যজীবন সম্পর্কে নানা কাহিনী আছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হোসেন তুর্কীস্তানের তরমুজ শহরে সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার সঙ্গে তিনি বঙ্গদেশে আসেন ও রাঢ়ের চাঁদপুর অঞ্চলে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গোপালকের কাজ করতেন। বাংলার সুলতান হয়ে তিনি চাঁদপুর গ্রামখানি মাত্র এক আনা খাজনায় ঐ ব্রাহ্মণকে ভোগ করার অধিকার দেন। সেই গ্রাম আজ অবধি একানী চাঁদপুর নামে পরিচিত।

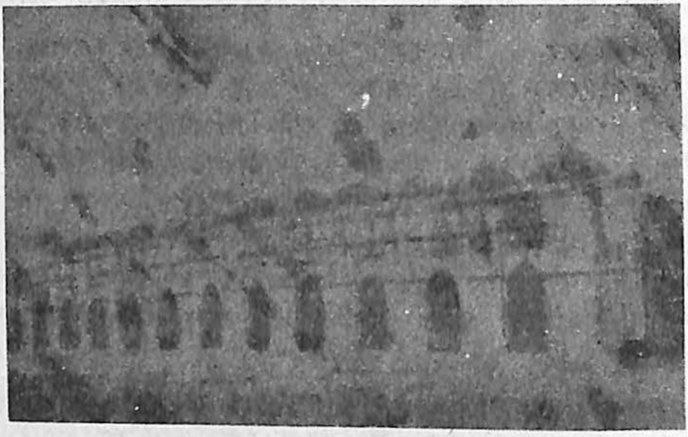
কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত নামক গ্রন্থে হোসেন শাহের বাল্যকালের একটি কাহিনী উল্লেখ করেছেন। গৌড়ের সুলতানের অমাত্য হওয়ার আগে হোসেন গৌড় রাজধানীর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে চাকুরী করতেন। সুবুদ্ধি রায় তাঁকে একটি দীঘি কাটানোর তদারকিতে নিযুক্ত করেছিলেন।

রাজ্যলাভ: বাল্যজীবন হীন অবস্থার মধ্যে কাটালেও হোসেন বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার গুণে বাংলার সিংহাসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি হাবসীদের ও হিন্দু পাইক (পদাতিক) সৈন্যের শক্তি খর্ব করেন। কামরূপ ও উড়িষ্যার সীমানা পর্যন্ত অঞ্চল জয় করে তিনি রাজ্যের পরিধি বিস্তার করেছিলেন। তিনি ছিলেন স্থিরবুদ্ধি সুশাসক। প্রতিভাশালী হিন্দুদের তিনি সমাদর করতেন। গোপীনাথ বসু নামে একজন কর্মদক্ষ কায়স্থ রাজত্বের প্রথম থেকেই তাঁর প্রধান অমাত্য ছিলেন। গোপীনাথকে তিনি 'পুরন্দর খাঁ' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। পুরন্দর খাঁর পর হোসেন শাহের প্রধান উজীর হয়েছিলেন রূপ ও সনাতন। তাঁর রাজত্বকালে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যে হোসেন শাহের যথেষ্ট প্রশংসা করা হয়েছে। হোসেন শাহকে বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম বলা যায়।

নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ: সুলতান হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ ১৫১৯ খৃস্টাব্দে গৌড়ের সুলতান হন। তিনি উদার ও অতি মহৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন। অন্যান্য সুলতানদের মত তিনি তাঁর ভ্রাতাদের হত্যা করেন নি, বরং তাদের বৃত্তির টাকা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

নসরৎ শাহ ত্রিহুত জয় করে রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেছিলেন। মোগল সম্রাট বাবরের সঙ্গে নসরতের যে যুদ্ধ হয় তাতে বাংলার সৈন্যগণ বিক্রম প্রদর্শন করেছিল। বাবর বাঙালী গোলন্দাজ সৈন্যের দক্ষতার বিশেষ প্রশংসা করেছেন। নসরৎ শাহের রাজত্বকালে পর্তুগীজেরা বঙ্গদেশে ঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা করেছিল কিন্তু তা সফল হয় নি।

শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগী ঃ নসরৎ শাহ গৌড়ের বিখ্যাত সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন। কদর-রসুল নামে প্রসিদ্ধ মসজিদটির প্রকোষ্ঠে মঞ্চ নির্মাণ করিয়ে



গৌড়ের বড়সোনা মসজিদ

তিনি তার ওপর হজরৎ মহম্মদের পদচিহ্ন যুক্ত একটি কারুকার্যখচিত কালো মর্মর বেদী স্থাপন করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের উৎসাহদাতা হিসাবে নসরৎ শাহ স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর রাজত্বকালে শ্রীকর নন্দী মহাভারত রচনা করেন। তিনি নসরৎ শাহের প্রশস্তি করে লিখেছেন—

নসরৎ শাহ নাম অতি মহারাজা।
পুত্রসম রক্ষা করে সকল পরাজা॥
নৃপতি হুসন শাহ তনয় সুমতি।
সামদান দণ্ডভেদে পালে বসুমতী॥

সুলতানী আমলে সাহিত্য ও ধর্ম

সাহিত্য ঃ সেন রাজাদের সময়ে সংস্কৃত ভাষাতেই সাহিত্য রচিত হত, সংস্কৃতই তখন ছিল সমাজের অভিজাত লোকের ভাষা। মুসলমান সুলতানগণ সংস্কৃত জানতেন না। জনসাধারণ যে ভাষায় কথা বলে, সেই ভাষায়, অর্থাৎ বাংলায় সাহিত্য চর্চার জন্য তাঁরা উৎসাহ দিতেন। সুলতানী আমলে বাংলা সাহিত্যের সূচনা হয়।

কবি কৃত্তিবাস গৌড়ের রাজার আদেশে রামায়ণ রচনা করেছিলেন। এখনও পর্যন্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাংলার ঘরে ঘরে পঠিত হয়ে আসছে। হোসেন শাহ ও

নসরৎ শাহ হিন্দু মনীষার সমাদর করতেন। নসরৎ শাহের সময়েই কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও ছুটি খাঁর মহাভারত লিখিত হয়। সেযুগের বাঙালী কবি কবিতায় এঁদের গুণগান করেছেন।

এই যুগে দুইজন বৈষ্ণব কবি বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিদ্যাপতি মিথিলার লোক। তিনি মিথিলার হিন্দু রাজার সভা অলংকৃত করে মিথিলার ভাষা মৈথিলীতে পদাবলী লিখেছিলেন। বাংলার লোকের কাছেও তার সমাদর ছিল। অন্য কবি চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। চণ্ডীদাসের পদাবলী বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

ধর্ম ঃ মুসলমানগণ বঙ্গদেশে রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্মেরও বিস্তার ঘটিয়েছিল। অনেক মুসলমান কর্মচারী হিন্দুর ওপর অত্যাচার করেছে, দেবস্থান অপবিত্র করেছে এবং জোর করে হিন্দুকে মুসলমান করেছে। আবার একথাও সত্য যে হিন্দু সমাজের যুক্তিহীন গোঁড়ামির ফলে অনেক হিন্দু সামান্য কারণে জাতিচ্যুত হয়ে মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছে। তবে ইসলাম ধর্মের পীর, দরবেশ প্রভৃতি সাধু ব্যক্তি হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করেছে। পাশাপাশি বাস করার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহনশীলতা ও প্রীতির ভাব গড়ে উঠেছে। বিপদে আপদে এবং মঙ্গলকামনায় হিন্দু যেমন পীরের দরগায় সির্ণি দিয়েছে, মুসলমানও তেমনি হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরে মানত করেছে। প্রজারঞ্জক শাসকদের আমলে হিন্দু মুসলমান প্রজা বিভেদ ভুলে সুখে শান্তিতে বসবাস করেছে।

৯. বাহ্‌মনী রাজ্য

দিল্লীর সুলতান মহম্মদ-বিন তোঘলকের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে কয়েকটি বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। অভিজাত সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ দৌলতাবাদ দুর্গ অধিকার করে ইস্‌মাইল মুখ্‌কে সুলতান বলে ঘোষণা করেন। পরে বৃদ্ধ শান্তিপ্রিয় ইস্‌মাইল সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং সাহসী যোদ্ধা আমীর হাসান 'আবুল মজফ্‌ফর আলাউদ্দীন বাহ্‌মন শাহ' উপাধি ধারণ করে ঐ সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৩৪৭ খৃঃ)। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ বাহ্‌মনী বংশ নামে পরিচিত। তিনি নিজেকে পারস্যের রাজা বহ্‌মনের বংশধর বলে দাবি করতেন।

প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দীন বাহ্‌মন শাহ

আলাউদ্দীন অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্যের পরিধি বাড়িয়ে দেন। ১৩৫৮ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে বাহ্‌মনী রাজ্য উত্তরে ওয়েনগঙ্গা থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণা এবং পশ্চিমে দৌলতাবাদ থেকে পূর্বে ভোঙ্গীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তিনি সমগ্র রাজ্য দৌলতাবাদ, গুলবর্গা, বেরার ও বিদর—এই

চারটি প্রদেশে বিভক্ত

চারটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। গুলবর্গায় রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল। পরে ১৪২৫ খৃস্টাব্দে রাজধানী বিদরে স্থানান্তরিত হয়।

প্রতিবেশী হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর ও বরঙ্গলের সঙ্গে বহু কাল ধরে লোক-ক্ষয়কারী যুদ্ধ

বাহ্‌মনীবংশের ১৮ জন সুলতান প্রায় ১৮০ বৎসর (১৩৪৭-১৫২৬ খৃঃ) রাজত্ব করেন। তাঁদের রাজত্বকালে প্রতিবেশী রাজ্যগুলি, বিশেষ করে হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর ও বরঙ্গলের সঙ্গে বহুকাল ধরে পুনঃ পুনঃ লোকক্ষয়কারী যুদ্ধ হয়। দেশের ভিতরেও বিদেশী (ইরানী) মুসলিম ও স্থানীয় দক্ষিণী মুসলমান আমীরদের মধ্যে কলহ রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল।

অনেক সুলতান ঘোরতর অত্যাচারী ও নৈতিক জীবনে উচ্ছৃঙ্খল

রাজসভায় আমন্ত্রণ

কতক বিদ্যোৎসাহী

সুলতানদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ঘোর অত্যাচারী এবং নৈতিক জীবনে উচ্ছৃঙ্খল। তবু বাহ্‌মনী রাজত্বকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল স্থাপন প্রভৃতি জনহিতকর কি কাজ সম্পাদিত হয়েছিল। দ্বিতীয় মহম্মদ শাহ নিজে শিক্ষিত ছিলেন। তিনি তৎকালীন বিখ্যাত পারসিক কবি হাফিজকে তাঁর জানিয়েছিলেন। তিনি সম্মত হয়েছিলেন কিন্তু বিপদসংকুল সমুদ্রপথে আসতে পারেন নি। সুলতান ফিরোজ শাহ বহু-ভাষাবিদ্ ছিলেন। জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর অনুরাগ ছিল; দৌলতাবাদের সন্নিকটে তিনি একটি মানমন্দির স্থাপন করেছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীন আহমদ শাহের সময়ে রাজধানীতে একটি বড় হাসপাতাল স্থাপিত হয়।

মামুদ গাওয়ানঃ বাহ্‌মনী রাজ্যে দেশশাসন, রাজ্যবিস্তার, সমরকুশলতা ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করে জনসাধারণের সামগ্রিক উন্নতি সাধনে মন্ত্রী মামুদ গাওয়ান সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর দূরদর্শিতা ও সুদক্ষ শাসনব্যবস্থার ফলে রাজ্য চরম উন্নতির শিখরে উপনীত হয়েছিল। তিনি কিছু অঞ্চল জয় করে রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করেছিলেন।

মামুদ গাওয়ান দক্ষ সুযোগ্য মন্ত্রী

যোদ্ধা রাজ্যবিস্তারক

বিদ্বান ও সুলেখক

স্থানীয় মুসলমান আমীরদের চক্রান্তে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত

আত্মকলহের ফলে রাজ্য বিলুপ্ত হয় ৫টি খণ্ডরাজ্য গঠিত—

সুনিয়ন্ত্রিত শাসনের সুবিধার জন্য তিনি রাজ্যকে ৮টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। গাওয়ান সুপণ্ডিত এবং সুলেখক ছিলেন। তাঁর গ্রন্থাগারে ৩ হাজার পুস্তক ছিল বলে জানা যায়। তিনি ছিলেন বিদেশী মুসলমান। দক্ষিণী মুসলিম অমাত্যদের চক্রান্তে সুলতান তৃতীয় মহম্মদ শাহের আদেশে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। স্থানীয় এবং বিদেশী আমীরদের কলহের ফলে বাহ্‌মনী রাজ্য ধ্বংস হয়। বংশের শেষ সুলতান কলিমুল্লাহ শাহ রাজধানী বিদর থেকে পলায়ন করেন (১৫২৭) এবং ১৫৩৮ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুতে অখণ্ড

যথা (i) বেরার (ii) বিজাপুর (iii) আহমদনগর (iv) গোলকুণ্ডা (v) বিদর

বাহ্‌মনী রাজ্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় এবং এর স্থলে ৫টি খণ্ড রাজ্য গঠিত হয় যথা—(i) বেরার (ii) বিজাপুর (iii) আহমদ-নগর (iv) গোলকুণ্ডা (v) বিদর। এগুলি পরবর্তীকালে মোগলসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

(গ) বাহ্‌মনী বিজয়নগর রাজ্যের সংঘর্ষের স্বরূপ

বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা (১৩৩৬ খৃঃ): দিল্লীর সুলতান মহম্মদ-বিন তোগলকের রাজত্বকালে সুলতানী সাম্রাজ্যের সর্বত্র যখন বিদ্রোহ ও গোলযোগ শুরু হয়, দক্ষিণ ভারতে তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণে বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন হরিহর ও বুক্ক নামে ভ্রাতৃদ্বয়। এঁরা মহীশূরের হয়সল রাজ্যের প্রশাসনিক কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। দিল্লী-সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হলে এঁরা সুলতানী সৈন্যের হাতে বন্দী হন এবং দিল্লীতে আনীত হন। সেখানে হরিহর এবং বুক্ক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সুলতান তখন দুই ভ্রাতাকে দাক্ষিণাত্যে সুলতানের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং উদ্যমশীল ভ্রাতৃদ্বয় সুলতানী সাম্রাজ্যের অস্থিরতার সুযোগ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং শৃঙ্গেরী মঠের গুরু বিদ্যারণ্যের আশীর্বাদ নিয়ে হিন্দুধর্মে পুনরায় দীক্ষিত হন ও বিজয়নগর হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন। উত্তরে কৃষ্ণা থেকে দক্ষিণে কাবেরী এবং পূর্বে ও পশ্চিমে সমুদ্র পর্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল।

হরিহর ও বুক্ক বিজয় নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা

হিন্দুরাজ্য বিজয় নগর দক্ষিণ ভারতে মুসলিম আগ্রাসন অভিযানের প্রতিরোধক; হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির রক্ষক

চতুর্দশ শতকে দক্ষিণ ভারতে হিন্দুরাজ বিজয়নগরে উত্থান ভারত ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ, দেবগিরি থেকে মাদুরা পর্যন্ত বারংবার মুসলিম আগ্রাসন অভিযানের বিরুদ্ধে বিজয়গর হিন্দুর ধর্ম ও প্রতিষ্ঠানের রক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে হিন্দুর সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা কিছু পরিমাণ অব্যাহত থাকার ব্যাপারে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের যথেষ্ট অবদান আছে।*

বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠার এক দশক পরে বাহ্‌মনী রাজ্যের পত্তন (১৩৪৭ খৃঃ)। বাহ্‌মনী সুলতান আলাউদ্দীন বাহ্‌মন শাহের লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ ভারতের সমৃদ্ধ অঞ্চল অধিকার করা কিন্তু এ পরিকল্পনা রূপায়ণে প্রধান প্রতিবন্ধক হয় বিজয়নগর রাজ্য। বাহ্‌মনী ও বিজয়নগর রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমারেখা ছিল কৃষ্ণা নদী; কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যবর্তী রায়চুর দোয়াব অধিকার নিয়ে এই দুই রাজ্যের মধ্যে কলহ

শস্যের 'গোলা' ও খনিজের 'ভাণ্ডার' স্বরূপ রায়চুর দোয়াব

* If South India retains today its individual cultural complexion, it is largely because of the defence and protection to Hindu Culture by the Vijayanagar empire. *The Gazeteer of India*, Vol. II, p. 294.

দুই রাজ্যের কলহের কারণ (bone of Contention)

প্রায় চিরন্তন ও বংশানুক্রমিক দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। কারণ, কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রার অববাহিকায় রায়চুর অঞ্চল শুধু উর্বর ও শস্য সমৃদ্ধ ছিল না, খনিজ সম্পদেও ছিল পূর্ণ। সন্নিকটে গোলকুণ্ডা হীরার খনির দিকে লোলুপ দৃষ্টি ছিল উভয় পক্ষেরই। তাছাড়া পশ্চিম উপকূলে গোয়াবন্দর দখলে রাখতে পারলে একদিকে যেমন প্রচুর বাণিজ্য শুল্ক প্রাপ্তির সম্ভাবনা, অন্যদিকে ঐ বন্দরপথে আরব বণিকদের সহায়তায় যুদ্ধের পক্ষে অপরিহার্য উৎকৃষ্ট অশ্ব আমদানি করারও সুবিধা। তাই ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক কারণে কোন পক্ষই রায়চুর দোয়াবের ওপর অধিকার ছাড়তে প্রস্তুত ছিল না। রোমিলা থাপার বলেন, বিজয়নগর বাহ্‌মনীদের মধ্যে সংঘর্ষ [অপ]রিহার্য ছিল; উভয় রাজ্যই রায়চুর দোয়াব দাবি করে ১৩৫৮ খৃস্টাব্দে যুদ্ধ শুরু [করে।] কিন্তু কোন মীমাংসা হয়নি, যে রাজ্য যতটুকু অঞ্চল দখলে রাখতে পারে তাই [ছিল] তার অস্থায়ী এবং অ-স্থির সীমানা।*

(ঘ) **বিজয়নগর সাম্রাজ্য:** দক্ষিণ ভারতে তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ উপকূলে বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় (১৩৩৬ খৃঃ)। মহীশূরের হয়সল রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মচারী হরিহর ও বুক্ক নামে ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। বিজয়নগর রাজ্যে চারটি রাজবংশ যথাক্রমে রাজত্ব করে। যেমন সঙ্গম বংশ, সালুক বংশ, তুলুব বংশ এবং অরবিড়ু বংশ।

১৩৩৬ খৃষ্টাব্দ বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা

সঙ্গম বংশ (১৩৩৬-১৪৯০ খৃঃ): প্রায় ১৫৫ বছর রাজত্ব করে। এই বংশের নরপতি **দ্বিতীয় বুক্ক** এবং **প্রথম দেবরায়** (১৪০৬-২২ খৃঃ) বিজয়নগরের বিস্তার সাধন করেন। রাজধানী সুরক্ষিত করার জন্য নতুন প্রাচার, পর্যবেক্ষণ স্তম্ভ ও দুর্গশ্রেণী নির্মাণ করা হয়। প্রজার কল্যাণের জন্য তুঙ্গভদ্রা নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে ১৫ মাইল দীর্ঘ কাটাখাল দিয়ে শহরে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পাহাড়ের পাদদেশে কঠিন প্রস্তর বিদীর্ণ করে কয়েক মাইল দীর্ঘ জল প্রবাহী নালা প্রস্তুত করা অসাধারণ কর্ম বলে গণ্য হয়। বর্তমানকালেও এই নালা ভারতে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কৃষি-সেচখাল বলে স্বীকৃত। (One of the most remarkable irrigation works to be seen in India'—R. Sewell, A Fargotten Empire).

নগর-প্রাকার প্রহরা-স্তম্ভ ও দুর্গ-শ্রেণী দ্বারা রাজধানী সুরক্ষিত

তুঙ্গভদ্রা বাঁধ ও জল প্রবাহী নালা প্রজা কল্যাণকর কর্ম

* Conflict between Vijayanagara anu the Bahmanis was unavoidable and hostilities began in 1358, with both kingdoms claiming the Raichur Doab. The boundary kept shifting according to the outcome of the campaign. Romila Thaper – *A Hist. of Inaia.* Vol. I. p. 325

দেবরায় (২য়) যোদ্ধা, রাজ্য-বিস্তারক, সৈন্য-বাহিনী সংগঠক, বিদ্যোৎসাহী, সমগ্র দক্ষিণ ভারত সিংহলের উপকূল পর্যন্ত ও উড়িষ্যা থেকে মালাবার পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার

দ্বিতীয় দেবরায় (১৪২২-৪৬ খৃঃ) ছিলেন সঙ্গম বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। যোদ্ধা, সংগঠক, স্থাপত্য সৌধ নির্মাতা ও বিদ্যাচর্চায় উৎসাহদাতারূপে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে পারসিক রাজদূত আব্দুর রজ্জাক বিজয়নগর রাজসভায় এসেছিলেন। আব্দুর রজ্জাকের বিবরণী থেকে জানা যায়, সমগ্র দক্ষিণ ভারতে দেবরায়ের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; তাঁর রাজ্য সিংহল থেকে গুলবর্গা, উড়িষ্যা থেকে মালাবার উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পর্তুগীজ ইতিবৃত্ত-লেখক নুনিজ বলেন, দেবরায় কুইলন, সিংহল, পুলিকট, পেগু ও টেনাসেরিমের শাসকদের কাছ থেকেও কর আদায় করেছিলেন।

সৈন্যদলে মুসলিম সৈন্য গ্রহণ করে শক্তিবৃদ্ধি

দেবরায় তাঁর সৈন্যবাহিনী বাহমনী রাজ্যের মুসলিমবাহিনীকে প্রতিরোধ করার উপযুক্ত করে শক্তিশালী করে তুলতে তাঁর সমর নায়কদের পরামর্শমত হিন্দুবাহিনীতে মুসলিম সৈন্য নিয়োগ এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। মুসলমান সৈন্যরা যাতে তাদের ধর্মীয় বিধান লঙ্ঘন না করেও রাজাকে অভিবাদন জানাতে পারে সেজন্য সিংহাসনের সম্মুখে 'কোরাণ' স্থাপন করা হয়েছিল। দেবরায়ের ব্যবস্থার ফলে হিন্দুসেনাবাহিনীর আক্রমণ ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

নিজে পণ্ডিত ও গ্রন্থকার; যোগ্য কবিকে স্বর্ণমুদ্রার ধারা স্নানে সম্মানিত

দেবরায় নিজে একজন পণ্ডিত এবং গ্রন্থকার হিসাবে সুখ্যাত ছিলেন। তাঁর রাজসভায় কবি সাহিত্যিকগণের সমাদর ছিল। কবি-সমাবেশে তিনি সভাপতিত্ব করতেন। একবার তেলেগু কবি শ্রীনাথ সভার রাজকবি অপেক্ষা উত্তম বিবেচিত হওয়ায় তাঁর মস্তকে 'স্বর্ণ-টংকা' রশ্মি বণ্টন করে কবির স্নান-অভিষেক সম্পন্ন করিয়েছিলেন। দেবরায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মল্লিকার্জুন ও ভ্রাতুষ্পুত্র বিরূপাক্ষ (১৪৪৯-৯০ খৃঃ) রাজত্ব করেন কিন্তু তাঁরা বাহমনী রাজ্যের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে অসমর্থ হন। নরসিংহ সালুভ নামে এক হিন্দু নায়ক বিজয়নগর সিংহাসন অধিকার করে সালুভ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

সালুভ বংশ প্রতিষ্ঠাতা বীর নরসিংহ বাহমনী—উড়িষ্যার আক্রমণ, বীর নরসিংহ বাহুবলে বিজয়নগর ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছিলেন

সালুভ বংশ (১৪৯০-১৫০৫ খৃঃ): মাত্র ১৫ বৎসর রাজত্ব করেন। সালুভ বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন বীর নরসিংহ। তিনি বাহমনী সুলতান ও উড়িষ্যা রাজ্যের মিলিত আক্রমণ প্রতিহত করে বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি দক্ষতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর রাজ্যে আবার অরাজক অবস্থা দেখা দিলে তাঁর সেনাপতি সিংহাসন অধিকার করে তুলুব বংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

তুলুব বংশ : (১৫০৫-১৫৬৫ খৃঃ) : বিজয়নগরের তৃতীয় রাজবংশ। এই বংশের নরপতি কৃষ্ণদেবরায়ের রাজত্বকালে বিজয়নগর গৌরব ও সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। **কৃষ্ণদেবরায়** ১৫০৯ খৃস্টাব্দ থেকে ১৫৩০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি যখন সিংহাসন লাভ করেন তখন বিজয়নগর রাজ্যের অবস্থা সুস্থির ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলের নায়কগণ বিদ্রোহী হয়ে অধিকতর ক্ষমতা দখলের জন্য পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল, উড়িষ্যারাজ উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের জেলাগুলি অধিকার করে রেখেছিলেন। বাহ্‌মনী রাজ্য পাঁচটি পৃথক রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়লেও ঐসব রাজা, বিশেষ করে বিজাপুর, বিজয়নগর ধ্বংস করার জন্য সক্রিয় ছিল ; পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজরা নতুন শক্তিরূপে ভারতের রাজনীতিতে অংশ নিতে প্রস্তুত হয়ে দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে বিজয়নগরের শত্রুদের পরাভূত করা এবং বিজয়নগর রাজ্যকে দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করা কৃষ্ণদেবরায়ের সামরিক প্রতিভা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, শাসন দক্ষতা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। দশ বছরের মধ্যে তিনি সমগ্র দেশে বিজয়নগরের কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের কোথাও বিদ্রোহের চিন্তা বা বিন্দুমাত্র অসন্তোষ দেখা যায় নি। পর্তুগীজদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে তিনি তাদের ভাটথাল নামক স্থানে একটি নৌ-ঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি দেন।



কৃষ্ণদেব রায়

বাহ্‌মনী সঙ্ঘের সঙ্গে যুদ্ধ : ১৫০১ খৃষ্টাব্দে বাহ্‌মনী সুলতান মামুদ বিজয়নগরের বিরুদ্ধে প্রতি বছর 'জিহাদ অভিযান' পরিচালনার নীতি সংকল্পরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তদনুসারে বাহ্‌মনী অমাত্যগণ বিদরে সমবেত হয়ে কৃষ্ণদেবরায়ের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেও নিদারুণভাবে পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। কৃষ্ণদেবরায় এর পর রায়চুর দোয়াব, রায়চুর দুর্গ অধিকার করে গুলবর্গা ও বিদর দখল করেন। তিনি অবশ্য ঐ দুই শহর নিজ অধিকারে না রেখে পরাজিত সুলতানদের হাতে প্রত্যর্পণ করেন। এই ঘটনার স্মারকহিসাবে কৃষ্ণদেবরায় 'যবন রাজ্য স্থাপক' উপাধি ধারণ করেছিলেন।

কৃষ্ণদেবরায়ের রাজত্বকাল বিজয়নগরের সর্বোচ্চ সাফল্যের যুগ। এ যুগের

সামরিকবাহিনী সর্বত্র বিজয় গৌরব অর্জন করে, রাজধানী বিজয়নগর ছিল অতুল ধনসম্পদে পরিপূর্ণ।

বিজয়নগর রাজ্যের পতন ঃ কৃষ্ণদেবরায়ের আমলে বাহ্‌মনী রাজ্য বিলুপ্ত হয় এবং ঐ রাজ্য বিভক্ত হয়ে **পাঁচটি** স্বাধীন মুসলিম রাজ্যের উৎপত্তি হয়। যথা—বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহমদনগর, বিদর ও বেরার। এই পঞ্চরাজ্যের সঙ্গে বিজয়নগর রাজ্যের চিরাচরিত দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। তুলুববংশীয় রাজা সদাশিব রায়ের আমলে ১৫৬৫ খৃস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের সম্মিলিত চারটি মুসলিম রাজ্যের সঙ্গে বিজয়নগরের যে যুদ্ধ হয় তা তালিকোটার যুদ্ধ নামে ইতিহাসে খ্যাত। যুদ্ধে বিজয়নগর পরাজিত হয় এবং বিজয়ী মুসলমান বাহিনী রাজধানীর ধনরত্ন লুণ্ঠন করে বিজয়নগর ধ্বংস করে দেয়।

তালিকোটার যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে তুলুববংশের পতন ঘটে এবং **সদাশিব রায়ের ভ্রাতা** তিরুমল অরবিড়ু বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু বিজয়নগর আর পূর্বগৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। বিজয়নগর রাজ্যের নায়কদের অন্তর্কলহ, মুসলমান রাজ্যগুলির আপোসহীন শত্রুতা এবং কৃষ্ণদেবরায়ের পরে যোগ্য শাসকের অভাব বিজয়নগর রাজ্যের পতনের মূল কারণ। রাজ্যে ধনসম্পদ ছিল কিন্তু তার সদ্ব্যবহার করে দেশ শক্তিশালী করার মত যোগ্য লোক ছিল না।

বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থা ঃ বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থা ছিল উন্নত এবং প্রজাকল্যাণমুখী। শাসকগণ রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালন পবিত্র কর্তব্য বলে গণ্য করতেন। রাজা কৃষ্ণদেবরায় রাজার আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর রচিত 'আমুক্ত-মাল্যদ' গ্রন্থে বলেছেন, 'ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রেখে রাজ্যশাসন করাই রাজার প্রধান কর্তব্য।'

শাসনযন্ত্র ঃ সুশৃঙ্খল শাসন সচল রাখতে সমগ্র রাজ্য কতকগুলি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রশাসন, বিচার, রাজস্ব, সমর বিভাগ প্রভৃতির সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ছিল রাজার হাতে।

কেন্দ্রীয় শাসন ঃ শাসনযন্ত্রের শীর্ষে ছিলেন রাজা। রাজা স্বৈরাচারী এবং রাজ্যের সর্বেসর্বা হলেও প্রজাকল্যাণ আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে বিজয়নগর রাজাগণ শাসননীতি নির্ধারণ ও পরিচালনা করতেন। রাজাকে রাজকার্যে পরামর্শদানের জন্য **মন্ত্রিসভা** ছিল; রাজা সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—**তিন শ্রেণীর ভিতর থেকে গুণী এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের মন্ত্রিসভায় স্থান দিতেন।** মুখ্যমন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি, পুরোহিত, উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও প্রাদেশিক শাসন-কর্তাগণ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরূপে শাসনকার্য পরিচালনায় রাজার সহায়ক ছিলেন। রাজসভার জাঁকজমক ছিল বিশেষ দর্শনীয়।

প্রাদেশিক শাসন ঃ সমগ্র সাম্রাজ্য কতকগুলি প্রদেশে ভাগ করা হয়েছিল। কৃষ্ণদেবরায়ের আমলে ২০০টি প্রদেশ ছিল। সংখ্যা দেখে বোঝা যায় বর্তমান-কালের প্রদেশ অপেক্ষা এগুলি আয়তনে ছোট ছিল। সাধারণত, রাজপরিবার ও

অভিজাত বংশের লোকদেরই প্রাদেশিক শাসকের পদে নিযুক্ত করা হত। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নিজ নিজ অঞ্চলে ছোটখাট রাজার মতই দায়িত্বসহকারে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন; তাঁদের সৈন্যদল ছিল। প্রয়োজনে রাজাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে হত; যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি স্থাপনের অধিকার তাঁদের ছিল না; প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে বার্ষিক নির্দিষ্ট কর দিতে হত, নিজব্যয়ে প্রাদেশিক সৈন্যবাহিনী পোষণ করতে হত এবং প্রয়োজনে সৈন্য দিয়ে রাজাকে সাহায্য করতে হত।

প্রতি প্রদেশ কতকগুলি জেলা বা **কোট্টমে** এবং কোট্টমগুলি গ্রামে বিভক্ত করা হয়েছিল। কতকগুলি গ্রাম নিয়ে একটি কোট্টম গঠিত হত। শাসনব্যবস্থায় সর্বনিম্ন স্তর ছিল গ্রাম। গ্রামের প্রধান আয়েঙ্গার নামে পরিচিত হতেন। গ্রাম-প্রধান পঞ্চায়েতের সাহায্যে রাজস্ব আদায়, বিচার, নালিশ ইত্যাদি সম্পন্ন করতেন। রাজ্যে সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত শাসন-শৃঙ্খলা কার্যকর ছিল।

রাজস্ব ব্যবস্থা: ভূমিরাজস্ব ও বাণিজ্য শুল্ক ছিল রাজস্বের প্রধান উৎস। উৎপন্ন ফসলের ¼ থেকে ⅙ অংশ করস্বরূপ আদায় করা হত। চাষ আবাদের উন্নতির জন্য সেচখাল নির্মাণ করা হয়েছিল। ভূমিকর ছাড়া অন্যান্য করের মধ্যে ছিল আমদানি রপ্তানির ওপর বাণিজ্য কর, পশুচারণ কর, বৃত্তিকর, বিবাহ কর প্রভৃতি।

সৈন্যবিভাগ: সর্বদা মুসলিম আক্রমণের আশংকা থাকায় বিজয়নগর রাজাদের বিরাট সৈন্যবাহিনী সর্বদা প্রস্তুত রাখতে হত। রাজার অধীনে ১০ লক্ষ বেতনভুক সৈন্য ছিল বলে জানা যায়। পর্তুগীজ পর্যটক পায়েজ বলেছেন, রায়চুর অভিযানের সময় কৃষ্ণদেবরায়ের বাহিনীতে ৭,০৩,০০০ পদাতিক, ৩২,০০০ অশ্বারোহী ও ৫৫১টি হস্তী ছিল। দাক্ষিণাত্যে উৎকৃষ্ট যুদ্ধাশ্বের অভাব থাকায় বিজয়নগর-বাহিনীতে অশ্বারোহী দল খুব শক্তিশালী ছিল না; বিদেশী বণিকদের মাধ্যমে পারস্য ও আরব থেকে আনা উত্তম জাতের অশ্বের খুব চাহিদা ছিল। বিজয়নগর নৃপতিগণ মুসলিম অশ্বারোহী ও তীরন্দাজ সৈন্য নিজেদের দলে অন্তর্ভুক্ত করতে চেষ্টা করতেন। বাহিনীতে পদাতিক, অশ্ব ও হস্তী ছাড়াও গোলন্দাজ সৈন্য যুক্ত ছিল।

বিচার ব্যবস্থা: রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারকর্তা ও আইন প্রণেতা। প্রজারা যাতে নিরপেক্ষ সুবিচার পায় সেদিকে রাজার তীক্ষ্ণ নজর ছিল। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত কঠোর। ছোটখাট চুরির জন্য এক হাত এবং এক পা কেটে দেওয়া হত; বড় চুরির এবং নারীর প্রতি অপরাধের শাস্তি ছিল কণ্ঠে বড়শি বিঁধিয়ে ঝুলিয়ে হত্যা করা। দেশদ্রোহিতার শাস্তি ছিল শূলে চড়িয়ে প্রাণদণ্ড। শাস্তির কঠোরতার রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করত।

সমাজ ও অর্থ নৈতিক অবস্থা

(i) **পূজায় পশুবলিঃ** হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য এবং বৈদিক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। রাজা বিষ্ণুর উপাসক হলেও পূজায় বহুসংখ্যক পশুবলি দেওয়া হত। পায়েজ বলেন, নবমী উৎসবের শেষ দিনে ২৫০টি মহিষ ও ৪,৫০০টি মেষ বলি দেওয়া হত। কোন বিশেষ উৎসবে রাজা দেবতার সম্মুখে এরূপ বলিদান প্রত্যক্ষ করতেন।

(ii) **ধর্ম আচরণে উদারতাঃ** মুসলিম পর্যটক আব্দুর রজ্জাক বলেন, রাজ্যের সর্বত্র প্রজাদের ধর্ম আচরণে স্বাধীনতা ছিল ; কেউ অন্যের ধর্মাচরণে বাধা সৃষ্টি করত না।

(iii) **সরল নৈতিক জীবনঃ** অভিজাত ধনশালী ব্যক্তিরা বিলাসিতার জীবনযাপন করলেও সাধারণ নাগরিক সরল অনাড়ম্বর নীতিবুদ্ধি-চালিত জীবন-যাপন করত। ব্রাহ্মণগণ নিরামিষাশী ছিলেন।

(iv) **সমাজে নারী সম্মানিতাঃ** সমাজে নারীর সম্মানের স্থান ছিল। নারীদের বিচারকের পদ গ্রহণ, শরীর চর্চার অংশ, গ্রহণ, এমন কি যুদ্ধে অংশ গ্রহণের কথাও জানা যায়। তাঁরা শিল্প, সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেতেন।

(v) **সতীদাহ প্রথাঃ** সতীদাহ প্রথা প্রশংসনীয় গণ্য হত ; ধনীদের মধ্যে বহু বিবাহ এবং পণ প্রথার প্রচলন ছিল।

অর্থ নৈতিক অবস্থা

(i) **কৃষি-ভিত্তিক সমাজঃ** জমির উর্বরতা অনুসারে ⅓ কিংবা ¼ ফসল ছিল রাজকর। রাজারা প্রজার চাষে উৎসাহ এবং ফসল বৃদ্ধিতে সহায়তার জন্য বাঁধ ও সেচখাল নির্মাণ করেছিলেন। রাজ্যের প্রায় সর্বত্র জলসেচের সুবন্দোবস্ত ছিল।

(ii) **কুটিরশিল্প ও বাণিজ্যঃ** দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসাবাণিজ্যের মাধ্যমে জনসাধারণের প্রয়োজন মিটানো হত। বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে দেশের প্রচুর অর্থাগম ঘটত। ব্রহ্মদেশ, চীন, আরব, পারস্য, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে ছিল কাপড়, ধান, চিনি, মশলা এবং সোরা ; আমদানি হত তামা, মুক্তা, রেশম এবং আরব ও পারস্যের অশ্ব প্রভৃতি। বণিক ও শিল্পীদের পৃথক সংঘ ছিল। জনগণের অর্থ নৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণে এই সংঘগুলি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করত।

(iii) **মুদ্রা প্রচলনঃ** ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য বিজয়নগর নৃপতিগণ স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন করেছিলেন।

(iv) **কৃষকের দারিদ্র্যঃ** রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা বিলাসিতার মধ্যে বাস করলেও করভারে প্রপীড়িত কৃষক প্রায়ই দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করত।

সংস্কৃতি ও শিল্পকলা

বিজয়নগর রাজগণ সংস্কৃত ও তেলেগু সাহিত্যের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বেদের বিখ্যাত ভাষ্যকার **সায়নাচার্য** এবং তাঁর ভ্রাতা **মাধবাচার্য** বিজয়নগর রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। শৃঙ্গেরী মঠের সঙ্গে সঙ্গমবংশের রাজাদের গভীর সশ্রদ্ধ যোগ ছিল। কৃষ্ণদেবরায়ের রাজত্বকালে সাহিত্যে যথেষ্ট উন্নতি হয়। বিজয়নগর রাজগণের পৃষ্ঠপোষতায় তামিল, তেলেগু, কানাড়ী প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষাগুলি উৎকর্ষ লাভ করেছিল। সেযুগের আটজন যশস্বী কবি ও সাহিত্যিক রাজা কৃষ্ণদেবরায়ের রাজসভায় সমাদরে গৃহীত হয়েছিলেন। কৃষ্ণদেবরায়ের প্রধান সভাকবি পোদ্দন ছিলেন সেযুগের শ্রেষ্ঠ তেলেগু গ্রন্থকার। কৃষ্ণদেবরায় নিজেও একজন চিন্তাশীল লেখক ছিলেন।

স্থাপত্য শিল্প: বিজয়নগর নৃপতিগণ স্থাপত্যের স্রষ্টা ছিলেন। তাঁরা বহু মনোহর মন্দির এবং সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেন। হাজার রামস্বামী মন্দির ও বিঠলস্বামী মন্দির সুন্দর প্রস্তর খোদাই কারুকার্যে ভূষিত। এ ছাড়া রাজা বহু সমৃদ্ধ শহর উদ্যান ও উপবনে শোভিত হয়েছিল। প্রশস্ত বৃক্ষরাজিশোভিত রাজপথ বিজয়নগরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল। বিজয়নগর নৃপতি জলাশয়, কৃত্রিম বিশাল হ্রদ, জলাধার, সেতু এবং জলপ্রণালী নির্মাণ করে লোকহিতৈষিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে অঙ্কন, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক প্রভৃতি চারু-ললিত কর্ম এবং কাষ্ঠ ও গজদন্ত শিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

বিদেশী পর্যটক

এই সময়ে আগত পাঁচজন বিদেশী পর্যটকের বিবরণ ঐ কালের নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দলিল। এঁরা হলেন:

নিকিতিন: অ্যাথানাসিয়াস নিকিতিন নামে এক রুশ বণিক বাহমনী রাজ্যে ১৪৭০ থেকে ১৪৭৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত পর্যটন করেছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় রাজধানী বিদর সমৃদ্ধ শহর ছিল। আমীরগণ ও সুলতান চরম ভোগ বিলাসের জীবনযাপন করতেন কিন্তু জনসাধারণের জীবন ছিল দারিদ্র্যও দুর্দশাপূর্ণ। তিনি লিখেছেন অভিজাত ব্যক্তিরা যখন রাজপথ দিয়ে চলেন তাঁদের রূপার পালংক বহন করা হয়, আগে আগে চলত কুড়িটি সোনার ঝালরে সজ্জিত অশ্ব, পিছনে চলত ৩০০ জন অশ্বারোহী এবং ৫০০ জন পদচারী, শিঙ্গাবাদক, ১০ জন মশালবাহী এবং ১০ জন গীতবাদ্যকার।

নিকোলো কন্টি: ইটালি দেশীয় ভ্রমণকারী **কন্টি** ১৪২০ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় দেবরায়ের রাজত্বকালে বিজয়নগরে আসেন। তিনি বলেন, রাজধানীর পরিধি ছিল ৬০ বর্গমাইল এবং চারদিকের পাহাড় ঘিরে সুদৃঢ় দুর্গ দ্বারা নগর সুরক্ষিত ছিল ঐ সময় রাজ্যে সতীদাহের ব্যাপক প্রচলন ছিল। রাজার মৃত্যু হলে তাঁর

২ থেকে ৩ হাজার পত্নীকে চিতায় প্রাণ দিতে হয়েছিল। এদের মধ্যে কতককে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হয়।

আব্দুর রজ্জাক : হিরাটের আব্দুর রজ্জাক ১৪৪২-৪৩ খৃস্টাব্দে তৈমুর-পুত্র সুলতান শাহরুখের দূত হিসাবে কালিকটের জামোরিনের রাজসভায় এসেছিলেন। বিজয়নগর রাজ্যের আমন্ত্রণে তিনি বিজয়নগর পরিদর্শন করেন। বিজয়নগরের সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, এমন শহর কেউ কখনও দেখেনি কিংবা পৃথিবীতে যে থাকতে পারে তাও কেউ শোননি। সুন্দর রাজপথ, মনোরম উদ্যান, প্রচুর দ্রব্যসম্ভারে সজ্জিত বিপণিতে বিজয়নগর অতুলনীয়। অধিবাসীরা সুন্দর পরিচ্ছদ ও অলংকার পরিধান করে।

ডোমিঙ্গোজ পায়েজ : কৃষ্ণদেবরায়ের রাজত্বকালে পর্তুগীজ পর্যটক পায়েজ বিজয়নগরে আসেন (১৫২২ খৃস্টাব্দ)। তখন রাজ্যের চরম উন্নতির যুগ। রাজধানী শহরে এক লক্ষের বেশি বাসগৃহ ছিল ; রাজপ্রাসাদের কক্ষ ছিল হস্তিদন্ত-নির্মিত ও অপূর্বকারুকার্য শোভিত।

নুনিজ : নুনিজ নামে এক পর্তুগীজ ভ্রমণকারী পায়েজের ১৩ বছর পর বিজয়নগর পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, রাজা শুভ্র রেশমবস্ত্র ও উৎকৃষ্ট মণিরত্ন পরিধান করে রাজসভায় বসতেন কিন্তু নগ্নপদ থাকতেন। রাজ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রচলন ছিল। ব্যক্তিগত অসিযুদ্ধে যে জয়ী হত, সে নিহত প্রতিপক্ষের সম্পত্তি লাভ করত। রাজ্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্য ছিল কিন্তু বহু পশুবলি দেওয়া হত। ধনীর প্রাচুর্যের মধ্যে চাষীর জীবন ছিল অভাব ও দুর্দশায় পূর্ণ। আগে বিজয়নগরের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা নুনিজের বিবরণ থেকেই সংগৃহীত।

১০. ভারতীয় সমাজের উপর ইসলামের প্রভাব

প্রভাব কিভাবে পড়ে : বিভিন্ন দেশের মানুষগোষ্ঠী অনেক বিষয়েই একে অপরের থেকে পৃথক। তবু এক দেশের লোক অন্য দেশের লোককে প্রভাবিত করে। নতুন দেশ যদি শিক্ষা সভ্যতায় নবাগতদের চেয়ে হীন হয় তবে সেখানকার অধিবাসীরা আগন্তুকদের উন্নত সভ্যতার মধ্যে তলিয়ে যাবে। যদি আগন্তুকরা সভ্যতা সংস্কৃতি নিচু হয়, তারাই নিজস্ব সত্তা হারিয়ে নতুন দেশের সমাজে মিশে যায়, যেমন মিশে গিয়েছে শক, হূণরা ভারতীয় সমাজসমুদ্রে। কিন্তু আগন্তুকরা যদি উন্নত সমাজব্যবস্থা, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য নিয়ে আসে এবং নতুন দেশে বহুদিন ধরে পাশাপাশি বসবাস করতে থাকে, তবে উভয়ে উভয়ের মধ্যে পুরোপুরি বিলীন হয় না কিন্তু উভয়ের প্রভাব পড়ে উভয়ের ওপর। ঠিক এমনি ব্যাপার ঘটে হিন্দু-ভারতে মুসলিমদের আগমন এবং এখানে স্থায়ী বসতি পত্তনের ফলে।

ভারতে মুসলিম আগমন ঃ পঞ্চম-শতাব্দীতে হূণদের আক্রমণে গুপ্তসাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছিল এবং বিদেশি বর্বর ধরনের আগন্তুকরা ভারতের পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ফলে এদেশের সমাজে মিশে গিয়েছিল। তারপর ছয়শো বছর ভারতে বিদেশি আক্রমণ ঘটেনি। মহম্মদ-বিন-কাসিম সিন্ধুদেশ স্বল্পকালের জন্য জয় করেছিলেন কিন্তু ভারতের হিন্দুসমাজের ওপর তার কোন প্রভাব পড়েনি।

প্রথম মুসলমান আগমন প্রায় প্রভাব শূন্য

একাদশ শতকে গজনীর সুলতান মামুদ তুর্কী ও আফগানদের নিয়ে ভারতে সত্যিকারের যে আঘাত হানতে থাকেন। সে আঘাতের মূলে রাজনৈতিক বাসনা অপেক্ষা ধর্মীয় উন্মাদনা ও ধনরত্নের লালসা ছিল প্রবল। এ আক্রমণ থেকেই ভারতে মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। দাস সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবকই ভারতে স্থায়ী মুসলিম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা (১২০৬ খৃঃ) করলেন।

দিল্লী সুলতানী আমল শেষে বাবর প্রতিষ্ঠা করলেন মোগল রাজবংশ যা মধ্যযুগে ভারতের ইতিহাসে নানা দিক দিয়ে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। সমাজের মানুষের ওপর মুসলিম প্রভাব কেমন পড়েছিল, তা ডঃ তারাচাঁদ তাঁর **History of the Freedom Movement in India** গ্রন্থে অল্প কথায় স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন—*

ভারতীয় সমাজের ওপর মুসলিম প্রভাব

"ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে ইসলামের প্রভাব পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। এই প্রভাব পড়ে ধর্ম, চিন্তাধারা, ভাষা, সাহিত্য ও শিল্প—স্থাপত্য, চিত্রশিল্প ও সঙ্গীতের ওপর। ভারত-সংস্কৃতির ওপর এই প্রভাব হয়েছিল গভীর এবং ব্যাপক। কিন্তু সমাজের আর্থিক কাঠামোয় বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি।"

ধর্ম, চিন্তাধারা, শিল্প স্থাপত্যে পরিবর্তন লক্ষণীয়

মুসলিম সংস্পর্শে ভারতীয় সমাজ

যেসব মুসলমান ভারত আক্রমণে সৈন্যসামন্ত ও শিবিরসহায়করূপে এদেশে এসেছিল তাদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। সেযুগের ১০ থেকে ১৪ কোটি লোকের দেশ ভারতবর্ষে এই বহিরাগতরা ছিল নেহাত নগণ্য। বিজেতা হিসেবে দেশের অঞ্চল অধিকার করে দেশের বাসিন্দা হয়ে বসলে তাদের আদিবাসভূমি থেকে

এক জাতির ওপর অন্য জাতির প্রভাবের স্বরূপ

* The impact of Islam effected changes in the cultural life of the Indian people. It influenced religion, thought, language, literature, and arts—architecture, painting and music. Its influence on Indian culture was deep and pervasive. But so far as the socio-economic structure was concerned there was little modification.

মাঝে-মাঝে কবি, শিক্ষিত ব্যক্তি, বণিক, দেশভ্রমণেচ্ছু বা ঐসব দেশ থেকে বিতাড়িত রাজন্যবর্গের কতক এদেশে আশ্রয় নিত। এরা বহুদিন হিন্দুদের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করেছে, এদেশের বহুলোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছে, এবং আচার-ব্যবহার, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে উভয়ে উভয়ের কাছ থেকে কিছু শিখিয়েছে।

১. ইসলামে ধর্মান্তরিত হিন্দুগণ তাদের সমাজের আচার-ব্যবহার, জীবন-যাপন পদ্ধতি নিয়ে গিয়েছিল মুসলিম সমাজে। অতি সহজে তারা পূর্ব সংস্কার পরিত্যাগ করতে পারেনি।

২. মুসলিম শাসকদের ভাষা রীতিনীতি, পোশাক, আদবকায়দা হিন্দুসমাজের অভিজাত মহলে প্রসারলাভ করে। মুসলমান শাসকদের অনেক হিন্দু রমণী বিবাহ করায় হিন্দু রীতি, প্রথা যেমন মুসলিম পরিবারে প্রবেশ করে তেমনি হিন্দু সমাজের প্রতি মনোভাবও অনেকটা নমনীয় হয়। জাহাঙ্গীর বাদশা ছিলেন রাজপুত জননীর সন্তান; তাঁর জন্য মোগল অন্তঃপুরে হিন্দু পদ্ধতিতে উপাসনার সুযোগ ছিল।

৩. সাধুসন্ত এবং মুসলিম পীর দরবেশ উদার সংজীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তিশ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। এর ফলে হিন্দু-মুসলমান নিজেদের ভাই ভাই মনে করতে শিখেছিল। একে অপরের ভাব ও সংস্কার দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত হয়েছিল যে, হিন্দুরা যেমন পীরের দরজায় বিপদ ও রোগমুক্তি কামনায় মানত করেছে, মুসলিমরা তেমনি মন্দিরে পূজার উপকরণ পাঠিয়েছে। এখন পর্যন্ত অনেক মুসলিম পীরসাধুর 'মাজার' অর্থাৎ সমাধিস্থানে অনুষ্ঠিত মেলা উৎসবে অনেক হিন্দু পূজা উপহার নিয়ে উপস্থিত হয়।

৪. মুসলিম সমাজে স্ত্রীলোকের মধ্যে পর্দাপ্রথার অনুকরণে হিন্দুদের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্দার প্রচলন হওয়ায় স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা কিঞ্চিৎ খর্ব হয় এবং তারা পুরুষের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

৫. মুসলমান রাজত্বে ক্রীতদাস প্রথা প্রবল রূপ ধারণ করে। দাসের সংখ্যার ওপর আভিজাত্য নির্ভর করত। নিয়মিত দাস-বাজার বসত। কতক সুলতান চাল-ডাল, তেল-লবণের মত ক্রীতদাসদের দাম পর্যন্ত বেঁধে দিয়েছিলেন।

৬. ব্যাপক বিলাস ও সুরাপান আভিজাত্যের অঙ্গ হয়। সমাজে শোষণ বাড়ে। সমাজের ধন উৎপাদনকারী সম্প্রদায়, চাষী ও কুটিরশিল্পী, উচ্চবর্গের লোকদের সেবায় নিজেদের প্রায় সবকিছু দিয়ে অভাবের মধ্যে দিন কাটাত।

৭. ইসলামের ধর্মান্তরকারী - শক্তি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে হিন্দুসমাজে আচার-বিধির কঠোরতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বিপরীতভাবে ধর্মান্তর গ্রহণ ব্যাপক হয়।

৮. এর প্রতিক্রিয়ায় ও ধর্মাচরণের কঠোরতা বিলোপের আন্দোলন শুরু হয়। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত নামসংকীর্তন সহজ আরাধনা-পদ্ধতি হিন্দু সমাজের ভাঙন রোধ করেছিল।

৯. মুসলিমদের মধ্যে সিয়া-সুন্নীর ধর্মসম্প্রদায়গত বিরোধ হিন্দুদের সংস্পর্শে আসার ফলে অনেক স্তিমিত হয়েছিল।

১০. মধ্যযুগে সমাজ মোটামুটি চারটি প্রধান বর্গে বিভক্ত ছিল, যেমন (ক) অভিজাত বর্গ-এর মধ্যে ধরা হত শাসক, ওমরাহ, হিন্দুরাজা ও জমিদারগণ। এদের জীবন ছিল বিলাসবহুল। (খ) মুসলিম উলেমা ও হিন্দু পুরোহিত সম্প্রদায়। এঁরা শাসকের কাছ থেকে ভূমি পেতেন। সমাজে এবং শাসকদের ওপর এঁদের প্রভাব ছিল প্রচুর। (গ) নগরের বণিক, ব্যবসায়ী, শিল্পকর্মী প্রভৃতি। (ঘ) কৃষক। ভূমি নির্ভর কৃষক ছিল খাদ্যের উৎপাদক। তাদের শোষণ করেই উচ্চবর্গের লোকদের আরাম-বিলাসের জীবন চলত।

মধ্যযুগের সমাজ

ধর্মসংস্কার: মুসলমান যুগের আগেও এদেশে আর একবার ধর্মসংস্কার আন্দোলন হয়। তার নায়ক মহাবীর ও বুদ্ধ। ওঁরা দুজনেই হিন্দুধর্মাশ্রিত ক্ষত্রিয়বর্ণের লোক; উভয়েই হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও আচরণপদ্ধতিতে অবগত ছিলেন। ধর্ম আচরণে ব্রাহ্মণদের জটিল ক্রিয়াকলাপ এবং বাহ্যাড়ম্বরপ্রধান যাগযজ্ঞ সাধারণ মানুষের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। এঁদের ধর্মমত প্রচার নতুন কোন বিদেশি ধর্ম নয়, বিদ্রোহী চিন্তানায়কদের মানবকল্যাণকর সংস্কারসাধন।

কিন্তু অন্য ইসলাম বহিরাগত ধর্ম, ইসলাম রাজার ধর্ম, ইসলামের সঙ্গে হিন্দুধর্মের অনেক বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য ছিল। অথচ ইসলাম ভারতে রাজানুকূল্যে ও তার অন্তর্নিহিত সামাজিক সাম্য ও সরলতার জন্য ভারতের সমাজে প্রতিষ্ঠিত। দুই সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করতে বাধ্য অথচ একের পক্ষে অন্যকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে নেওয়া কঠিন। এরূপ অবস্থায় মধ্যযুগের সাধুসন্তরা মানুষে মানুষে প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করবেন—এটাই ছিল স্বাভাবিক, এটাই ছিল সমাজে শান্তিবারিসিঞ্চনের প্রয়াস। তাই হিন্দুরা যেমন পার্সী ভাষা আয়ত্ত করেছিল, যেমন গ্রহণ করেছিল অভিজাত মুসলিমদের মত পোশাক পরিচ্ছদ, খানাপিনা ও আদবকায়দা।*

প্রাথমিক সংযোগ

ভক্তিবাদ: ঈশ্বরের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রেম ভালবাসা ভিত্তিক উপাসনা পদ্ধতি ভক্তিবাদ নামে পরিচিত। মুসলমান আগমনের সময়ে হিন্দু পূজা অর্চনায় অনুষ্ঠান বাহুল্য এসে যায়। পুরোহিত হয়ে পড়ে অর্চনার মাধ্যম। মধ্যযুগের ভক্তিবাদ এই আড়ম্বর সর্বস্বতা ও পুরোহিতবাদের প্রতিবাদ।

ভক্তিবাদ

এই যুগের হিন্দু-মুসলমান ধর্মজ্ঞানীরা উপলব্ধি করলেন যে ভালবাসা ও ভক্তির অর্ঘ্য সাজিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগই শ্রেষ্ঠ সাধনা। ভালবাসার দ্বারাই

* ব্রিটিশ আমলেও দেখা গেছে রাজার ভাষা ইংরেজি শেখার ঝোঁক, ইংরেজদের মত পোশাক-পরিচ্ছদ ও রীতি অনুকরণের উদ্যম।

ঈশ্বর বা আল্লাকে লাভ করা যায়। ঈশ্বর সৃষ্ট মানুষকে ভালবাসলেও ঈশ্বরকেও ভালবাসা হয় আর মানুষকে ঘৃণা করলে সে ঘৃণা ঈশ্বরকেই আঘাত করে। মুসলমান সুফীবাদ ও হিন্দু ভক্তিবাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছিল না।

ভক্তিবাদ প্রচারকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রামানন্দ, কবীর, চৈতন্যদেব প্রমুখ উদারচেতা সাধক এবং সুফীবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন নিজামউদ্দীন আউলিয়া ও মঈনুদ্দীন চিস্তি।

রামানন্দ

রামানন্দ (১৪শ শতক): ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কাশীতে অতিবাহিত করেন। গভীর প্রেম ও ভালবাসা দ্বারা আরাধ্য দেবতার কৃপালাভ করা যায়—রামানন্দ এই মতবাদ তাঁর ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে প্রচার করতেন। জাতিভেদ প্রথা তিনি মানতেন না। মানুষ হিসেবে মানুষকে মর্যাদা দিয়ে তিনি উচ্চনীচ সব শ্রেণীর লোককেই শিষ্য করেছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কবীর ছিলেন প্রধান। সাধারণ লোকের বোধগম্য হিন্দী ভাষায় তিনি উপদেশবাণী প্রচার করতেন। তিনি বলতেন—জাতি-পাতি পুছই ন কোই; হরিকো ভজে সো হরিকো হোই।

কবীর

কবীর (১৪৪০-১৫১৮ খৃঃ): কাশীতে নিমু শেখ নামে এক জোলার ঘরে মাতৃ-পরিত্যক্ত ব্রাহ্মণ সন্তান কবীর প্রতিপালিত হয়েছিলেন। স্বাভাবিক কবিত্বসম্পন্ন কবীর ছিলেন সাধক রামানন্দের শিষ্য। সহজ জ্ঞান ও মুক্ত বুদ্ধির বলে কবীর জ্ঞান ভক্তি ও জীবনের পরম সত্য সরল মধুর কাব্যময় ভাষায় প্রকাশ করতেন। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধী কবীর বলতেন, রাম-রহিম, আল্লা-হরি সবই এক, ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র কিন্তু এই সহজ সত্য না বুঝে হিন্দু মুসলমান নিজেদের মধ্যে কলহ করত। কবীর মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধি দূর করা ও নির্মল পবিত্র জীবনযাপনের উপদেশ দিয়েছেন। কবীরের দোঁহা এখনও প্রচলিত আছে।



কবীর

চৈতন্যদেব

চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩ খৃঃ): পিতা জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী। ফাল্গুনী গ্রহণ-পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে নবদ্বীপে জন্ম। চৈতন্যদেব সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য ঈশ্বরচিন্তার সহজ পথ দেখিয়েছেন। জীবে দয়া ঈশ্বরে ভক্তি এবং ভক্তি উদ্দীপনের জন্য নামসংকীর্তন—চৈতন্যদেবের ভক্তি-ধর্মের মূলভিত্তি। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষই উচ্চ

জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে—এই বাণী ঘোষণা করে চৈতন্যদেব মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ধর্মমত গ্রহণ করেছিল। উচ্চ-নীচ ভেদ দূর করে তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে নাম-সংকীর্তন ও ভক্তিভাবের যে বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন, তার ফলে হিন্দু সম্প্রদায় ইসলামধর্মের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। সমাজের বর্ণহিন্দুদের কড়াকড়ি ও উদাসীনতার দরুন হিন্দুদের অবক্ষয় হচ্ছিল চৈতন্যদেব মানুষের মূল্যবোধ জাগ্রত করে সমাজের আত্মচেতনা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—অস্পৃশ্য বলে কেউ নেই। মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদ নেই। মানুষ মাত্রেই ঈশ্বরের অংশ।



চৈতন্যদেব

গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮ খৃঃ): পিতা কালু জাতিতে জাঠ। মাতা ত্রিপতা। লাহোরের কাছে তালবন্দী (বর্তমান নাম নানকানা) গ্রামে পূর্ণিমা তিথিতে জন্ম। নানক জাতিভেদ মানতেন না, মূর্তি পূজারও প্রশ্রয় দেননি। ভগবান এক, মানুষ ভাই ভাই—এই সত্যটি তিনি প্রচার করতেন। হিন্দু ও মুসলমান—এই দুই ধর্মের মিলন সাধন করে তিনি উদার ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। উদার সহনশীলতার ভিত্তিতে তিনি হিন্দু-মুসলমানের ধর্মগত ও সামাজিক মিলনের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলতেন—তিনিই প্রকৃত হিন্দু যিনি ন্যায়নিষ্ঠ, তিনিই প্রকৃত মুসলমান যিনি পবিত্র।



নানক

নামদেব (১২৭০-১৩৫০ খৃঃ): মারাঠী সাধক। তিনি নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু সরল পবিত্র জীবনের জন্য তিনি হিন্দু-মুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি বলতেন, ঈশ্বরের কাছে হিন্দু-মুসলমানে কোন প্রভেদ নেই, সকলেই তাঁর সন্তান। নামদেবের ভক্তিমূলক কবিতা এখনও মহারাষ্ট্রে প্রচলিত আছে।

সুফী সাধক: ভক্তি ও পবিত্রতার বাণী-প্রচারক মুসলিম সাধুসন্তর সুফী

নামে পরিচিত। আজমীরের খাজা মঈনুউদ্দীন চিস্তি এবং দিল্লীর নিজামউদ্দীন আউলিয়া সুফী পীরদের অগ্রগণ্য এবং সকল সম্প্রদায়ের লোকের শ্রদ্ধাভাজন। মানুষে-মানুষে সদ্ভাব স্থাপনে উৎসাহ দিয়ে এঁরা ভারতীয় জনসাধারণকে উদার ও সহনশীল হতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। নিজামউদ্দীনের দরগা ও চিস্তিশরিফ এখন পর্যন্ত হিন্দু, মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোকের কাছে পবিত্র তীর্থস্বরূপ।

ভক্তিবাদ প্রসারের ফল: ভক্তিবাদের প্রসার হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত সমাজের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। যেমন—

১. **হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে তিক্ততা হ্রাস:** বেশিরভাগ ভক্তিবাদী সাধক সর্বধর্মের সমতা এবং মানুষের সহ-অবস্থার নীতির ওপর জোর দিয়েছিলেন। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের লোক হিন্দু সাধু ও মুসলিম পীরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শিখেছিল।

২. **হিন্দু সমাজের ভাঙন রোধ:** ইসলামের সাম্যবাদী ধর্মমত ও জাতিভেদ প্রথার অনস্তিত্ব নিম্নবর্ণের হিন্দুদের আকৃষ্ট করত। ভক্তিবাদ প্রসারের ফলে হিন্দু-সমাজের সংকীর্ণতা হ্রাস পায় এবং সমাজে নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয়।

৩. **ভারতীয় শাসকদের উদার মনোভাব সৃষ্টি:** কতক ভারতীয় শাসক, বিশেষ করে শের শাহ এবং আকবর, হিন্দু-মুসলমান প্রজাকে সমদৃষ্টিতে দেখে দেশে উদার ধর্মীয় মনোভাবের সৃষ্টি করেছিলেন।

৪. **আঞ্চলিক সাহিত্যের উদ্ভব:** ভক্তিবাদী সাধকগণ সংস্কৃত বা পারসীতে তাদের ধর্মমত প্রচার না করে জনসাধারণের সহজবোধ্য স্থানীয় ভাষায় উপদেশ দিতেন। এর ফলে আঞ্চলিক ভাষার চর্চা ও সমৃদ্ধি ঘটেছিল।

৫. **ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্তিমিত:** ভক্তিবাদী সাধকগণ যাগযজ্ঞ, আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে মনের বিশুদ্ধতা ও প্রেম-ভালবাসার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ফলে ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড-সম্পাদনকারী ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

শিল্প-স্থাপত্যে মুসলিম শাসনের প্রভাব

হিন্দু ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষ ঘটেছিল গুপ্তযুগে। ইলোরার পাহাড়কাটা কৈলাসনাথ মন্দির, তাঞ্জোরের শিবমন্দির প্রভৃতি হিন্দু মন্দির-স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিদর্শন। মুসলিম শিল্প স্থাপত্য এদের থেকে বিশিষ্ট ছিল। এর বৈশিষ্ট্য ছিল **খিলান, গম্বুজ** ও দীর্ঘ ক্রমশ-সরু স্তম্ভচূড়া বা **মিনার**। মুসলমান যুগে এই দুই স্থাপত্য রীতির মিশ্রণ ঘটেছে। ভারতীয় সৌধে যুক্ত হয়েছে খিলান, গম্বুজ, মিনার।

১. **খিলান:** খিলানযুক্ত সৌধের উত্তম নিদর্শন ফতেপুরসিক্রির বুলান্দ দরওয়াজা, জৌনপুরের অটলাদেবী মসজিদ, বাংলার বড় সোনা মসজিদ, দিল্লীর হুমায়ুনের সমাধিসৌধ প্রভৃতি।

২. **গম্বুজযুক্ত সৌধ:** সুদৃশ্য গম্বুজযুক্ত সৌধ মুসলিম স্থাপত্যের বড় অবদান। সাসারামে শের শাহের সমাধিসৌধ, গিয়াসুদ্দীন তোগলকের সমাধি, আগ্রা দূর্গ, সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি এবং সর্বোপরি তাজমহল নয়নসুখকর স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত।

৩. **মিনার:** মিনারের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দিল্লীর কুতুবমিনার। সুশ্রী মজবুত গড়ন ও দৈর্ঘ্যে ভারতে এটি অদ্বিতীয়।



কুতুবমিনার

এই তিনটি বৈশিষ্ট্য যে পৃথক পৃথকভাবে প্রদর্শিত হয়েছে, তা নয়। অনেক স্থাপত্যে এ তিনটিরই সুসমঞ্জস মিলন ঘটেছে, যেমন মোগলযুগের তাজমহলে। খিলানযুক্ত দরজা, সুদৃশ্য গম্বুজ ও চারকোণে উঁচু মিনারসদৃশ গম্বুজশীর্ষ স্তম্ভ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে থেকে মূল সৌধটিকে পূর্ণতা দান করেছে। এই স্তম্ভগুলি না থাকলে তাজমহলকে মনে হত পরিত্যক্ত, সঙ্গীবিহীন।

মিশ্ররীতি: ইসলামিক রীতি শুধু মুসলিম শাসক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নির্মিত সৌধেই প্রকাশ পায়নি, হিন্দু রাজরাজড়ার প্রাসাদে এবং হিন্দু মন্দিরেও এর প্রভাব পড়েছে। ফতেপুর সিক্রিতে রাজা বীরবলের কন্যার প্রাসাদে এবং বৃন্দাবনে গোবিন্দদেব মন্দিরে হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যরীতির মিশ্রণ সুস্পষ্ট। অবশ্য মসজিদ ও হিন্দু-মন্দিরের অঙ্গসজ্জা ও কারুকার্যে তফাৎ ছিল। একেশ্বরবাদী

মুসলিমদের মসজিদে কোন বিগ্রহ নেই, দেওয়ালে নেই কোন প্রাণীর ছবি ; শুধু লতাপাতা, ফুল ইত্যাদির নকশা দিয়ে সাজান। আর মন্দিরে বিগ্রহ ত থাকতই, মন্দিরের গায়ে জীবজন্তুর মূর্তি ও নানা পৌরাণিক কাহিনী রূপায়িত হত।

মধ্যযুগে বাঙলায় যে সকল হিন্দুমন্দির নির্মিত হয়েছিল তাতে মুসলিম প্রভাব বিশেষ দেখা যায় না। এদেশে পাথরের অভাবে ইটের তৈরি মন্দিরই বেশি, তার বহিরঙ্গে পোড়ামাটির ফলক সাজান। এই ফলকগুলোতে নানা দেবদেবী, মানুষ, জীব-জন্তুর চিত্র, এইসব পোড়ামাটির (টেরাকটা) মূর্তির মাধ্যমে রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী প্রভৃতি কাব্য ও পুরাণের কাহিনী, কখনও বা সমাজচিত্রও প্রতিফলিত। বিষ্ণুপুরের মন্দিরের টেরাকটা (**terracotta**) সৌন্দর্যে ও বৈচিত্র্যে আকর্ষণীয়।

ইতিহাস : মুসলিম শাসকগণ ইতিহাস রচনায় উৎসাহ দিতেন। এই যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ মিন্হাজ-উস-সিরাজের 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'; জিয়াউদ্দীন বরণীর তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' ও 'ফতেহি-ই-জাহান্দারী'; আমীর খসরুর 'তারিখ-ই-আলাই'; সিরাজ অফিফের 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' এবং আলাম ইয়াহিয়া বিন-মহম্মদের 'তারিখ-ই-মুবারকশাহী'। সুলতানী যুগের ইতিহাসের আকরগ্রন্থ হিসাবে এগুলি অত্যন্ত মূল্যবান।

আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ : সুলতানী আমলে ভারতে আঞ্চলিক ভাষাগুলির বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটে। সাধুসন্তদের ধর্মীয় আন্দোলন জনসাধারণের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিল। সমাজে অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোকের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষা জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল; তাই, সাধারণ মানুষ যাতে জ্ঞানধর্মের কথাগুলি বুঝতে পারে সেজন্য সাধুসন্তগণ সহজবোধ্য আঞ্চলিক ভাষায় তাঁদের বাণী প্রচার করেন। এর ফলে মহৎ ভাবের বাহন হিসাবে এইসব ভাষার গৌরব ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। কবীরের ছোট ছোট কবিতা (দোহা) গুলি ভাষার মাধুর্যে ও ভাবের গভীরতায় সূর্যকিরণে উজ্জ্বল নির্মল শিশিরবিন্দুর মত হৃদয়গ্রাহী। মীরাবাঈ 'ব্রজভাষায়' তাঁর ভক্তিরসপূর্ণ কবিতা রচনা করেছিলেন। গুরু নানকের বাণী পাঞ্জাবী ভাষাকে জনপ্রিয় করে; নামদেবের ভক্তিমূলক গান মারাঠী ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সহায়ক হয়েছিল। এযুগের হিন্দী সাহিত্যের সূচনা হয় চাঁদবরদই-রচিত 'পৃথ্বীরাজ রাসো' কাব্যগ্রন্থ দিয়ে। চাঁদবরদই পৃথ্বীরাজের সভাকবি ছিলেন। এ গ্রন্থে পৃথ্বীরাজের বীরত্বকাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। অপর হিন্দী কবি শারঙ্গধর রণথম্ভর-এর হামীরের শৌর্য অবলম্বনে 'হামীর রাসো' ও হামীর কাব্য' রচনা করেন।

কবীরের দোহা;
মীরার ভজন;
নানকের বাণী
হিন্দী বীর কাহিনী

সুলতানী যুগে বাংলা সাহিত্যে প্রেমভক্তির জোয়ার এসেছিল বলা যায়। চণ্ডীদাসের মধুর গীতিকাব্য, মৈথিলী বিদ্যাপতির কৃষ্ণপ্রেম-লীলার কবিতাবলী বাংলাভাষা সমৃদ্ধ করেছে। এ যুগের মুসলিম শাসক সুলতান হোসেন শাহ এবং নসরৎ শাহ হিন্দু সংস্কৃতিও ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের উৎসাহে মহাভারত, রামায়ণ ও ভাগবত সংস্কৃত থেকে বাংলায় রূপান্তরিত হয়েছিল।

উর্দুর উদ্ভব: হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতির একটি সুফল উর্দুভাষার উদ্ভব। শাসক মুসলিমগোষ্ঠী পারসী বা তুর্কীভাষা ব্যবহার করতেন; উত্তর ভারতের অধিবাসীর ভাষা ছিল হিন্দী। এখানে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর মিলন ও ভাবের আদান-প্রদানের ফলে ভারতীয় ভাষার শব্দ ইন্দো-পারসীক সাহিত্যে স্থান পেতে থাকে, অনেক পারসী শব্দও হিন্দী ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় প্রচলিত হয়। এইভাবে পারসী, আরবী ও তুর্কী শব্দ ও ভাবগত বাক্-ধারা ভারতীয় ভাষায় মিশ্রিত হয়ে ব্যবহারিক ভাষার উদ্ভব ঘটায়। হিন্দী-পারসীর মিলনসঞ্জাত এই লোকপ্রচলিত ভাষা উর্দু বা শিবির ভাষা নামে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। উর্দু হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিশ্র সুফল। যেসব বহিরাগত মুসলিম ভারতে স্থায়ী বসবাস গড়ে তুলেছিল উর্দু ভাষার মাধ্যমে এদেশের সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক মিলন বন্ধন রচিত হয়।

চিরন্তন ভারত

(মোগলযুগ)

[১৫২৬—১৭০৭]

মোগলযুগের ঐতিহাসিক উপাদান

মোগলযুগ ভারত ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জল অধ্যায় বলে বিবেচিত হয়। সুলতানী আমলের তিনশো বছরের তুলনায় মোগল আমলের প্রথম দুশো বছরে ভারত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা, শাসনতান্ত্রিক দৃঢ়তা ও অর্থনৈতিক সুস্থিরতা অর্জন করে। সামরিক তৎপরতা, শিল্প সাহিত্যের বিকাশ ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে এ যুগের কর্মকাণ্ডের পরিচয় পাওয়া যায়। এযুগের ঐতিহাসিক উপাদান প্রচুর এবং গবেষক ইতিহাসবিদগণ এখনও এর বিষয়বস্তুর ওপর নতুন আলোকপাত করে চলেছেন।

মোগল যুগের ঐতিহাসিক উপাদান প্রচুর

(i) **সরকারী বিবরণ ও নথি :** সমসাময়িক সরকারি বিবরণ ও ইতিবৃত্ত রচনার দিকে মুসলিম শাসকদের উৎসাহ ছিল। রাজানুগ্রহপুষ্ট লেখকদের রচনা সর্বত্র নিরপেক্ষ না হলেও তা থেকে বহুতথ্য ও যুগচিত্র পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আবুল ফজলের **আইন-ই-আকবরী ও আকবর-নামা,** নিজাম-উদ্দীন-আহমদের **তবকৎ-ই-আকবরী** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আইন-ই-আকবরীতে মোগল সাম্রাজ্যের ও শাসনতন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সংকলিত ফেরিস্তার রচনা **'তারিখ-ই-ফেরিস্তা'** বহু তথ্যের আকর। আব্দুল কাদির বরাউনীর **মুন্তাখাব্-ই-তারিখ** মূল্যবান উপাদান।

সরকারি বিবরণ ও ইতিবৃত্ত

(ii) **বিশিষ্ট ব্যক্তির আত্মচরিত :** বাবরের **আত্মচরিত** উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক উপাদান। পুস্তকখানি সাহিত্যকীর্তি হিসাবেও বিশ্বে পরিচিত। হুমায়ুন সম্বন্ধে সমসাময়িক বিবরণ পাওয়া যায় জোহরের আত্মকথায়; গুলবদন বেগমের **জীবন-কথা** ও বায়াজিদের **আত্মকাহিনী** উল্লেখযোগ্য। জাহাঙ্গীরের **আত্মচরিত** সম্রাটের প্রকৃতি-প্রীতি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় বহন করে।

বাবরের আত্মচরিত গুলবদন বেগমের জীবনকথা, জাহাঙ্গীরের আত্ম-চরিত প্রভৃতি

(iii) **বিদেশীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত :** মোগল যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে অনেক বিদেশী এসেছিলেন। এঁদের ভারত-বিবরণ নানা তথ্যে পূর্ণ। আকবরের সভায় জেসুইটগণ অবস্থান করে নানা বিষয় পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা করেছিলেন। র‍্যালফ ফিচ আকবরের রাজত্বকালে বাণিজ্যিক সুবিধা অনুসন্ধানে এসে সম্রাট আকবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন (১৫৮৫ খৃঃ)। স্যার টমাস্ রো আসেন জাহাঙ্গীরের সভায় ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের দূতরূপে এছাড়া ট্যাভার্নিয়ে, বার্নিয়ে,মানুচ্চি প্রভৃতির বিবরণ চিত্তাকর্ষক। পিটার

জেসুইটদের বিবরণ, র‍্যালফ্ ফিচ্ স্যার টমাস রো, ট্যাভার্নিয়ে বার্নিয়ে, মানুচ্চি প্রভৃতি বিবরণ পিটার মাণ্ডির বর্ণনা

মাণ্ডি নামক ইংরেজ ব্যবসায়ী শাহজাহানের আমলের শাসনব্যবস্থা ও দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়েছেন।

(iv) **স্থাপত্য, শিল্প, মুদ্রা :** মোগল যুগের স্থাপত্য সারা বিশ্বে প্রশংসিত। বিশেষ ধরনের চিত্রশৈলী, নানা ডিজাইনের মুদ্রা ইত্যাদি থেকে সেযুগের শিল্পকলা ও রুচির পরিচয় মেলে। পি. ব্রাউনের **Indian Painting under the Mughals** এবং **Archaeological Survey of India** প্রকাশিত গ্রন্থে মোগল চিত্র ও স্থাপত্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে।

পি. ব্রাউনের মোগল চিত্রকলা, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের পুস্তকাবলী সহায়ক উপাদান

২.
মোগলদের পরিচয়

বাবরের রাজ্যস্থাপন

বাবর : মধ্য এশিয়ার মঙ্গোলিয়া ছিল মঙ্গোলদের আদি বাসভূমি। মঙ্গোলরা মোগল নামে পরিচিত। দিল্লী সুলতানী আমলে এই দুর্ধর্ষ যুদ্ধপ্রিয় জাতি তাদের নায়ক চেঙ্গিস খাঁর নেতৃত্বে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে হানা দিয়েছিল, তবে তারা ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেনি। রাজ্য-পত্তন করেছিলেন বাবর।



বাবর

বাবরের পুরোনাম জাহিরউদ্দীন মহম্মদ বাবর। পিতা উমর শেখ মীর্জা সিরদরিয়া উপত্যকায় ফরগণা রাজ্যের শাসক ছিলেন। পিতার দিক থেকে তিনি তৈমুরলঙ্গ এবং মাতার দিক থেকে চেঙ্গিস খাঁর বংশধর। কৈশোরে পিতৃহীন হলে আত্মীয়স্বজনদের চক্রান্তে রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন কিন্তু তিনি নিরাশ হয়ে দুর্ভাগ্যকে মেনে নেননি। অল্প কিছু সংখ্যক অনুগত সৈনিকের সহায়তায় বাবর নিজের জন্য রাজ্য গড়ে তুলতে চেষ্টা করতে থাকেন। কয়েকবার ভাগ্য বিপর্যয়ের পর তিনি কাবুল অধিকার করেন এবং এখান থেকে ভারতে রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখতে থাকেন। পাঞ্জাবের গভর্নর দৌলত খাঁ লোদীর দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীর সিংহাসনের প্রতি

লোভ ছিল। তিনি বাবরকে ভারত আক্রমণ করতে আমন্ত্রণ জানান, উদ্দেশ্য সুলতান পরাজিত হলে তাঁর পক্ষে সুলতানি লাভ করা সহজ হবে।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬): দিল্লী থেকে ৫৫ মাইল দূরে পানিপথ প্রান্তরে দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গে বাবরের যুদ্ধ হল ২১ এপ্রিল ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে। ভারত-ইতিহাসে এ যুদ্ধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে, এর ফলে ভারতে মোগলশাসনের সূত্রপাত হয়। বাবরের ছিল ১২ হাজার উৎকৃষ্ট সুশৃঙ্খল অশ্বারোহী সৈন্য। অন্যান্য সৈন্য মিলিয়ে হাজার পঁচিশেক। ইব্রাহিম লোদীর ছিল ১ লক্ষ সৈন্য ও এক হাজার রণহস্তী। বাবরের রণকৌশল ও অভিজ্ঞ সৈন্যবাহিনীর সাহস ও পরাক্রমের মুখে সুলতানের বিশাল সৈন্যদল টিকতে পারেনি। ১৫ হাজার সৈন্যসহ সুলতান যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। পানিপথে বিজয়ী হয়ে বাবর দিল্লী ও আগ্রা দখল করলেন এবং সেখানে যে প্রচুর ধনরত্ন হস্তগত হল তা সৈন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। বিশ্বস্ত সঙ্গীদের অনুগত রাখতে হবে, কারণ বিশাল দেশে আরও অনেক শত্রুর সঙ্গে লড়তে হবে। বাবর যেমন বীর তেমনি বিচক্ষণ ছিলেন।

মোগল যুগের সূত্রপাত

মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে আগ্রার কাছে খানুয়ার যে যুদ্ধ হল তা বাবরের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে রাণা ১২০ জন নায়কসহ ৮০ হাজার অশ্বারোহী ও ৫০০ রণহস্তী নিয়ে স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

খানুয়ার যুদ্ধ—১৫২৭

বাবরের সৈন্য সংগ্রামসিংহের বাহিনী থেকে সংখ্যায় অনেক কম হলেও তাঁর সৈন্যদলের মরণপণ সংকল্প, উন্নত শৃঙ্খলা, বন্দুক ও কামানের ব্যবহার, অশ্বারোহী বাহিনীর 'তৌলকামা' আক্রমণ পদ্ধতি যাতে সতেজ অশ্বারোহী দল 'সাঁড়াশি' প্রয়োগের মত দুদিক থেকে অকস্মাৎ অগ্রসর হয়ে বিপক্ষকে ঘিরে ফেলে ছত্রভঙ্গ করে দেয়—এই সব কৌশল ভারতীয় বাহিনীকে লণ্ডভণ্ড করে দিল। বাবর বিজয়ী হলেন। খানুয়ার যুদ্ধে জয় বাবরের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বড় পদক্ষেপ। কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

চন্দেরি (১৫২৮): ১৫২৮ খৃস্টাব্দে বাবর চন্দেরি দুর্গ আক্রমণ করে দুর্গাধিপতি রাণার প্রতিনিধি মেদিনী রাওকে পরাজিত করেন এবং দুর্গটি বিধ্বস্ত করে দেন।

চন্দেরি—১৫২৮

ঘাগরা যুদ্ধ (১৫২৯): দিল্লী, আগ্রা ও চন্দেরিতে নিজ আধিপত্য বিস্তার করার পর বাবরকে বাঙলা ও বিহারের আফগান সর্দারদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। গঙ্গা ও ঘাগরা নদীর মিলনস্থলের কাছে ঘাগরা প্রান্তরে আফগানরা পরাজিত হয়। পর পর ৪টি যুদ্ধে জয়লাভ করে বাবর তাঁর প্রতিষ্ঠা শক্ত ভিত্তির ওপর স্থাপন করেন। বাবরের সাম্রাজ্য

ঘাগরা যুদ্ধ—১৫২৯

কাবুলের অক্ষু নদীর তীর থেকে বিহার, হিমালয় থেকে মালব ও রাজস্থান পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

বাবরের কৃতিত্ব : ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারূপে বাবর ইতিহাসে বিখ্যাত পুরুষ। বিশ্বের অন্যত্রও সাম্রাজ্য স্থাপকের কীর্তি জানা যায় কিন্তু বাবর কতক বিষয়ে ছিলেন অনন্য। যেমন—১১ বছর বয়সে পিতৃরাজ্য থেকে বিতাড়িত কিশোর যে অসীম ধৈর্য, সাহস ও দুঃখ জয় করার উদ্যম দেখিয়েছেন ইতিহাসে তা বিরল। বারংবার ব্যর্থ হয়েও অবশেষে তিনি কাবুল রাজ্য অধিকার করে আত্মপ্রতিষ্ঠায় জয়ী হন।

বিপদে নির্ভীক; সংকল্পে অটল

বাবর অপেক্ষা কম সাহসী কোন নায়ক এত অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে এমন বিরাট অভিযানের ঝুঁকি নিতেন কিনা সন্দেহ। নতুন অস্ত্র (কামান-বন্দুক) ব্যবহার ও অশ্বারোহী দিয়ে 'সাঁড়াশি' আক্রমণ বাবরের রণকৌশলের সাফল্যের চাবিকাঠি। ব্যূহরচনায় ও সৈন্য চালনায় তিনি আলেকজান্দারের রণনীতি অনুসরণ করেছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের সামনে গাড়ি স্থাপন করে বিপক্ষকে ঠেকান এবং ঢালের আড়াল দাঁড় করে বন্দুক চালনা বাবরের উদ্ভাবিত কার্যকর পন্থা॥

সাহসী যোদ্ধা, কৌশলী ব্যূহ রচয়িতা

বাবরের আত্মচরিত : শত্রুবেষ্টিত বিদেশে বাবর নিরুদ্যম শঙ্কিত সৈন্যবাহিনীকে আবেগময় ভাষায় আহ্বান জানিয়ে যুদ্ধে প্রাণ দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বিদ্বান, কবি ও সুলেখক। তাঁর 'আত্মচরিত' তুর্কী সাহিত্যের সম্পদ বলে বিবেচিত এবং পৃথিবীতে একখানি উত্তম জীবনকথা বলে সমাদৃত। সঙ্গীতে ও চিত্রকলায় তাঁর অধিকার ছিল। তাঁর শিল্পীমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হত। ভারতের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল না, এ দেশ প্রিয় ছিল কেবল 'প্রচুর সম্পদের জন্য'। স্বদেশ এবং সেখানকার ফল-ফুলের প্রতি বাবরের অনুরাগ ছিল অপরিসীম। কাবুল থেকে আনা কস্তুরি-তরমুজ কেটে খাওয়ার সময় জন্মভূমির কথা স্মরণ করে তিনি অশ্রুবর্ষণ করেছিলেন। বাবর রণক্ষেত্রে কঠোর, স্বদেশপ্রেমে কোমল। তাঁর চরিত্রে রুদ্র ও সুন্দরের অপূর্ব মিলন ঘটেছিল।

বক্তা, কবি, শিল্পী

রাজ্যস্থাপয়িতা : বাবর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিন্তু শাসনব্যবস্থার আইন-শৃঙ্খলে তাকে স্থায়ী করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সুযোগ পাননি। একাজ সম্পন্ন করেছিলেন পৌত্র আকবর।

মোগল-আফগান সংঘর্ষ

হুমায়ুন (১৫৩০-৪০ এবং ১৫৫৫-৫৬)

পানিপথ যুদ্ধের পর মাত্র ৪ বছর বাবর জীবিত ছিলেন। নতুন দেশে বিপক্ষ হিন্দু ও মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিজের অধিকার রক্ষা করাই ছিল তাঁর প্রধান সমস্যা। তাঁর অকাল মৃত্যুতে সিংহাসন সুদৃঢ় করার দায়িত্ব পড়ল ২৩ বছর বয়স্ক পুত্র হুমায়ুনের ওপর। তিনি পিতার মত উদ্যম ও বহুমুখী গুণের অধিকারী ছিলেন না। ভদ্র, আরামপ্রিয়, মার্জিতরুচি হুমায়ুন যখন আগ্রায় বিলাসে ও পাঠচর্চায় সময় কাটাচ্ছিলেন তখন মালব ও গুজরাট মোগলদের হাতছাড়া হয়ে যায়। হুমায়ুনের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে শক্তি সঞ্চয় করছিলেন যে পাঠান তরুণ, হুমায়ুন তাঁর দিকে নজর দেননি কিন্তু অল্পদিন পরেই উদ্যমহীনতার ফল ভোগ করতে হয়েছিল।

হুমায়ুনের চরিত্র



হুমায়ুন

ভারতে আফগানরা এসেছিল মোগলদের অনেক আগে। তারা এদেশে স্থায়ী বসতি গড়েছিল। এক সময়ে আফগানরা ছিল দিল্লীর শাসক। স্বভাবতঃ তারা এদেশের অধিবাসী এবং অভিজাত বলে গর্ববোধ করত। এ কারণে মোগলরা ভারতবর্ষ দখল করতে এলে হিন্দুরা যেমন তাদের বাধা হয়ে দাঁড়ায়, ঠিক তেমনি বাধা হয় আফগানরা। বাবরের মৃত্যুর মাত্র দশ বছরের মধ্যে হুমায়ুনকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করলেন শের শাহ।

মোগল আফগান সম্পর্ক

শের শাহ (১৫৪০—৪৫)

বাল্যে ও কৈশোরে নানা ভাগ্য-বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে নিজের জীবন তিনি গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন জৌনপুরে সাসারাম পরগণার জাগীরদার। পিতার প্রতিনিধিরূপে সেখানে তাঁর প্রশাসনকার্যে হাতেখড়ি। প্রথমে বাবরের অধীনে (১৫২৭ খৃঃ) এবং পরে জালাল খাঁ লোহানির অধীনে কাজ করেন। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে শের খাঁ জালাল খাঁর সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে নিজে এক শক্তিশালী সৈন্যদল গড়ে তোলেন। শের খাঁ-এর উত্তরোত্তর ক্ষমতাবৃদ্ধিতে

জালাল খাঁ এবং বিহারের লোহানি অভিজাতবর্গ ঈর্ষান্বিত হয়ে বাংলা দেশের



শের শাহ

সুলতান মামুদ শাহ-এর সাহায্য নিয়ে তাঁকে দমন করতে উদ্যত হন। কিন্তু সুরজগড়ের যুদ্ধে (১৫৩৪ খৃঃ) এঁদের মিলিত বাহিনী পরাজিত হওয়ায় শের খাঁ-ই বিহারের প্রকৃত স্বাধীন সুলতান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর বাল্য নাম ছিল ফরিদ খাঁ। ফরিদ একবার নিজ হাতে একটি বাঘ হত্যা করে সাহস ও দৈহিক শক্তির জন্য 'শের' আখ্যা লাভ করেছিলেন। শুধু দৈহিক বল নয়, মানসিক গুণেও তিনি ভূষিত ছিলেন। কাব্য ও শিল্পসাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। তিনি ছিলেন মেধাবী ছাত্র; আরবী ও পার্সী সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। সামরিক দক্ষতা তাঁর রাজপদপ্রাপ্তির পথ সুগম করে দিয়েছিল। প্রথমে চৌসা, পরে কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে তিনি শের শাহ নাম নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন (১৫৪০ খৃঃ)।

শের শাহের শাসন ঃ নিজ বাহুবলে সিংহাসন লাভ করে শের শাহ মাত্র ৫ বছর (১৫৪০-৪৫ খৃঃ) রাজত্ব করেছিলেন। তবু এই সময়কালের মধ্যে তিনি রাজ্যশাসন, প্রজাকল্যাণ, শিল্পসংস্কৃতির বিকাশ প্রভৃতি ব্যাপারে যে কৃতিত্ব ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তাঁকে ভারত-ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক আখ্যা দেওয়া যায়। ঐতিহাসিক স্মিথ বলেছেন, শের শাহ যদি দীর্ঘজীবী হতেন কিংবা তাঁর বংশধরেরা যদি তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী হত তবে ভারত-ইতিহাসমঞ্চে মোগলদের আবির্ভাব ঘটত না।

শাসক শের শাহ

সামরিক সংস্কার ঃ সামরিক শক্তি বলে রাজ্যলাভে সফলকাম শের শাহ এক শক্তিশালী সৈন্যদল গড়ে তুলেছিলেন যার সহায়তায় রাজ্য রক্ষা ও বিস্তার ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

পুলিশী ব্যবস্থা ঃ রাজ্য মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং প্রজার ধন-সম্পত্তির নিরাপত্তার দিকে শের শাহের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কোন এলাকায় চুরি-ডাকাতি হলে সেই অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত পুলিশকে তার জন্য দায়ী করা হত এবং তাকে ক্ষতিপূরণসহ কঠোর শাস্তি পেতে হত। শের শাহের শাসনগুণে দুষ্ট এমনভাবে দমিত হয়েছিল যে, পথে ঘাটে বহু মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে লোকে নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারত।

পুলিশী ব্যবস্থার সুফল

ভূমিরাজস্ব সংস্কার : ভূমিরাজস্বের সুবন্দোবস্ত করার জন্য শের শাহ স্মরণীয় হয়ে আছেন। এগুলি হল :

রাজস্ব নীতি

ক. সমগ্র ভূমি জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারণ ; খ. উৎপন্ন ফসলের ১/৪ থেকে ১/৩ অংশ রাজস্ব হিসাবে দিতে হত ; ফসল অথবা তার মূল্য কর বাবদ দেওয়া চলত। গ. রাজস্ব আদায়কারী ছিল ; প্রজারা ইচ্ছে করলে রাজস্ব সরাসরি রাজকোষে জমা দিতে পারত ; ঘ. কর নির্ধারণের সময় উদারতা দেখান হত কিন্তু আদায়ের ব্যাপারে যথেষ্ট কড়াকড়ি ছিল ; ঙ. চাষীর স্বার্থরক্ষায় শের শাহ সদা সচেষ্ট ছিলেন। খরা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি অভাবিতপূর্ণ সংকটে চাষীকে অগ্রিম টাকা দিয়ে সাহায্য করা হত ; চ. জমির ফসল যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে সৈন্যদের ওপর কঠোর নির্দেশ ছিল ; ছ. জমিতে প্রজার স্বত্ব মেনে নিয়ে সরকার থেকে 'পাট্টা' দেবার ব্যবস্থা হয়, প্রজা 'কবুলিয়ত (স্বীকার পত্র) দিয়ে জমি গ্রহণের শর্ত মেনে নিত। পাট্টা-কবুলিয়ত মাধ্যমে আইনগত আদান-প্রদানের ভিত্তিতে রাজা-প্রজার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। শের শাহের ভূমিরাজস্ব সংস্কার সুফলপ্রদ হওয়ায় আকবর এবং পরবর্তীকালের ইংরেজ শাসকগণও এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন।

কেন্দ্রীয় শাসন : শের শাহ নিজে ছিলেন রাজ্যের সর্বময় কর্তা, সামরিক এবং অ-সামরিক শাসনের যাবতীয় কর্তৃত্ব তাঁর হাতে ছিল। তবে বিশাল রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার জন্য কতকগুলো বিভাগ এবং বিভাগীয় মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়েছিল।

প্রাদেশিক শাসন : শের শাহের প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা থেকে তাঁর প্রজা-হিতৈষণার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সুষ্ঠু ব্যবস্থা শুধু মোগল যুগেই নয় আধুনিককালেও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে। প্রশাসনিক বিভাগ ও কর্মচারিদের বিন্যাস ছিল এই রকম—

আঞ্চলিক শাসন

ক. সমগ্র সাম্রাজ্য ৪৭টি সরকারে বিভক্ত হয়েছিল ; প্রতি সরকার বিভক্ত হয় কতকগুলো পরগণায় ; খ. সরকারের প্রধান কর্মচারি ছিলেন শিকদার-ই-শিকদারান অর্থাৎ প্রধান শিকদার এবং মুনসেফ-ই-মুনসিফান (প্রধান মুনসেফ)। এঁরা পরগণা-কর্মচারিদের কাজ তত্ত্বাবধান করতেন। গ. পরগণার কর্মচারী ছিলেন মুনসেফ (বিচারক), শিকদার (আইন শৃঙ্খলারক্ষক), আমিন (রাজস্ব আদায়কারী), কোষাধ্যক্ষ এবং হিন্দী ও পার্সী লেখক। ঘ. প্রতি পরগণা গঠিত হত কতকগুলো গ্রাম নিয়ে। গ্রামের প্রশাসন-কর্মচারী ছিলেন মোকাদ্দম চৌধুরি ও পাটোয়ারি। গ্রাম পঞ্চায়েৎ গ্রামের শাসনকার্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিতেন। ঙ. সরকারী কর্মচারীদের এক বা দুই বছর

পর পর বদলি করার ব্যবস্থা ছিল যাতে কেউ কোথাও অধিক প্রভাবশালী হতে না পারে।

বিচার ব্যবস্থা : শের শাহ্ বলতেন, ন্যায় বিচার ধর্মাচরণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি সারা রাজ্যে বিচারক কর্মচারীর মাধ্যমে সুবিচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। এছাড়া প্রতি বুধবারে তিনি রাজদরবারে স্বয়ং বিচারের আবেদন শুনতেন এবং নিরপেক্ষ ব্যবস্থা নিতেন।

মুদ্রাসংস্কার : শের শাহ্ মুদ্রা ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা এনে প্রজাদের উপকার করেছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী রাজাদের মুদ্রাগুলো সবই এক মানের ছিল না। মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি প্রথমে প্রচুর সংখ্যায় সোনা, রূপা ও তামার মুদ্রা প্রচার করে তাদের পরস্পরের মধ্যে মূল্যমান নির্ধারণ করে দেন; তারপর প্রাচীন মুদ্রার প্রচলন বাতিল করে দিলে রাজ্যে মুদ্রার লেনদেন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আসে। শের শাহের অধিকাংশ মুদ্রা, বিশেষ করে রূপার টাকা (টংকা) মোগল আমলে প্রচলিত ছিল এবং ইংরেজ রাজত্বকালেও শের শাহের মুদ্রা ব্যবস্থা ব্রিটিশ মুদ্রা পদ্ধতির ভিত্তিরূপে গৃহীত হয়েছিল।

শেরশাহের মুদ্রা ব্যবস্থা

সড়ক পথ ও পান্থশালা নির্মাণ : সামরিক প্রয়োজনে ও দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য বহু সুন্দর সুদীর্ঘ রাজপথ ও পথের ধারে স্থানে স্থানে সরাই পান্থশালা নির্মিত হয়েছিল। পথ-নির্মাতা হিসেবে শের শাহের নাম এখনও স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর নির্মিত প্রধান পথগুলো হল :

পথাদি সংস্কার

ক. গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড (সড়ক-ই-আজম)—ঢাকার নিকট সোনারপুর থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে আটক পর্যন্ত ১৫০০ 'কোশ' দীর্ঘ; খ. আগ্রা থেকে বুরহানপুর অভিমুখী দক্ষিণ পথ; গ. আগ্রা থেকে যোধপুর ও চিতোর; ঘ. লাহোর থেকে মুলতান। হিন্দু ও মুসলমানের পৃথকভাবে ব্যবহারের জন্য ১৭০০টি সরাইখানা স্থাপন ও পথের ধারে ছায়াবৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল।

ব্যবসা বাণিজ্যে উৎসাহ দান : রাজ্যমধ্যে বাণিজ্য প্রসারের জন্য শের শাহ আভ্যন্তরীণ শুল্ক রহিত করে দিয়েছিলেন। শুধু দুইবার কর আদায় করা হত—একবার সীমান্তকর, যখন অন্য রাজ্য থেকে পণ্য তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করত, দ্বিতীয়বার বিক্রয়ের সময়। কঠোর আইন-শৃঙ্খলা পরিবহন সড়ক, বণিকদের নিরাপত্তা ও বাসের সুব্যবস্থা, অন্তর্দেশীয় শুল্ক রদ এবং মুদ্রাসংস্কার দরুন দেশে প্রভূত বাণিজ্যসমৃদ্ধি ঘটেছিল।

ব্যবসা বাণিজ্য

ডাকচৌকি : রাজ্য প্রশাসন চালাতে গুপ্তচর মারফৎ যেমন নানা খবর সংগ্রহ করা দরকার তেমনি প্রয়োজন বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে ডাক যোগাযোগ মাধ্যমে কর্মচারীদের কাছ থেকে বিবরণ পাওয়া ও নানা নির্দেশ পাঠান। এই কাজ দ্রুত সম্পাদনের জন্য ঘোড়ার ডাকচৌকি ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর সরাইতে অশ্বারোহী ডাকহরকরা প্রস্তুত থাকত এবং এক সওয়ার ডাক নিয়ে হাজির হওয়ার সঙ্গে অন্যজন তা নিয়ে পরের চৌকিতে পৌঁছে দিত।

ডাক ব্যবস্থা

শিক্ষা, শিল্প সংস্কৃতি

শের শাহ বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। প্রজাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করে ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য অর্থ-ভাতা মঞ্জুর করেছিলেন।

ধর্মের ব্যাপারে উদার ও নিরপেক্ষ নীতি শের শাহকে মুসলিম শাসকদের মধ্যে বিশিষ্টতা দান করেছে। নিজে খাঁটি সুন্নী মুসলমান শের শাহ শিয়া-সম্প্রদায়ের মুসলিম ও হিন্দু প্রজাদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করেননি।

সমদর্শী ধর্মীয় নীতি

শের শাহের বংশধর : শের শাহ অল্প সময়ের মধ্যে পাঞ্জাব, মালব, মুলতান, চিতোর, আজমীর প্রভৃতি জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। ১৫৪৫ খৃস্টাব্দে বুন্দেলখন্দে রাজপুতদের বিরুদ্ধে কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করার সময় তিনি বারুদ বিস্ফোরণে আহত হয়ে প্রাণ হারান। আসাম, কাশ্মীর, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও গুজরাট ছাড়া শের শাহ প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত জয় করেছিলেন।

শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জালাল খাঁ সলিম শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৮ বছর যোগ্যতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সলিম শাহের ১২ বছর বয়স্ক পুত্র ফিরোজ সিংহাসনে ছিলেন মাত্র ৩ দিন। তাঁর মাতুল ভাগ্নেকে হত্যা করে মহম্মদ আদিল শাহ নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন এবং শাসনের পূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দেন হিমু নামে হিন্দুমন্ত্রীর হাতে। যোগ্য শাসক না থাকায় সাম্রাজ্যের মধ্যে গোলমাল শুরু হয়। এই সুযোগে হুমায়ুন ফিরে এসে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন (১৫৫৫)। কিন্তু তিনি বেশিদিন রাজ্য ভোগ করতে পারেননি। ১৫৫৬ খৃস্টাব্দে নিজের পাঠকক্ষের সিঁড়ি থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। হুমায়ুন শের শাহের হাতে রাজ্যহারা হয়ে ১৫ বছর দেশে বিদেশে আশ্রয় খুঁজে ফিরছেন; এইরূপ অবস্থায় সিন্ধুদেশের অমরকোটনগরে পুত্র আকবরের জন্ম (১৫ অক্টোবর, ১৫৪২) হয়।

৪.
মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও সংহতির কাল

আকবর (১৫৪২—১৬০৫)

দিল্লী সুলতানদের বেশিরভাগই আপন ভোগবিলাসে মত্ত থেকে, মারামারি কাটাকাটি করে স্বার্থের জীবনযাপন করেছে। ভারতবর্ষকে তারা বিজিত রাজ্য-রূপেই বিবেচনা করেছে। এদেশকে হিন্দুদের নিয়ে মিলিত হিন্দু-মুসলমানের দেশ-রূপে অনুভব করেনি। শের শাহই প্রথম শাসক যিনি ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর পরে আমরা জানি মোগল-সম্রাট আকবরকে যিনি প্রকৃতপক্ষে বাবরের প্রতিষ্ঠিত এবং হুমায়ুনের হস্তচ্যুত রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করে দৃঢ় ভিতের ওপর স্থাপন করেছিলেন।

আকবর ইতিহাসে ক্ষণজন্মা পুরুষ। পিতা যখন ভাগ্যচ্যুত হয়ে আশ্রয় সন্ধানে ভ্রাম্যমাণ সেই সময় হিন্দুরাজা রাণাপ্রসাদের আশ্রয়ে সিন্ধুর অমরকোটে এক তাঁবুতে তাঁর জন্ম। জননী হামিদা বানু তখন ১৫ বছরের কিশোরী। পুত্রলাভের সুসংবাদ জানতে পেরে হুমায়ুনের শেষ সম্বল একখণ্ড মৃগনাভি কস্তুরি ভাগ করে অনুগত সঙ্গীদের হাতে হাতে দিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন—মৃগনাভির সৌরভ যেমন তাঁবুর বাতাস সুরভিত করছে, সন্তানের যশ যেন তেমনি পৃথিবী পূর্ণ করে।

আকবরের সিংহাসন লাভ ঃ দুর্ঘটনায় হুমায়ুনের যখন মৃত্যু হয় তখন আকবর তাঁর শিক্ষক বৈরাম খাঁর সঙ্গে পরাজিত আফগান সৈন্যদের পিছু ধাওয়া করতে পাঞ্জাবে ছিলেন। হুমায়ুনের মৃত্যু খবর প্রচারিত হলে দিল্লীতে গণ্ডগোল হতে পারে আশংকা করে এ খবর গোপন রাখা হয় এবং এক ব্যক্তি হুমায়ুনের মত রূপ ধারণ করে রাজপ্রাসাদের অলিন্দ থেকে জনসাধারণকে দর্শন দেন। ইতিমধ্যে বৈরাম খাঁর কাছে আসল খবর পাঠান হয়। গুরুদাসপুর জেলার কালানৌরের এক উদ্যানে আকবরের অভিষেকের ব্যবস্থা হয় ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৫৫৬ খৃস্টাব্দে। রাজধানীর বাইরে বিশেষ কারণে নির্মিত এই সাধারণ সিংহাসনটিতে পরবর্তীকালে একটি তথ্যফলক স্থাপিত হয়েছিল।

বৈরাম খাঁ যখন কালানৌরে আকবরকে দিল্লীর 'বাদশা' বলে ঘোষণা করলেন, তখন তার্দি বেগ নামে একজন তুর্কি কর্মচারীকে দিল্লীর গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। হুমায়ুনের মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে আদিল শাহের সেনাপতি হিমু আক্রমণ করে দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করে নেন এবং নিজে 'বিক্রমজিৎ' উপাধি ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। কাজেই দিল্লীর সিংহাসন কার ভাগ্যে থাকবে তা নির্ধারণ করার জন্য দুপক্ষেরই প্রস্তুতি চলল। এর মীমাংসা হল পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬ খৃঃ) : পানিপথের প্রথম যুদ্ধের কথা আমরা আগেই জেনেছি। সেখানে ৩০ বছর আগে অর্থাৎ ১৫২৬ খৃস্টাব্দে বাবর দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করে ভারতে মোগলরাজত্বের পত্তন করেছিলেন। এবারে মোগল সাম্রাজ্য ভারতে আদৌ থাকবে কি না, তার পরীক্ষা শুরু হ'ল।

দ্বিতীয় পানিপথ যুদ্ধে আকবর বিজয়ী হলেন নেহাৎ আকস্মিকভাবে। হিমু ছিলেন অভিজ্ঞ দক্ষ সেনাপতি। তাঁর ছিল ১৫০০ রণহস্তি ও বিরাট সৈন্যদল। কিছু সংখ্যক কামানও ছিল কিন্তু যুদ্ধের শুরুতেই কামানগুলো শত্রুপক্ষের হাতে পড়াতে তাঁর শক্তি কমে গিয়েছিল। তবু বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে তিনি বৈরাম খাঁর নেতৃত্বে চালিত আকবরের বাহিনীকে কোনঠাসা করে ফেলেছিলেন। জয় যখন প্রায় নিশ্চিত সেই সময় অকস্মাৎ একটি তীর হিমুর চোখে বিঁধে যাওয়ায় তিনি অজ্ঞান হয়ে হাতির পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে যান। বৈরাম খাঁর নির্দেশে আকবর হিমুর শিরশ্ছেদ করেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

পিতামহ বাবরের অধিকৃত দিল্লী সিংহাসন কয়েকবার হাতবদলের পর আবার ফিরে এল পৌত্র আকবরের হাতে। আকবর মোগল রাজ্যকে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করে সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থায় ২০০ বছরের জন্য স্থায়ী ও সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন।

আকবরের রাজ্যবিস্তার : পিতা হুমায়ুনের কাছ থেকে আকবর পেয়েছিলেন দিল্লী ও আগ্রার সামান্য অংশ। তাও পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করে হিমুর কাছ থেকে পুনরধিকার করতে হয়। বাবর ভারতে মোগলসাম্রাজ্য স্থাপন করলেও আকবরই যে সাম্রাজ্যের আসল প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক তা তাঁর কৃতিত্ব থেকেই প্রমাণিত হয়।

আকবর কিভাবে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন তা হল :

১. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলে দিল্লী ও আগ্রা পুনরধিকার (১৫৫৬ খৃঃ)।

২. বৈরাম খাঁ ৪ বছর আকবরের অভিভাবকরূপে রাজ্যশাসন কালে গোয়ালিয়র, আজমীর ও জৌনপুর জয় করে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন (১৫৫৬-৬০ খৃঃ)।

৩. ১৫৬০-৬২ খৃস্টাব্দে মালব জয় করেন। আকবর মালবের আফগান শাসক বাজ বাহাদুরকে নিজ দরবারে সম্মানের সঙ্গে স্থান দেন।

৪. ১৫৬৪ খৃস্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের গণ্ডোয়ানা রাজ্য বিজিত হয়। পুত্র বীরনারায়ণ যুদ্ধে নিহত হলে তেজস্বিনী রানী দুর্গাবতী ছুরিকাদ্বারা আত্মহত্যা করে আত্মসম্মান রক্ষা করেন।

৫. ১৫৬৮ খৃস্টাব্দে আকবর চিতোর অধিকার করেন। চিতোরের পতন হলে রাজপুত রমণীগণ নিজেদের সম্মান বাঁচানোর জন্য দেশীয় প্রথা অনুযায়ী জহরব্রত

পালন করে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দেন। কিন্তু চিতোর বিজিত হলেও তিন বছর পরে মেবারের নতুন রাণা, উদয় সিংহের পুত্র প্রতাপ মোগলদের বিরুদ্ধে আবারও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ শুরু করেন। প্রতাপকে পরাস্ত করার জন্য আকবর সেনাপতি মানসিংহকে পাঠালেন। হলদিঘাটের যুদ্ধে (১৫৭৬ খৃঃ) প্রতাপ পরাজিত হলেন। কিন্তু তা হলেও তিনি মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন নি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত (১৫৯৭ খৃঃ) তিনি চিতোর ফিরে পাওয়ার জন্য মোগলদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন।

৬. ১৫৬৯ খৃস্টাব্দে রণথমবোর ও কালিঞ্জর অধিকৃত হয়।

৭. ১৫৭০ খৃস্টাব্দে বিকানীর, জয়সলমীর ও যোধপুর রাজ্য আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে।

৮. ১৫৭২-৭৩ খৃস্টাব্দে গুজরাট জয় করে আকবর একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেন।

৯. ১৫৭৪-৭৬ খৃস্টাব্দে বিহার এবং বাংলাদেশ মোগলসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১০. কাবুল—আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মীর্জা হাকিম কাবুলের শাসক ছিলেন। ভ্রাতার জীবিতকালে আকবর কাবুল আক্রমণ করেননি। মীর্জা হাকিমের মৃত্যু হলে ১৫৮৫ খৃস্টাব্দে কাবুল অধিকৃত হয় কিন্তু বিদ্রোহী পাঠানগণ পরের বছরেই কাবুল পুনরায় অধিকার করে নেয়। পাঠানের বিদ্রোহ দমন করতে আকবর রাজা বীরবলকে কাবুলে পাঠালে সেখানে তিনি নিহত হন।

১১. ১৫৮৬ থেকে ১৫৯৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীর, সিন্ধু ও কান্দাহার অধিকার করে আকবর সাম্রাজ্যের উত্তরসীমা হিমালয় ও পশ্চিমে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত করেন।

১২. মোগল সম্রাটদের মধ্যে আকবরই প্রথম দাক্ষিণাত্য বিজয়ে উদ্যোগী হন। ১৫৫৯-৬১ খৃস্টাব্দে আহমদনগর ও খান্দেশ জয় করে তিনি দাক্ষিণাত্যকে বেরার, আহমদনগর ও খান্দেশ—এই তিনটি প্রদেশে বিভক্ত করে যুবরাজ দানিয়েলের অধীনে স্থাপন করেন।

আকবরের সাম্রাজ্য পূর্বে বঙ্গদেশ থেকে পশ্চিমে আফগানিস্তান এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই বিশাল সাম্রাজ্য ১৫টি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত হয়েছিল। এর মধ্যে ৩টি ছিল দাক্ষিণাত্যে। আকবর শুধু বাহুবলে রাজ্য জয়ই করেননি, সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থায় তিনি সাম্রাজ্যকে শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

নতুন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা : আকবর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ১৫টি সুবা বা প্রদেশে ভাগ করে সর্বত্র একই প্রকার শাসনপ্রণালী প্রবর্তন করেন। সুবার প্রধান কর্মচারীরা ছিলেন সুবেদার দেওয়ান, বক্সী, সদর, কাজী, কোতয়াল, মীরবহর ও ওয়াকি-নবীশ। প্রদেশগুলি সরকারে এবং সরকার পরগণায় বিভক্ত

করা হয়েছিল। গ্রাম ছিল শাসন অঞ্চলের সর্বনিম্ন একক। প্রতি গ্রামের শাসনদায়িত্ব ন্যস্ত ছিল পাটোয়ারি ও চৌকিদারের ওপর।

জাগীরদারী ব্যবস্থার পরিবর্তন ঃ আকবর সেনাবাহিনীর সংগঠন, অস্ত্রসজ্জা এবং শৃঙ্খলার দিকে বিশেষ নজর দিয়ে পূর্বেকার জাগীর ব্যবস্থার বিলোপ ঘটান। পূর্বে আমীর ওমরাহরা জাগীর ভোগ করতেন এবং বিনিময়ে রাজাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতেন। এঁদের শক্তিশালী হয়ে অবাধ্য হওয়ার ঝোঁক দেখা যেত। আকবর জাগীর প্রথা তুলে দিয়ে মনসবদারী ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। ৩৩ স্তরের মনসবদার ছিল যাদের সৈন্য সংখ্যা হত ১০ থেকে ১০০০। মনসবদারদের নগদ বেতন দেওয়া হত, তারা সবাই ছিল সম্রাটের সাক্ষাৎ অধীনে। সৈন্যের তালিকা রাখা, অশ্বগুলি দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা এবং মাঝে মাঝে পরিদর্শন করার ফলে সৈন্যদলের মনোবল ও তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

রাজস্বব্যবস্থা ঃ রাজস্বমন্ত্রী টোডরমলের সহায়তায় আকবর সমস্ত জমি বিঘাভিত্তিক জরিপ করিয়ে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—১. পোলাজ (প্রতি বছর আবাদযোগ্য) ; ২ পরৌতি (২।৩ বছর পর চাষযোগ্য), ৩. চাচর (৩।৪ বছর পতিত রাখতে হত) ; ৪ বনজার (৫ বছরের বেশি যা অনাবাদি রাখতে হত)। শস্যের $\frac{১}{৩}$ অংশ কর ফসলে বা নগদে দেওয়া যেত। বনজার জমি চাষের উপযোগী করার ব্যবস্থা নেওয়া হত। চাষীকে ঋণ দিয়ে চাষে উন্নতি করতে সাহায্য দেবার ব্যবস্থা ছিল।

আকবরের হিন্দুনীতি ঃ দূরদর্শী আকবর বুঝেছিলেন, হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে হিন্দু প্রজাদের বিরোধিতার মুখে সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। হিন্দুদের, বিশেষ করে রাজপুতদের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করে এবং প্রীতি ও উদারতার দ্বারা হিন্দু প্রজাদের মন জয় করে তিনি মোগল সাম্রাজ্য দৃঢ়মূল করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তার মধ্যে ছিল :

১. হিন্দু-মুসলমানে সমমর্যাদা—কোন কোন দিল্লী সুলতান হিন্দুদের নিকৃষ্ট মনে করে ঘৃণা করতেন। তাদের ধর্মাচরণে আঘাত দিতেন এবং অবিশ্বাসের দরুণ উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করতেন না। আকবর এই ঘৃণার নীতির পরিবর্তন করেন। তিনি তাদের মুসলমানদের সমমর্যাদাযুক্ত বিবেচনা করতেন।

২. রাজপুতানার রাজপরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন। আকবর অম্বরের (জয়পুর) রাজা বিহারীমলের কন্যা যোধবাঈকে বিবাহ করেন, যুবরাজ সেলিম (জাহাঙ্গীর) এই রানীর গর্ভজাত পুত্র। তিনি বিকানীর ও জয়সলমীরের রাজকন্যাদেরও বিবাহ করেছিলেন। যুবরাজ সেলিমকেও বিবাহ দিয়েছিলেন জয়পুরের রাজা ভগবানদাসের কন্যার সঙ্গে। এই নীতির ফলে

আকবর সে যুগের অনেক সাহসী সেনাপতি ও কূটনীতিকের সহায়তা লাভ করেছিলেন।

৩. হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ—রাজা ভগবানদাস, রাজা মানসিংহ, রাজা টোডরমল, বীরবল প্রভৃতি উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আকবরের প্রায় অর্ধেক সৈন্য ও সেনাপতি ছিলেন রাজপুত ও হিন্দু।

৪. ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান—আকবর সকল সম্প্রদায়ের লোকের ধর্ম আচরণের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। হিন্দুদের ধর্মস্থান তিনি ধ্বংস করেননি বরং মন্দির নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য অর্থ সাহায্য করতেন। হিন্দুদের কোন কোন উৎসবের সময় তিনি পশুহত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং দেওয়ালি, দশেরা প্রভৃতি উৎসবে নিজে অংশগ্রহণ করতেন।

৫ জিজিয়া কর বিলোপ—জিজিয়া, তীর্থকর প্রভৃতি হিন্দুদের দেয় করগুলো রদ করে দিয়ে আকবর হিন্দু প্রজাদের শুভেচ্ছা লাভ করেছিলেন।

৬. সমাজ সংস্কার—মানবতাবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আকবর সতীদাহ প্রথা ও শিশুকন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন ; বিধবা বিবাহেও তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন। প্রায় দু'শ বছর পরে রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমাজদরদী মানুষ যে কাজ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন সম্রাট আকবর তার সূত্রপাত করেন।

৭. দীন-ই-ইলাহী—হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ, ইহুদী, খৃস্টান প্রভৃতি ধর্মের সারমর্ম গ্রহণ করে আকবর দীন-ই-ইলাহী নামে এক উদার ধর্মমত প্রচার করেন। ধর্মীয় ব্যাপারে নিরপেক্ষতা আকবরকে অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে জনপ্রিয় করেছিল।

মহানুভব আকবরের সভায় বহু জ্ঞানী ও গুণী লোকের সমাবেশ হয়েছিল। ঐতিহাসিক আবুল ফজল, বদায়ুনী ও নিজামুদ্দীন, কবি ফৈজী, হাস্যরসিক বীরবল, সঙ্গীতজ্ঞ তানসেন ও বাজবাহাদুর প্রভৃতি তাঁর সভা অলংকৃত করতেন। পার্সী ও সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক আকবরের উৎসাহে ও আদেশে অথর্ব বেদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পার্সীভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। ফতেপুর সিক্রীর প্রাসাদ, দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধি সৌধ, সেকেন্দ্রায় নিজের সমাধি আকবরের বলিষ্ঠ রুচির পরিচয় বহন করে। সাহস, দৈহিক শক্তি, মনের বল ও শাসন বুদ্ধি—সকল বিষয়েই আকবর অসাধারণ ছিলেন।

জাহাঙ্গীর : আকবর ও তাঁর রাজপুত মহিষীর পুত্র সেলিম ১৫৬৯ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জাহাঙ্গীর ১৬০৫ থেকে ১৬২৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ২৭ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা হল—(১) জাহাঙ্গীরের সিংহাসন আরোহণের পাচ মাসের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ খুসরু পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। জাহাঙ্গীর সসৈন্যে খুসরুর পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁকে বন্দী করেন। কিছুকাল পরে খুসরু আবার বিদ্রোহের চেষ্টা করলে তাঁকে অন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৬২২ খৃস্টাব্দে খুররমের নির্দেশে তাঁর সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার জন্য খুসরুকে হত্যা করা হয়।


জাহাঙ্গীর

(২) **গুরু অর্জুনের প্রাণদণ্ড** (১৬০৬ খৃঃ) : বিদ্রোহী পুত্র গুরু অর্জুনের কাছে সাহায্য ও শুভেচ্ছা পেয়েছেন এই সংবাদে জাহাঙ্গীর অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। তিনি গুরুকে এনে কঠোর নির্যাতন করে তাঁকে হত্যা করেন। এর ফলে শিখজাতি মোগলের প্রচণ্ড শত্রুতে পরিণত হয়। সম্রাটের পক্ষে এরূপ কঠোর শাস্তি প্রদান অদূরদর্শিতার পরিচায়ক বলে বিবেচিত হয়।

(৩) **বঙ্গে বিদ্রোহ** (১৬১৪ খৃঃ) : বঙ্গের শাসনকর্তা ওসমান খাঁ বিদ্রোহ করলে জাহাঙ্গীর সৈন্যদলের সাহায্যে তা দমন করেন।

(৪) **মেবারের সঙ্গে শান্তি সম্পর্ক স্থাপন** (১৬১৪ খৃঃ) : মেবারের রাণা প্রতাপের সঙ্গে আকবর বহু সংগ্রাম করেও সেরাজ্য অধিকার করতে পারেন নি। জাহাঙ্গীর পর পর কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করেন অবশেষে প্রতাপের পুত্র রাণা অমরসিংহ মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন। মেবারের সঙ্গে ব্যবহারে জাহাঙ্গীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

(৫) **দাক্ষিণাত্যে স্থিতাবস্থা** (১৬০৮-২১ খৃঃ) : আকবর ১৬০০ খৃস্টাব্দে আহমদনগর জয় করেন কিন্তু ১৬০৮ খৃস্টাব্দে মন্ত্রী মালিক অম্বরের পরিচালনায় আহমদনগর স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কয়েকবার অভিযান করেও কোন সুফল পাওয়া যায়নি। ১৬০৭ খৃস্টাব্দে যুবরাজ খুররম সামান্য সাফল্য লাভ করলেও অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি।

(৬) **কাংড়া দুর্গ জয়** (১৬২০ খৃঃ) : পাঞ্জাবের দুর্ভেদ্য কাংড়া দুর্গ জয় জাহাঙ্গীরের উল্লেখযোগ্য সামরিক কৃতিত্ব।

(৭) **কান্দাহার হস্তচ্যুত হয় (১৬২২ খৃঃ)** : আকবর ১৫৯৫ খৃস্টাব্দে কান্দাহার জয় করেছিলেন। পারস্যরাজ শাহ আব্বাস মোগল রাজপরিবার অন্তঃকলহের সুযোগে কান্দাহার পুনরায় অধিকার করলেন।

(৮) **খুররমের বিদ্রোহ** (১৬২৩-২৫ খৃস্টাব্দ) : নূরজাহান তাঁর কন্যা লাড্‌লি বেগম (তার পূর্ব স্বামী শের আফগানের সন্তান)-কে জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়রের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে জামাতাকে সিংহাসন দেবার ষড়যন্ত্র করতে থাকলে খুররম সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। দুই বছর ধরে নানা ঘটনার পর খুররমকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা করে পাঠানো হয়। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি দাক্ষিণাত্যেই ছিলেন।

(৯) **মহবৎ খাঁর বিদ্রোহ** (১৬২৬ খৃঃ) : নূরজাহানের ক্ষমতালিপ্সা ও চক্রান্তে বিরক্ত হয়ে সৈন্যধ্যক্ষ মহবৎ খাঁ বিদ্রোহী হন এবং অল্পকালের জন্য জাহাঙ্গীরকে বন্দী করে রাখেন। নূরজাহান বলপ্রয়োগে সম্রাটকে মুক্ত করতে না পেরে কৌশলে সৈন্যদের মধ্যে বিভেদ ঘটিয়ে স্বামীকে উদ্ধার করেন, মহবৎ খাঁ দাক্ষিণাত্যে গিয়ে খুররমের সঙ্গে মিলিত হন।

(১০) **ইউরোপীয় পর্যটকদের আগমন** : জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে যে সকল ইউরোপীয় ভ্রমণকারী এদেশে আসেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন উইলিয়ম হকিন্স্ (১৬০৮) এবং স্যার টমাস রো (১৬১৫-১৮ খৃঃ)। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের প্রতিনিধিরূপে হকিন্স্ ইংরেজদের জন্য বাণিজ্যিক সুবিধা প্রার্থনা করেছিলেন। স্যার টমাস রো প্রথম জেমসের রাজদূত হিসাবে জাহাঙ্গীরের সভায় এসে তিন বছরকাল আগ্রায় ছিলেন। যদিও তিনি বাণিজ্য ব্যাপারে কোন চুক্তিতে সম্রাটকে রাজি করাতে পারেন নি, ইংরেজ বণিকদের অনুকূলে এদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার সুবিধা তিনি লাভ করেছিলেন। হকিন্স্ এবং রো—এবং রো-র সহকারী এডওয়ার্ড টেরি মোগল দরবার এবং তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী লিখে গেছেন।



স্যার টমাস রো

(১১) **পর্তুগীজদের সঙ্গে কলহ** (১৬১৩ খৃঃ) : পর্তুগীজ ও ইংরেজ উভয় পক্ষই ছিল বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের জন্য মোগল সরকারের উমেদার এবং উভয়ের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। পর্তুগীজরা অসন্তুষ্ট হয়ে মোগলের চারখানা জাহাজ লুঠপাট করে। এর প্রতিশোধ হিসাবে মোগল সৈন্য পর্তুগীজ এলাকা দমন ও অধিকার করে, পর্তুগীজদের ধর্মীয় কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হয়, গীর্জাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

জাহাঙ্গীরে চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব ঃ জাহাঙ্গীরের চরিত্রে বিপরীতধর্মী দোষ-গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। ভিনসেণ্ট স্মিথের কথায় তাঁর মধ্যে দেখা যায় কোমলতা কঠোরতা, ন্যায়বিচার-খামখেয়াল, রুচি-বর্বরতা, শুভবুদ্ধি-বাল্যসুলভ-চপলতার অদ্ভুত মিশ্রণ।* তিনি ছিলেন দয়াবান, স্নেহ-পরায়ণ ও বদান্য। দরিদ্রের জন্য দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন, দীন-দুঃখীর মধ্যে অর্থ বিতরণে তিনি ছিলেন অকৃপণ। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আশায় তিনি আগ্রা দুর্গে ও যমুনার তীরে প্রস্তরস্তম্ভের মধ্যে স্বর্ণ শৃঙ্খল স্থাপন করেছিলেন। ন্যায়বিচার প্রার্থী ঐ শিকল টেনে সম্রাটের কাছে বিচার প্রার্থনা করতে পারত।

জাহাঙ্গীর ধর্ম ব্যাপারে উদার এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টান সব সম্প্রদায়ের সাধুসন্তের প্রতিই তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রাজনীতিক হিসাবে দূরদর্শিতা এবং এবং যোদ্ধা হিসাবে সমরনায়কের গুণ তাঁর চরিত্রে দেখা যায়। নেশায় আসক্তি এবং নিষ্ঠুরতা তাঁর চরিত্রের বড় দোষ বলে বিবেচিত হয়।

আকবরের মত বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী না হলেও তাঁর অনেক সদ্‌গুণ ছিল। তিনি ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যানুরাগী এবং প্রকৃতি-প্রেমিক। তাঁর আত্মজীবনী 'তুজুক-ই জাহাঙ্গীরী'-তে তিনি অতি নিপুণতার সঙ্গে বিভিন্ন ফলফুল, নদী-পর্বত, পশুপক্ষীর বর্ণনা করেছেন। মোগল চিত্রশিল্প, সঙ্গীত ও স্থাপত্যে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। [জাহাঙ্গীরের পৃষ্ঠপোষকতায় ফারহাৎ-ই-জাহাঙ্গীরী' নামে একখানা মূল্যবান অভিধান সংকলিত হয়। তাঁর রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য চিত্রকর ছিলেন আবু-ই-হাসান এবং ওস্তাদ মনসুর।] সেকেন্দ্রাতে আকবরের সমাধিসৌধ, লাহোর নির্মিত মসজিদ, কাশ্মীরে ও লাহোরে রচিত মোগল-উদ্যান তাঁর সুরুচির নিদর্শন হয়ে আছে।

শাহজাহান ঃ মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র শাহজাদা খুররম আহমদনগরের সেনাপতি মালিক অম্বরের সঙ্গে যুদ্ধ জয়লাভ করে সন্ধি করলে উল্লসিত সম্রাট তাঁকে শাহজাহান (জগতের শাসক) উপাধিতে ভূষিত করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নূরজাহানের জামাতা শাহরিয়রকে এবং খসরুর পুত্র দাওয়ার বক্সকে পরাজিত ও বন্দী করেন। শ্বশুর আসফ খাঁ এবং সেনাপতি মহবৎ খাঁ-র সাহায্যে তিনি সিংহাসন অধিকার করেন (১৬২৮ খৃঃ)। সাহায্যের প্রতিদানে তিনি আসফ খাঁকে উজির অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন।

---

* A strange compound of tenderness and cruelty, Justice and caprice, refinement and brutality, good sense and childishness.

—*The Oxford Hist. of India, p. 372*

শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা : শাহজাহান প্রায় ৩১ বৎসর রাজত্ব করেন (১৬২৮-৫৮)। তাঁর রাজত্বকালে দুটি বিদ্রোহ ঘটে। বুন্দেলা বিদ্রোহ (১৬২৮ খৃঃ) এবং খান জাহানের বিদ্রোহ(১৬২৮ খৃঃ), দুটিই সম্রাট দমন করেন। ১৬৩০-৩২ খৃস্টাব্দ জুড়ে দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। শাহজাহান সাহায্যের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ঐতিহাসিক ডঃ ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে তাঁর এ কাজ 'প্রশংসারযোগ্য'। শাহাজাহান দাক্ষিণাত্যে আহম্মদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার আংশিক জয় করেন, এবং সাময়িকভাবে কান্দাহার উদ্ধার করেন।


শাহজাহান

শাহজাহানের রাজত্বকাল : কতক ঐতিহাসিকের মতে শাহজাহানের রাজত্বকাল মোগল রাজবংশের এবং মোগল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতির যুগ। এই অভিমতের সমর্থনে বলা হয়—(i) শাহজাহান পিতা-পিতামহের কাছ থেকে যে বিশাল সাম্রাজ্য লাভ করেছিলেন তা দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সম্রাটের ব্যক্তিত্বগুণে তাঁর শাসনযন্ত্র সুনিয়ন্ত্রিত ছিল।

দৃঢ় ভিত্তি, সুশাসিত সাম্রাজ্য

(ii) শাহজাহান ৩০ বছর প্রায় নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে রাজত্ব করে। কান্দাহার পুনরুদ্ধার করার জন্য তিনবার পারস্যরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও তার ফলে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি বিঘ্নিত হয় নি।

৩০ বছর শান্তি বিরাজিত

আর্থিক উন্নতি

(iii) দেশ বিদেশের আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকায় বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটে ;

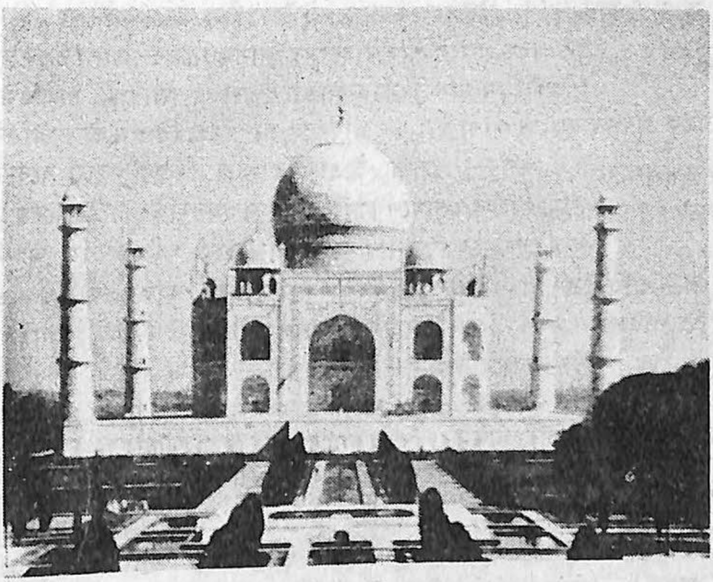
(iv) শাহজাহানের মধ্যে তাঁর পূর্বপুরুষের শিল্প সৃষ্টির গুণাবলীর পূর্ণপ্রকাশ ঘটেছিল, ৩০ বছরের প্রায় নিরবচ্ছিন্ন শান্তির রাজত্ব, পরিপূর্ণ রাজকোষ ও শিল্পীমন শাহজাহানের শিল্পসৃষ্টির মূল উৎস। শাহজাহান বহু জাঁকজমক-পূর্ণ সৌধ নির্মাণ করে দেশের শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন। উৎকৃষ্ট স্থাপত্যের স্রষ্টা বলে তিনি সর্বজনস্বীকৃত। তাঁকে বলা হয় 'ইঞ্জিনীয়র রাজা।' দিল্লীতে শাহজাহানবাদ নামে নতুন শহর, জামা মসজিদ, মোতি মসজিদ, লালকেল্লা, তাজমহল নির্মাণ তাঁরই কীর্তি।

উৎকৃষ্ট স্থাপত্য

সৌধ : তাজমহল শাহজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। যেন মার্বেলে রচিত স্বপ্ন,

পত্নীদের পরিকল্পিত, মণিকার দ্বারা রত্ন-খচিত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্মৃতিসৌধরূপে তাজমহল বিশ্ববাসীর কাছে আকর্ষণীয় বস্তু। আগ্রা দুর্গের সন্নিকটে ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪ বছরে শুভ্র মার্বেল পাথরে পবিত্রতার প্রতীকরূপে লাবণ্যপুঞ্জরূপ মোতি মসজিদ নির্মিত হয়। উঁচু ভিতের উপর নির্মিত বিশাল মসজিদ, ভারতের অন্যতম বিখ্যাত সুবৃহৎ মুসলিম প্রার্থনাভবন। ঐতিহাসিক ডঃ ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে জামা মসজিদ, মোতি মসজিদের চেয়েও আনন্দদায়ক ও ভাবোদ্দীপক।

তাজমহল, মোতি মসজিদ, জামা মসজিদ



তাজমহল

লালকেল্লা: মোগল দরবারের জাঁকজমক ও গৌরবের প্রতীক হিসাবে লালকেল্লার সমকক্ষ কোন সৌধ ভারতে নেই। লাল রঙের পাথরে নির্মিত উঁচু দেওয়ালগুলি এখনও অক্ষত, দৃঢ়। ৯ বছরে এ দুর্গের নির্মাণ সম্পন্ন করে ১৬৪৮ খৃস্টাব্দে শাহজাহান এই প্রাসাদে প্রবেশ করেন। চারুশিল্প ও ললিতকলার বিশেষ উন্নতি হয় এ যুগে। অলংকার তৈরী, মৃৎশিল্প, চিত্রশিল্প, কারুকার্যপূর্ণ ধাতুদ্রব্য উৎপাদন প্রভৃতি শিল্পকর্মে শাহজাহানের অনুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। শাহজাহান নিজে বিদ্বান ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তিনি হিন্দী ও ফার্সী ভাষায়

লালকেল্লা

চারুশিল্প

গদ্য ও কাব্যরচনায় উৎসাহ দিতেন। আব্দুল হামিদ লাহোরীর 'বাদশানামা' ও কাফী খাঁ-এর 'মুন্তাখাব-উল-লুবা' তাঁর আমলে রচিত হয়। হিন্দী কবি সুন্দর, সেনাপতি, ভূষণ, বিহারী প্রভৃতি এই যুগে তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। এছাড়া গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতিরও উন্নতি ঘটে। জনহিতকর কার্যের দিকেও শাহজাহানের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি বহু রাজপথ, সরাই, সেতু, জলাশয়, প্রভৃতি নির্মাণ করেন। লাহোর অঞ্চলে জলসেচের জন্য খাল খনন এবং ফিরোজশা তোগলক নির্মিত পশ্চিম যমুনা খাল সংস্কার করে তিনি এর নতুন নাম দেন নাহার-ই-বহিস্ত্।

কাব্যসাহিত্য

জনহিতকর কার্য

কতক ঐতিহাসিক শাহজানের আমলকে মোগল সাম্রাজ্যের শীর্ষযুগ বলে স্বীকার করতে চান না। তাঁদের বক্তব্য—ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বিবরণ অনুধাবন করলে শাহজাহানের শাসনকালের আপাত জৌলুস ও শিল্পকীর্তির চাকচিক্যের আড়ালে দেশের আর্থিক, সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক অবক্ষয় বুঝতে পারা যায়। ব্যয়বহুল শাসনযন্ত্র, বিশাল সৈন্যবাহিনীর জন্য অর্থব্যয়, সৌধ ইত্যাদির জন্য বিপুল খরচ, সর্বোপরি জমিদারদের শোষণে চাষীর দুরবস্থা সুখসমৃদ্ধির পরিচয় দেয় না। পারস্যের সঙ্গে তিনবার যুদ্ধে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের অক্ষমতা মোগল সৈন্য বাহিনীর গৌরব বৃদ্ধি করে না। শাহজাহান, আকবর-প্রবর্তিত ধর্মে উদারনীতি পরিত্যাগ করে হিন্দুধর্মবিদ্বেষী কার্যকলাপ দ্বারা হিন্দু-প্রজাদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। নানা সদ্‌গুণ সত্ত্বেও তিনি পরধর্মদ্বেষী ছিলেন; বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন। সিয়া মুসলমান ও খৃস্টানদের ওপর অত্যাচার করেন। তাঁর আদেশে হিন্দু পুরুষদের মুসলমান-কন্যা বিবাহ করা নিষিদ্ধ হয়। দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের দুঃখমোচনে তিনি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নি; অর্থাভাবে ক্লিষ্ট প্রজাদের কঠোর শাসনে শান্ত রাখার জন্য তিনি ভয়াবহ শাস্তির বিধান করেন। চোরের শাস্তি ছিল শিরশ্ছেদ। ইংরেজ পর্যটক পিটার মাণ্ডি ১৬৩০ থেকে ১৬৩৩ খৃস্টাব্দে পাটনা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে ভ্রমণ করার সময় ৩০ থেকে ৪০টি করে নরমুণ্ড দিয়ে তৈরী ২৬০টি 'চোরমিনার' দেখতে পেয়েছিলেন। জনসাধারণের মনে ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে অপরাধী মুণ্ড দিয়ে গাঁথা স্তূপগুলি শহরের কাছাকাছি স্থাপন করা হয়েছিল। দেশে চাষী ছিল অবহেলিত, শোষিত; জলাভাবে অনেক জমি চাষের অযোগ্য; প্রজাকে দমনে রাখার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রতিপালিত; বার্ণিয়ে-র কথায়, আঞ্চলিক শাসকদের অত্যাচারে সারাদেশে বিরাজ করেছিল ধ্বংস ও উৎসাদন (ruin and desolation overspread the land)।

সমালোচনা

জৌলুসের অন্তরালে আর্থিক দৈন্য

পরধর্মদ্বেষী শাসন

অপ্রতুল সরকারী সাহায্য

চোর-ডাকাতের মুণ্ড দিয়ে মিনার তৈরী'—পিটার মাণ্ডি

সারাদেশে ধ্বংস ও উৎসাদন—বার্ণিয়ে

বিদেশী বণিকদের প্রতি নীতি ঃ ধন সম্পদে সমৃদ্ধ ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করতে ইউরোপীয় যে কয়টি দেশ প্রথমে আগ্রহী হয় তারা হল পর্তুগাল ও ইংলণ্ড। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্‌-এর প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন উইলিয়ম হকিন্স্‌ ১৬০৮ খৃস্টাব্দে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি প্রার্থনা করতে জাহাঙ্গীরের সভায় আসেন। সেখানে তিনি ৩ বৎসর অবস্থান করে সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন কিন্তু বাণিজ্য সংক্রান্ত কোন আনুকূল্য আদায় করতে পারেননি।

জেমসের প্রতিনিধি হকিন্স

জাহাঙ্গীরের শাসনকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারে সচেষ্ট হয়। এই উদ্দেশ্যে সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় ১৬১৫ খৃস্টাব্দে স্যার টমাস রো ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেম্‌সের রাষ্ট্রদূত হিসাবে জাহাঙ্গীরের রাজসভায় আগমন করেন। তিন বছরেরও বেশি তিনি ভারতে ছিলেন এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের জন্য অল্প কিছু সুবিধা তিনি আদায় করতে পেরেছিলেন। জাহাঙ্গীরের বাণিজ্য বিষয়ে প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনেছেন কিন্তু বিশেষ উৎসাহ দেখান নি।

স্যার টমাস রো

পর্তুগীজদের সঙ্গে সম্পর্ক : বাণিজ্যের সুবিধা আদায় করা নিয়ে পর্তুগীজ ও ইংরেজদের মধ্যে প্রবল রেষারেষি ছিল। ইংরেজরা মোগল দরবার থেকে বাণিজ্যের কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ করেছে, এই সংবাদ জেনে পর্তুগালের—অধিকৃত গোয়ার ভাইসরয় মেন্‌ডোসা জাহাঙ্গীরের কাজকে শত্রুতামূলক কার্যকলাপ বলে হুম্‌কি দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। জাহাঙ্গীর পর্তুগীজদের শান্ত করার জন্য ইংরেজদের অনুকূলে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা বাতিল করে দেন। কিন্তু পর্তুগীজদের শান্ত করা যায় নি। মোগল নৌশক্তির দুর্বলতার সুযোগে পর্তুগীজরা মোগল বাণিজ্য জাহাজ লুঠ করে। জাহাঙ্গীর এদের শাস্তি প্রদান করেন। শাহজাহানের আমলে পর্তুগীজরা বাংলার ঘাঁটি থেকে উপদ্রব করতে থাকলে সুবেদার কাশিম খাঁ হুগলী থেকে তাদের উৎখাত করেন। পর্তুগীজরা উদ্ধত ব্যবহার ও অন্যায় কার্যকলাপের জন্য মোগলবাদশাদের অনুগ্রহভাজন হতে পারে নি।

পর্তুগীজরা উদ্ধত

অন্যায় কার্যকলাপে লিপ্ত

৬. দ্বন্দ্ব ও পতনের কাল

সিংহাসনের জন্য কলহ ঃ শাহজাহান ও মমতাজমহলের ১৪ জন সন্তানের মধ্যে জীবিত ৬ জন—৪ পুত্র ও ২ কন্যা—তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে কলহ শুরু করেন। চারপুত্র—দারাশুকো, সুজা, ঔরঙ্গজেব ও মুরাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশুকো দিল্লীতে শাহজাহানের কাছে থাকতেন। সুজা ছিলেন বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদার, ঔরঙ্গজে দাক্ষিণাত্যে এবং মুরাদ গুজরাটে শাসনকার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

কন্যা দুজনের মধ্যে জাহানারা দারাশুকোর সমর্থক, রোশনারা ছিলেন ঔরঙ্গজেবের পক্ষে।

ভ্রাতৃযুদ্ধ: ১৬৫৭ খৃস্টাব্দে শাহজাহান আগ্রায় কঠিন রোগে আক্রান্ত, এই জনরব প্রচারিত হলে রাজকুমারগণ সিংহাসন দখলের যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ঔরঙ্গজেব ও মুরাদের মিলিত বাহিনী দিল্লীর দিকে অগ্রসর হয়, সুজাও আসতে থাকেন। দারাশুকোর পুত্র সুলেমান সুজাকে কাশীর নিকট পরাজিত করেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেব ও মুরাদ ধর্মাটের যুদ্ধে সম্রাটের সেনাপতি যশোবন্ত সিংহের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে আগ্রার নিকট উপস্থিত হন। ১৬৫৮ খৃস্টাব্দে ২৯ মে শামুগড়ের যুদ্ধে দারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন। ঔরঙ্গজেব আগ্রা দুর্গ অধিকার করে সম্রাট শাহজাহানকে বন্দী করে রাখলেন।

বিভিন্ন যুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের জয়



ঔরঙ্গজেব

এরপর ঔরঙ্গজেব সুজাকে পরাজিত করে বাংলা থেকে বিতাড়িত করলেন। দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় আরাকান সীমান্তে আরাকানীদের হাতে তিনি সপরিবারে নিহত হন। অবশিষ্ট দুইভাই দারাশুকো এবং মুরাদকে হত্যা করে ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসন নিষ্কণ্টক করে নেন। ৮ বছর আগ্রা দুর্গে বন্দী জীবনযাপনের পর ৭৪ বছর বয়সে শাহজাহানের মৃত্যু হয়। ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করে মোগল সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তৃতি ঘটান কিন্তু তাঁর শাসননীতির ফলে তাঁর আমলেই সাম্রাজ্যের ভাঙন শুরু হয়।

ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি: আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান দাক্ষিণাত্য জয় করার যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন, ঔরঙ্গজেব তাকেই পরিপূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এজন্য তিনি প্রায় ২৬ বছর রাজধানী দিল্লী ছেড়ে দক্ষিণ ভারতে বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে শিবিরে শিবিরে অবস্থান করেন। তাঁর দাক্ষিণাত্য অভিযানের ৫টি উদ্দেশ্য ছিল।

ক. মারাঠা শক্তি বিনাশ করা, যাতে তারা মোগল সাম্রাজ্যের বিপদের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। খ. বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে বন্দী করে শাস্তি দেওয়া। গ. বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা শিয়া সম্প্রদায়ের শাসকদের রাজ্য ধ্বংস করা। ঔরঙ্গজেব নিজে ছিলেন সুন্নী মুসলমান। ঘ. দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলো জয় করে সাম্রাজ্যের পরিধি আরও বাড়ান। ঙ. সাম্রাজ্যের বিখ্যাত সেনাপতিদের

দক্ষিণ ভারত বিজয়ে পাঠান সত্ত্বেও তাদের অকৃতকার্যতা বিশ্বাসঘাতকতা বলে সন্দেহ করে সম্রাট নিজে সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব নেন। সম্রাটের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

দাক্ষিণাত্য অঞ্চলকে বশীভূত করার জন্য ঔরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বকালের দীর্ঘ সময় এবং রাজকোষের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছিলেন। কিন্তু এত করেও তিনি শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। স্পেনের যুদ্ধ ফরাসী বীর নেপোলিয়নের ভাগ্যে যেমন বিপর্যয় ডেকে এনেছিল তেমনই ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযানও বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করেছিল।



ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয়নীতি : ঔরঙ্গজেব ছিলেন স্বধর্মনিষ্ঠ গোঁড়া সুন্নী মুসলমান। কোরানের বিধান অনুসারে রাজ্যশাসন করে তিনি ভারতবর্ষকে মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। মুসলমানগণ শরিয়ৎ অনুযায়ী জীবনযাপন করছে কিনা দেখার জন্য 'মুতাসিব' নামে বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়েছিল। অ-হিন্দুদের বিরুদ্ধে কতকগুলো ব্যবস্থা গৃহীত হয় :

১. হিন্দুদের নতুন মন্দির নির্মাণ এবং পুরাতন মন্দির সংস্কার নিষিদ্ধ হয় ২. প্রাদেশিক শাসকদের নির্দেশ দিয়ে হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয় যেমন, কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির, মথুরার কেশবদেব মন্দির প্রভৃতি ; ৩. মন্দিরের স্থানে মসজিদ নির্মাণ ও মন্দির অপবিত্র করা হয় ; ৪. হিন্দুদের ওপর জিজিয়া কর, তীর্থকর পুনরায় নির্ধারিত ; ৫. আকবর-প্রবর্তিত যোগ্যতার মর্যাদা দানের নীতি পরিবর্তন করে হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ বন্ধ করা হয় ; ৬. ধর্মীয় সমতা বাতিল করে নানা প্ররোচনায় ইসলামে ধর্মান্তকরণের চেষ্টা করা হয়।

বিদ্বেষমূলক নীতির ফলে নানা হিন্দু সম্প্রদায় মোগল সম্রাটের শত্রু হয়ে দাঁড়ায় ফলে শাসনমূল শিথিল হয়ে পড়ে।

ঔরঙ্গজেব উত্তরাধিকারসূত্রে বিশাল সাম্রাজ্য লাভ করেছিলেন কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট না থেকে তিনি ভারতের সর্বদক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত রাজ্যসীমা বাড়ানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় ব্রতী হন। সে যুগে মন্থর যানবাহন এবং দ্রুত যোগাযোগের অসুবিধার জন্য উত্তর ভারতে শাসনকেন্দ্র থেকে সমগ্ররাজ্য নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যন্ত কঠিন ছিল। দক্ষ শাসক এবং সেনানায়ক হওয়া সত্ত্বেও ঔরঙ্গজেব রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেননি। সাম্রাজ্যের অতিরিক্ত বিস্তার সাধন করতে গিয়ে তিনি সাম্রাজ্য ভঙ্গের পথ প্রস্তুত করেছিলেন।

উত্তর ভারতে কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা

সীমান্ত সমস্যা মোগলদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শাহজাহানের সময়ে পারস্যরাজের আক্রমণে কান্দাহার হাতছাড়া হয়ে যায়। পরে চেষ্টা করেও তিনি কান্দাহার পুনরায় অধিকার করতে পারেন নি। ঔরঙ্গজেব কান্দাহার জয়ের কোন চেষ্টা করেননি কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্ধর্ষ আফগান উপজাতি রাজ্যে হানা দিয়ে লুঠপাট করে অশান্তি সৃষ্টি করে। ১৬৬৭ খৃস্টাব্দে উপজাতীয় আফগানরা সিন্ধু অতিক্রম করে হাজারা জেলা আক্রমণ করে। এর পাঁচ বছর পর আফ্রিদি উপজাতির লোকেরা বিদ্রোহ করে আফগানিস্তানের মোগল শাসককে পরাস্ত করে। অশান্ত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ঔরঙ্গজেবকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছিল।

সীমান্তে অবহেলা

ঔরঙ্গজেব যখন দিল্লী সিংহাসনের জন্য ভ্রাতৃকলহে লিপ্ত সেই সময় উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অশান্তি দেখা দেয় ; আসামের শাসক মোগল সাম্রাজ্যের কিছু অঞ্চল অধিকার করেন। ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলা আসাম-রাজকে পরাস্ত করে বিজিত অঞ্চল পুনরায় দখল করেন কিন্তু বর্ষার প্রকোপে মোগলসৈন্য বিপন্ন হয়ে প্রায় ধ্বংস হয়ে যায় এবং মীরজুমলাও রোগে প্রাণ হারান।

বিস্তৃতি ব্যাহত

মোগলের সঙ্গে বোঝাপড়া : ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাদের অভ্যুত্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সামান্য জায়গীরদারের পুত্র হয়ে

শিবাজী সংগঠন গুণে ঔরঙ্গজেবকেও সন্ত্রস্ত করে তুলেছিলেন। তবে আগে তাঁর বিরোধ শুরু হয় বিজাপুরের সুলতানের সঙ্গে। কূটনৈতিক চাল দেবার সময় শিবাজী শাহজাহানের ছেলে মুরাদের সাহায্য চেয়ে বিজাপুর সুলতানকে সন্ত্রস্ত করেছিলেন। ইতিমধ্যে ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসন দখল করেছেন। ঔরঙ্গজেব যখন উত্তর ভারত নিয়ে ব্যস্ত শিবাজী মোগল সাম্রাজ্যে লুঠপাট করতে থাকতে থাকেন। তাঁকে দমন করার জন্য ঔরঙ্গজেব প্রথমে শায়েস্তা খাঁকে, পরে শাহজাদা মোয়াজ্জেমকে পাঠালেন। কিন্তু কেউই কিছু করতে পারলেন না। অবশেষে সম্রাটের নির্দেশে রাজপুতরাজ জয়সিংহ এসে শিবাজীর কয়েকটি দুর্গ দখল করেন। এই বার উভয় পক্ষের মধ্যে পুরন্দরের চুক্তি (১৬৬৫ খৃঃ) স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধির শর্ত অনুসারে শিবাজী নিজের দখলে মাত্র ১২টি দুর্গ রেখে বাকি ২৩টি দুর্গ মোগলদের নিকট সমর্পণ করেন। এর পর জয়সিংহের অনুরোধে এবং ঔরঙ্গজেবের আমন্ত্রণ অনুযায়ী শিবাজী সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আগ্রা যান। আগ্রায় শিবাজীর কোন বিপদ হবে না স্বয়ং জয়সিংহ এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং শিবাজীর দেখা শোনার ভার ছিল জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের ওপর। কিন্তু ঔরঙ্গজেব কৌশলে শিবাজীকে আগ্রা দুর্গে বন্দী করে রাখেন।

আগ্রা দুর্গে বন্দী শিবাজী যে অদ্ভুত চাতুরী ও সাহসের পরিচয় দিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন তা ইতিহাসে স্মরণীয় কাহিনী হয়ে আছে। ফলের ঝুড়িতে লুকিয়ে দুর্গ থেকে পলায়ন এবং ঔরঙ্গজেবের সতর্ক ফৌজের চোখে ধুলো দিয়ে সন্ন্যাসীর বেশে রাজ্যে ফিরে আসা শিবাজীর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

রাজ্যাভিষেক : ১৬৭৪ খৃস্টাব্দে শিবাজী 'ছত্রপতি' উপাধি ধারণ করে মহাসমারোহে রাজধানী রায়গড়ে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং মারাঠা-জাতিকে এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করা শিবাজীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ১৬৮০ খৃস্টাব্দে ৫৩ বছর বয়সে শিবাজীর মৃত্যু হয়।


শিবাজী

শিবাজীর চরিত্র ও কৃতিত্ব : শিবাজী ছিলেন ভক্তিমান পুত্র, আদর্শ স্বামী, স্নেহশীল পিতা, নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সর্বধর্মসমদর্শী ন্যায়বান প্রজাপালক রাজা। সেযুগে শিবাজীর মত উন্নত নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন পুরুষ ছিল একান্ত বিরল। স্যার যদুনাথের কথায়, 'শিবাজীর প্রকৃত মহত্ত্ব' ছিল তাঁর চরিত্র ও বাস্তব দক্ষতায়। ধর্মের ব্যাপারে উদার সহনশীলতা এবং সকল প্রজার প্রতি সমান ন্যায়বিচার সকল শ্রেণীর প্রজার কাছে সন্তোষের কারণ হয়েছিল। রাজ্যের সর্বত্র কঠোরভাবে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখায় তাঁর প্রজারা যেমন সুখে শান্তিতে ছিল অন্য রাজ্যে সেরূপ ছিল না।

জাতির স্রষ্টা : শিবাজীর পূর্বে মারাঠারা বিভিন্ন রাজ্যে ভাড়াটে সৈন্যরূপে কাজ করত ; তারা ছিল বিদেশীর ভৃত্য। অপরের রাজ্য জয়ে নিজেদের রক্ত দিত কিন্তু শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারত না ; তারা ছিল অপরের অধীন। নিজেরা রাজ্য স্থাপন করে শাসনকার্য চালাবে তা তাদের কল্পনায়ও ছিল না। শিবাজীই প্রথম নানা অঞ্চলে বিন্দু বিন্দু করে ছড়ান-ছিটান মারাঠাদের এক নায়কের পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ করে শক্তিশালী মারাঠা জাতির প্রতিষ্ঠা করলেন। নিজেরই দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি দেখালেন, হিন্দুরা জাতি গঠন করতে পারে, রাজ্য স্থাপন করতে পারে, শত্রুদের পরাভূত করতে পারে ; তারা নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে, দেশে শিল্পসা হত্য, ব্যবসাবাণিজ্যে উৎসাহ দিয়ে সমৃদ্ধি আনতে পারে ; তারা নিজেদের নৌ-বাহিনী ও বাণিজ্যপোত চালাতে পারে এবং বিদেশীর সঙ্গে সমান তালে নৌযুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে। শিবাজী আধুনিক হিন্দুদের তাদের শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশসাধন করতে শিখিয়েছেন। স্যার যতুনাথের কথায়—He taught the modern Hindus to rise to the full stature of their growth. রাজ্যস্থাপন করার উদ্দেশ্য—দেশ ও জাতির মঙ্গলসাধন, প্রজার জীবনযাপন সুখকর করা, দেশরক্ষা ও শান্তিশৃঙ্খলা বিধান করা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। আর্থিক সমৃদ্ধির ব্যবস্থা ও সুস্থির সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠাও রাজশক্তির অন্যতম লক্ষ্য। (এইসঙ্গে বর্তমান পুস্তকের ১০৭ পৃষ্ঠায় লিখিত শিবাজীর আসল কৃতিত্ব অংশটুকুও পঠিতব্য।)

শিবাজীর শাসনব্যবস্থা : রাজ্যশাসন প্রধানত প্রশাসন, রাজস্ব ও সমর বিভাগের কাজকর্মের ওপর নির্ভর করত। সে যুগের অন্যান্য শাসকদের মত শিবাজীর শাসনব্যবস্থাও ছিল স্বৈরাচারী অর্থাৎ রাজা ছিলেন রাজ্যের সর্বেসর্বা, তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই রাজ্য পরিচালিত হত। কিন্তু তিনি একা সমস্ত দায়িত্বভার বহন না করে আটজন মন্ত্রী নিয়ে গঠিত উপদেষ্টাপরিষদের ওপর দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছিলেন। এই পরিষদ **অষ্ট-প্রধান** নামে পরিচিত। **রাজপুরোহিত ও ন্যায়াধীশ** বা প্রধান বিচারপতি ছাড়া অন্য সব মন্ত্রীকে যুদ্ধকালে সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হত অর্থাৎ বেসামরিক কাজের দায়িত্বে থাকলেও আপৎকালে যুদ্ধের দায়িত্বও পালন করতে হত।

রাজস্ববিভাগ : শিবাজীর রাজ্য কতকগুলো প্রান্ত বা প্রদেশে এবং প্রদেশগুলি পরগণা ও তরফে ভাগ করা হয়। জমি জরিপ করে তার উৎপাদন ক্ষমতা অনুসারে কর ধার্য করা হত। উৎপন্ন ফসলের শতকরা ৩০ ভাগ ছিল কর। এই ধার্য-কর ফসলে অথবা তার মূল্যে দেওয়া চলত। রাজ-কর্মচারীরা প্রজার কাছ থেকে কর আদায় করত। চাষ আবাদে উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে বীজশস্য ও গবাদি পশু কেনার জন্য সহজ কিস্তিতে পরিশোধ্য সরকারি ঋণ দেবার ব্যবস্থা ছিল।

পাহাড়পূর্ণ মহারাষ্ট্রে যথেষ্ট পরিমাণে রাজস্ব আদায় হত না বলে শিবাজী মাঝে মাঝে আশপাশের রাজ্য থেকে 'চৌথ' (ফসলের এক-চতুর্থাংশ) ও 'সরদেশমুখি' (রাজস্বের এক-দশমাংশ) নামক কর আদায় করতেন।

সামরিক বিভাগ ঃ একদিকে দাক্ষিণাত্যের সুলতান, অন্যদিকে মোগল সম্রাট এই দুই প্রধান প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করে শিবাজীকে রাজ্যস্থাপন ও রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

শিবাজীর স্থলবাহিনীর দুটি ভাগ ছিল—অশ্বারোহী ও পদাতিক। অশ্বারোহী দলের ছিল দুটি শাখা—বর্গী ও শিলাদার। বর্গীরা সরকার থেকে বেতন ও যুদ্ধের সরঞ্জাম পেত ; শিলাদাররা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে যুদ্ধের সরঞ্জাম নিজেরাই সংগ্রহ করে নিত। শিবাজী স্থায়ী বেতনভুক সৈন্যবাহিনী সৃষ্টি করেন।

অশ্বারোহী ও পদাতিক ছাড়া শিবাজীর হস্তিবাহিনী, উষ্ট্রবাহিনী ও গোলন্দাজবাহিনী ছিল। পশ্চিম উপকূলের নিম্নবর্ণের হিন্দুদের নিয়ে তিনি এক নৌবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তীকালে আংরে বা আংরিয়াদের নেতৃত্বে মারাঠা নৌবহর যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছিল।

ঔরঙ্গজেবের কৃতিত্ব ঃ ঔরঙ্গজেব কতকগুলি অসাধারণ ব্যক্তিগত গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চরিত্রে সাহস, স্থির মেজাজ এবং বিবেচনা শক্তির সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি অত্যন্ত ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। ফার্সী, কবিতা এবং আরবী

গুণ

ভাষায় রচিত ধর্মতত্ত্বমূলক সাহিত্যে তাঁর অসামান্য অধিকার ছিল। ভারতবর্ষে লিখিত ইসলামীয় আইনের সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন 'ফতোয়া-ই-আলমগীরী' তাঁর নির্দেশে প্রস্তুত করা হয়। তাঁর প্রশাসনিক কর্তব্য সম্পাদনে তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করতেন। তিনি প্রত্যহ একবার দরবারে বসতেন ; সপ্তাহে একবার বিচার করতেন। চিঠিপত্র ও আবেদনের ওপর তিনি নিজহাতে আদেশ লিখতেন এবং সরকারী চিঠির উত্তরের ভাষা নিজে বলে দিতেন। কঠোর পরিশ্রমের কাজে তিনি ক্লান্তিবোধ করতেন না। সাম্রাজ্যের যাবতীয় কাজের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকার ইচ্ছায় তিনি অতিরিক্ত কেন্দ্রীয়করণ পছন্দ করতেন।

কঠোর প্রকৃতির এই জেদী সম্রাট এমন একজন দূরদর্শী রাজনীতিবিদে পরিণত হতে পারেন নি যিনি নতুন নীতি এবং আইন প্রবর্তন করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের

দোষ

জীবন ও চিন্তার গতি নির্ধারণ করতে পারেন। তাঁর চরিত্রে উদারতা ও রাজনৈতিক বিজ্ঞতার অভাব ছিল। তিনি রাজপুত ও মারাঠাদের বুঝতে পারেন নি। আকবর যেখানে তাদের অনুগত রেখে তাদের সাহায্যে সাম্রাজ্যের কল্যাণসাধন করেছিলেন, ঔরঙ্গজেব সেখানে তাদের প্রতিরোধের দিকে ঠেলে দিয়ে সাম্রাজ্যের পতন ডেকে এনেছিলেন। একটি অবাস্তব ধর্মীয় আদর্শ অনুসরণে তিনি আকবরের উদার ও বিজ্ঞ নীতির

পরিবর্তন ঘটিয়ে সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে আঘাত হেনেছিলেন। প্রধানত হিন্দু অধিবাসীর দেশ ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক মিলন সাধন করে তিনি যদি ভারতে জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারতেন ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে থাকতেন। এত গুণ, কর্মক্ষমতা, সাহস ও সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইতিহাসে ঔরঙ্গজেবকে বিরাট ব্যর্থতার দায় বহন করতে হয়েছে।

৭. ইউরোপীয় বণিকদের কার্যকলাপ

জলপথে ভারতে : ভারতের সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগ ছিল অতি প্রাচীনকাল থেকেই। শুধু ইউরোপ কেন, মেসোপটেমিয়া, মিশর, এশিয়া মাইনর, গ্রীস, রোম—এসব দেশের সঙ্গেও। এ যোগাযোগ বাণিজ্যের মাধ্যমে। সিন্ধু সভ্যতার যুগে ভারতের সামগ্রী ব্যাবিলনিয়া, মেসোপটেমিয়ায় আদৃত হত। বাণিজ্য চলত স্থলপথে, আংশিক জলপথে, যেমন লোহিত সাগর থেকে সমুদ্রের উপকূল দিয়ে বণিকরা পণ্য দ্রব্য নিয়ে আসত এবং এখান থেকে নিয়ে যেত নানাবিধ দ্রব্য। আলেকজান্দার এসেছিলেন স্থলপথে। ফেরার সময় নৌ-সেনাপতি নিয়ারকসের অধীনে কিছু সৈন্য পাঠিয়েছিলেন সাগরপথে। আরব বণিকরা ভারতের পণ্যসামগ্রী কিনে নিয়ে ইউরোপে ব্যবসা চালাত। এরা কিছুটা পথ জাহাজে, কিছুটা পথ উট, গাধা, ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে মালপত্র নিয়ে যাতায়াত করত। ইউরোপ থেকে যে বণিকেরা এল, তারা মাঝপথে যানবাহন বদল করে নয়, সরাসরি জলপথে বাণিজ্যের পথ ধরে।

পর্তুগীজদের কার্যকলাপ : ইউরোপ থেকে একটানা জলপথে পর্তুগীজরাই প্রথমে ভারতে আসে কিন্তু তাদের আসার আগে থেকেই আরব-বণিকরা কালিকট বন্দরে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত। তাদের সঙ্গে পর্তুগীজদের কলহ শুরু হল। এর ফলে কালিকটের শাসক জামোরিনের সঙ্গে পর্তুগীজদের বিবাদ বাধে। জামোরিনের শত্রু কোচিনের রাজার সঙ্গে পর্তুগীজরা বন্ধুত্ব করে কোচিন ও ক্যানানোরে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে ব্যবসা চালাতে থাকে। বাণিজ্যকেন্দ্র তত্ত্বাবধানের জন্য পর্তুগাল থেকে একজন করে রাজপ্রতিনিধি আসত। আলবুকার্ক পর্তুগীজ রাজপ্রতিনিধিরূপে এদেশে এসে পর্তুগীজদের উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলেন। তিনি বিজাপুর সুলতানের অধিকার থেকে গোয়া দখল করেন। পরে দমান, দিউ, সলসেট, বেসিন ও বোম্বে পর্তুগীজদের দখলে আসে।

বঙ্গদেশে পর্তুগীজদের প্রথম বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল সপ্তগ্রাম। কিন্তু নদীর জল কমে যাওয়ায় জাহাজ চলাচলে অসুবিধা হলে বাণিজ্যকেন্দ্র হয় হুগলী। পর্তুগীজদের জলদস্যুবৃত্তি এবং হিন্দু-মুসলমান বালিকাদের ধরে নিয়ে জোর করে খৃস্টান

করার দরুন তারা জনসাধারণের বিরাগভাজন হয়। শাহজাহানের আমলে হুগলীর বন্দর থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করা হয়। এরপর পর্তুগীজদের দখল করা অঞ্চল একে একে হাতছাড়া হয়ে যায়। ১৯৬১ খৃস্টাব্দে গোয়া, দমান ও দিউ স্বাধীন ভারতের সঙ্গে যোগ করে নেওয়া হয়।

ভারতে ওলন্দাজ বণিক ঃ ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম অংশে সাগরকূলে হল্যাণ্ড। হল্যাণ্ডের অধিবাসীরা ডাচ বা ওলন্দাজ নামে পরিচিত। সাগরকূলের দেশের লোকেরা বাণিজ্যে ছিল বিশেষ পটু। পর্তুগীজরা ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে থাকলে ডাচরা প্রাচ্য-দেশের সঙ্গে জলপথে বাণিজ্য করতে উৎসাহী হল। ১৬০২ খৃস্টাব্দে ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হল। ভারতে ডাচদের প্রধান কুঠি ছিল মসুলিপত্তম, সুরাট, কারিকল, চুঁচুড়া, কাশিমবাজার, বরাহনগর, পাটনা, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থানে।

ইংরেজরা যখন ভারতে বাণিজ্য করতে এল পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকদের মধ্যে অনেকদিন কলহ চলেছিল। অবশেষে পলাশীযুদ্ধের পর ইংরেজদের হাতে বিদেরার যুদ্ধে (১৭৫৯ খৃঃ) পরাজিত হয়ে ওলন্দাজরা ভারত ছেড়ে চলে যায়।

ভারতে ইংরেজ বণিক ঃ ১৬০০ খৃস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠন। ২. প্রথম দিকে কোম্পানি জাভা, সুমাত্রা ও মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জে জাহাজ পাঠিয়ে বাণিজ্যপণ্য মশলা সংগ্রহ করত। ৩. ভারতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের আবেদন নিয়ে ক্যাপ্টেন হকিন্স ১৬০৮ খৃস্টাব্দে দিল্লী সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন কিন্তু এ প্রার্থনা মঞ্জুর হয়নি। ৪. ১৬১৩ খৃস্টাব্দে জাহাঙ্গীর ইংরেজদের সুরাটে স্থায়ী কুঠি স্থাপনে অনুমতি দিলেন। ৫. ১৬১৫ খৃস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডরাজ প্রথম জেমসের দূত স্যার টমাস রো (Sir Thomas Roe) বাণিজ্য ব্যাপারে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে দিল্লী দরবারে আসেন। তখন জাহাঙ্গীরের সঙ্গে কোন চুক্তি হল না, তবে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের অনুমতি মিলল। ৬. কুঠি স্থাপিত হল মসুলিপত্তমে, উড়িষ্যায় হরিহরপুর ও বালেশ্বরে, বিহারের পাটনায়, বাংলায় হুগলী ও কাশিমবাজারে। ৭. চন্দ্রগিরির রাজার কাছ থেকে মাদ্রাজ ইজারা নিয়ে ইংরেজরা সেখানে সেন্ট জর্জ দুর্গ গড়ে তুলল।

ভারতে ফরাসী বণিক

ইউরোপের বণিকদের মধ্যে সর্বশেষ আসে ফরাসীরা। ১৬৬৮ খৃস্টাব্দে তারা সুরাটে এক কুঠি স্থাপন করে। ইউরোপের বণিকদল এদেশে একা মিলেমিশে বাণিজ্য ত করেইনি, একে অন্যকে হটিয়ে কি করে বাণিজ্যের মোটা অংশ নিজেদের হাতে রাখবে, এই নিয়ে ছিল তাদের মধ্যে নিরন্তর কলহ।

কে কত বেশি পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতে পারে এই নিয়ে বিদেশী বণিকদের মধ্যে কলহ বাধে। অন্যের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ফরাসীরা নিজেদের

কুঠিগুলি মোটামুটি সুরক্ষিত করে এবং ছোটখাট সৈন্যদল গড়ে তোলে। তবে প্রথম দিকে বাণিজ্য ছাড়া ভারতীয় অঞ্চল অধিকার করার কোন পরিকল্পনা তাদের ছিল না। কিন্তু ঘটনাচক্রে সুযোগ উপস্থিত হল। ১৭৪০ খৃস্টাব্দে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। যেহেতু ইউরোপে তারা একে অপরের শত্রুপক্ষ, ভারতে বাণিজ্য উপলক্ষে বসবাস করার সময়ও তারা যুদ্ধের রেশ এখানে টেনে আনল।

৮.

মোগলশাসনের অধীনে ভারত

রাজনৈতিক ঐক্যসাধন : ভৌগোলিক দিক থেকে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ একটি উপমহাদেশ। এর ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভিন্ন রকম জলবায়ু ও ভূমির গঠন-পার্থক্য থাকলেও সামগ্রিকভাবে ভারত একক দেশ। কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে সমগ্র দেশ পূর্বে কখনও ঐক্যবদ্ধ হয়নি। প্রাচীনযুগে অশোকের রাজত্বকালে, সুলতানী আমলে আলাউদ্দীন খিলজী ও মহম্মদ তোগলকের রাজত্ব সময়ে এবং মোগলযুগে দেশের অনেকখানি অংশ একই রাজনৈতিক শাসন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছিল। এই কয়েকবারের মধ্যে মোগল আমলেই সমগ্র উত্তর ভারত প্রায় দুশো বছর রাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধ শাসনের অধীনে ছিল। তবু শাসকের সঙ্গে শাসিতের জাতিগত ঐক্যবোধ বা ধর্মীয় আদর্শগত সমভাব গড়ে ওঠেনি।

শাসন ব্যবস্থা : কেন্দ্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগের প্রধান অঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে প্রদেশ বা সুবাগুলি। আকবরের আমলে সমস্ত সাম্রাজ্য ১৫টি সুবায় বিভক্ত এবং প্রতি সুবায় একজন করে সুবাদার নিযুক্ত ছিল। সুবাদারগণ কেন্দ্রশক্তির প্রতিভূরূপে কেন্দ্রের নির্দেশে দেশ শাসন করত। সম্রাটের আত্মীয় বা বিশ্বস্ত আপনজনকেই প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করা হত। তাঁর দায়িত্ব ছিল প্রজাবর্গকে কেন্দ্রশাসনের প্রতি অনুগত রাখা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা, রাজস্ব আদায় করে তা যথাসময়ে কেন্দ্রীয় রাজকোষে জমা দেওয়া এবং প্রয়োজন হলে সৈন্যসামন্ত দিয়ে সম্রাটকে সাহায্য করা। স্থানীয় অঞ্চলে কেন্দ্রশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিলে তা দমন করার ভার থাকত প্রাদেশিক শাসকের ওপর। তাছাড়া প্রাদেশিক শাসক যদি নিজেই নিজেকে স্বাধীন করার পরিকল্পনামত কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মাথা তুলত, সম্রাটের বাহিনী ছুটে আসত তার উচ্চাশা চূর্ণ করতে, কেন্দ্রকে তাই সারা সাম্রাজ্যের সুবাদারদের কার্যকলাপের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হত। দেশের নানাস্থানে দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তুলে রাজ্যব্যাপী প্রহরা-চৌকির মত শক্তিকেন্দ্র সজাগ রাখার ব্যবস্থা ছিল।

গুপ্তচর ব্যবস্থা : কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গুপ্তচরকে রাজার চক্ষু ও কর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মোগল শাসকগণও যে এই 'চোখ-কান' সর্বদা সজাগ রাখতেন তার কথা ইতালীয় ভ্রমণকারী মানুচি স্পষ্টভাবেই বলেছেন। তিনি বলেন, তাঁর সমস্ত রাজত্বকালে ঔরঙ্গজেবের এমন দক্ষ গুপ্তচর ছিল যে, তারা মানুষের চিন্তা ভাবনা পর্যন্ত জানত। তাঁর রাজত্বে সর্বোপরি শহর দিল্লিতে তাঁর অজ্ঞাতসারে কোথাও কিছু ঘটতে পারত না।'*

বিদ্রোহ দমনে শাস্তি : রাজ্যে কোথাও বিদ্রোহ হলে তা দমনের জন্য মোগলশাসকগণ চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতেন। বিদেশী ভ্রমণকারীদের বিবরণে এই ধরনের বহু ঘটনার উল্লেখ আছে।

মোগল শাসক ও জাগীরদার : মোগল আমলে সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। সমাজের এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চে ছিলেন সম্রাট ; তাঁর নিচে ছিলেন মনসবদার বা অভিজাতগণ ও রাজকর্মচারী। এঁরাই একমাত্র রাষ্ট্রীয় সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন ; এঁদের নিচে থাকত বঞ্চিত জনসাধারণ। যেহেতু সম্রাট বাহুবলে রাজ্য জয় করেছেন তাই রাজ্যের যাবতীয় ভূমির মালিক ছিলেন সম্রাট। সম্রাট তাঁর রাজ্যের কিছু কিছু ভূমি জাগীরদারদের মধ্যে বিলি করতেন, প্রতিদানে জাগীরদার নির্দিষ্ট পরিমাণ জাট ও সওয়ার সৈন্য নিয়ে সম্রাটকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকত।**

সম্রাটের পরেই ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন জাগীরদার, মনসবদার, অমাত্য প্রভৃতি অভিজাতবর্গ। অভিজাতগণ রাজ্যের মঙ্গল অপেক্ষা নিজ স্বার্থের প্রতি বেশি মনোযোগী, পরস্পর কলহ এবং দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়েন। বিপানচন্দ্র বলেন, ক্ষমতা, মর্যাদা ও আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অভিজাতরা দল, উপদল গঠন করে পরস্পরের বিরুদ্ধে এমন কি সম্রাটের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করত। ক্ষমতালাভের লড়াইতে বলপ্রয়োগ, মিথ্যাচার ও জালিয়াতির আশ্রয় নিত।***

ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা : মোগল আমলে ভারতের অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। কৃষির ফসল থেকেই রাজস্ব আসত। চাষীরা ফসলের একটা অংশ কিংবা ফসলের দাম রাজস্ব হিসাবে জমা দিতে পারত। ঐতিহাসিক ইরফান হবিব বলেছেন, শস্য-ভাগ ব্যবস্থায়, ভাগ করার সময়েই রাষ্ট্রের অংশ মাঠ বা খামার থেকে সরাসরি নিয়ে নেওয়া হত, যাতে নির্ধারণ আদৌ না করলেও চলে।

* গৌতম ভদ্র—মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষকবিদ্রোহ, পৃ. ২০৪

** 'নগদ অর্থের পরিবর্তে জাগীর দান করা হইল বলিয়া এগুলি হইতে যাহাতে অন্তত পক্ষে বেতনের সমতুল্য অর্থলাভ হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হইত।'—ঔরঙ্গজেবের সময়ে মুঘল অভিজাত শ্রেণী পৃ. ১০২ এম. আতাহার আলি।

*** In order to increase their power, prestige, and income, the nobles formed groups and factions against each other and even against the King—Bipan Chandra, Modern India, p. 11

কিন্তু নগদে বা জিনিসে—যে মাধ্যমেই রাজস্ব দেওয়া হোক না কেন, তা অবশ্যই সংগ্রহ করা হত ফসল তোলার সময়ে।…রাজস্ব না দেওয়া অবধি চাষীরা মাঠ থেকে ফসল তুলতে পারবে না—এই ছিল রীতি… ।*

রাজস্ব প্রদানে চাষীর গাফিলতি হলে চাষীকে বন্দী করে দুর্গে আটক রাখা হত। আবাদী ক্ষেত ছাড়া গবাদি পশু ও ফলের বাগানের ওপর কর বসানো হত। গাছের ব্যাপারে গাছ প্রতি হিন্দুদের কাছে নেওয়া হত ফলনের ½ ভাগ, মুসলমানদের কাছ থেকে ⅙ ভাগ। জমির ফসল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জলসেচ খাল খনন করার ব্যবস্থা করা হত। শাহজাহানের আমলে কতকগুলি নালা তৈরি করা হয়েছিল। তবু চাষীর প্রয়োজন অনুপাতে সে ব্যবস্থা খুবই সামান্য। ইরফান হবিব বলেন, শাহজাহান যে দুটি বড় খাল কাটিয়েছিলেন, ক্ষেতে জল দেওয়াটাই তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। একটি উদ্দেশ্য ছিল লাহোরের বাগানে জলসেচ করা অন্যটির উদ্দেশ্য শাহজাহানের দুর্গে জল সরবরাহ করা। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সেচব্যবস্থা নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণ মোগল আমলে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় নি।

বিদেশীর চোখে শাসক সমাজ: মোগলযুগে বহু বিদেশী পর্যটক ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে ও ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এদেশে এসেছিলেন। সেযুগে ভারতের ধনদৌলতের খ্যাতি এবং মোগলদের জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাত্রার কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বচ্ছদৃষ্টিভঙ্গি এবং উদার মানবিকতাবোধ নিয়ে যাঁরা ভারতে পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং ভারতের জন-জীবনের সঙ্গে কিছুমাত্রও পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁরা শাসক ও শাসিতের জীবনযাত্রার বৈষম্য দেখে বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েছিলেন। শাসক-সম্প্রদায় হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে বিদেশীর শাসন কঠোরতার সঙ্গে বজায় রেখেছিল। শাসিতকে শোষণ করে, দমিত রেখে নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জীবনধারা অব্যাহত রাখাই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য। শাসকশ্রেণী অপরিমিত ভোগ ও ঐশ্বর্যের মধ্যে বিলাসের জীবনযাপন করত। জীবনযাত্রায় এমন অনেক আড়ম্বর প্রদর্শন করা হত যা নিছকই অহমিকা প্রকাশক। অভিজাত ব্যক্তিরা অন্তঃপুরে যেরূপ বিলাসে মগ্ন থাকত তা সাধারণ মানুষের ধারণার অগম্য ছিল। প্রতি ধনী ব্যক্তির বহুসংখ্যক স্ত্রী ও প্রতিপালিতা নারী ছিল, এদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক মহল, প্রত্যেকের সৌভাগ্য অনুসারে ১০ থেকে ১০০ করে পরিচারিকা থাকত। নৃত্যগীত ও আনন্দ-উল্লাসে এদের জীবন কাটত।

ভোগবিলাস ও আড়ম্বর জাহির

বার্ণিয়ের বর্ণনা—অন্তঃপুরে বিলাসিতার বিশাল আয়োজন

মোগল অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতির প্রচলন ছিল। বিদেশী পর্যটকদের অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে, উৎকোচ না দিলে তাদের কাছ থেকে কোন

* ইরফান হবিব—মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭০৭ খৃঃ) পৃ. ২৫৫

কাজ ও সাহায্য পাওয়া যেত না। ইরফান হবিবের অভিমত: মুঘল অভিজাত শ্রেণীর দুর্নীতি ও উৎকোচের বিবরণ অতিরঞ্জিত নয়…এরা অত্যন্ত অদূরদর্শী এক শাসকশ্রেণীর ভূমিকাই গ্রহণ করেছিল। ব্যক্তিগত লাভের ইচ্ছা তাদের এত আচ্ছন্ন করেছিল যে, শাসনব্যবস্থার ভবিষ্যৎ বিপদের ইঙ্গিত তাদের অন্তরে স্থান পায় নি।*

উৎকোচ ও দুর্নীতি

বাণিজ্যে অমাত্যবর্গের ভূমিকা: মোগল অভিজাতশ্রেণী সমসাময়িক ইউরোপীয় অভিজাতবর্গের মত ভূমিব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল না; তাদের জাগীর প্রায়ই স্থানান্তরিত হত এবং অনেকেই ছিল 'নক্‌দি' অর্থাৎ রাজকোষ থেকে নগদ অর্থে বেতন গ্রহণ করত। তবু তারা ব্যবসার ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে নি। তারা সামুদ্রিক বাণিজ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করত। তাভার্ণিয়ে লিখেছেন, সুরাট পৌঁছে বাণিজ্যদ্রব্যের জন্য প্রচুর অর্থ পাওয়া যায়। কারণ ভারতবর্ষের অভিজাতবর্গের প্রধান ব্যবসা হচ্ছে পণ্যদ্রব্যের মাধ্যমে অর্থ বিনিয়োগ করে হরমুজ, বসরা, মক্কা, এমন কি ফিলিপাইনে জাহাজ প্রেরণ করা। সামুদ্রিক বাণিজ্যে মীরজুমলা এবং অন্তর্বাণিজ্যে শায়েস্তা খান বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

বাণিজ্যে অর্থ-বিনিয়োগ

শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য: মোগল আমলে ব্যক্তিগত উদ্যমে ও রাজ্য-পরিচালিত কারখানায় শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হত। কুটিরশিল্পীরা অতি উত্তম দ্রব্যসামগ্রী তৈরী করত। এদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজপরিবার ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গ। সরকারী কারখানায় বহুল পরিমাণে নানা বস্তু উৎপাদন করা হত। দ্রব্যের ঔৎকর্ষ সাধনের জন্য দক্ষ কারিগর নিযুক্ত করা এবং তাদের তদারকির জন্য সরকারী পরিদর্শক কর্মচারী নিযুক্ত থাকত। আবুল ফজল বলেন, আকবর শিল্পসামগ্রীর মান উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। কারুশিল্পীরা দক্ষ ছিল কিন্তু উপযুক্ত পারিশ্রমিক তাদের ভাগ্যে জুটত না। মোরল্যাণ্ড বলেন, তাঁতীরা অর্থাভাবে নগ্নদেহে থাকত কিন্তু পরিচ্ছদ তৈরী করত অপরের জন্য; চাষীরা ক্ষুধার্ত থাকত কিন্তু খাদ্য উৎপাদন করত নগর ও শহরবাসীদের জন্য। বার্ণিয়ের কথায় শিল্পী-চাষী শ্রমিক শাসক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের শোষণে দুঃখময় জীবনযাপন করত।

কুটির শিল্পজাত উৎকৃষ্ট দ্রব্য

বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য: মোগলযুগে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বিস্তৃত বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ইউরোপীয়দের আগমনের ফলে বাণিজ্য আরো সম্প্রসারিত হয়। ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে ভারতের রপ্তানি পণ্য ছিল সোরা, নীল, আফিম, সুতীবস্ত্র, মরিচ এবং চিনি। বিদেশ থেকে আমদানি হত সোনা, কাঁচা রেশম, মূল্যবান পাথর, চীনা বাসনকোসন, অশ্ব, আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস। বাণিজ্যে লাভের পাল্লা ছিল ভারতের দিকেই। প্রধান বন্দর ছিল সুরাট,

* দ্রষ্টব্য—ঔরঙ্গজেবের সময়ে মুঘল অভিজাত শ্রেণী, পৃ. ২১৪; পৃ. ২২১।

ব্রোচ (প্রাচীন যুগের ভৃগুকচ্ছ), কাম্বে, কালিকট, কোচিন, মসুলিপত্তনম ও চট্টগ্রাম। বিচক্ষণ ও কর্মকুশল বলে ভারতীয় বণিকদের খ্যাতি ছিল।

শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা

সাংস্কৃতিক জীবন ঃ ঔরঙ্গজেব বাদে অন্যান্য মোগল সম্রাটগণ ছিলেন রুচি সম্পন্ন এবং শিল্প সংস্কৃতির প্রতি উৎসাহী। আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালকে মোগল সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ বলা যায়। এই যুগে স্থাপত্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের যে বিচিত্র ও বিস্ময়কর বিকাশ ঘটে ভারত-ইতিহাসে সেরূপ কখনও হয়নি। এই মোগল সম্রাটগণ শিল্পসৃষ্টির ওপর নিজ নিজ প্রতিভার ছাপ রেখেছেন যা এখন পর্যন্ত সকলের প্রশংসার উদ্রেক করে। শাসকগণের সুরুচি, আর্থিক সমৃদ্ধি ও শান্তিশৃঙ্খলাপূর্ণ শাসন শিল্পসৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ রচনা করেছিল। এইসব শিল্পকাজের মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতি ও ভাবধারার মিলন সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিলন

স্থাপত্য ঃ মোগল স্থাপত্য বলিষ্ঠতা, সৌন্দর্য ও সূক্ষ্ম কারুকার্যের জন্য জগদ্বিখ্যাত। এর সূত্রপাত করেন বাবর। তিনি কনস্টান্টিনোপল থেকে দক্ষ শিল্পী এনেছিলেন এবং ভারতীয় তরুণ শিল্পীদের (পাথর কাটাই শিল্পী) কাজে নিযুক্ত করেন। হুমায়ুন রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে স্থাপত্য কর্মে মনোযোগ দিতে পারেন নি। শেরশাহ স্থাপত্যশিল্পে যে বলিষ্ঠতা ও সৌন্দর্যের মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিহারের সাসারামে তাঁর নিজের সমাধিভবন এবং দিল্লী পুরান কিল্লার মসজিদ। আকবর শক্ত লাল পাথর ব্যবহার করে আগ্রাকে বহু সৌধে সজ্জিত করেছিলেন। দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস ও 'জাহাঙ্গীরী মহল' এবং সর্বোপরি ফতেপুর সিক্রিতে শেখ সলিমচিস্তির সমাধি ও বুলান্দ দরওয়াজা অনুপম শিল্পকীর্তি। ১৭৬ ফুট উঁচু বুলান্দ দরওয়াজা গুজরাট বিজয়ের স্মারক হিসাবে নির্মিত, ভারতের সর্বোচ্চ এবং বিশ্বের অন্যতম সুউচ্চ তোরণ। সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধিগৃহ আকবরের পরিকল্পিত এবং জাহাঙ্গীর কর্তৃক নির্মিত মনোহর সৌধ। জাহাঙ্গীরের অপর স্থাপত্যের মধ্যে আছে পত্নী নূরজাহান কর্তৃক তাঁর পিতা ইতিমাদ উদ্দৌলার সমাধিভবন; এটি শুভ্র মর্মর প্রস্তরে নির্মিত এবং পিয়েত্রা ডুরা (**Pietra dura**) অর্থাৎ নানা রঙের আধা মূল্যবান প্রস্তরখণ্ডের অন্তস্থাপনে (**inlaid**) অলংকৃত।

স্থপতি-সম্রাট শাহজাহান সৌধনির্মাণের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। দিল্লীর লালকেল্লা, মোতি মসজিদ, জামা-মসজিদ, তাজমহল প্রভৃতি শিল্পকীর্তির জন্য শাহজাহান অমর হয়ে আছেন। এর যে কোন একটির স্রষ্টা হিসাবে যে কোন শাসক বিশ্বে অতুল খ্যাতির অধিকারী হতে পারত। স্থপতি ওস্তাদ ইশার পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় ২২ বছরে এই 'মর্মরস্বপ্ন' নির্মিত হয়।

শাহজাহানের স্থাপত্যশিল্পে বিদেশী প্রভাব অপসৃত, হিন্দুরীতি মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। শাহজাহানের পর মোগল শিল্পের অবনতি শুরু হয়।

চিত্রকলা : মোগল যুগের পূর্বে মুসলমান শাসকদের কাছে চিত্রশিল্প ইসলাম বিরুদ্ধ বলে বিবেচিত হত। কিন্তু মোগলগণ ছিলেন চিত্রের সমঝদার এবং পৃষ্ঠপোষক। হুমায়ুন পারসিক চিত্রশিল্পী আব্দুস সামাদ ও মীর সৈয়দ আলী দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। হুমায়ুন ও আকবর পার্সী গ্রন্থ 'দস্তান-ই-আমীর হাম্‌জা' চিত্রসজ্জায় অলংকৃত করতে তাঁদের নিযুক্ত করেন। ফতেপুর সিক্রির সৌধ-দেওয়াল হিন্দু ও পারসিক শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রে অলংকৃত করেছিলেন।

হুমায়ুন, বাবর

জাহাঙ্গীর নিজে একজন চিত্রসমঝদার ছিলেন। তাঁর সংগ্রহে বহু উৎকৃষ্ট চিত্র স্থান পেয়েছিল। তাঁর আমলে আগা রেজা, মহম্মদ নাদির, মহম্মদ মুরাদ চিত্রশিল্পী হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। ওস্তাদ মনসুর পাখির চিত্র অঙ্কনে এবং বিষেণ দাস মানব-প্রতিকৃতি আঁকতে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। চিত্র সমালোচক পার্সি ব্রাউন বলেন, বাস্তবধর্মিতা মোগল চিত্রশিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শাহজাহান স্থাপত্যে অনুরাগী ছিলেন কিন্তু চিত্রশিল্প তাঁর কাছে উপেক্ষিত হয়েছে। রাজসভায় চিত্রশিল্পীদের সমাদর হ্রাস পায়। এরূপ অবস্থায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশুকো চিত্রশিল্পের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছেন। তাঁর সংগৃহীত ছবির অ্যালবাম এখনও ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ঔরঙ্গজেব চিত্রাঙ্কন ইসলামধর্মের অনুমোদিত নয় মনে করে এর পৃষ্ঠপোষকতা করেননি।

জাহাঙ্গীর সমর্থক

শাহজাহান চিত্রে অনুৎসাহী

মোগল দরবারের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়ে চিত্রশিল্পীরা রাজস্থান ও পাঞ্জাবের সামন্ত নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রশিল্পে যে নতুন আঙ্গিকের প্রবর্তন করেন তা রাজপুত শৈলী ও কাংড়া শৈলী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এম. এস. রণধাওয়া (M. S. Randhawa) **Kangra Paintings on Love** চিত্রসঙ্কলন গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, হরিপুর গুলারের রাজা গোবিন্দচাঁদ মোগল চিত্রশিল্পে অভিজ্ঞ শিল্পীদের নিজ দরবারে আশ্রয় দেন। পাঞ্জাব-হিমালয়ের সবুজ শৈল, তরঙ্গায়িত ধানক্ষেত এবং তুষারমণ্ডিত ধৌলধর পর্বতের বরফগলা জলে উচ্ছল স্রোতস্বিনীশোভিত পরিবেশে স্বাভাবিক অনুভূতিময় মোগল চিত্রকলা কাংড়া শৈলীতে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল।

রাজপুত ও কাংড়া চিত্রশৈলী

মোগলযুগে সাহিত্য : মোগল সম্রাটগণ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের উৎসাহ দানের ফলে পার্সী ও হিন্দী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলিম ভাষা ও চিন্তাধারার সমন্বয় দেখা যায়। আকবরের রাজসভায় সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের সহায়তায় তিনি হিন্দু দর্শন, ধর্ম ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক গ্রন্থ পার্সীতে অনুবাদ করান। কতক মুসলিম পণ্ডিত হিন্দী ও বাংলা ভাষা শিক্ষা করে এই ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। মালিক মহম্মদ জয়সীর কাব্য 'পদ্মাবত' পদ্মিনীর কাহিনী অবলম্বনে লিখিত, আব্দুর রহিম খান-খানানের 'দোহা', মীর্জা হোসেন আলীর বাংলায় রচিত শ্যামাসংগীত সে যুগে সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ফলস্বরূপ বিবেচিত হত। এছাড়া ইতিহাস রচনায় মুসলমান শাসকের বিশেষ উৎসাহ ছিল। হুমায়ুনের আমলে জৌহর, শাহজাহানের সময়ে রায় ভরমল এবং ঔরঙ্গজেবের সময়ে ভীমসেন রচিত ইতিহাস গ্রন্থ বহু মূল্যবান তথ্যে পূর্ণ। মোগলযুগে লিখিত বিখ্যাত সাহিত্য বাবরের 'আত্মচরিত' (ওয়াকিয়াৎ-বাবরী)। সাহিত্য রসাশ্রিত এই আত্মকথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি বলে স্বীকৃত।

আকবরের আমল

ইতিহাস সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত

আকবরের আমলে শ্রেষ্ঠ ইতিহাস গ্রন্থ আবুল ফজলের 'আকবর নামা' ও 'আইন-ই-আকবরী'; বদাউনীর 'মুন্তাখাব-উল তারিখ'; নিজামউদ্দীন আহম্মদের 'তবকাৎ-ই-আকবরী'। আবুল ফজল একাধারে ছিলেন কবি, প্রবন্ধকার, ঐতিহাসিক ও সমালোচক। আকবরের নির্দেশে বদাউনী রামায়ণ পার্সীতে অনুবাদ করেন, ফৈজী অনুবাদ করেন অঙ্কশাস্ত্র গ্রন্থ 'লীলাবতী'। তাছাড়া 'মহাভারত', 'রাজতরঙ্গিনী', 'পঞ্চতন্ত্র', 'অথর্ববেদ', 'হরিবংশ' প্রভৃতি পার্সীতে অনূদিত হয়েছিল।

জাহাঙ্গীরের আত্মচরিত (তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী)-ও সুলিখিত। এই আমলের অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ হল আব্দুল হামিদ লাহোরীর 'পাদশানামা', ইনায়েৎ খানের 'শাহজাহান-নামা' এবং মুহম্মদ সলীর 'আমল-ই-সলী'। শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশুকো সংস্কৃত, পার্সী ও আরবী ভাষায় ব্যুৎপন্ন, সুফী মতবাদে আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি 'উপনিষৎ' ও 'গীতা' পার্সীতে অনুবাদ করেন। ঔরঙ্গজেবের কাব্য সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি কোন আগ্রহ ছিল না। মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও আইনকানুন সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁর নির্দেশে 'ফতোয়া-ই-আলমগীরী' নামে মুসলিম আইনের সার সংকলন প্রকাশিত হয়। ঔরঙ্গজেবের আমলের ইতিহাসগ্রন্থ হল কাফী খাঁ-র মুন্তাখাব-উল্-লুবাব। কাফী খাঁ গোপনে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অন্য ঐতিহাসিক পুস্তক হল সুজন রায় ক্ষত্রীর 'খুলাসাৎ-উৎ-তারিখ' এবং ভীমসেনের 'নুকশা-ই-দিলখুশা'।

জাহাঙ্গীর

দারাশুকো

ঔরঙ্গজেবের আমল

আঞ্চলিক সাহিত্য: মোগলযুগে আঞ্চলিক সাহিত্যের অভূতপূর্ব স্ফুরণ ঘটেছিল। আকবরের সভায় কবিপ্রতিভাসম্পন্ন সভাসদ ছিলেন। এঁদের মধ্যে বীরবলকে আকবর 'কবি-প্রিয়' উপাধিতে ভূষিত করেন। রাজা মানসিংহ ও ভগবান দাসও কবি বলে খ্যাত ছিলেন। তবে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হিন্দী কবি ছিলেন আব্দুর রহিম খান-ই-খানান। তাঁর দোহাগুলি অদ্যাবধি প্রশংসার সঙ্গে পঠিত হয়। কবি তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' সেযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কালজয়ী ধর্মগ্রন্থ। আগ্রার অন্ধকবি সুরদাস মথুরা-বৃন্দাবনের 'ব্রজভাষায়' কৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনা করেছেন। শাহজাহানের আমলের কবি সুন্দর এবং বিহারীলাল ব্রজভাষায় মনোজ্ঞ কাব্য সৃষ্টি করেছেন।

হিন্দী

ব্রজভাষা

এযুগে বাংলাভাষায় যে সাহিত্য রচিত হয়েছিল বাঙালীর কাছে তা স্থায়ী সম্পদে পরিণত হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত', বৃন্দাবন-দাসের 'চৈতন্য ভাগবত', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' এবং মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'কবিকঙ্কন চণ্ডী' এখনও সমভাবে জনপ্রিয়।

সঙ্গীত: গোড়া মুসলিম ঔরঙ্গজেব ছাড়া অন্য মোগল সম্রাটগণ সঙ্গীতরসজ্ঞ ও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। সঙ্গীত রাজকুমারদের পক্ষে রাজোচিত গুণ বলে বিবেচিত হত। বাবর নিজে গীত রচনা করতেন, হুমায়ুন সঙ্গীতকে প্রার্থনার অঙ্গ বলে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। আকবর সঙ্গীত প্রীতির জন্য সারা ভারত থেকে ৩৬ জন গায়ককে রাজসভায় স্থান দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে গোয়ালিয়রের **তানসেন** এবং মালবের **বাজবাহাদুর** সঙ্গীত জগতে প্রবাদপুরুষ বলে পরিচিত হয়েছেন। গানের তানে মুগ্ধ হয়ে বনের হরিণ আপনাভুলে মানুষের কাছে চলে আসত, মেঘ থেকে বৃষ্টি নামত, শ্রোতা আত্মহারা হয়ে পড়ত—তানসেন সম্বন্ধে এই ধরনের কাহিনী প্রচলিত আছে। শাহজাহান যন্ত্রসঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। তাঁর সময়ে বিকানীরের জগন্নাথ ও জনার্দন ভট্ট ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতবিশারদ। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সঙ্গীত আবার মোগল-দরবারে স্থান লাভ করে। শুধু তাই নয়, রাগরাগিণী বিশেষজ্ঞরা নতুন নতুন সুর ও রাগ প্রবর্তন করেন। পরবর্তী মোগল শাসক মহম্মদ শাহের সভা-সঙ্গীতকার সদারঙ্গ ও অদারঙ্গ **খেয়াল গান** জনপ্রিয় করেন। এই সময় ঠুংরী, টপ্পা, তরাণা, দাদ্‌রা ও গজলের সূত্রপাত হয়। ফলে সঙ্গীত জগতে রাগ ও সুরে বৈচিত্র্য আসে এবং বিভিন্ন শৈলী বা ঘরানার সৃষ্টি হয়।

তানসেন ও বাজবাহাদুর

অন্যান্য সংস্কৃতির কথা: সিন্ধু-যমুনা-গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলে মোগল-শাসন দীর্ঘকাল ধরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে এই অঞ্চলের হিন্দু অধিবাসীদের জীবনযাত্রা, ধর্ম ও সংস্কৃতির ওপর যেমন গভীর ছাপ পড়েছিল

ভারতের অন্য অঞ্চলে তেমন হয়নি। পাহাড়ী অঞ্চলের দেশ নেপাল মুসলিম শাসনের আওতায় আসেনি ; সেখানকার অধিবাসীরা নিজেদের ধর্ম ও পরিবেশ-অনুকূল জীবনচর্যা বজায় রেখেছিল। নেপালে হিন্দুধর্ম ও পূজাপদ্ধতিতে ইসলামের ছায়াপাত ঘটেনি। হিমালয়ের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত ভুটান ভারতের অন্য অঞ্চলের রাজনৈতিক আলোড়ন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। এখানে ভুটিয়া টেফু নামক উপজাতির বসবাস ছিল। তিব্বতীদের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে বর্তমান ভুটিয়াদের উৎপত্তি। এদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হওয়ায় এরা অনেকাংশে ভারতীয় হিন্দু-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। এখানে ইসলামের কোন প্রভাব নেই। ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে, আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরায় মুসলিম প্রভাব বিস্তারলাভ করতে পারে নি। ঐসব অঞ্চলে চিরাচরিত জীবনধারা ও উপজাতিগত বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে বজায় ছিল। ইসলাম সেখানে জনজীবনে সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পায় নি। দক্ষিণ ভারতে হিন্দুদের ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি সামাজিকভাবে মুসলিম প্রভাব থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

নেপাল

ভুটান

উত্তর-পূর্ব অঞ্চল

দক্ষিণ ভারত

মধ্যভারতের দুর্গম পাহাড়ময় আরণ্যক পরিবেশে সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীগোষ্ঠীর লোকেরা বিদেশাগত লোকেদের সংশ্রব থেকে দূরে নিজেদের সাংস্কৃতিক ধারা বজায় রেখেছে। নৃতত্ত্বের দিক থেকে এরা অস্ট্রেলিয়ার প্রাচীন অধিবাসীদের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রোটো অস্ট্রল্যায়ড গোষ্ঠীর মানুষ বলে নৃতত্ত্ববিদদের ধারণা। কর্ম ও জীবিকা উপলক্ষে এরা শহরের মানুষের সংস্পর্শে এলেও মুসলিম রীতিনীতি, ভাষা, আচার-ব্যবহার বা ধর্ম সম্পূর্ণ এড়িয়ে এরা নিজেদের ভাষা ও জীবনযাপন পদ্ধতি যথাসম্ভব অনুসরণ করে চলে।

সাঁওতাল

———

চিরন্তন ভারত

কোম্পানির আমল

[১৭০৭—১৮৫৭]

১.

মোগল সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মোগলসাম্রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়েছিল, অথচ অবিশ্বাস্য মনে হলেও, তাঁর রাজত্বকালেই সাম্রাজ্যের অবনতি শুরু হয় এবং অল্পকালের মধ্যেই এর পতন ঘটে। ঔরঙ্গজেব এক বিশাল সাম্রাজ্য উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট না থেকে ভারতের সর্বদক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত সাম্রাজ্যসীমা বাড়ানোর প্রচেষ্টায় তিনি বিপুল অর্থব্যয় ও লোকক্ষয়কর সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। সে যুগে দ্রুত যানবাহন ব্যবস্থার অভাবে সমগ্র দেশে কেন্দ্রীয়-শাসন বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন ছিল। সারা দেশ একই শাসনের অধীনে সংহত রাখা নীতিগতভাবে কাম্য হলেও বাস্তবে তা সম্পন্ন করা সহজ ছিল না। যোগ্য শাসক হয়েও ঔরঙ্গজেব এই বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন নি। একজন ঐতিহাসিকের মতে ঔরঙ্গজেবের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল তাঁর রাজনৈতিক বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার অভাব। মারাঠাদের চূর্ণ করার জন্য তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশের ভূমিপ্রকৃতি ও জাগ্রত মারাঠাজাতিকে দমন করা যে সহজ হবে না তা মানতে চান নি। অনুরূপ পরিস্থিতিতে আকবর রাজপুতদের নিজের পক্ষে আনতে পেরেছিলেন। ঔরঙ্গজেব উদারতা ও কূটনীতি প্রয়োগ মারাঠা সর্দারদের অনুগত রাখতে পারলে সাম্রাজ্যের মঙ্গল হত। এর পরিবর্তে শক্তি প্রয়োগে তাদের পদানত করতে যাওয়ায় রাজকোষের অর্থহানি ও দাক্ষিণাত্যের শিল্পবাণিজ্য ধ্বংস হল। উত্তর ভারত থেকে ২৫ বৎসর কাল অনুপস্থিতি এবং মারাঠাদের দমনে ব্যর্থতা সম্রাটের মর্যাদা ধূলিলুণ্ঠিত করে দেয়; সৈন্যবাহিনী হতমান হয়ে পড়ে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত উপেক্ষিত থাকে, প্রাদেশিক শাসক এবং পদস্থ কর্মচারীরা কেন্দ্রশক্তির দুর্বলতার সুযোগে নিজেরা প্রধান হয়ে ওঠার পরিকল্পনা করতে থাকে।

বাস্তব বুদ্ধির অভাব

সাম্রাজ্যের ওপর আঘাত: মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। রাজ্যে অশান্তির সুযোগ নিয়ে অহোমরা মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে এসে হানা দেয়। আরাকানে মগজাতি এবং উত্তরবঙ্গে কোচবিহারের রাজাও মোগল প্রাধান্য অস্বীকার করেন। ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে বাংলার শাসনকর্তা মীরজুমলা বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে দুর্গম অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে কোচবিহার ও আসাম জয় করেন বটে কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রকোপে মোগলবাহিনী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। রোগাক্রান্ত হয়ে মীরজুমলা নিজেও প্রাণত্যাগ করেন। অহোমরা আবার তাদের অঞ্চল অধিকার করে নেয়।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দুর্ধর্ষ আফগান দলগুলি সর্বদা মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে উপদ্রবের উৎস হয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ইউসুফজাই নামে উপজাতি সিন্ধু অতিক্রম করে হাজারা জেলা দখল করে। এদের দৌরাত্ম্য দমন করতে ঔরঙ্গজেবকে বহু সৈন্য নিয়োগ করতে হয়। পেশোয়ার, বান্নু ও কোহাট জেলার কতক উপজাতি বিদ্রোহ করে মোগল সম্রাটকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। রাজকোষ থেকে ভাতা, জাগীর প্রভৃতি উৎকোচস্বরূপ প্রদান করে ঔরঙ্গজেব এদের সাময়িকভাবে শান্ত করেন বটে কিন্তু অত্যধিক ব্যয়ের দরুন রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ায় সাম্রাজ্যে অর্থ সংকট দেখা দেয়।

জাগীরের সংখ্যা বৃদ্ধি: মোগল শাসকদের ব্যক্তিত্ব ছাড়াও সাম্রাজ্যের শক্তি নির্ভর করত অমাত্যবর্গের সংগঠন ও চরিত্রশক্তির ওপর। শাসকের দুর্বলতা থাকলেও উদ্যমশীল, কর্মনিষ্ঠ ও অনুগত অমাত্যশ্রেণী রাজশক্তিকে বিপদ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারত কিন্তু অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থ-পরতা এবং পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা সাম্রাজ্যের দুর্বলতার অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে যে যোগ্য লোক ছিল না, তা নয়; রাজ্যের সামগ্রিক মঙ্গল অপেক্ষা নিজেদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও আর্থিক সমৃদ্ধির দিকেই তাদের দৃষ্টি ছিল বেশি। ফলে নিজেদের মধ্যে কলহ, ছোট ছোট দল গঠন এবং জাগীর বৃদ্ধির জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। কিন্তু জাগীরের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় অভিজাতদের প্রতিযোগিতা আরো তীব্র আকার ধারণ করে; নিজেদের ক্রমবর্ধমান ব্যয়-নির্বাহের জন্য অমাত্যরা চাষীকে শোষণ করে যথাসম্ভব বেশি পরিমাণ কর আদায় করতে থাকে। জাগীরগুলি বংশানুক্রমিক করে এবং খলিশা (সম্রাটের খাস) জমি নিজেদের অধিকারে এনে অমাত্যরা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যয়ভার বহনের ব্যবস্থা করে নেয় কিন্তু এর ফলে রাজকোষে রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পায়। সমগ্র রাজ্যের স্বার্থ উপেক্ষা করে অমাত্যদের নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি সাম্রাজ্যকে আর্থিক প্রশাসনিক ও সামরিক দিক থেকে শিথিল করে দেয়। খাস-জমির পরিমাণ কমে যাওয়ায় রাজ্যের আর্থিক ক্ষতির সঙ্গে কৃষক প্রজাবর্গের অসন্তোষ প্রশাসনিক সংকট সৃষ্টি করে। জাগীরদারগণ জাগীরের পরিমাণ বাড়ালেও সেই অনুপাতে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে রাজকীয় বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করে নি। ফলে সম্রাটের অর্থহানি ও সামরিক শক্তিহানি দুই-ই অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

কৃষক বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ: জাগীরদার কর্তৃক অত্যধিক কর বৃদ্ধির ফলে চাষী বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং নিরুপায় হয়ে পড়ে; অনেক ক্ষেত্রে তারা চাষ আবাদ ছেড়ে দেয়; উৎপীড়ন নীতির ফলে কোন কোন অঞ্চলে চাষীরা সংঘবদ্ধ হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। [১৬৬৯ খৃস্টাব্দে সৎনামী সম্প্রদায়ের পাঁচহাজার দুর্ধর্ষ কৃষক ধর্মমতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিদ্রোহ করে। আগ্রা ও মথুরা অঞ্চলে গোকলার নেতৃত্বে জাঠগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। শিখগুরু তেগ

বাহাদুরও ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে দাঁড়ান।] এইভাবে সৎনামী, জাঠ ও শিখদের অসন্তোষ আন্দোলন সাম্রাজ্যের শক্তি দুর্বল করে দেয়। রাঠোর নেতা দুর্গাদাস ও মেবারের রাণা রাজসিংহ ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। ফলে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে সংশয় সৃষ্টি হয়। রাজধানী থেকে ঔরঙ্গজেবের অনুপস্থিতির জন্য অমাত্যবর্গ নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে মোগল দরবার স্বার্থপরায়ণ আমীরওমরাহদের দলাদলি ও ষড়যন্ত্রের অনুকূল ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

মোগল দরবারে দলাদলি : ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে যেমন যোগ্য শাসকের অভাব দেখা যায়, শাসনকার্যে সাহায্যকারী অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেও তেমনি স্বার্থসিদ্ধির কলহ ও দলাদলি চলতে থাকে। এদের মধ্যে কারোরই দেশের সংহতি রক্ষার দিকে লক্ষ্য ছিল না। কয়েক পুরুষ ধরে যারা ভারতে বসবাস করেছে এমন অভিজাতগণ, যেমন—**আফগান, বাড়হার সৈয়দ** এবং বাদাকশান থেকে আগত **দৌরাণী খাঁগণ হিন্দুস্থানী দলভুক্ত** ছিল। এরা হিন্দু সহকর্মীদের কাছ থেকেও সাহায্য নিত। মধ্য এশিয়া থেকে আগত প্রধান সুন্নী-সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ ছিল **তুরাণী** দলের লোক। মহম্মদ আমীন খাঁ এবং চিনকিলিস খাঁ নিজাম-উল-মুল্‌ক ছিলেন এই দলের প্রধান নায়ক। পারস্য থেকে আগত শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ ছিল ইরাণী-দলভুক্ত। আসাদ খাঁ এবং জুলফিকার খাঁ ইরাণীদলের প্রধান ছিলেন।

সম্রাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং দক্ষ শাসক হলে বিভিন্ন দলের অমাত্যদের অধীনে রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারতেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীদের অযোগ্যতার ফলে দলগুলি ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্বে সম্রাটকে হাতের পুতুলে পরিণত করতে চেষ্টা করে।

সিংহাসনে যোগ্য শাসক অধিষ্ঠিত না থাকলে এবং সৎ, দেশপ্রেমিক নিঃস্বার্থ মন্ত্রীর হাতে রাজ্যের ভার ন্যস্ত না থাকলে ক্ষমতালোলুপ চক্রান্তকারীরা কিরূপ দুঃস্বপ্নের রাজত্বকাল সৃষ্টি করে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের কার্যকলাপ তার দৃষ্টান্ত। আট বৎসর কাল ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাঁরা বিভীষিকার রাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন। উইলিয়ম আরভিনের (**William Irvine**) **Later Mughals** গ্রন্থে বর্ণিত তার বিশদ বিবরণ গোলকধাঁধাঁর মত হতবুদ্ধিকর।

দুর্বল উত্তরাধিকারী : মোগল সাম্রাজ্যের সর্বশেষ যোগ্য শাসক ঔরঙ্গজেব তাঁর মৃত্যুর পর জীবিত তিন পুত্রের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে কলহ শুরু হবে অনুমান করেছিলেন এবং এর শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সাম্রাজ্য তিনজনের মধ্যে ভাগ করে দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর বালিশের তলায় ঐ প্রস্তাব বা উইল পাওয়া যায় কিন্তু পুত্রদের কেউই সাম্রাজ্যের অংশমাত্র নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে ইচ্ছুক ছিলেন না। জ্যেষ্ঠপুত্র মোয়াজ্জেম কাবুলের শাসক ছিলেন।

তিনি নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হন। দ্বিতীয় পুত্র আজম এবং তৃতীয় পুত্র কামবক্স দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। এঁরা প্রত্যেকে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন এবং নিজনামে মুদ্রা প্রচার করেন। আগ্রার কয়েক মাইল দক্ষিণে যাজৌ নামক স্থানে মোয়াজ্জেম ও আজমের সৈন্যদলের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় (১০ জুন, ১৭০৭ খৃঃ)। আজম যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। কামবক্স ঐ সময় বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার করে নিজেকে শক্তিশালী করেছিলেন। মোয়াজ্জেম দাক্ষিণাত্যে অভিযান চালিয়ে হায়দরাবাদের নিকট কামবক্সকে পরাজিত করেন। যুদ্ধে আহত কামবক্সের মৃত্যু ঘটে। মোয়াজ্জেম বাহাদুর শাহ (শাহ আলম) নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বাহাদুর শাহ (১৭০৭—১৭১২ খৃঃ): বাহাদুর শাহ মাত্র ৫ বৎসর রাজত্ব করেন। শিবাজীর পৌত্র সাহুকে মুক্তি দিয়ে তিনি দেশে পাঠিয়ে দেন। এর ফলে মারাঠা শাসকদের মধ্যে তাঁর কাম্য বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। রাজপুতদের সঙ্গে তিনি সাময়িক শান্তি স্থাপন করেন কিন্তু শিখরা প্রবল হয়ে পাঞ্জাবে অশান্তি সৃষ্টি করে। সাম্রাজ্যের মধ্যে যে অশান্তি ও গোলযোগ দেখা দিয়েছিল, তা দমন করার সামর্থ্য বাহাদুর শাহের ছিল না। বৃদ্ধ, শান্ত, শিক্ষিত ও উদার প্রকৃতির বাহাদুর শাহ জনসাধারণের নিকট থেকে আখ্যা পেয়েছিলেন শাহ-ই-বেখবর অর্থাৎ উদাসীন রাজা।

সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্ব: বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁর চার পুত্রের মধ্যে যথারীতি কলহ আরম্ভ হয়। এঁদের মধ্যে যোগ্যতম আজিম-উশ্-শান বাংলার শাসক ছিলেন। যুদ্ধে তিনিই প্রথমে নিহত হন; যুদ্ধে পরে অপর দুই ভ্রাতাও নিহত হলে ক্ষমতাশালী অমাত্য জুলফিকার খাঁ জাহান্দারকে সিংহাসনে স্থাপন করেন এবং নিজে উজিরের (প্রধানমন্ত্রী) পদ গ্রহণ করেন। জাহান্দার শাহ ছিলেন হীনরুচি ও অকর্মণ্য। ঔরঙ্গজেবের বংশধরদের অযোগ্যতার সুযোগে অমাত্যদের মধ্যে ষড়যন্ত্র ও ক্ষমতার লড়াই প্রবল হয়ে ওঠে। অল্পদিন পরে অপর অমাত্যদল (সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়) জাহান্দারকে অপসারিত করে আজিম-উশ্-শানের পুত্র ফারুকশিয়রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৭১৩ খৃঃ)। ফারুকশিয়রের নির্দেশে জাহান্দারকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। জুলফিকার খানও নিহত হন।

ফারুকশিয়রের রাজত্বকালে শিখদের পরাভূত করে তাদের নেতা বান্দাকে বন্দী করা হয় এবং অমানুষিক কষ্ট দিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। তাঁর এক সহস্র অনুগামীকেও বধ করা হয়। ফারুকশিয়রের আমলে ইংরেজ বণিকরা এদেশে বাণিজ্য ব্যাপারে কতকগুলি সুবিধা লাভ করেছিল। ইংরেজ প্রতিনিধি হ্যামিলটন নামে এক শল্য চিকিৎসক সম্রাটের চিকিৎসা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করেন

এবং নিজ দেশবাসীর জন্য বাণিজ্যিক অধিকারে যাচ্ঞা করে নেন। ফারুকশিয়র ছিলেন দুর্বল ও ঘৃণ্যপ্রকৃতির লোক। সৈয়দ ভ্রাতাদের বিরুদ্ধদলের কুমন্ত্রণায় তিনি তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকলে সৈয়দগণ তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং অবশেষে নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেন।

মহম্মদ শাহ (১৭১৯—১৭৪৮ খৃঃ): হিন্দুস্থানী দলের নায়ক সৈয়দ ভ্রাতাগণ ফারুকশিয়রকে অপসারিত করে পর পর দুইজন অযোগ্য ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসান এবং পদচ্যুত করেন। অবশেষে বাহাদুর শাহের চতুর্থ পুত্র জাহান শাহের পুত্র অষ্টাদশবর্ষীয় রৌশন আগতারকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। ইনি মহম্মদ শাহ নাম ধারণ করেন এবং ১৭৪৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। দাক্ষিণাত্য, অযোধ্যা ও বঙ্গদেশ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হয়ে পড়ে। মারাঠাদের রাজ্য ও প্রতিপত্তি বিস্তার লাভ করে, রুহেলা আফগানগণ রোহিলাখণ্ডে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। জাঠগণ আগ্রার নিকট স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। শিখগণ পাঞ্জাবে প্রবল হয়ে ওঠে এবং নাদির শাহের ভারত আক্রমণ দিল্লী সাম্রাজ্যে চরম আঘাত হানে।

অমাত্যদের শক্তিবৃদ্ধি : অমাত্যগণ এক সময়ে মোগল রাজবংশের প্রতি একান্ত অনুগত ছিল এবং এর প্রতিদানে অর্থ প্রতিপত্তি ও সামাজিক মর্যাদা প্রভূত পরিমাণে লাভ করেছিল। কিন্তু রাজবংশ হীনবল হয়ে পড়লে এরা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করে আত্মস্বার্থ ও উচ্চাশাকেই পরমকাম্য বলে মনে করে এবং নিজেরা স্বতন্ত্র রাজ্য গড়ে তুলে সাম্রাজ্যের সংহতির মূলেই আঘাত হানে। বিপানচন্দ্রের কথায় : **the nobles placed their self interest and ambition above loyalty to the state and attacked the very unity of the Empire.**

মোগল রাজবংশের জীর্ণদশার সুযোগ নিয়ে যে সকল অমাত্য দল, আঞ্চলিক শক্তি বা নায়কেরা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল তাদের কার্যকলাপে একটি বিষয় সুস্পষ্ট বোঝা যায়। মারাঠা, জাঠ, রাজপুত বা অপর সব ক্ষমতাভোগ অভিলাষী প্রার্থীই আঞ্চলিক, গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই তৎপর হয়েছিল। মোগল সাম্রাজ্যের স্থলে কোন ঐক্যবদ্ধ জাতীয়রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা প্রকাশ পায়নি। বস্তুত, তৎকালীন অর্থনীতি, সামাজিক চেতনা, রাজনৈতিক পরিবেশ ভারতে এক-জাতিহিসাবে রাষ্ট্রগঠনের অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করেনি। ফলে এক বড-শাসন-অঞ্চল ভেঙে কতকগুলি খণ্ডরাজ্য গঠন করার দিকেই ক্ষমতা-লোভীদের উদ্যম পরিচালিত হল। এই রকম পরিস্থিতিতে অমাত্য ও বিভিন্ন প্রদেশের শাসকগণ যখন দুর্বল কেন্দ্রের অধিকার থেকে যথাসম্ভব বেশি লাভ দখল করে নিতে উদগ্রীব, সেই সময় যদি বিদেশী আক্রমণকারী কেন্দ্রকে আরো

ছত্রখান করে দেয় তবে তাদের পক্ষে সেরূপ অবস্থা বাঞ্ছনীয় মনে হবে। ঠিক এই রকম রাজনৈতিক অবস্থায় ভারতে নাদির শাহের আক্রমণ ঝঞ্ঝার মত শুষ্কবৃক্ষতুল্য মোগল সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ করে দিয়ে গেল।

নাদির শাহের ভারত আক্রমণ কালে দিল্লী দরবারের ওমরাহদের মধ্যে ঐক্য ও যুদ্ধে জয়লাভ করার অনমনীয় মনোভাব ছিল না। নিজাম-উল-মুলক সসৈন্যে সম্রাটকে সাহায্য করতে কর্নালের যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে সম্রাটের বিজয় কামনা করেন নি। 'মোগল দরবারে দল ও রাজনীতি' গ্রন্থে সতীশচন্দ্র লিখেছেন, পারসীকরা যখন ভারতীয় সৈন্যদের কামানের গোলায় নির্মূল করে দেয়, 'নিজামুল মুলক্ প্রশান্ত চিত্তে একটি হাতির ওপর বসে নিজের সৈন্যদলকে পিছনে নিয়ে কফিতে চুমুক দিচ্ছিলেন।' কর্নালের যুদ্ধে ব্যর্থ ভূমিকার জন্য নিজাম-উল-মুলক্ সম্রাটের আস্থা হারালেন।

নাদির শাহের আক্রমণের ফলে দিল্লী দরবার অত্যন্ত হীনবল হয়ে পড়ে। দিল্লীর দুর্বলতাকে নিজাম-উল-মুলক্ স্বাধীন হায়দরাবাদ রাজ্য সুদৃঢ় করার উপায় হিসাবে কাজে লাগিয়েছিলেন।

নাদির শাহের আক্রমণের ফল : পারস্য সম্রাট নাদির শাহের ভারত আক্রমণ জীর্ণ মোগল সাম্রাজ্যের ওপর চরম আঘাতস্বরূপ এসেছিল। (ii) মোগল বাহিনীর পরাজয় এবং নাদির শাহের জাঁকজমকসহকারে দিল্লীতে প্রবেশ এবং লালকেল্লায় প্রায় দুইমাস অবস্থান মোগল রাজবংশের পক্ষে অপমানকর বলে সাধারণ মানুষের কাছে মনে হয়েছিল। এতে প্রমাণিত হয়েছিল যে, মহান মোগলদের গৌরবরবি অস্তমিত হয়েছে। (iii) সাম্রাজ্যের মর্যাদা বিলুপ্ত এবং সেনাবাহিনীর অন্তঃসার শূন্যতা প্রমাণিত হওয়ায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্যের উত্থান ঘটে। বঙ্গদেশে সুবাদার আলিবর্দী খাঁ, অযোধ্যায় সাদাৎ খাঁ এবং দাক্ষিণাত্যে নিজাম-উল-মুলক্ কার্যত স্বাধীনভাবে নিজ নিজ রাজ্য শাসন করতে থাকেন। (iv) মারাঠা, জাঠ, শিখ এবং রোহিলারা এই অভিযানের ফলে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির সুযোগ পায়। (v) নাদির শাহ কাবুল দখল করে পারস্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কাবুল মোগল সাম্রাজ্যের হাতছাড়া হয়ে যায়। (vi) সাধারণ নাগরিকের জীবন ও সম্পদ হানি হওয়া ছাড়াও মোগল-সম্রাটদের দুই শতাব্দীর সঞ্চিত ধনরত্ন, ময়ূরসিংহাসন, কোহিনূর হীরকসহ কোটি-কোটি স্বর্ণমুদ্রা লুণ্ঠিত হয়। মোগল সাম্রাজ্যের ওপর এতবড় নির্মম আঘাত আগে আর আসেনি।

আঞ্চলিক শক্তিসমূহের উদ্ভব

রাজ্য ভাঙা গড়া ঃ মোগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসন শিথিল হয়ে পড়লে প্রাদেশিক শাসকদের মধ্যে স্বাধীনতালাভের বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে। ঔরঙ্গজেব ও তাঁর পুত্র বাহাদুর শাহের রাজত্বকাল পর্যন্ত সাম্রাজ্য কাঠামো জীর্ণ হলেও ভেঙে পড়তে আরম্ভ করেনি। কিন্তু বাহাদুর শাহের স্বল্পকালীন শাসনের পর মোগল সিংহাসনে এমন কোন দক্ষ শাসক অধিষ্ঠিত হননি যিনি সাম্রাজ্যের পতন রোধ করতে পারেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭ খৃঃ) ২০ বৎসরের মধ্যেই সুবাগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং গড়ে ওঠে ৬টি প্রধান রাষ্ট্র, যথা—(১) বাংলা (২) হায়দরাবাদ (৩) মহীশূর (৪) অযোধ্যা (৫) শিখরাজ্য এবং (৬) মহারাষ্ট্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতে ইংরেজ শক্তির প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টায় এরাই প্রাণপণে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রগুলির কার্যকলাপে বিদেশীকে প্রতিহত করার ঐক্যবদ্ধ উদ্যম দেখা যায়নি। দ্বিতীয়ত, অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য রাজ্যগুলি আভ্যন্তরীণ ব্যব[illegible]-বাণিজ্যের উন্নতির প্রতি নজর দিলেও যন্ত্র বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে শিল্পবাণিজ্য আধুনিকীকরণের কোন চেষ্টা হয়নি।

স্বতন্ত্র রাজ্যগঠনের প্রবণতা। দুর্বল কেন্দ্রীয় শাসনে আঞ্চলিক সংহতির উদ্যম

৬টি প্রধান রাজ্য ঃ ইংরেজের প্রাধান্য বিস্তারে বাধা

প্রধান আঞ্চলিক রাজ্যসমূহ

(ক) বাংলা

সমৃদ্ধ সুবা ঃ বাংলা মোগল সাম্রাজ্যের অন্যতম সমৃদ্ধ সুবা বলে খ্যাত ছিল। এখানকার উৎপন্ন প্রচুর খাদ্যদ্রব্য এবং কুটিরশিল্পজাত কার্পাস ও রেশমবস্ত্র বিদেশী বণিকদের কাছে লোভনীয় পণ্যরূপ বিবেচিত হত। স্থলপথ ও জলপথে বাণিজ্যের দরুণ রাজকোষে প্রচুর রাজস্ব জমা হত। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লী সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগে মুর্শিদকুলী খাঁ এবং আলিবর্দী খাঁ কার্যত বাংলাকে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করেন। ১৭০১ খৃস্টাব্দে ঔরঙ্গজেব সুযোগ্য কর্মচারী মুর্শিদকুলী খাঁকে সুবে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। সে সময়ে আজিম্-উশ্-শান বাংলার নবাব নাজিম অর্থাৎ সম্রাটের প্রতিনিধি শাসক। তখন নবাব নাজিম ও দেওয়ান দুইটি পৃথক স্বাধীন পদ ছিল। মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলাদেশে রাজস্ব আদায়ের ও জমি বিলির সুবন্দোবস্ত করেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতির ফলে দেশের মালগুজারী বাবদ প্রতি বছর ১ কোটি টাকা ঔরঙ্গজেবকে পাঠাতেন। এ কারণে দক্ষিণ ভারতে যুদ্ধ পরিচালনায় অর্থাভাবগ্রস্ত ঔরঙ্গজেব মুর্শিদকুলী খাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

কৃষি ও কুটিরশিল্প জাত দ্রব্যের জন্য বাংলা খ্যাত ছিল; রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার; মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত

আজিম-উশ্-শানের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় মুর্শিদকুলী খাঁ রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের নিয়ে রাজধানী ঢাকা থেকে মুখসুদাবাদে তাঁর দপ্তর স্থানান্তরিত করেন। ১৭১৩ খৃস্টাব্দে সম্রাট ফারুকশিয়র মুর্শিদকুলী খাঁকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত করেন। তখন থেকে মুখসুদাবাদের নাম পরিবর্তিত হয়ে তাঁর নাম অনুসারে **মুর্শিদাবাদ** হয় এবং ইহা হয় বাংলার রাজধানী।

মোগল সাম্রাজ্যের টলায়মান অবস্থায় দেশের জমিদারদেরও মধ্যে প্রাধান্য লাভের প্রচেষ্টা দেখা দেয়। সীতারাম রায়, উদয়নারায়ণ প্রমুখ জমিদার বিদ্রোহ করলে মুর্শিদকুলী খাঁ কঠোর হস্তে তা দমন করে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। মুর্শিদকুলী খাঁ এবং পরবর্তী শাসকগণও দেশীয় ও বিদেশী বণিকদের বাণিজ্যে উৎসাহ দিতেন কারণ তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন, আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির সহায়ক। পুলিশ-থানা ও চৌকি স্থাপন করে স্থলপথে ও জলপথে দস্যুর উপদ্রব নিবারণের ব্যবস্থা হয়, কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য বন্ধ করে এবং বিদেশী বাণিজ্য কোম্পানিগুলির ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বহাল রেখে মুর্শিদকুলী খাঁ ন্যায়পরায়ণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসকের পরিচয় দিয়েছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আজীবন এক-ধর্মপত্নীনিষ্ঠ থেকে তিনি সেযুগের মুসলিম শাসকদের মধ্যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলাস্থাপন, জমিদার বিদ্রোহ দমন; বাণিজ্যপথ দস্যুর উপদ্রবমুক্ত; বাণিজ্য কোম্পানিগুলির ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ; মুর্শিদকুলী ন্যায়নিষ্ঠ শাসক উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী

সুজাউদ্দীন ও আলিবর্দী খাঁ: মুর্শিদকুলী খাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন উড়িষ্যার ছোট নবাব ছিলেন। মুর্শিদকুলীর পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁর মৃত্যুর (১৭২৭) পর সুজাউদ্দীন বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। সুজাউদ্দীনের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ বাংলার নবাব হন। তিনি অপদার্থ, দুর্বলচিত্ত ও অত্যাচারী ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণ সরফরাজের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠেন। সেই সুযোগে বিহারের ছোট নবাব আলিবর্দী খাঁ বাংলা আক্রমণ করেন এবং সরফরাজকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে বাংলার মসনদ অধিকার করেন (১৭৪০ খৃঃ)।

মুর্শিদকুলীর জামাতা সুজাউদ্দীন বাংলার নবাব; সুজাউদ্দীনের পুত্র সরফরাজ খাঁ আলিবর্দী কর্তৃক নিহত; আলিবর্দীর সিংহাসন দখল

আলিবর্দী খাঁর শাসন: আলিবর্দী খাঁ ১৬ বৎসর (১৭৪০—১৭৫৬ খৃঃ) কার্যতঃ স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করেন। তিনি শক্তিমান যোদ্ধা এবং যোগ্য শাসক ছিলেন। বহু যোগ্য হিন্দু কর্মচারীকে রাজকার্যে নিযুক্ত করে তিনি গুণের মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাঁর শাসনকালে ৯ বৎসরকাল মারাঠা বর্গীদের লুণ্ঠন ও

যোদ্ধা এবং যোগ্য শাসক; বর্গীর হাঙ্গামা বন্ধ করতে ১২

লক্ষ টাকা চৌথ দিতে সম্মত হয়ে সন্ধি স্থাপন; ইংরেজ বণিকদের কার্যকলাপের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি

অত্যাচারে জনসাধারণের অশেষ দুর্দশা হয়েছিল। মারাঠা নায়ক ভাস্কর পণ্ডিতকে ছলনা করে হত্যা করেও বর্গীদের লুঠপাট বন্ধ করা যায়নি। অবশেষে উড়িষ্যার কিছু অংশ এবং বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ দিতে স্বীকার করে মারাঠাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করা হয়। ইংরেজ বণিকদের প্রতি আচরণে আলিবর্দী দূরদৃষ্টি ও রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৭৫৬ খৃস্টাব্দে ৮২ বৎসর বয়সে আলিবর্দী খাঁর মৃত্যু হয়।

সিরাজউদ্দৌলা (১৭৫৬—১৭৫৭ খৃঃ)ঃ নবাব আলিবর্দী খাঁর দৌহিত্র রাজকার্যে অভিজ্ঞতাবিহীন যুবক সিরাজউদ্দৌলা বিনা বাধায় সিংহাসনে আরোহণ করলেন (৯ এপ্রিল, ১৭৫৬ খৃঃ)। জ্যেষ্ঠ মাসিমা ঘসিটি বেগম, মাসতুত ভাই পূর্ণিয়ার নবাব সৌকৎ জঙ্গ এবং আলিবর্দীর ভগ্নীপতি মীরজাফর আলি খাঁ—প্রত্যেকেই সিংহাসনের প্রতি লোভবশতঃ সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। দেওয়ান রাজবল্লভ ঘসিটি বেগমের সমর্থক ছিলেন। এই গৃহশত্রুদলের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যোগ দেওয়ায় সিরাজের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী চক্র গড়ে উঠেছিল।

তরুণ সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসন লাভ; চক্রান্তকারী স্বজন এবং লোভী ইংরেজ কোম্পানির সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

(খ) হায়দরাবাদ

রাজ্য প্রতিষ্ঠাতাঃ নিজাম-উল-মুলক্ আসফ জা ১৭২৪ খৃস্টাব্দে হায়দরাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী মোগল দরবারে নিজাম-উল-মুলক একজন প্রতিপত্তিশালী অমাত্য ছিলেন। রাজদরবারে যখন ক্ষমতা লাভের জন্য রেষারেষি চলছিল তখন তুরাণীদলের নায়ক নিজাম-উল-মুলক সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতন ঘটাতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং কৃতজ্ঞ সম্রাট মহম্মদ শাহের কাছ থেকে পুরস্কার স্বরূপ দাক্ষিণাত্যের ভাইসরয় বা শাসকের পদ লাভ করেন। ১৭২০ থেকে ১৭২২ খৃস্টাব্দের মধ্যে তিনি দাক্ষিণাত্যে সকল প্রকার বিক্ষোভ প্রতিবন্ধক কঠোর হস্তে দমন করে দক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ১৭২২ থেকে ১৭২৪ খৃস্টাব্দে পর্যন্ত তিনি দিল্লী সম্রাটের উজির বা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন কিন্তু সাম্রাজ্য ভাঙন রোধ করার জন্য তাঁর সকল সংস্কার প্রচেষ্টা অন্যান্য অমাত্যদের প্রতিরোধে এবং সম্রাটের অস্থির চিত্ততার জন্য ব্যর্থ হয়। অবশেষে দিল্লী পরিত্যাগ করে তিনি দাক্ষিণাত্যে নিজের প্রাধান্য রক্ষার পরিকল্পনায় হায়দরাবাদ রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লীর আধিপত্য অগ্রাহ্য করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নি কিন্তু নিজ রাজ্য সম্বন্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

নিজাম-উল-মুলক হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা; দূরদর্শী কূটনীতিক, দক্ষ শাসক, দিল্লীর শাসন প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য না করলেও কার্যতঃ স্বাধীন

শান্তি স্থাপন, কর্মচারীদের জাগীর দান প্রভৃতি কাজ সম্রাটের অনুমোদন ছাড়াই স্বাধীনভাবে করতে থাকেন।

নিজাম-উল-মুলক্ ধর্ম নিরপেক্ষ উদার নীতি অনুসরণ করে রাজ্যে সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। যোগ্য হিন্দু কর্মচারী পূরণচাঁদ ছিলেন তাঁর রাজ্যের দেওয়ান। রাজস্ব ব্যবস্থায় দুর্নীতি দমন করে এবং মারাঠাদের হাঙ্গামা থেকে রাজ্য মুক্ত রেখে নিজাম প্রজাকল্যাণকারী যোগ্য শাসকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৭৪৮ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে সিংহাসনের দাবীদারদের মধ্যে কলহ এবং অস্থির রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি হয়, যার ফলে ইংরেজ ও ফরাসী শক্তি দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পায়।

ধর্ম নিরপেক্ষ উদার নীতি; রাজস্ব ব্যবস্থায় দুর্নীতি দমন; ভারতীয়দের আত্মকলহে বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপের সুযোগ

(গ) মহীশূর

রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা: বিজয়নগর রাজ্যের পতনের পর রাজা ওদেয়ার (১৫৭৮-১৬১৭ খৃঃ) মহীশূর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, শ্রীরঙ্গপত্তম হয় রাজধানী। এই বংশের রাজা চিক্কদেব পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অধিকার করে রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেব বিজাপুর গোলকুণ্ডা জয় করে দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তার করলে চিক্কদেব তাঁর অধীনতা স্বীকার করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মহীশূর রাজের দুই মন্ত্রী নঞ্জরাজ (সর্বাধিকারী বা প্রধানমন্ত্রী) এবং দেবরাজ (দালবাই বা দেওয়ান) রাজ্যের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করে রাজা চিক্কদেবকে হাতের পুতুলে পরিণত করেন। হায়দার আলি মহীশূর রাজ্যের সামান্য সামরিক কর্মচারী ছিলেন। রাজ্য যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়লে দক্ষতা, সাহস ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে তিনি সৈন্যবিভাগে উচ্চপদ অধিকার করেন। পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষিত ও আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদলের কার্যকারিতা উপলব্ধি করে তিনি নিজের অধীন সেনাবাহিনী আধুনিক সামরিক কায়দায় প্রশিক্ষণ দিয়ে শক্তিশালী করে তোলেন। ফরাসী বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় তিনি দিন্দিগুলে আধুনিক অস্ত্রাগার স্থাপন করেছিলেন (১৭৫৫ খৃঃ)। ১৭৬১ খৃস্টাব্দে তিনি প্রধানমন্ত্রী নঞ্জরাজকে অপসারিত করে মহীশূর রাজ্যের ওপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে পলিগার (জমিদার) গণ বিদ্রোহ করলে হায়দার আলি তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং বেদনোর, সুন্দা, মালাবার প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করে মহীশূর রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন করেন। একটি দুর্বল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত রাজ্যকে হায়দার আলি

পুরাতন বিজয়নগর রাজ্যের কিছু অঞ্চল নিয়ে মহীশূর রাজ্য গঠিত হয়; রাজা চিক্কদেব ঔরঙ্গজেবের অধীনতা স্বীকার করেন; দুই হিন্দু মন্ত্রীকর্তৃক রাজার ক্ষমতা অধিকৃত; হায়দার আলির উত্থান, মহীশূর অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রে পরিণত, দক্ষিণ ভারতে প্রাধান্যের জন্য নিজাম, মহীশূর, মারাঠা ও ইংরেজদের দ্বন্দ্ব

দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রধান রাজ্যে পরিণত করেন। শাসনকার্যে তিনি ধর্ম নিরপেক্ষতা পালন করতেন; তাঁর প্রথম দেওয়ান এবং অন্যান্য অনেক কর্মচারী হিন্দু ছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের দাক্ষিণাত্য সুবার প্রধান শাসক হিসাবে নিজাম মহীশূরের ওপর নীতিগত কর্তৃত্ব দাবি করতেন কিন্তু সামরিক শক্তি ব্যতীত কোন রাজ্যই নিছক নীতি মানতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে নিজাম, মহীশূর, মারাঠা ও ইংরেজদের মধ্যে প্রাধান্য লাভের জন্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে।

(ঘ) অযোধ্যা

রাজ্য প্রতিষ্ঠা: ১৭২২ খৃস্টাব্দে সাদাৎ খাঁ বুরহান-উল-মুলক দিল্লী সম্রাট মহম্মদ শাহ কর্তৃক অযোধ্যা প্রদেশের শাসক নিযুক্ত হন এবং স্বতন্ত্র অযোধ্যা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লী সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জমিদারগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন এবং রাজস্বকর দিতে অস্বীকার করেন। তাঁরা ব্যক্তিগত সৈন্যদল গঠন ও নিজ নিজ এলাকায় দুর্গ নির্মাণ করে রাজকীয় আদেশ অমান্য করতে থাকেন। সাহসী, দৃঢ়চেতা সাদাৎ খাঁ কঠোর-হস্তে অরাজকতা দমন করে জমিদারদের বিদ্রোহ চূর্ণ করেন এবং রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। তিনি বিদ্রোহী ভূস্বামীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না করে নিয়মিত রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার সাপেক্ষে জমিদারি পূর্বতন মালিকদের প্রত্যার্পণ করেছিলেন। কঠোরতা, রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির প্রয়োগে রাজ্যে সুস্থির শাসন ও অর্থনৈতিক উন্নতির সূত্রপাত সাদাৎ খাঁর বিশেষ কৃতিত্ব। ১৭২৩ খৃস্টাব্দে নতুন রাজস্ব বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে কৃষকদের ওপর ন্যায্য কর নির্ধারণের ব্যবস্থা করেন এবং চাষী যাতে জমিদারের অত্যাচার থেকে রক্ষা পায় সেদিকে নজর দেন।

সাদাৎ খাঁ অযোধ্যা প্রদেশের জমিদার বিদ্রোহ ও অরাজকতা দমন করে অযোধ্যারাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। নতুন রাজস্ব বন্দোবস্ত দ্বারা চাষীকে জমিদারের অত্যাচার থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়

দূরদর্শী শাসক: রাজ্যশাসন ও কর্মচারী নিয়োগ ব্যাপারে সাদাৎ খাঁ হিন্দু-মুসলমান কোন বৈষম্য করেন নি। অসামরিক শাসন ও সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদে অনেক যোগ্য হিন্দু কর্মচারী নিযুক্ত ছিল; অবাধ্য জমিদার ও অমাত্যদের শাস্তিবিধানের ব্যাপারেও তিনি হিন্দু-মুসলমানে কোন পক্ষপাতিত্ব বা তারতম্য দেখাননি। উপযুক্ত বেতন, উত্তম অস্ত্রশস্ত্র ও যথোচিত সামরিক ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে নবাব শক্তিশালী সুশৃঙ্খল সৈন্যদল গড়ে তুলেছিলেন। দক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে তিনি বস্তুত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন এবং অযোধ্যাকে বংশানুক্রমিক রাজ্যে পরিণত করেন।

হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী অযোধ্যা বংশানুক্রমিক রাজ্যে পরিণত

সফদর জং: ১৭৩৯ খৃস্টাব্দে সাদাৎ খাঁ-এর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র

সফদর জং অযোধ্যার সিংহাসন লাভ করেন। অযোধ্যার নবাব পদ ছাড়াও তিনি ১৭৪৮ খৃস্টাব্দে দিল্লী সাম্রাজ্যের উজিরের পদ এবং এলাহাবাদ প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হন। সফদর জং-এর শাসনকালে জমিদার বিদ্রোহ ও বাইরের শত্রুর আক্রমণে জনজীবনের শান্তি বিঘ্নিত হয়। তিনি জমিদারদের অবাধ্যতা নির্মমভাবে দমন করেন এবং মারাঠাদের অভিযান উপদ্রব থেকে দেশ রক্ষা করার জন্য সর্দারদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেন। শুধু মারাঠাবর্গীর উৎপাত থেকে মুক্তি নয়, তিনি ১৭৫০-৫১ খৃস্টাব্দে রোহিলা ও বঙ্গাশ পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মারাঠা ও জাঠ সৈন্যের সাহায্য লাভ করেছিলেন। সৈন্য সাহায্যের প্রতিদানে মারাঠাদের প্রতিদিন ২৫ হাজার টাকা এবং জাঠদের দৈনিক ১৫ হাজার টাকা দিতে হয়েছিল। উজির হিসাবে আহম্মদ শাহ্ আবদালীর আক্রমণ থেকে মোগল সাম্রাজ্য রক্ষা করার অভিপ্রায়ে তিনি মহারাষ্ট্রের পেশোয়ার সঙ্গে সাহায্য-চুক্তির পরিকল্পনা করেছিলেন। এইরূপ শর্ত স্থির হয়েছিল যে পেশোয়াকে ৫০ লক্ষ টাকা এবং পাঞ্জাব সিন্ধুসহ কয়েকটি জেলার চৌথ অধিকার ও আজমীর ও আগ্রার শাসনভার দেওয়া হবে। মোগল দরবারে সফদর জং-এর বিরোধী অমাত্যরা ভেবেছিল মারাঠাদের বন্ধুত্ব সাহায্য লাভ করলে উজির সফদর জং অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে উঠবেন, তাই পেশোয়াকে অযোধ্যা ও এলাহাবাদের শাসনকর্তার পদ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে সফদর জং-পেশোয়া চুক্তি বানচাল করে দেওয়া হয়। পেশোয়া অধিকতর লাভের আশায় সফদর জং-এর শত্রুপক্ষে যোগ দেন কিন্তু তাতে সুফল পাওয়া যায়নি।

সকল কূটনৈতিক, সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক উদার শাসক, কারুশিল্পের উৎসাহদাতা; কূটবুদ্ধিবলে রোহিলা ও বঙ্গাশ পাঠানদের বিরুদ্ধে অর্থের প্রতিদানে মারাঠা ও জাঠসৈন্যের সাহায্য লাভ; পেশোয়ার সঙ্গে আহম্মদ শাহ আবদালীর আক্রমণ থেকে রক্ষার চুক্তি ব্যর্থ

(ঙ) শিখদের উত্থান

গুরু নানক (১৪৬৯—১৫৩৮ খৃঃ): লাহোরের নিকট তালবন্দী (বর্তমান নাম নানকানা) নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে শুভ পূর্ণিমা তিথিতে নানকের জন্ম। পিতার নাম কালু এবং মাতার নাম ত্রিপতা। এঁরা ছিলেন ক্ষত্রিয়। পিতা কালু জাতিতে জাঠ; কৃষি ও সামান্য ব্যবসা দ্বারা জীবিকা অর্জন করতেন। বাল্যকাল হতেই নানক চিন্তাশীল, মিতভাষী ও সাধু-সজ্জনসেবায় অনুরাগী ছিলেন। পাঠশালায় তিনি সংস্কৃত ও পারসী ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি বলে তিনি ভাবপূর্ণ কবিতা রচনা করতে পারতেন। বিশ্বময় ঈশ্বরের মহিমায় মুগ্ধ নানক বিশ্বস্রষ্টাকে উপলব্ধি করার জন্য আকুল হন। কোন্ পথ তিনি অবলম্বন করবেন কোন্ ধর্মমত শ্রেয়ঃ তা জানার জন্য তিনি ফকিরের বেশে ভারতবর্ষের

নানক বাল্যকাল থেকেই মিতভাষী, সাধুসেবাপরায়ণ; স্বভাবকবি ঈশ্বরপ্রেমিক নানক ফকিরবেশে নানাদেশ ভ্রমণ করেছিলেন

সর্বত্র ও ভারতের বাইরে সিংহল, মক্কা, পারস্য, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন। মর্দানা নামক এক অনুরাগী সঙ্গী সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকতেন। নানক যে সকল শ্লোক ও স্তোত্র রচনা করতেন, সুগায়ক মর্দানা রবাব যন্ত্রসহযোগে তাতে সুর দিয়ে গাইতেন। নানকের ভক্তরা নিজেদের গুরুর শিষ্য বা 'শিখ' বলে অভিহিত করত। ১৫৩৮ খৃস্টাব্দে নানকের দেহত্যাগ হয়।

শিখ সংগঠন ঃ নানক বিশ্বপ্রেম ও একেশ্বরবাদের আদর্শ প্রচার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'সকলের মধ্যে যে জ্যোতিঃ, তা ঈশ্বরেরই জ্যোতিঃ। তাঁর প্রকাশে সকলি প্রকাশিত হয়।' মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর প্রিয়তম শিষ্য গুরু অঙ্গদকে তাঁর শিক্ষাবলী প্রচারের আদেশ দিয়ে যান এবং অঙ্গদ হলেন শিখদের দ্বিতীয় ধর্মগুরু। অঙ্গদের পর ক্রমান্বয়ে আরো ৮ জন শিখগুরু নানকের ধর্মমত জনসমাজে প্রচার করেন। চতুর্থ গুরু রামদাসকে সম্রাট আকবর শিখ ধর্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য অমৃতসরে একটি অতি রমণীয় স্থান দান করেন। এই স্থানে শিখদের বিখ্যাত হরিমন্দির বা স্বর্ণ মন্দির নির্মিত হয়। এই স্থান এখন শিখদের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান।

নানকের বিশ্বপ্রেম ও একেশ্বরবাদের আদর্শ প্রচারের ভার পড়ে দ্বিতীয় অঙ্গদের ওপর। চতুর্থ গুরু রামদাসের সময়ে সম্রাট আকবর অমৃতসরে মন্দির নির্মাণের স্থান দান করেন

ভক্তিধর্ম বীরধর্মে রূপান্তরিত ঃ পঞ্চম গুরু অর্জুনদেব আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে জাগতিক বাস্তববোধের পরিচয় দিয়ে ভক্তদের প্রদত্ত অর্থ মহত্তর কাজের জন্য সঞ্চয় করেন। তাঁর সঙ্গে সম্রাট জাহাঙ্গীরের যে বিবাদ শুরু হয় তার ফল হয়েছিল সুদূর-প্রসারী। বিদ্রোহী মোগল রাজকুমারকে সাহায্যদানের জন্য জাহাঙ্গীর অর্জুনদেবের ২ লক্ষ টাকা জরিমানা করেন এবং গুরু অর্জুন তা প্রদান করতে অস্বীকৃত হলে সম্রাটের আদেশে তাঁকে হত্যা করা হয়।

ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ শান্ত শিখসম্প্রদায়কে ধর্মযোদ্ধারূপে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। অর্জুনদেবের পর গুরুপদে উন্নীত হওয়ার সময় তাকে যখন পূর্বতন গুরুদের কণ্ঠহার ও উষ্ণীষ প্রদান করা হয়, তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বলেন, 'আমার কণ্ঠহার হবে তরবারি-বন্ধনী এবং উষ্ণীষে থাকবে রাজকীয় পক্ষিপালক'। মোগলশাসকের বিরুদ্ধে আত্ম-রক্ষার জন্য তিনি শিখদের সামরিক ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করলেন। মোগলদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে শিখগণ শিবালিক পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহজাহান তাদের দমন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন কিন্তু হরগোবিন্দ আমৃত্যু মোগলদের প্রতিরোধ করেন। ১৬৪৫ খৃস্টাব্দে হরগোবিন্দের মৃত্যু হয়।

ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ শান্তিপ্রিয় শিখসম্প্রদায়কে সামরিক ভ্রাতৃবন্ধনে গঠিত করেন এবং আমৃত্যু মোগলশক্তি প্রতিরোধ করেন

নবম গুরু তেগবাহাদুর মোগলদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের অভিপ্রায়ে আসাম অভিযানে মোগলপক্ষকে সাহায্য করেন কিন্তু আসাম থেকে পাঞ্জাবে ফেরার পর ঔরঙ্গজেবের হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে বিদ্রোহী হন। ঔরঙ্গজেবের হাতে বন্দী হওয়ার পর তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলা হলে তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয় (১৬৭৫ খৃঃ)।

গুরু গোবিন্দ ঃ তেগবাহাদুরের পুত্র দশম এবং শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহ (১৬৭৫—১৭০৮ খৃঃ) শিখ সামরিক শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে হিন্দুদের ওপর যে উৎপীড়ন চলতে থাকে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানর জন্য সমস্ত শিখশক্তিকে তিনি সংহত করতে সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে পাঁচজন মৃত্যু-ভয়হীন বীরকে তিনি নির্বাচন করেন এবং শিখ ধর্মকে এক নতুন রূপ দেন। যার নাম খালসা বা পবিত্র। শিখদের অবশ্যধারণীয় ৫টি প্রতীক নির্দিষ্ট হয়; এদের বলা হয় পঞ্চ 'ক' অর্থাৎ এদের প্রতিটির আদি অক্ষর 'ক' যথা—(১) কেশ, দীর্ঘ শ্মশ্রু ও মাথায় দীর্ঘ কেশ—(২) কজ্ঘ কেঙ্কতিকা ঃ মাথায় ধারণযোগ্য চিরুনি; (৩) কর বা লৌহ নির্মিত কঙ্কণ হাতের বলয়; (৪) কচ্ছঃ অন্তর্বাস এবং (৫) কৃপাণ; তরবারি। এছাড়া প্রত্যেক শিখের নামের সঙ্গে বীরত্বব্যঞ্জক 'সিংহ' পদবি যুক্ত থাকবে। উদার শান্তিপ্রিয় ধর্মশিষ্যদের ধর্মযোদ্ধারূপে প্রস্তুত করা হল। গুরু গোবিন্দের নির্দেশ হল ঃ শিখেরা সিংহের মত তেজস্বী ও মৃত্যু-ভয়হীন হবে এবং সর্বপ্রকার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে প্রয়োজন হলে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেবে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলে সংকল্প সাধনে সংঘবদ্ধ হবে; শিখমাত্রেই সত্যবাদী হবে, টাকা ধার দেবে না, সাধু উপায়ে জীবিকা অর্জন করবে, বিপন্ন বন্ধুকে সাহায্য করবে এবং সময়মত শিখমন্দির 'গুরুদ্বার' দর্শন করবে। গুরু গোবিন্দের শিক্ষায় শিষ্যগণ সাহস ও ধর্মবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মোগলরাজশক্তির সঙ্গে সশস্ত্র লড়াই চালাতে থাকে। যুদ্ধে গুরু গোবিন্দের চার পুত্র নিহত হন এবং গুরুর পর্যায় বন্ধ হয়ে যায়। তখন গোবিন্দ নির্দেশ দেন যে, এরপর থেকে যা কিছু ধর্মাদেশ তা 'আদিগ্রন্থ' থেকে গ্রহণ করতে হবে, অর্থাৎ 'আদিগ্রন্থ' শিখদের সর্বকালের 'গুরু' বলে গ্রহীত হবে।

শান্তিপ্রিয় শিখগণ নির্ভীক ধর্মযোদ্ধায় পরিণত; গুরু গোবিন্দের চার পুত্র নিহত; আদিগ্রন্থ সর্বকালের গুরু বলে ঘোষিত

(চ) মারাঠা জাতির অভ্যুত্থান ও অবনতি

মারাঠা জাতি ঃ তিন দিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা, কেবল পূর্বদিকে খোলা এই পার্বত্য নিকেতন মারাঠাদের রাজ্য। অল্প বৃষ্টিপাত ও অনুর্বর ভূমি মারাঠা দেশের বৈশিষ্ট্য। পাহাড়ময় অঞ্চলে কঠোর পরিশ্রমে জীবিকা অর্জন করার

ফলে অধিবাসীরা কর্মঠ, সাহসী ও মিতব্যয়ী। অনেকক্ষেত্রে নারীদেরও সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য মাঠে শারীরিক কাজ করতে হয়; ভূ-প্রকৃতি অধিবাসীদের মনে আত্মবিশ্বাস আর দৈহিক পটুতা এনে দিয়েছে। এরা বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির কোলে লালিত, স্বাধীনতাপ্রীতি তাদের জন্মগত গুণ। যোদ্ধা হিসাবে মারাঠারা কষ্টসহিষ্ণু, পাহাড়-পর্বতে চলফেরায় এবং অতর্কিত আক্রমণে শত্রুকে বিপন্ন করতে পটু।

মারাঠারা কর্মঠ, সাহসী, মিতব্যয়ী, দুর্গম অঞ্চলে যুদ্ধে নিপুণ; প্রাচীন ভারতে রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তিতে জয়ী হয়েছিলেন

প্রাচীনকালে মারাঠারা যুদ্ধে নিজেদের শক্তির পরিচয় দিয়েছে। সপ্তম শতাব্দীতে রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী উত্তর ভারতের সম্রাট হর্ষবর্ধনকে নর্মদা তীরে প্রতিহত করেছিলেন। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ মারাঠাদের সম্বন্ধে বলেছেন, এরা 'শক্তি-গর্বিত ও যুদ্ধপ্রিয়, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ কিন্তু অন্যায়ের প্রতিশোধে বদ্ধপরিকর।' জাতি হিসাবে মারাঠারা সরল, মনখোলা, স্বাধীনচেতা, উদার, ভদ্র এবং সদ্ব্যবহার পেলে বিশ্বস্ত। বুদ্ধি ও শৌর্য এ জাতির স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

স্বাধীনতা লোপ ঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলমান অভিযানের ফলে মারাঠারা মধ্য ও সমতল দাক্ষিণাত্য অংশ থেকে পশ্চিম ঘাটের বন-পাহাড়ময় অঞ্চলে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এখানে প্রকৃতিকর্তৃক সুরক্ষিত দুর্গম ছোট ছোট উপত্যকায় মারাঠা সর্দারগণ কোন রকমে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল। আহম্মদনগর ও বিজাপুরের শাসকগণ তাদের ওপর খুব একটা বড় নজর দেয়নি; কখনো কখনো বা নামমাত্র আনুগত্য স্বীকার করেই সর্দারগণ ক্ষুদে সামন্তের মত নিজ নিজ অঞ্চলে প্রভুত্ব করত। মহারাষ্ট্রের অপেক্ষাকৃত সুগম এবং উর্বর অঞ্চলে রাজ্য ভাঙাগড়ার আলোড়ন অব্যাহত ছিল।

চতুর্দশ শতাব্দীতে মারাঠাদের রাজ্য মুসলিমদের অধিকারে যায়, সমতল উর্বর অংশ ছেড়ে মারাঠা সর্দারগণ দুর্গম অঞ্চলে আশ্রয় নেয়

সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক ঐক্য সাধিত হওয়ার আগেই ভাষা, ধর্ম ও সমাজ জীবনধারা অধিবাসীদের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করেছিল। শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতি নতুন উদ্যমে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করে ভারত ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল।

শিবাজী (১৬২৭—১৬৮০ খৃঃ) ঃ শাহজী ভোঁসলে ও জিজাবাঈ-এর পুত্র শিবাজী জুনারের নিকট শিবনের নামক দুর্গে ১৬২৭ খৃস্টাব্দে (১০ এপ্রিল) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিজাপুর সুলতানের অধীনে চাকুরি নিয়ে দ্বিতীয় পত্নীসহ নতুন জাগীরে চলে গেলে শিবাজী দাদাজী কোণ্ডদেব নামক এক ব্রাহ্মণের অভিভাবকত্বে মাতার সঙ্গে পুনায় বসবাস করতে থাকেন। প্রাচীন ভারতের বীরদের কাহিনী ও মহৎ জীবনকথা

বাল্যকাল ঃ পিতৃসাহচর্য থেকে বঞ্চিত, মাতা ও অভিভাবকের প্রভাবে সাহসী, কর্মঠ জীবনগঠন; স্বাধীন রাজ্য-স্থাপনের সঙ্কল্প

শুনিয়ে ধর্মপরায়ণা জননী জিজাবাঈ বালক শিবাজীর মনে স্বদেশপ্রেম ও হিন্দুধর্ম রক্ষার বাসনা জাগিয়ে কোণ্ডদেবের প্রভাব শিবাজীকে সাহসিকতার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মাতা ও অভিভাবকের প্রভাব শিবাজীর মনে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের সঙ্কল্প উদ্দীপ্ত করেছিল। পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় (মাওল দেশের) মাওলী উপজাতির লোকেদের সাথে অন্তরঙ্গতার ফলে তিনি সাহসী বিশ্বস্ত অনুচর ও সৈনিকের সাহায্য লাভ করেছিলেন। শিবাজী পুঁথিগত শিক্ষা পেয়েছিলেন কিনা জানা যায় না, কিন্তু বিদেশীর কবল থেকে দেশ উদ্ধার করার বাসনায় সৈনিকের কঠোর ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

শিবাজীর রাজ্যস্থাপন: ১৯ বৎসর বয়সে শিবাজী তোরণা গিরিদুর্গ অধিকার করে তার নিকটে রায়গড় দুর্গ নির্মাণ করেন। ক্রমে আরো কয়েকটি ছোট খাট গিরিদুর্গ দখল করে তিনি একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করলেন। দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগে শিবাজী কোঙ্কন ও জাওলি রাজ্য হস্তগত করলে বিজাপুরের সুলতান তাঁকে দমন করার জন্য এক বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ সেনাপতি আফজল খাঁকে পাঠান। সন্ধি করার অভিপ্রায়ে শিবাজীর সাথে এক নির্দিষ্ট স্থানে সাক্ষাৎকারের সময় আফজল খাঁ তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করলে শিবাজী 'বাঘনখ' নামক লোহার গুপ্ত অস্ত্র ও 'বিছুয়া' নামক তীক্ষ্ণ ছুরি দ্বারা আফজল খাঁকে হত্যা করেন। শিবাজীর সৈন্যদের হাতে আফজল খাঁর সমস্ত সৈন্য নিহত হয়।

বিজাপুর সুলতানের সেনাপতি আফজল খাঁ: শিবাজীর সঙ্গে সন্ধি করার অজুহাতে হত্যা করার চেষ্টা করলে শিবাজীর গোপন অস্ত্রাঘাতে নিহত

মোগলের সঙ্গে শিবাজীর দ্বন্দ্ব: বিজাপুর রাজ্যের কিছু অংশ অধিকার করে শিবাজী রাজ্যের পরিধি বাড়াতে চেষ্টা করতে থাকেন। শিবাজীর সৈন্যদল মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে লুঠপাট করতে থাকলে সম্রাট ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে দমন করার জন্য তাঁর মাতুল শায়েস্তা খাঁকে ও পরে শাহজাদা মোয়াজ্জেমকে পাঠালেন। তাঁরা অকৃতকার্য হলে সম্রাটের নির্দেশে রাজপুতরাজ জয়সিংহ এসে কয়েকটি দুর্গ দখল করেন। তখন শিবাজী মোগলের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে ঔরঙ্গজেবের আমন্ত্রণে আগ্রা গমন করেন। আগ্রায় শিবাজীর কোন বিপদ হবে না, জয়সিংহ এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের ওপর শিবাজীর দেখাশোনার ভার ছিল। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের কৌশলে শিবাজীকে আগ্রায় বন্দী করে রাখেন। অদ্ভুত চাতুরি ও সাহসের পরিচয় দিয়ে শিবাজী পলায়ন করে স্বদেশে ফিরে আসেন। অবশেষে

মোগলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব; জয়সিংহের মধ্যস্থতায় সন্ধিস্থাপন; ঔরঙ্গজেবের আমন্ত্রণে আগ্রায় গেলে শিবাজী বন্দী; কৌশলে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন; ঔরঙ্গজেব কর্তৃক শিবাজীর স্বাধীনতা স্বীকার; 'ছত্রপতি' উপাধি ধারণ, অভিষেক (১৬৭৪ খৃঃ); মৃত্যু ১৬৮০ খৃঃ; কৃতিত্ব স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা

ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে স্বাধীন রাজা বলে স্বীকার করেন। ১৬৭৪ খৃস্টাব্দে শিবাজী **'ছত্রপতি'** উপাধি ধারণ করে মহাসমারোহে রাজধানী রায়গড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। **একটি** স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং মারাঠা জাতিকে একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করা শিবাজীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ১৬৮০ খৃস্টাব্দে ৫৩ বৎসর বয়সে শিবাজীর মৃত্যু হয়।

শিবাজীর আসল কৃতিত্ব: শিবাজীর মহৎ জীবন ও সাফল্যের ভিত্তি ছিল তাঁর চরিত্র ও বাস্তব কর্মক্ষমতা। অপরের চরিত্র নিরূপণে সুনিশ্চিত অন্তর্দৃষ্টি, ব্যবস্থাপনায় তৎপরতা যেকোন অবস্থায় কতখানি সম্ভব এবং সর্বাধিক লাভজনক তা সঠিক নির্ণয়ের প্রবণতা শিবাজীর জীবনে সাফল্যের মূল কারণ। এই সকল গুণের জন্য শক্তিশালী মোগল সম্রাটের প্রতিরোধ সত্ত্বেও ছোট এক জাগীরদার থেকে বাহুবলে স্বাধীন রাজ্য-স্থাপন করে অপরিসীম সাহস, রণকৌশল ও রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। **খণ্ড বিচ্ছিন্ন মারাঠা জাতিকে এক শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করা শিবাজীর গৌরবময় কৃতিত্ব।** তাঁর নাম মন্ত্রের মত কাজ করে মারাঠা জাতিকে এক নতুন জীবনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর মৃত্যুর নয় বৎসরের মধ্যেই তাঁর রাজ্যে ভাঙন ও এলোমেলো অবস্থা শুরু হয়। কিন্তু তাঁর জীবনের অবিনাশী কৃতিত্ব হল মারাঠাদের এক জাতিতে রূপান্তরকরণ এবং তাঁর সর্বাধিক মূল্যবান উত্তরাধিকার হল দেশবাসীর মধ্যে সঞ্চারিত তেজস্বিতা।

সাফল্যের ভিত্তি—চরিত্র ও বাস্তব কর্মক্ষমতা; বিচ্ছিন্ন মারাঠাজাতিকে এক ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী জাতিতে পরিণতকরণ; সর্বাধিক মূল্যবান উত্তরাধিকার—দেশবাসীর মধ্যে সঞ্চারিত তেজস্বিতা

শিবাজীর উত্থানের **পূর্বে** মারাঠা জাতি পরমাণুর মত দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। শিবাজী এদের এক শক্তিমান জাতিতে সংহত করেন। এই জাতিনির্মাণ কাজে তাঁর বিরুদ্ধে শক্তিরূপে সক্রিয় ছিল মোগলসাম্রাজ্য, বিজাপুর, পর্তুগীজ ভারত এবং জাঞ্জিরার আবিসিনিয়ানগণ। বর্তমানকালে অন্য কোন হিন্দু এরূপ সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় দেননি।* বিজাপুর ও দিল্লীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শিবাজীই প্রথমে দেখান, তাঁদের পক্ষে স্বাধীনভাবে যুদ্ধের নায়ক হওয়া সম্ভব। পরে রাজ্যস্থাপন **করে** তিনি দেখালেন, তাঁর লোকেরা রাজ্য পরিচালনায় সক্ষম। নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, হিন্দুরা জাতি গঠন করতে পারে, রাজ্যস্থাপন করতে পারে, শত্রুকে পরাজিত করে

প্রবল প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে জাতিগঠন; যুদ্ধ, রাজ্যস্থাপন, রাজ্যপরিচালনা, দেশরক্ষা, শত্রুর প্রতিরোধ, শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্যের উন্নতি, বিদেশীর সমকক্ষ নৌশক্তি ও বাণিজ্য বহর গঠন—শিবাজীর কৃতিত্ব: বর্তমান হিন্দুদের পরিপূর্ণ বিকাশের পথপ্রদর্শন

* No other Hindu has shown such constructive genious in modern times ..He taught the modern Hindus to rise to the full stature of their growth
Sir J. N. Sarkar – *Hist. of Aurangzib* Vol. IV. p. 269

দেশরক্ষা করতে পারে; তারা সাহিত্য, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারে, নিজেদের নৌশক্তি ও বাণিজ্যবহর গড়ে তুলে বিদেশীর সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিতে পারে। তিনি বর্তমান হিন্দুদের তাঁদের শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের পথ দেখিয়েছেন।

শিবাজীর বংশধর ঃ শিবাজীর মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভুজী এবং কনিষ্ঠ পুত্র রাজারামের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। অমাত্য এবং সৈন্যদল দুই পক্ষে ভাগ হয়ে যায়। অবশেষে শম্ভুজী সিংহাসন লাভ করেন এবং মোগলের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। মোকারব খাঁ নামে এক মোগল সেনাপতি অতর্কিত আক্রমণে তাঁকে বন্দী করেন। ঔরঙ্গজেব নানাভাবে নির্যাতন করে ২৫ জন সঙ্গীসহ শম্ভুজীকে হত্যা করেন। পরে মোগলদের আক্রমণে রাজধানী রায়গড় অধিকৃত হয় (১৬৮৯), শম্ভুজীর শিশুপুত্র সাহু ধৃত হন এবং মোগল দরবারে প্রতিপালিত হতে থাকেন। এর পর শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারাম সিংহাসনে আরোহণ করে অস্থায়ী রাজধানী কোলাপুর থেকে মোগল শক্তির প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেন। রাজারামের মৃত্যু হলে তাঁর বিধবা পত্নী তারাবাঈ নাবালক পুত্র দ্বিতীয় শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন করেন এবং তাঁর অভিভাবিকারূপে তেজস্বিতার সঙ্গে রাজ্য রক্ষা ও মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তারাবাঈ-এর নেতৃত্বে মারাঠাশক্তি আবার প্রবল হয়ে ওঠে।

শিবাজীর দুই পুত্র শম্ভুজী ও রাজারামের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে কলহ; শম্ভুজীর সিংহাসন লাভ; মোগলের হাতে ধৃত ও নিহত; রাজধানী রায়গড়ের পতন (১৬৮৯): শম্ভুজীর শিশুপুত্র সাহু বন্দী অবস্থায় ঔরঙ্গজেবের দরবারে পালিত; শিবাজীর দ্বিতীয়পুত্র রাজারাম এবং পরে শিশুপুত্র ৩য় শিবাজীর অভিভাবিকা রানীমাতা তারাবাঈ তেজস্বিতার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করেন

সাহু ঃ শিবাজীর পৌত্র সাহু ১৬৮৯ খৃস্টাব্দ থেকে ঔরঙ্গজেবের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেব সাহু এবং তাঁর জননীকে রাজকীয় মর্যাদায় এবং তাঁদের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রয়োজন মিটানর বন্দোবস্ত করে যত্নসহকারে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর হয়ত মহারাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এ ইচ্ছা পূরণ হওয়ার আগেই ১৭০৭ খৃস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। পরবর্তী সম্রাট শাহ আলম (বাহাদুর শাহ) সাহুকে মুক্তি দেন। ১৭০৭ খৃস্টাব্দে সাহু মহারাষ্ট্রে ফিরে সাতারা অধিকার করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এদিকে শম্ভুজীর মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজারাম সিংহাসন অধিকার করেছিলন। রাজারামের মৃত্যুর পর রাণী তারাবাঈ শিশুপুত্র দ্বিতীয় শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন করে অভিভাবিকারূপে

ঔরঙ্গজেবের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত সাহু সম্রাটের মৃত্যুর পর মুক্তি পেয়ে মহারাষ্ট্রে ফিরে আসেন; তারাবাঈ-এর সঙ্গে সিংহাসন নিয়ে গৃহযুদ্ধ; বালাজী-বিশ্বনাথের সহায়তায় রাজ্যলাভ

রাজ্যশাসন ও মোগলের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রেখেছিলেন। সাহু ফিরে আসায় রাজ্যের দুই দাবিদার—সাতারার সাহু এবং কোলাপুরের তারাবাঈ গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হলেন। এই রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগে মারাঠা রাজ্যের সর্দারগণ, যাদের প্রত্যেকেরই অনুগত কিছুসংখ্যক করে সৈন্য ছিল, নিজেদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির আশায় কেউ সাহুর পক্ষে, কেউ বা তারাবাঈ-এর পক্ষে যোগ দেয়। কতক আবার দাক্ষিণাত্যের মোগল শাসনকর্তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। এইভাবে সাহুর অবস্থা যখন টলটলায়মান তখন বালাজী বিশ্বনাথ নামক এক বিশ্বস্ত মন্ত্রী কূটবুদ্ধি বলে সাহুর সমর্থক সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাঁকে রাজ্যলাভে সহায়তা করেন। পুরস্কার-স্বরূপ সাহু বালাজী বিশ্বনাথকে **'পেশোয়া'** বা মুখ প্রধান (প্রধানমন্ত্রী) নিযুক্ত করেন (১৭১৩ খৃঃ)।

পেশোয়াতন্ত্র মহারাষ্ট্রে নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা

বালাজী বিশ্বনাথঃ কোঙ্কন প্রদেশের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ বালাজী বিশ্বনাথ এক সাধারণ রাজস্ব কর্মচারীরূপে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। ক্রমে দক্ষতাগুণে উচ্চপদ অধিকার করেন এবং সাহু স্বদেশে ফিরে এলে তাঁর শত্রুদের দমনে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অনুগত সেবাদ্বারা সাহুকে জয়যুক্ত করেন।

কোঙ্কন প্রদেশের চিৎপাবন বালাজী বিশ্বনাথ পেশোয়া-রূপে রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। মারাঠ সাম্রাজ্যে পেশো'য়াতন্ত্রের সূত্রপাত হয়

১৮ বৎসর মোগল দরবারে প্রতিপালিত সাহু আচার-ব্যবহারে মুসলমানদের অনুরূপ হয়ে উঠেছিলেন। বিলাসিতায় জীবনযাপনে অভ্যস্ত সাহু শাসনকার্যের দায়িত্ব বালাজী বিশ্বনাথের ওপর ন্যস্ত করে ১৭১৩ খৃস্টাব্দে তাঁকে পেশোয়াপদে নিযুক্ত করেন। বালাজী ক্রমশঃ মহারাষ্ট্রের দক্ষিণাংশ বাদে অন্য সর্বত্র মারাঠা সর্দারদের ওপর সাহুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং শাসন ব্যাপারে অন্যান্য মন্ত্রীদের আড়ালে ফেলে সকল ক্ষমতা নিজহস্তে সংহত করেন। কোলাপুরের দক্ষিণ অঞ্চলে রাজারামের বংশধরেরা রাজত্ব করতে থাকেন। সাতারায় ছত্রপতি সাহু নামেমাত্র রাজা রইলেন, রাজ্যশাসনের প্রকৃত ক্ষমতা বালাজীর করায়ত্ত হল যিনি তাঁর পেশোয়াপদ বংশানুক্রমিক করে মারাঠা সাম্রাজ্যে পেশোয়াতন্ত্র বা নতুন শাসনব্যবস্থার সূত্রপাত করলেন।

মারাঠাশক্তি বৃদ্ধিঃ দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে ঔরঙ্গজেবের পৌত্রদের মধ্যে কলহ ও অমাত্যদের মধ্যে ষড়যন্ত্র চলছিল। কূটবুদ্ধি বালাজী মোগল সাম্রাজ্যের এই দুর্বলতার সুযোগে মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। এর প্রথম ধাপ ছিল মোগলের সঙ্গে মিত্রতা।

বালাজীর কূটনীতিঃ শিবাজীর যে সকল অঞ্চল মোগলরা দখল করে নিয়েছিল, তা ফিরে পাওয়ার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে বালাজী মোগল সম্রাটের

কূটনীতির বলে বালাজী বিশ্বনাথ সম্রাটের সেনাপতির সঙ্গে সন্ধিক্রমে শিবাজীর রাজ্যাংশ সাহু ফিরে পান এবং দাক্ষিণাত্যের ৬টি সুবার চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার লাভ করেন। প্রতিদানে ১৫ হাজার অশ্বারোহী দিয়ে সম্রাটকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি

প্রধান সেনাপতি হোসেন আলির সঙ্গে আপোষ-সন্ধি করেন (১৭১৪ খৃঃ)। সন্ধির শর্ত হয় যে, (১) মোগল অধিকৃত শিবাজীর রাজ্যাংশ সাহু ফেরৎ পাবেন; (২) দাক্ষিণাত্যের ৬টি সুবা থেকে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার মারাঠাদের দেওয়া হবে; প্রতিদানে সাহু, যিনি অন্তত নামে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, মোগল সম্রাটের সৈন্যদলে সাহায্যের জন্য ১৫ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দেবেন এবং দাক্ষিণাত্যে লুঠতরাজ থেকে বিরত থাকবেন। এই সন্ধির ফলে দাক্ষিণাত্যে প্রভুত্বের ব্যাপারে মারাঠাগণ মোগলদের সমান অংশীদার হয়ে দাঁড়ায়। ১৭১৯ খৃস্টাব্দে বালাজী মারাঠা সৈন্যদলসহ সৈয়দ হোসেন আলির সঙ্গে দিল্লীতে উপনীত হয়ে সম্রাট ফারুকশিয়রকে অপসারণের কাজে হোসেন আলিকে সাহায্য করেন। মারাঠারাজ্যের সহযোগিতায় হোসেন ফারুকশিয়রকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজের মনোমত ব্যক্তিকে সিংহাসনে স্থাপন করতে সক্ষম হন। এর ফলে দিল্লী সম্রাটের ভাগ্যনিয়ন্তারূপে মারাঠাদের প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। দিল্লীতে উপস্থিত হয়ে বালাজী এবং অন্যান্য মারাঠা সর্দারগণ মোগল দরবারের দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করে উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তারে উৎসাহী হন।

বালাজী সসৈন্যে হোসেন আলির সঙ্গে দিল্লীতে উপনীত; মারাঠাদের বলে বলীয়ান হোসেন আলি সম্রাট ফারুকশিয়রকে সিংহাসন চ্যুত করে নিজের মনোমত ব্যক্তিকে সিংহাসনে স্থাপন করেন: মারাঠারা উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তারে উৎসাহী হয়

জাগীর ব্যবস্থা: দাক্ষিণাত্যের ৬টি সুবা থেকে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার পেয়ে বালাজী বিশ্বনাথ এই রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য মারাঠা সর্দারদের মধ্যে পৃথক পৃথক অঞ্চল নির্দিষ্ট করে দেন। মহারাষ্ট্রে পূর্বেও জাগীর (ওয়াতন ও সরঞ্জাম) ব্যবস্থা ছিল। নতুন বন্দোবস্তের ফলে সংগৃহীত রাজস্বের বেশির ভাগ ব্যয় নির্বাহের জন্য সর্দারগণ নিজেরা রাখতেন। জাগীর বিতরণ করে বালাজী বহু সর্দারদের আনুগত্য ও সমর্থন লাভ করেছিলেন সত্য কিন্তু এই সব সামন্ত নায়কদের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করার প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়। এমন কি পরবর্তীকালে কতক মারাঠানায়ক কেন্দ্রীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হওয়ার আশায় মারাঠার শত্রু নিজাম, মোগল কিংবা ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিতেও ইতস্ততঃ করেনি।

জাগীর পেয়ে মারাঠা নায়কদের স্বাধীনতার প্রবণতা দেখা দেয়

প্রথম বাজীরাও: ১৭২০ খৃস্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু হলে তার ২২ বৎসর বয়স্ক পুত্র প্রথম বাজীরাও পেশোয়াপদ লাভ করেন। বালাজী বিশ্বনাথের

বংশে পেশোয়া পদ বংশগত হয়ে যায়। তরুণবয়স্ক বাজীরাও ছিলেন অতিশয় সাহসী ও দক্ষ সেনানায়ক। শিবাজীর পরই তাঁকে সর্বাধিক কৌশলী গোরিলা-যুদ্ধের প্রয়োগ-প্রবক্তা বলা হয়। মারাঠারাজ্যের বিস্তারসাধনে তিনি একদিকে মোগল রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চৌথ আদায় এবং অঞ্চল অধিকার করতে থাকেন; অন্যদিকে মারাঠাশক্তির প্রধান বাধা হায়দরাবাদের নিজামকে পরাস্ত করে মারাঠার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। নিজাম পেশোয়ার শক্তি খর্ব করতে কোলাপুরের প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠা রাজা এবং ক্ষুব্ধ মারাঠা সর্দারদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। কিন্তু বাজীরাও তুইবার নিজামকে সম্মুখ যুদ্ধে নিদারুণভাবে পরাজিত করে দাক্ষিণাত্যের প্রদেশগুলি থেকে মারাঠাদের চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার স্বীকার করতে বাধ্য করান। এছাড়া বাজীরাও মালব, গুজরাট এবং বুন্দেলখন্দের কিছু অংশ জয় করে রাজ্যের পরিধি বাড়িয়ে দেন। এই সময় নতুন নতুন অঞ্চল শাসন এবং চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের ভার পেয়ে গায়কোয়াড়, হোলকার, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে পরিবার প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে বিদেশীরা কিছু অঞ্চল অধিকার করে বাণিজ্য-কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। বাজীরাও এই বিদেশীদের ভারতভূমি থেকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করেন (১৭৩৩ খৃঃ)। এবং জাঞ্জিরার সিদ্দিদের ভারতের মূল ভূখণ্ড ছেড়ে যেতে বাধ্য করেন। পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তিনি সলসেট ও বেসিন অধিকার করে নেন।

বাজীরাও গোরিলাযুদ্ধের নিপুণ প্রয়োগ প্রবক্তা; মোগল ও নিজামের বিরুদ্ধে সফল যুদ্ধ; মালব, গুজরাট ও বুন্দেলখন্দের অংশ জয়; গায়কোয়াড়, হোলকার, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে সামন্ত-পরিবারের প্রাধান্য লাভ; জাঞ্জিরা, সলসেট ও বেসিন অধিকার

পেশোয়ারূপে ২০ বৎসর কাল শাসন সময়ে বাজীরাও মারাঠারাজ্যকে সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করেন। যোদ্ধা হিসাবে তিনি ছিলেন অপরাজেয় কিন্তু বিজিত অঞ্চল শাসন শৃঙ্খলায় সমৃদ্ধ করে তিনি এক সংগঠিত দৃঢ়মূল সাম্রাজ্যে পরিণত করতে পারেননি। রাজস্ব আদায়ের দিকেই সামন্ত-শাসকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, সাম্রাজ্যের সংহতিসাধনের দিকে নয়। এর ফলে বাজীরাও নানা অঞ্চল জয় করে মারাঠারাজ্যের আয়তন সাম্রাজ্যতুল্য করেছেন কিন্তু প্রশাসনিক বন্ধনে সাম্রাজ্যের কাঠামো শক্ত হয়ে ওঠেনি। তিনি ছিলেন দক্ষ যোদ্ধা, সাম্রাজ্য সংগঠক নন।

বালাজী বাজীরাও: ১৭৪০ খৃস্টাব্দে বাজীরাও-এর মৃত্যু হলে তাঁর ১৮ বৎসর বয়স্ক পুত্র বালাজী বাজীরাও পেশোয়ারূপে ১৭৪০ থেকে ১৭৬১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত মহারাষ্ট্র শাসন করেন। বালাজী বাজীরাও 'নানাসাহেব' এবং দ্বিতীয় বাজীরাও নামেও পরিচিত। বালাজী বাজীরাও-এর শাসনকাল মারাঠার ইতিহাসে নানা ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৪৯ খৃস্টাব্দে রাজা সাহুর

মারাঠাসাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তার; মালব, গুজরাট ও বুন্দেলখন্দে মারাঠাশাসন সুদৃঢ়, উড়িষ্যা অধিকৃত,

মহীশূর ও অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্য রাজস্ব দিতে বাধ্য, পরাজিত নিজাম কর্তৃক বার্ষিক ৬২ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদায়ী অঞ্চল প্রদান

মৃত্যু হয়। জীবিতকালে তিনি আলংকারিক রাজ্যপ্রধানে পরিণত হয়েছিলেন। আসল শাসনক্ষমতা ছিল পেশোয়ার হাতে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি রাজ্যশাসন-কর্তৃত্ব অনুষ্ঠানিকভাবে পেশোয়ার হাতে অর্পণ করেন। ফলে কার্যতঃ এবং আইনগত উভয় দিক থেকেই রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব পেশোয়ার অধিগত হল। এই পরিবর্তিত অবস্থার প্রতীক হিসাবে রাজধানী সাতরা থেকে পুণায় স্থানান্তরিত হয়। বালাজী বাজীরাও-এর শাসনকালে মারাঠাসাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করে।

উত্তর ভারত অভিযান: গাঙ্গেয় দোয়াব, রাজপুতনা, দিল্লীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও পাঞ্জাবে মারাঠাশক্তির প্রতিষ্ঠা। মোগল সম্রাটের উজির মারাঠা শক্তির ওপর নির্ভরশীল অনুগত সহায়কে পরিণত

বালাজী তাঁর পিতা বাজীরাও-এর মতই যোদ্ধা এবং রাজ্যবিজেতা ছিলেন। এ সময় মারাঠাবাহিনী প্রায় সারা ভারতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। মালব, গুজরাট ও বুন্দেলখন্দের ওপর মারাঠাকর্তৃত্ব সুদৃঢ় করা হয়, বারংবার বঙ্গদেশ আক্রমণ করার ফলে নবাব আলিবর্দী খাঁ ১৭৫১ খৃস্টাব্দে উড়িষ্যা মারাঠাদের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। দক্ষিণ ভারতে মহীশূর এবং অন্যান্য ছোট রাজ্য পেশোয়াকে রাজস্ব কর দিতে বাধ্য হয়। ১৭৬০ খৃস্টাব্দে হায়দরাবাদের নিজাম মারাঠাবাহিনীর নিকট উদ্‌গিরের যুদ্ধে নিদারুণভাবে পরাজিত হয়ে বার্ষিক ৬২ লক্ষ টাকা রাজস্বের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মারাঠাদের অর্পণ করতে বাধ্য হন। উত্তর ভারতে মারাঠাশক্তি অপ্রতিহত হয়ে ওঠে। পেশোয়া-র বাহিনী গাঙ্গেয় দোয়াব ও রাজপুতনার ভিতর দিয়ে দিল্লীতে উপনীত হয়ে ইমাদ-উল-মুল্‌ক-কে দিল্লী সম্রাটের উজিরপদে স্থাপন করে। মারাঠা সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ইমাদ মারাঠাদের হাতের পুতুলে পরিণত হন। দিল্লী থেকে মারাঠারা পাঞ্জাবে অভিযান পরিচালনা করে আফগানরাজ আহম্‌দ শাহ আবদালীর প্রতিনিধিদের বিতাড়িত করে। এর ফলে আহমদ শাহ আবদালীর সঙ্গে মারাঠাদের বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধ (১৭৬১ খৃঃ): ১৭৬১ খৃস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি পানিপথ প্রান্তরে আহমদশাহ আবদালীর সঙ্গে মারাঠাবাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অযোধ্যার নবাব ও রোহিলা সর্দার নাজিব-উদ্দৌলা আবদালীর পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন; মারাঠাদের পক্ষে ছিলেন উজির ইমাদ-উল-মুলক। আহমদশাহের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার, মারাঠাদের ৪৫ হাজার। পেশোয়ার ১৭ বৎসর বয়স্ক পুত্র বিশ্বাসরাও পেশোয়ার প্রতিনিধি নায়ক রূপে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, সেনাপতির প্রকৃত দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল পেশোয়ার পিতৃব্যপুত্র সদাশিব

এক পক্ষে আহমদ শাহ আবদালী, অযোধ্যার নবাব ও রোহিলা সর্দার; অন্য-পক্ষে মারাঠা বাহিনী ও দিল্লীর উজির ইমাদ-উল-মুলক। মারাঠাদের ইউরোপীয় কায়দায় ট্রেনিং-

প্রাপ্ত পদাতিক ও ইব্রাহিম খাঁ গরদী পরিচালিত গোলন্দাজ, মারাঠারা পরাজিত

রাও ভাউ-এর ওপর। সদাশিব সাহসী এবং যুদ্ধবিজয়ী সেনানায়ক। মারাঠা বাহিনীতে ইউরোপীয় কায়দায় শিক্ষাপ্রাপ্ত পদাতিক সৈন্য এবং ইব্রাহিম খাঁ গরদীর নেতৃত্বে পরিচালিত গোলন্দাজ সৈন্য ছিল। অন্য পক্ষে তৎকালে সাহস ও সামরিক প্রতিভায় আহমদ শাহ আবদালীর সমতুল্য এশিয়ায় কেউ ছিল না।

সকাল থেকে অপরাহ্ণ দুই ঘটিকা পর্যন্ত উভয় পক্ষে সমান সংগ্রাম চলে। ঐ সময় অকস্মাৎ পেশোয়ার পুত্র বিশ্বাসরাও গুলিতে নিহত হন। সেনাপতি সদাশিব রাও ভাউ শোকে দুঃখে মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেন। মারাঠাবাহিনী মুহূর্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। বড় বড় সেনানায়কসহ ২৮ হাজার সৈন্য যুদ্ধে প্রাণ হারায়। যুদ্ধের নিদারুণ সংবাদ পেশোয়াকে বণিকের ভাষায় সংকেতে জানান হয়েছিল—'দুই মুক্তা বিনষ্ট হয়েছে, পঁচিশটি স্বর্ণমুদ্রা হারিয়েছে এবং রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা যে কত ক্ষয় হয়েছে তার হিসাব করা যায় না।' পানিপথ যুদ্ধের পর পেশোয়া ভগ্নহৃদয়ে ১৭৬১ খৃস্টাব্দের ২৩ জুন পুণায় প্রাণত্যাগ করেন।

তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধের পরাজয়ের কারণ ও ফলাফলঃ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজয় মহারাষ্ট্রের পক্ষে এক শোকাবহ জাতীয়-বিপর্যয়। মারাঠা দেশে এমন কোন পরিবার ছিল যার কেউ না কেউ যুদ্ধে প্রাণ না দিয়েছিল। এই পরাজয়ে মারাঠাদের সামরিক দুর্বলতা অপেক্ষা নৈতিক আস্থাহীনতার অধিকতর প্রকাশ ঘটে। প্রমাণিত হয় যে, মারাঠাদের 'প্রকৃত বন্ধু' কেউ ছিল না; তাদের সারাদেশে অবাধ লুণ্ঠন এবং উদ্ধত আচরণ ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্রনায়কের সন্দেহ ও বিদ্বেষ জাগ্রত করে মিত্রলাভের অন্তরায় হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পেশোয়ার কূটনৈতিক ব্যর্থতা পরাজয়ের অন্যতম কারণ। দ্বিতীয়ত, মারাঠাদের পূর্ব-অনুসৃত এবং ফলপ্রদ ক্ষিপ্র গেরিলা আক্রমণ পদ্ধতি পরিবর্তন করে সম্মুখ-যুদ্ধে কৌশলী শত্রুর অশ্বারোহীবাহিনীর মুখে মারাঠা সৈন্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তৃতীয়ত, মারাঠাদের একমাত্র সহায়ক উজির ইমাদ-উল-মুলকের শক্তি ছিল অন্যান্যদের তুলনায় তুচ্ছ।

ফলাফলঃ তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধে পরাজয় মারাঠাদের ভারতে মারাঠাসাম্রাজ্য

পরাজয়ের প্রধান কারণ: পেশোয়ার কূটনৈতিক ব্যর্থতা; চিরাচরিত মারাঠা-আক্রমণ-পদ্ধতির পরিবর্তন; দুর্বল সহায়ক
ফলাফল: জাতীয় বিপর্যয়, পেশোয়ার শক্তি খর্ব, সুদূর-

স্থাপনের প্রচেষ্টায় রূঢ় আঘাত হেনেছিল। সুদূরপ্রসারী ফল হিসাবে পানিপথ যুদ্ধ শিখদের উত্থান ও ভারতে ইংরেজ শক্তি বিস্তারের পথ প্রশস্ত করেছিল। মারাঠা শক্তি দমন করতে ব্যস্ত থাকায় আহমদশাহ আবদালী শিখদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন নি। ফলে শিখগণ পাঞ্জাবে প্রবল হয়ে ওঠার সুযোগ পায়।

প্রসারী ফল—শিখ ও ইংরেজ শক্তির উত্থানের পথ সুগম; প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল বিবেচনায় ৩য় পানিপথ যুদ্ধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে মারাঠা ও মুসলমান শক্তি নিজেদের দুর্বল করে ফেলেছিল। এতে প্রকারান্তরে ইংরেজদের বাংলায় ও দক্ষিণ ভারতে রাজ্যবিস্তারের পথ সুগম হয়। মারাঠাগণ পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে পরে ইংরেজদের প্রাধান্য স্থাপনে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তখন ইংরেজ ভারতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, তাদের পরাজিত করার সামর্থ্য মারাঠাদের ছিল না। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলের বিবেচনায় তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধ ভারত-ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৩.

ইউরোপীয় বাণিজ্যবিস্তার ও বণিক কোম্পানিগুলির কলহ

ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধঃ ভারতের করমণ্ডল (পূর্ব-উপকূল) অঞ্চল ইউরোপীয়দের কাছে কর্ণাটক নামে পরিচিত ছিল। এই অঞ্চলে মাদ্রাজ ইংরেজদের ও পণ্ডিচেরী ফরাসীদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে। এরা ইউরোপীয় ও ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহ করে এবং প্রাচীর দিয়ে ঘিরে এই শহর দুটি সুরক্ষিত করেছিল। পণ্ডিচেরীর অল্প দক্ষিণে সাগরকূলে ছিল ইংরেজদের সেন্ট ডেভিড দুর্গ (Fort St. David)। অবস্থান বিবেচনা করলে ইংরেজরা ছিল অনকূল অবস্থায় —পণ্ডিচেরী পড়েছিল মাদ্রাজ ও সেন্ট ডেভিড, এই দুই ইংরেজ ঘাঁটির মাঝে। কিন্তু ইংরেজরা তবু প্রথম দিকে সুবিধা করতে পারেনি।

ইউরোপে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার নিয়ে যুদ্ধ বাধলে দুই প্রতিপক্ষ ইংরেজ ও ফরাসী ভারতেও কলহ আরম্ভ করে। ইংরেজ ক্যাপ্টেন বার্নেট ফরাসীদের জাহাজ আটক করলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। ভারতে ফরাসীদের আর কোন জাহাজ ছিল না। কাজেই পণ্ডিচেরীর গভর্নর ডুপ্লে মরিসাসের ফরাসী গভর্নরের কাছে জরুরি সাহায্য চেয়ে পাঠান। গভর্নর লা বোর্দনে ৮ খানা জাহাজ নিয়ে মাদ্রাজ উপকূলে এলে ইংরেজ জাহাজগুলো পালিয়ে হুগলীতে চলে যায়। ফরাসীরা এবার জলে-স্থলে মাদ্রাজ অবরোধ করে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে মাদ্রাজ ফরাসীরা দখল করে নেয়।

এই গণ্ডগোলের সময় এমন একটি ঘটনা ঘটে যার ফলে বিদেশী বণিকদের নীতি ও মনোভাব পাল্টে যায়। ইংরেজদের মাদ্রাজ ও ফরাসীদের পণ্ডিচেরী কর্ণাটক রাজ্যে অবস্থিত। তাই বিপদের সময় বিদেশী বণিকরা অপর বণিকের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করে। নবাব উভয় পক্ষকেই যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন কিন্তু কোন পক্ষই মানেনি। অবশেষে ফরাসীরা ইংরেজের কাছ থেকে মাদ্রাজ অধিকার করে নিলে নবাবের

সৈন্যদল এসে মাদ্রাজ অবরোধ করে, উদ্দেশ্য মাদ্রাজ উদ্ধার করে ইংরেজদের ফিরিয়ে দেবে। এই সময় ফরাসী সৈন্য দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে আকস্মিক আক্রমণে নবাব-সৈন্য ছত্রভঙ্গ করে দেয়। অল্পসংখ্যক ফরাসী সৈন্যের সামনে নবাবের অনেক বেশি সংখ্যক সৈন্য টিকতে পারল না। ফরাসী গভর্নর এ থেকে বুঝতে পারলেন, দেশীয় সৈন্যের তুলনায় সুশিক্ষিত ও সুপরিচালিত ইউরোপীয় সৈন্য শ্রেষ্ঠ। ফরাসী সৈন্যের দক্ষতা একদিকে দেশীয় রাজাদের কাছে ফরাসীর কদর বাড়িয়ে দিল। অন্যদিকে তেমনি এদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে ভারতে ফরাসী প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার কল্পনা ডুপ্লের মনে জেগে ওঠে।

অস্ট্রিয় উত্তরাধিকার যুদ্ধের প্রতিফলন হিসেবে ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তা প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৭৪৮ খৃস্টাব্দে ইউরোপে শান্তি স্থাপিত হলে ভারতেও যুদ্ধ থেমে যায়, সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ফরাসীরা মাদ্রাজ ইংরেজদের ফিরিয়ে দেয়। ফরাসীদের আর্থিক বা বাণিজ্যিক কোন লাভ হল না কিন্তু লাভ হল প্রাধান্য লাভের সুযোগ। দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধের ফলে ফরাসীরা প্রথমে চমকপ্রদ সাফল্য লাভ করে। কিন্তু তা বজায় রাখতে পারেনি।

দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ ঃ মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যোগ্য শাসকের অভাবে বিশাল সাম্রাজ্য যখন ভেঙে পড়ল, নিজাম-উল মুলক দক্ষিণ ভারতের সুবাদাররূপে একরকম স্বাধীন হয়ে গেলেন, তাঁর খাস শাসনাধীন হল হায়দরাবাদ। নিজামের মৃত্যু হলে তাঁর সিংহাসন নিয়ে কয়েকজনের মধ্যে কলহ শুরু হল। এই সময় নিজামের অধীনে যে উপ-শাসক বা গভর্নর ছিল তাদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হল, নিজেদের স্বার্থের জন্য তারা নিজামের সিংহাসনের দাবিদারদের একজনকে অথবা অন্যজনকে সমর্থন জানায়। শুধু এতেই তারা নিশ্চিন্ত হল না, বিদেশী বণিকদের সামরিক সাহায্য নিয়ে নিজ নিজ পক্ষ শক্তিশালী করতে উদ্যোগী হল।

নিজামের পুত্র নাসির জঙ্গ সিংহাসন লাভ করেন কিন্তু নিজামের পৌত্র মুজঃফর জঙ্গ ঐ পদ দাবি করেন। কর্ণাটকের নবাবের জামাতা চাঁদ সাহেব কর্ণাটকের সিংহাসন দখল করতে উদ্যোগ করেন। ডুপ্লে মুজঃফর জঙ্গ ও চাঁদ-সাহেবের পক্ষ সমর্থন করে ফরাসী সৈন্য ও সেনাপতির সাহায্যে তাদের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ইংরেজরা এই দাবিদারের বিরুদ্ধ পক্ষে যোগ দিয়েছিল কিন্তু ডুপ্লের বাহিনীর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি। ফলে ফরাসীদের প্রতিপত্তি দারুণ বেড়ে গেল। কৃতজ্ঞ সুবাদার ডুপ্লেকে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে মোগল অঞ্চলের গভর্নর করে পুরস্কৃত করলেন। উড়িষ্যা উপকূলের মসুলিপত্তমসহ কিছু ভূভাগ এবং পণ্ডিচেরীর সন্নিহিত কিছু অঞ্চল ডুপ্লেকে দেওয়া হল। এর প্রতিদানে ফরাসী সেনানায়ক বুসীর অধীনে একদল ফরাসী সৈন্য নিজামের রাজধানীতে রাখার ব্যবস্থা হল নিজামের রক্ষক হিসেবে। ডুপ্লের জয়জয়কার হল। উল্লসিত ফরাসী

গভর্নর ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই এ স্বপ্ন ভেঙে দিলেন এক তরুণ সাহসী ইংরেজ সেনানায়ক, রবার্ট ক্লাইভ।

আর্কটের নবাবের প্রতিপক্ষ ত্রিচিনোপল্লী দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ফরাসী বাহিনী চাঁদসাহেবের মিত্র হিসাবে ঐ দুর্গ অবরোধ করে রাখে। ইংরেজরা দেখল চাঁদসাহেব জয়ী হলে ফরাসীদের প্রভাব আরও বেড়ে যাবে। তাই তারা চাঁদসাহেব ও ফরাসীদের মিলিত বাহিনীর প্রতিরোধ ভাঙার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু কিছুই করতে পারল না। ঐ সময় রবার্ট ক্লাইভ মাত্র ৫০০ সৈন্য নিয়ে অতর্কিত আক্রমণে চাঁদসাহেবের রাজধানী আর্কট অধিকার করলেন—উদ্দেশ্য নিজ রাজধানী রক্ষার জন্য চাঁদসাহেব ত্রিচিনোপল্লীর অবরোধ শিথিল করে সৈন্য সরিয়ে আনতে বাধ্য হবেন। হলও তাই। চাঁদসাহেব ও ফরাসী সৈন্য আর্কটের মধ্যে অবস্থিত ক্লাইভকে অবরুদ্ধ করে ফেলল। তবু ৫৩ দিন ধরে দুর্গ রক্ষা করে এবং অবরোধকারীদের পিছু হটতে বাধ্য করে ক্লাইভ অসাধারণ সামরিক কৃতিত্ব দেখালেন। শুধু তাই নয়, ইংরেজ-ফরাসী প্রতিযোগিতার চেহারাই গেল পাল্টে। ফরাসীদের আশ্রিত বন্ধু চাঁদসাহেব ইংরেজদের হাতে ধরা পড়লেন, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজ-আশ্রিত মহম্মদ আলির হাতে প্রাণ হারালেন, ফরাসী সেনাপতি ল' সৈন্যসহ ইংরেজদের হাতে বন্দী হলেন। মহম্মদ আলি হলেন আর্কটের নবাব ; ডুপ্লেকে ফরাসী সরকার অপসারণ করে নতুন গভর্নর পাঠালেন। তিনি ডুপ্লের নীতি পরিবর্তন করে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করলেন। আর্কট-বিজয়ী ক্লাইভ —**Clive of Arcot** আখ্যায় সম্মানিত হলেন।

তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ : ভারতে ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধ ইউরোপে তাদের মধ্যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের (**Seven Years' War**) প্রতিক্রিয়া। ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হতেই বাংলায় ইংরেজ ও ফরাসীদের যুদ্ধ বেধে যায়। ক্লাইভ ও ওয়াটসন চন্দননগর অধিকার করে নেন (মার্চ, ১৭৫৭ খৃঃ)। নবাব সিরাজউদ্দৌলা দুই পক্ষকেই নিরস্ত থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। ইংরেজরা তখন বেপরোয়া। শুধু চন্দননগর দখল করাই নয়, পলাশীর যুদ্ধে নবাবকে পরাজিত করে তারা বাংলায় শক্ত ঘাঁটি করে বসল।

ওদিকে দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হল ১৭৫৮ খৃস্টাব্দে। এবারে ফরাসীদের ভরাডুবির পালা। হায়দরাবাদে অবস্থিত ফরাসী সৈন্য সেনানায়ক বুসীর সঙ্গে সেখান থেকে চলে আসে ; ইংরেজরা হায়দরাবাদে প্রাধান্য স্থাপন করে এবং উত্তর সরকার অধিকার করে নেয়। ইংরেজ সেনাপতি স্যার আয়ার কুট (Sir Eyre Coot) বন্দিবাসের যুদ্ধে (২২ জানুয়ারি, ১৭৬০ খৃঃ) ফরাসীদের সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করেন। পশ্চিম উপকূলে জিঞ্জি ও মাহে, পূর্ব উপকূলে পণ্ডিচেরী এবং বাংলায় চন্দননগর বাদে ফরাসীদের সকল অঞ্চল হাতছাড়া হয়ে গেল।

এই সঙ্গে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা বিলীন হল, ইংরেজের সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ হল প্রশস্ত।

ইউরোপীয় বণিকরা এদেশে এসে অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য নিজেদের মধ্যে যে লড়াই শুরু করেছিল, তার শেষ অঙ্কে দেখা গেল অন্য সব প্রতিদ্বন্দ্বী ধরাশায়ী, ইংরেজ কোম্পানি এক হাতে তরবারি অন্য হাতে বাণিজ্যের দাঁড়িপাল্লা ও লুঠের থলি নিয়ে ভারতের একপ্রান্ত থেকে দেশের মধ্যে এগিয়ে চলেছে। এই কোম্পানি প্রথম রাজনৈতিক অধিকার লাভ করল বাংলায়।

ইংরেজ শক্তির বিস্তার ঃ ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এসে ইউরোপীয় বণিকরা নিজেদের মধ্যে কলহ বাধিয়ে নিয়েছিল। তার ফল শেষ পর্যন্ত এই হল যে, একে একে সবাই পিছিয়ে পড়ল, অঞ্চল দখল ও রাজ্যবিস্তার করে চলল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। দক্ষিণ ভারতে ইংরেজদের প্রধান প্রতিযোগী হয়েছিল ফরাসীরা। তাদের হটিয়ে দিয়ে ইংরেজরা এবার বাংলায় নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হল।

৪.

বঙ্গদেশ ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি

বাংলায় ইংরেজ ঃ মোগল আমলে ১৬৯০ খৃস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারি জোব চার্নক কলকাতা কুঠি স্থাপন করেছিলেন। নদাতীরে অবস্থিত এই বন্দর ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে যেমন সুবিধাজনক, শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার পক্ষেও তেমনি অনুকুল ছিল। বাংলার আলিবর্দী খাঁ মনে করতেন বিদেশী বণিক মারফৎ ব্যবসাবাণিজ্য চললে দেশের সমৃদ্ধি ঘটবে কিন্তু সুযোগ পেলে তারা যে প্রাধান্য বিস্তারে উৎসুক হবে, দূরদৃষ্টি বলে তাও তিনি বুঝেছিলেন। তাই ইংরেজরা যাতে এখানে সমরশক্তি গড়ে তুলতে না পারে সেদিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল। তিনি তাদের দুর্গ শক্তিশালী করতে দেননি। ১৭৫৬ খৃস্টাব্দে আলিবর্দীর মৃত্যু হলে তাঁর দৌহিত্র তরুণ সিরাজউদ্দৌলা বাংলার মসনদে বসলেন। সিরাজের ভাগ্যের সঙ্গে বাংলার তথা ভারতের ভবিষ্যত এক অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা হয়ে গেল।

সিরাজউদ্দৌলা ঃ যুবক সিরাজ রাজকার্যে অনভিজ্ঞ কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সুপরামর্শদাতার পরিবর্তে শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তজাল বিস্তার করেছিল। মাসিমা ঘসেটি বেগম, মাসতুত ভাই সৌকৎ জঙ্গ এবং আলিবর্দীর ভগ্নীপতি মীরজাফর প্রত্যেকেই সিংহাসনের প্রতি লোভে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। এই গৃহশত্রুর দলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যোগ দেয়।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বিরোধ : ইউরোপে ইংরেজ-ফরাসীর যুদ্ধ বাধলে তার প্রতিক্রিয়ায় ভারতেও ইংরেজ-ফরাসী বণিকদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগে যেত, দাক্ষিণাত্য এমন ঘটনা দেখা গেছে। ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হলে এখানেও ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ হতে পারে এই আশংকায় ইংরেজরা নবাবের অনুমতি না নিয়েই কলকাতার পুরনো দুর্গে কামান বসিয়ে রক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী করতে শুরু করে।

ইংরেজরা নবাবের অনুমতি না নিয়ে ফোর্ট উইলিয়মে কামান বসিয়ে আত্মরক্ষার শক্তি বৃদ্ধি করল; অজুহাত—ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধতে পারে। নবাব এ ব্যবস্থায় কোম্পানির উদ্ধতভাব লক্ষ্য করলেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস প্রচুর অর্থসহ কলকাতা এসে ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজবল্লভ সিরাজের শত্রু-ভাবাপন্ন মাসিমা ঘসেটি বেগমের সমর্থক এবং নবাবের শত্রু স্থানীয় ব্যক্তি। কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেওয়া নবাবের শত্রুতার সামিল। ইংরেজ কোম্পানির দুর্গের সুরক্ষা ব্যবস্থা নষ্ট করে ফেলার জন্য নবাবের আদেশ উপেক্ষা করে; কৃষ্ণদাসকে নবাবের হাতে সমর্পণের জন্য নবাবের নির্দেশ অমান্য করে এবং নবাবের কাছে কলকাতার গভর্নর ড্রেকের উদ্ধত্যপূর্ণ চিঠি পাঠায়। মাসতুত ভাই সৌকত জঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে নবাব পাটনার পথে রাজমহল পৌঁছে ড্রেকের চিঠি পেয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন এবং ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি অধিকার করেন। ১৬ জুন (১৭৫৬ খৃঃ) নবাব কলকাতায় উপনীত হন। তিনদিন পর ড্রেক এবং বহু ইংরেজ দুর্গ থেকে পালিয়ে গঙ্গায় জাহাজে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সিরাজ প্রায় বিনা বাধায় ফোর্ট উইলিয়ম অধিকার করে নেন (২০ জুন, ১৭৫৬ খৃঃ)।

অন্ধকূপ হত্যা : ড্রেকসহ বেশির ভাগ ইংরেজ পালিয়ে গেলে অবশিষ্টদের নায়ক হলওয়েলসহ ১৪৬জন ইংরেজ নবাবের হাতে বন্দী হয়। এদের ফোর্টের **Black Hole** নামে একটি সামরিক কারাকক্ষে ২০ জুন রাত্রিতে আটক রাখা হয়। বন্দী হলওয়েলের বর্ণনা অনুসারে বন্দীদের ১২৩ জন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়, ২৩ জন মাত্র জীবিত ছিল। এই ঘটনা 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকগণ হলওয়েলের বর্ণনা অসত্যমিশ্রিত অতিরঞ্জিত এবং উদ্দেশ্যমূলক বলে প্রমাণ করেছেন। ঘটনা যাই হোক সিরাজ এর জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী ছিলেন না। ফোর্টেরই একটি কক্ষে বন্দীদের আটক রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন মাত্র।

কলকাতা জয়ের পর নবাব সেনাপতি মানিকচাঁদের ওপর কলকাতার ভার দিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন।

ইংরেজদের কলকাতা পুনরাধিকার : নবাব কলকাতা ফিরে সৌকৎ জঙ্গের বিরুদ্ধতা করেন কারণ তিনি দিল্লী সম্রাটের কাছ থেকে সুবেদারির সনদ লাভ করে বাংলায় মসনদ দখল করার পরিকল্পনা করছিলেন। সৌকৎ জঙ্গকে

যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করে নবাব এক আত্মীয়-শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন। কিন্তু বিদেশী শত্রু ইংরেজকে শায়েস্তা করা সহজ হল না।

কলকাতা থেকে পালিয়ে ইংরেজরা ফলতায় জাহাজে বসে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তারা সিরাজের পরাজয় কামনা করে সৌকৎ জঙ্গের কাছে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিল। সৌকৎ জঙ্গের পরাজয়ে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ইংরেজরা সেনাপতি মানিকচাঁদ, ধনশালী বণিক উমিচাঁদ, জগৎশেঠ ও রাজদরবারের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নানা প্রলোভনে সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজপক্ষ সমর্থনে রাজি করায়। ইতিমধ্যে মাদ্রাজ থেকে অ্যাডমিরাল ওয়াটসন ও রবার্ট ক্লাইভ কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ কলকাতায় এসে প্রায় বিনা যুদ্ধে কলকাতা পুনরায় অধিকার করেন। মানিকচাঁদ পালিয়ে মুর্শিদাবাদে চলে যায়।

আলিনগর সন্ধি ঃ কলকাতা পুনরধিকার করে ইংরেজদের সাহস বেড়ে গেল। ওয়াটসন নবাবের কাছে চিঠিতে শুধু বাণিজ্যের সুযোগ ও অধিকার নয়, সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ও ক্ষতিপূরণ দাবি করলেন। যুদ্ধের হুমকি দিয়ে তিনি লিখলেন, 'বাংলাদেশে আমরা এমন আগুন জ্বালাব গঙ্গার সব জল দিয়েও যা নিভান যাবে না।' ইংরেজদের এরূপ উদ্ধত আচরণ সত্ত্বেও নবাব কলকাতা এসে আলিনগর সন্ধি স্থাপন করলেন (ফেব্রুয়ারি, ১৭৫৭)।

নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ঃ ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হলে তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ভারতেও ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। বাংলায় এরূপ সংঘর্ষ শুরু হলে ফরাসীরা যে নবাবের সমর্থন পাবে সে বিষয়ে ইংরেজদের কোন সন্দেহ ছিল না। তাই তারা সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সেনাপতি মীরজাফর ও রায়দুর্লভ এবং জগৎশেঠ এই ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়। শর্ত ঃ মীরজাফর সিংহাসন পেলে প্রতিদানে ইংরেজদের প্রচুর পুরস্কার দেবেন। এই গোপন চুক্তির সঙ্গে জড়িত উমিচাঁদ রাজকোষের এক মোটা অংশ দাবি করে। অন্যথায় ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেবার ভয় দেখায়। ক্লাইভ উমিচাঁদের দাবি মেনে নিয়ে এক জাল চুক্তিপত্র দেখিয়ে তাকে শান্ত করেন ওয়াটসন এই জাল চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করলে ক্লাইভের নির্দেশে অন্য এক ব্যক্তি তাতে স্বাক্ষর দেয়। ছলে বলে কৌশলে যেকোন প্রকারেই হোক ক্লাইভ নবাবকে অপসারণ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধ (২৩ জুন, ১৭৫৭) ঃ নদীয়া জেলার পলাশী প্রান্তরে ইংরেজ ও নবাবের সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ হল। ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভের ছিল ইউরোপীয় ও দেশীয় সিপাহী নিয়ে ৩ হাজারের মত সৈন্য, নবাবের ছিল ৫০ হাজার পদাতিক, ১৮ হাজার অশ্বারোহী, ৫৩টি ভারি কামান। এছাড়া প্রায় ৫০ জন ফরাসী সৈনিক ৪টি হাল্কা কামান নিয়ে নবাবের পক্ষে যোগ দিয়েছিল।

নবাবের পক্ষে যেরূপ সৈন্য ছিল সবাই একাত্ম হয়ে যুদ্ধ করলে ইংরেজের পরাজয় ছিল অনিবার্য। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের ফলে মীরজাফর ও রায়দুর্লভ যুদ্ধ না করে দর্শকদের মত দাঁড়িয়ে রইল। নবাবের প্রতি অনুগত সেনানী মীরমদন ও মোহনলাল প্রাণপণে যুদ্ধ করলেন। মীরমদন নিহত হলে মীরজাফরের কুপরামর্শে নবাব যুদ্ধ থামিয়ে দিলেন। সেই সময় ইংরেজরা পাল্টা আক্রমণে নবাব সৈন্য ছত্রভঙ্গ করে দিল। নবাব পরাজিত ও পরে নিহত হন।

পলাশীর যুদ্ধ একটা বড় যুদ্ধের মত নয়। এখানে বিশ্বাসঘাতকতা, জালিয়াতি ও হীনস্বার্থের জয় হল। কিন্তু এ যুদ্ধ ভারত-ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের সূচক। পলাশী যুদ্ধের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় যে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করল তা কালক্রমে সারা ভারতে ছড়িয়ে যায়। এই রাজ্য বিস্তৃতি একদিনে বা একটি ঘটনার ফলে ঘটেনি, বাংলায় পদস্থাপনের সুযোগ পেয়ে ইংরেজরা ভারতের অন্যান্য অংশ অধিকার করতে এগিয়ে চলে তৃণাচ্ছাদিত মাঠে আগুনের ক্রম-বিস্তৃতির মত।

ইংরেজদের প্রচুর ধনরত্ন উপহার এবং ২৪ পরগণা জেলার জমিদারি দিয়ে মীরজাফর বাংলার মসনদ পেলেন কিন্তু আগুনে ঘি ঢেলে যেমন নেভান যায় না, অর্থ দিয়ে বণিক প্রভুদের তৃপ্ত করা বিশ্বাসঘাতক নবাবের সামর্থ্যে কুলাল না। ইংরেজরা মীরজাফরকে হটিয়ে তাঁর জামাতা মীরকাশিমকে সিংহাসন দিলেন। এবার তিনি কোম্পানিকে দিলেন মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রাম জেলা কিন্তু এতে কোম্পানি খুশি হল না। কোম্পানি দেশের মধ্যে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার পেয়েছিল সম্রাটের সনদবলে। কোম্পানির কর্মচারিরাও ব্যক্তিগত লাভের জন্য এই সুযোগ ভোগ করতে থাকে। এর ফলে অ-সম প্রতিযোগিতায় দেশীয় বণিকদের লোকসান হতে লাগল। মীরকাশিম এই ব্যবস্থা বন্ধ করতে অক্ষম হয়ে দেশের মধ্যে পণ্য চলাচল-শুল্ক সম্পূর্ণ তুলে দিলেন। একচেটিয়া লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত কোম্পানির কর্মচারিরা ক্রুদ্ধ হয়ে গণ্ডগোল সৃষ্টি করে, এমনকি পাটনা কুঠির বড়কর্তা এলিস বিদ্রোহ করে পাটনা শহর দখল করার চেষ্টা করে। মীরকাশিম এলিসের সৈন্য শিবির ধ্বংস করে দেন। এর ফলে ইংরেজরা মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অজুহাত পেয়ে গেল।

বক্সার যুদ্ধ (২৩ অক্টোবর, ১৭৬৪): মীরকাশিম বুঝেছিলেন, অর্থ দিয়ে ইংরেজ কোম্পানির লোভ তৃপ্ত করা যাবে না। তারা এদেশের ধনসম্পদ নিঃশেষ না করে ক্ষান্ত হবে না। এদের কবল থেকে উদ্ধার পেতে হলে চাই শিক্ষিত সৈন্যদল, উন্নত অস্ত্র ও বন্ধুর সহায়তা। ইংরেজের সঙ্গে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী জেনে মীরকাশিম রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে সরিয়ে নিয়ে যান, সেখানে অস্ত্র নির্মাণ কারখানা স্থাপন করেন এবং ইউরোপীয় ধরনে সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। এছাড়া অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দীন এবং মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ

আলমের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইংরেজ বিরোধী দল গঠন করেন। কিন্তু ইংরেজ সেনাপতি হেক্টর মুনরো ১৭৬৪ খৃস্টাব্দের ২২ অক্টোবর বক্সারে এই মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন।

ইংরেজ কোম্পানির শোষণ থেকে দেশ রক্ষা করার জন্য মীরকাশিমের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ভাগ্যহত, স্বদেশপ্রেমিক নবাব অতি দীনভাবে জীবনের শেষ কিছু দিন অনাদৃতভাবে যাপন করে প্রাণত্যাগ করেন। পলাশীর পর বক্সার ইংরেজ শক্তিকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপিত করে।

দেওয়ানি লাভ (১৭৬৫ খৃঃ) **:** ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী লাভ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কথাটি প্রায়ই শুনতে পাই। দেওয়ানি বলতে কি বোঝায় এবং এর প্রাপ্তির তাৎপর্য কি তা জেনে নাও। আইনত সুবা বাংলা মোগল সম্রাটের অধীন, সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত সুবাদার এর শাসন পরিচালনা করতেন। নবাব আলিবর্দীর সময় বাংলা প্রায় স্বাধীন হয়ে যায়। তবে তিনি নিয়মিত বার্ষিক কর দিল্লীতে পাঠাতেন। নবাবের দুইটি প্রধান দায়িত্ব—১. দেশের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, অর্থাৎ প্রশাসন ব্যবস্থা ও ২. রাজস্ব আদায়। আইন-শৃঙ্খলা দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত কর্মচারি ছিলেন নাজিম; আর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে ছিলেন ‘দেওয়ান’। কাজেই ‘দেওয়ানির’ অর্থ রাজস্ব আদায়ের ভার। বক্সারের যুদ্ধে নবাব সুজাউদ্দিন ও সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম মীর কাশিমের পক্ষ নিয়েছিলেন কিন্তু পরাজিত হন। অযোধ্যা ইংরেজরা অধিকার করে নেয়। ক্লাইভ এলাহাবাদ সন্ধি দ্বারা বক্সারের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটালেন। শর্ত হল :

১. ৫০ লক্ষ টাকা কোম্পানিকে দিয়ে অযোধ্যার নবাব রাজ্য ফিরে পাবেন। ২. এ রাজ্যের এলাহাবাদ ও কোরা জেলা সম্রাটকে দেওয়া হল। ৩. এর প্রতিদানে সম্রাট সনদবলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদান করলেন।

তাৎপর্য : পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সুবা বাংলার বাস্তব (de facto) শাসক হয়েছিল কিন্তু আইনত তাদের কোন অধিকার ছিল না। মোগলসম্রাটের কাছ থেকে দেওয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করার ফল এই বাস্তব অধিকার আইনসিদ্ধ (**de jure**) হল। নীতির দিক থেকে কোম্পানিকে আর বে-আইনী দখলদার বলা যাবে না।

ইংরেজ কোম্পানির চাতুরীর দিকটা হল এই যে, কোম্পানি টাকা আদায় করবে অর্থাৎ সিন্দুকের চাবি আর সামরিক শক্তি তার হাতে, অন্যদিকে দেশ শাসনের দায়িত্ব থাকবে নবাবের ওপর; তিনি যেন ঢাল তরোয়ালবিহীন নিধিরাম সর্দার। এইটি হল দুই তরফের শাসন যাকে বলা হয় দ্বৈত শাসন। এক তরফে রাজস্ব আদায়কারী কোম্পানি, অন্য তরফে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী নবাব। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা দেশের পক্ষে কল্যাণকর হয়নি। অর্থ নৈতিক অব্যবস্থা, দুর্ভিক্ষ মহামারি বাংলার লোকেদের বিপন্ন করেছিল।

৫.

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার

বক্সার যুদ্ধের পর ক্লাইভ পুনরায় বাংলার গভর্নর হয়ে আসেন (মে, ১৭৬৫)। তাঁর দ্বিতীয় শাসনকালে (১৭৬৫-১৭৬৭) দুইটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে।

ক্লাইভের পুনরাগমন

প্রথমত, মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সঙ্গে একটি সন্ধির মাধ্যমে ইংরেজ কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে।



লর্ড ক্লাইভ

দ্বিতীয়ত, অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে স্বাক্ষরিত এলাহাবাদ সন্ধির সর্ত অনুসারে ইংরেজরা ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং কোরা ও এলাহাবাদ জেলা লাভ করে। ঐ জেলা দুইটি মোগল সম্রাটকে প্রদান করা হয়। অযোধ্যা রাজ্য ইংরেজের প্রভাবাধীন হয়।

দেওয়ানি লাভ ও অযোধ্যার সঙ্গে সন্ধির ফলে বাংলায় ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার খুব সহজ হয়নি। উত্তর ভারতে মারাঠা

রাজ্য, হায়দরাবাদের নিজাম এবং মহীশূর রাজ্যের হায়দার আলি তখন বিশেষ শক্তিশালী ছিল। এই সকল প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্য বিস্তার সম্ভব ছিল না। ১৭৭২ খৃস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্য বিস্তারে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। সম্রাট শাহ আলম মারাঠাদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ায় হেস্টিংস তাঁর বৃত্তি বন্ধ করে দেন এবং তাঁর কাছ থেকে এলাহাবাদ ও কোরা জেলা দুইটি কেড়ে নিয়ে ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তা অযোধ্যার নবাবকে ফিরিয়ে দেন।



ওয়ারেন হেস্টিংস

নবাব সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যায় একদল ব্রিটিশ সৈন্য রাখতে এবং তার ব্যয়ভার বহন করতে সম্মত হন। ইংরেজ সমর্থন ও সাহায্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে সুজাউদ্দৌল্লা তাঁর রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত রোহিলখণ্ড রাজ্য জয় করতে উদ্যত হন। ৪০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে হেস্টিংস সুজাউদ্দৌল্লাকে একদল ইংরেজ সৈন্য ভাড়া দিলে তাদের সাহায্য তিনি রোহিলখণ্ড অধিকার করেন (১৭৭৪)। ন্যায়নীতির বিচারে হেস্টিংসের এই কার্য সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু রোহিলা যুদ্ধের ফলে কূটবুদ্ধি হেস্টিংস ঐ অঞ্চলে মারাঠাদের প্রাধান্য বিস্তারের সম্ভাবনা দূর করে ইংরেজদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেছিলেন।

অযোধ্যা ইংরেজের আশ্রিত ও অনুগত

হেস্টিংসের কাজ নীতিবিরুদ্ধ কিন্তু কূটনীতি সমর্থিত

ক. ব্রিটিশ মারাঠা সম্পর্ক

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে নিদারুণ পরাজয়ের দশ বছরের মধ্যে মারাঠাশক্তি আবার প্রবল হয়ে ওঠে। তারা মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে ইংরেজদের প্রভাব থেকে মুক্ত করে দিল্লীতে এনে নিজ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করে। মারাঠার শক্তিবৃদ্ধিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শঙ্কিত হয়েছিল কিন্তু তরুণ পেশোয়া প্রথম মাধবরাওয়ের অকাল মৃত্যুতে মারাঠা রাজ্যে আত্মকলহ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং ইংরেজ শক্তির হস্তক্ষেপের সুযোগ আসে।

ইংরেজ হস্তক্ষেপের সুযোগ

প্রথম ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধ : পেশোয়া প্রথম মাধবরাও-এর ভ্রাতা নারায়ণরাও পেশোয়া হন। অল্পকাল পরেই পিতৃব্য রঘুনাথরাও (রঘোবা) তাঁকে হত্যা করে পেশোয়া পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু নানা ফড়নবিশ নামক এক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্রাহ্মণ যুবক

নারায়ণরাও-এর শিশুপুত্রকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করে রঘোবাকে রাজধানী থেকে বিতাড়িত করেন। ইংরেজদের সহায়তায় পেশোয়া-পদ প্রাপ্তির আশায় রঘোবা বোম্বাই সরকারের সঙ্গে স্থাপিত সুরাট সন্ধি (১৭৭৫ খৃঃ) দ্বারা ইংরেজদের সলসেট ও বেসিন বন্দর প্রদান করেন এবং আড়াই হাজার ইংরেজ সৈন্যের ব্যয় বহনে রাজি হন। তারপর ইংরেজ সৈন্য ও রঘোবার সৈন্য মিলিত হয়ে নতুন পেশোয়ার বাহিনীকে পরাজিত করে। বোম্বাই সরকার কর্তৃক রঘোবাকে সাহায্য দান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বড় কর্তারা সমর্থন করেননি। নানা ফড়নবিশ ফরাসীদের সাহায্য লাভের চেষ্টা করছেন, এরূপ সন্দেহ করে বোম্বাই সরকার ৬০০ ইংরেজ সৈন্য ও ৩৩০০ দেশীয় সৈন্যের এক বাহিনী পেশোয়ার রাজধানী পুণা অভিমুখে প্রেরণ করেন।

রঘোবার সমর্থনে ইংরেজ

পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় তেলেগাঁও-র যুদ্ধে মারাঠা বাহিনীর কাছে ইংরেজ সৈন্যদল পরাজিত হয় এবং অপমানজনক ওয়াড়গাঁও সন্ধি করতে বাধ্য হয়। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এই পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে কর্নেল গডার্ড ও ক্যাপ্টেন পপ্‌হামের নেতৃত্বে দুইটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। কয়েকটি যুদ্ধের পর মাহদাজী সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় সলবাই সন্ধি স্থাপিত হয় (১১ মে, ১৭৮২ খৃঃ)। এই সন্ধির ফলে ইংরেজরা সলসেট লাভ করে, নিহত নারায়ণরাও-এর পুত্র মাধবরাও নারায়ণ আইনসম্মত পেশোয়া বলে স্বীকৃত হন এবং রঘোবাকে ভাতা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়। সলবাই সন্ধি ইংরেজকে ভারতে রাজ্য ও প্রতিপত্তি বিস্তারে একধাপ এগিয়ে দিয়েছিল।

সলবাই-এর সন্ধি

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ঃ পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট (Pitt's India Act, 1784) অনুসারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে যুদ্ধ ও রাজ্যজয় নিষিদ্ধ হয়েছিল কিন্তু ওয়েলেসলি গভর্নর জেনারেল হয়ে ভারতে এসে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করতে লাগলেন। তিনি দেশীয় রাজ্যগুলিকে অধীনতামূলক মিত্রতা (Subsidiary Alliance) গ্রহণ করে ইংরেজের আশ্রয় অবলম্বন করতে আহ্বান জানান। নানা ফড়নবিশের পরিচালনায় মারাঠা শক্তি ইংরেজের প্রতি সন্দেহ ও ঈর্ষাবশত এই আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর পেশোয়ার দুর্বলতা হেতু রাজ্যে ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে মারাঠা নায়কদের মধ্যে কলহ উপস্থিত হল। যশোবন্ত রাও-কর্তৃক পরাজিত পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ওয়েলেসলির নিকট অধীনতামূলক মিত্রতার জন্য আবেদন করে বেসিন সন্ধি স্থাপন করলেন (৩১ ডিসেম্বর, ১৮০২ খৃঃ) এবং ইংরেজ সৈন্যের সহায়তায় পুনায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেন। ইংরেজরা প্রকৃতপক্ষে পেশোয়ার প্রভু হয়ে বসল।

পেশোয়ার অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ

মারাঠাদের মিলিত সংগ্রাম ঃ পেশোয়া অধীনতামূলক মিত্রতা স্বীকার করে

ইংরেজের সাহায্য গ্রহণ করলে অন্যান্য মারাঠা নায়কগণ অত্যন্ত মর্মাহত হন। তাঁরা অধীনতামূলক মিত্রতাকে স্বাধীনতা ও জাতির সম্মান বিসর্জন দেওয়ার সামিল মনে করে নিজেদের কলহবিভেদ ভুলে ইংরেজের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হলেন। দৌলৎরাও সিন্ধিয়া, রঘুনাথজী ভোঁসলে এবং যশোবন্তরাও হোলকার প্রায় ৩ লক্ষ সৈন্য সমবেত করলেন। ওয়েলেসলি এই মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দুইটি প্রধান সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। আর্থার ওয়েলেসলি দাক্ষিণাত্যে এবং লর্ড লেক উত্তর ভারতের বাহিনী পরিচালনা করেন। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের বাহিনী ঔরঙ্গবাদের নিকট আসায়ের যুদ্ধক্ষেত্রে ওয়েলেসলির নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় (১৮০৩ খৃঃ)। লর্ড লেক দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন এবং সিন্ধিয়ার উত্তরাঞ্চলের বাহিনীকে পরাস্ত করেন। দেওগাঁয়ের সন্ধি (১৭ ডিসেম্বর ১৮০৩ খৃঃ) দ্বারা ভোঁসলে এবং সুরজি-অর্জনগাঁয়ের সন্ধি (৩০ ডিসেম্বর, ১৮০৩ খৃঃ) দ্বারা সিন্ধিয়া ইংরেজদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্যের পরিধি ও প্রভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। প্রধান মারাঠা নায়কগণ ইংরেজের কাছে মাথা নত করায় ছোট রাজ্যগুলি যেমন—যোধপুর, জয়পুর, বুন্দি প্রভৃতি ইংরেজের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে। উড়িষ্যা অধিকারে আসায় বঙ্গদেশ থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত একটানা অঞ্চল কোম্পানির হাতে আসে। ১৮০৪ খৃস্টাব্দে হোলকারের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধে কর্নেল মনসন পরাজিত হন কিন্তু সেনাপতি লর্ড লেক হোলকারকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করলে তিনি ইংরেজ-প্রদত্ত সর্ত মেনে নিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হন।

মিলিত মারাঠা নায়কদের পরাজয়

ইংরেজের সাফল্য

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ: পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরেজের সহায়তায় সিংহাসন লাভ করে ইংরেজের সঙ্গে মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ থাকলেও ভারতে ইংরেজের শক্তি বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তিনি গোপনে অন্যান্য মারাঠা নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ইংরেজবিরোধী জোট গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই জোটে তিনি পাঠান সর্দার আমীর খাঁ পিণ্ডারীকেও অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়াসী হন এবং নিজ সৈন্যের শক্তিবৃদ্ধির দিকেও দৃষ্টি দেন।

ইংরেজবিরোধী জোট গঠনের চেষ্টা

লর্ড হেস্টিংস (১৮১৩-১৮২৩ খৃঃ) গভর্নর জেনারেল হয়ে ভারতে এসে ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হন। তিনি পেশোয়ার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে তাঁকে পুণাচুক্তি (১৮১৭ খৃঃ) দ্বারা মারাঠা-জোটের নেতৃপদ পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেন। হেস্টিংস মারাঠা নায়কদের আত্মকলহের সুযোগ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে পৃথক পৃথক সন্ধি স্থাপন করেন। এর ফলে পেশোয়ার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়। গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া এবং নাগপুরের ভোঁসলে ইংরেজ প্রাধান্য মেনে নিতে বাধ্য হন কিন্তু ইংরেজের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার আর একবার চেষ্টা না করে ছাড়েননি।

মারাঠাদের শেষ চেষ্টা: যেদিন সিন্ধিয়া ইংরেজদের সঙ্গে অধীনতামূলক

মিত্রতা চুক্তি সম্পাদন করেন (২৭ মে, ১৮১৬ খৃঃ) সেইদিনই পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও পুণায় অবস্থিত ইংরেজ রেসিডেন্সি লুঠপাট করে পুড়িয়ে দেন এবং ২৭ হাজার সৈন্যসহ খিরকিতে অবস্থিত ২৮০০ ইংরেজ সৈন্যকে আক্রমণ করেন কিন্তু যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হন।

পেশোয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নাগপুরের আপ্পা সাহেব ভোঁসলে এবং ইন্দোরের যশোবন্ত রাও-এর পুত্র মলহর রাও হোলকার পৃথক পৃথক ভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। যুদ্ধে সীতাবলদিতে নাগপুর সৈন্য এবং মহিদপুরে হোলকারের সৈন্য ইংরেজ সৈন্যের কাছে পরাজিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এর ফলে রাজ্য দুইটি ইংরেজের আয়ত্তাধীনে আসে। নাগপুর রাজ্যের নর্মদার উত্তরাঞ্চল ইংরেজের দখলে আনা হয়, অবশিষ্ট অংশের রাজারূপে দ্বিতীয় রঘুজী ভোঁসলেকে সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। হোলকারের সঙ্গে অধীনতামূলক চুক্তি দ্বারা নর্মদা নদীর দক্ষিণের সমগ্র অঞ্চল ইংরেজ অধিকার করে নেয় এবং হোলকারকে রাজ্যের মধ্যে ভরণপোষণসহ ইংরেজ সৈন্য রাখতে বাধ্য করে।

ভোঁসলে ও হোলকারের পরাজয়

খিরকিতে পরাজয়ের পর পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরেজের সঙ্গে আরো দুইটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্তু দুইটিতেই তিনি পরাজয় বরণ করে অবশেষে ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করেন (৩ জুন, ১৮১৮ খৃঃ)। ইংরেজরা পেশোয়াপদ লুপ্ত করে বাজীরাওকে কানপুরের নিকট বিঠুরে অন্তরীণ করে রাখে। তাঁর ভরণপোষণের জন্য বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা ভাতা মঞ্জুর করা হয়। পেশোয়া পদ তুলে দিয়ে মারাঠাদের জাতীয় ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দুটিকে মুছে ফেলা হল।

পেশোয়ার পরাজয়; পদ বিলুপ্ত; বিঠুরে অন্তরীণ

পেশোয়া রাজ্য ইংরেজের শাসনাধীনে চলে গেলে শুধু সাতারা রাজ্য নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করে ছত্রপতি শিবাজীর বংশধর প্রতাপসিংহকে সাতারার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পরবর্তীকালে শাসনকার্যে অযোগ্যতার অভিযোগে লর্ড ডালহৌসির স্বত্ববিলোপনীতি প্রয়োগ করে সাতারা রাজ্য ইংরেজের শাসনাধীনে আনা হয়।

সাতারা রাজ্য গঠন

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর মারাঠাদের ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের সুযোগ ও প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল। ইংরেজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কালক্রমে এই আশা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইংরেজ কূটনীতি ও সমরবলে বলীয়ান হয়ে প্রায় সমগ্র ভারতে তার শাসন বিস্তার করে। মারাঠাশক্তির পতন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে দেয়।

ইংরেজের শক্তি ও কূটনীতির সাফল্য

(খ) মহীশূরের সঙ্গে সম্পর্ক

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ঃ হায়দার আলির শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে মারাঠা নিজাম ও ইংরেজ তাঁর বিরুদ্ধে এক মিলিত ত্রিশক্তি গঠন করে। এদের মধ্যে মারাঠারা প্রথম আক্রমণ করে কিন্তু হায়দার তাদের সঙ্গে আপোষে মিটমাট করে নেন। নিজাম ও ইংরেজগণ একত্রে হায়দারের বিরুদ্ধে অভিযান করলেও ঐ সময় হায়দারের বন্ধুদের পরামর্শে নিজাম ইংরেজ পক্ষ ত্যাগ করে হায়দারের সঙ্গে সন্ধি করেন। কখনও ইংরেজপক্ষ কখনও হায়দারের পক্ষ অবলম্বন করে নিজাম নির্ভরযোগ্য বন্ধুর পরিচয় দেননি। নিজাম তাঁর পক্ষ ত্যাগ করলেও হায়দার একাকী ইংরেজবাহিনীকে পরাস্ত করে মাদ্রাজের সন্নিকটে উপস্থিত হন (১৭৬৯ খৃঃ) এবং তাঁর অনুকূলে সন্ধি করতে ইংরেজদের বাধ্য করেন। হায়দার আলি অন্য কোন শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হলে ইংরেজগণ তাঁকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদন করে (১৭৬৯ খৃঃ)।

সাহায্য চুক্তি

দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ ঃ ১৭৭১ খৃস্টাব্দে মারাঠাগণ মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করলে ইংরেজগণ হায়দারকে সাহায্য করেনি। এতে স্বভাবতই তিনি ইংরেজদের ওপর রুষ্ট হয়েছিলেন। ১৭৭৯ খৃস্টাব্দে হায়দার আলি ইংরেজের বিরুদ্ধে নিজাম ও মারাঠাদের সঙ্গে মিলিত মহাজোটে যোগদান করেন। মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ফরাসী-অধিকৃত মাহে ইংরেজগণ অধিকার করায় হায়দার আলি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। দাক্ষিণাত্যে ইংরেজবাহিনীকে বিপন্ন অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস প্রধান সেনাপতি আয়ার কুটকে প্রেরণ করেন এবং কূটনৈতিক কৌশলে নিজাম ও মারাঠাদের হায়দারের পক্ষ থেকে সরিয়ে আনেন। আয়ার কুট পোর্টোনোভোর যুদ্ধে (১৭৮১ খৃঃ) হায়দারকে পরাজিত করেন। যুদ্ধ চলাকালীন ১৭৮২ খৃস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর হায়দার আলি ক্যানসার রোগে পরলোক গমন করেন।

ইংরেজের চুক্তিভঙ্গ

হায়দারের মৃত্যুর পর তার পুত্র টিপু পিতার ন্যায় বীর বিক্রমে যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকেন এবং ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে সেনাপতি ম্যাথুসসহ সমস্ত ইংরেজ সৈন্যদের বন্দী করেন। মাদ্রাজের গভর্নর লর্ড ম্যাকার্টানি সন্ধির প্রস্তাব করে টিপু সুলতানের কাছে দূত প্রেরণ করেন। পরস্পর পরস্পরের বিজিত অঞ্চল প্রত্যর্পণ ও বন্দী বিনিময়ের সর্তে ম্যাঙ্গালোর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় (মার্চ, ১৭৮৪ খৃঃ)। দ্বিতীয় ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধে হায়দার আলি ও টিপুর শৌর্যের কাছে ইংরেজকে মাথা নোয়াতে হয়েছিল।

ইংরেজ হায়দারের কাছে পরাজিত

তৃতীয় ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধ ঃ ১৭৮৬ খৃস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস গভর্নর-জেনারেল হয়ে ভারতে এসে দেশীয় শক্তিবর্গের সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে নিজাম ও মারাঠাদের সঙ্গে ত্রিশক্তি মৈত্রী সম্পাদন করেন। নিজাম ও মারাঠা শক্তি টিপুর শক্তি বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে ইংরেজের সঙ্গে যোগ দেয়।



লর্ড কর্নওয়ালিস

ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ ত্রিবাংকুর রাজ্য টিপু কর্তৃক আক্রান্ত হলে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রায় দুই বৎসর যুদ্ধ চলার পর মিলিত তিন বাহিনী কর্তৃক বেষ্টিত হয়ে টিপু শ্রীরঙ্গপত্তম সন্ধি (১৭৯২ খৃঃ) করতে বাধ্য হন। টিপুকে প্রায় অর্ধেক রাজ্য, ৩০ লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ ও দুই পুত্রকে জামিনস্বরূপ কর্ণওয়ালিসের হস্তে সমর্পণ করতে হয়, নিজাম ও মারাঠাশক্তি ইংরেজকে সাহায্য করার প্রতিদানে টিপুর রাজ্যাংশ লাভ করে।

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ঃ তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে প্রায় অর্ধেক রাজ্য হারিয়েও টিপু হতাশ হয়ে ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করেন নি কিংবা রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা থেকে বিরত হননি। ইউরোপে ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ড জীবনমরণ যুদ্ধে লিপ্ত হলে টিপু ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকারের প্রতি বন্ধুত্ব জ্ঞাপন করেন এবং আরব, কাবুল, মরিসাস প্রভৃতি স্থানে দূত পাঠিয়ে ইংরেজদের ভারতবর্ষ থেকে উচ্ছেদ করতে সাহায্য প্রার্থনা করেন।

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ অল্পকাল স্থায়ী হয়। টিপু প্রথমে শ্রীরঙ্গপত্তমের ৪৫ মাইল পশ্চিমে সেদাশিরে এবং পরে ম্যালভেলিতে পরাজিত হয়ে শ্রীরঙ্গপত্তমে আশ্রয় নেন। সেখানে আক্রমণকারী ইংরেজবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে টিপু বীরের মৃত্যু বরণ করেন, ইংরেজ সৈন্য শহর লুণ্ঠন করে (৪ মে, ১৭৯৯ খৃঃ)।

মহীশূর রাজ্য জয় করে ইংরেজরা টিপু সুলতানের পরিবারকে ভেলোরে নির্বাসিত করে। সেখানে সিপাহীরা ১৮০৬ খৃস্টাব্দে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে, এতে রাজপরিবারের গোপন সমর্থন আছে, এই সন্দেহে পরিবারের সদস্যদের কলকাতায় নির্বাসনে রাখা হয়।

গ. অপরাপর রাজ্য জয় ও ইংরেজ শক্তির প্রসার

অধীনতামূলক মিত্রতা ঃ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্য সফল করতে ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫) তিনটি পন্থা গ্রহণ করেছিলেন—(i) অধীনতামূলক

মিত্রতা (ii) যুদ্ধ এবং (iii) পরাভূত শাসকদের রাজ্যাঞ্চল অধিগ্রহণ। অধীনতামূলক মিত্রতার স্বরূপ কি?

অধীনতামূলক মিত্রতা (Subsidiary Alliance) কথাটির মধ্যেই নীতির উদ্দেশ্য পরিস্ফুট—অধীনতা স্বীকার করে ইংরেজের মিত্রতা অর্থাৎ আশ্রয়গ্রহণ।

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির সূত্রাবলী

ওয়েলেসলি ঘোষণা করলেন—১. যে কোন দেশীয় রাজা ইংরেজের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে পারেন; ২. এইরূপ মিত্ররাজ্য ইংরেজের আনুগত্য স্বীকার করবে এবং দেশীয় অন্য কোন রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ সন্ধি বা মিত্রতা স্থাপন করতে পারবে না; ৩. ইংরেজ সরকার মিত্ররাজ্যের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে; ৪. মিত্ররাজ্যের খরচে একদল ব্রিটিশ সৈন্য ঐ রাজ্যে মোতায়েন থাকবে; ৫. মিত্ররাজ্য ব্রিটিশ ছাড়া অন্য কোন জাতির সামরিক প্রশিক্ষক নিযুক্ত করতে পারবে না; ৬. রাজ্যে একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট রাখতে সম্মতি দিতে হবে; ৭. অন্য কোন রাজ্যের সঙ্গে বিরোধে ইংরেজের পরামর্শ মেনে চলতে হবে এবং ৮. ইংরেজ কোম্পানিকে সার্বভৌম শক্তি বলে স্বীকার করতে হবে। মাকড়সা যেমন আঠামাখানো জাল বিস্তার করে পতঙ্গকে একবার ধরতে পারলে তার মুক্তির আশা থাকে না, ওয়েলেসলি তেমনি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ছড়িয়ে দেশীর রাজগুলোকে আবদ্ধ করতে প্রয়াসী হলেন।

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রয়োগঃ ১. প্রথমে হায়দরাবাদের নিজাম মারাঠা ও মহীশূরের ভয়ে ইংরেজের আশ্রয়ে অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করলেন।

হায়দ্রাবাদে ঐ নীতি

বার্ষিক ২৪ লক্ষ টাকার বিনিময়ে একদল ব্রিটিশ সৈন্য হায়দরাবাদে মোতায়েন থাকল। পরে সৈন্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য বেলারি ও কুড্ডাপা ইংরেজদের ছেড়ে দেওয়া হয়। হায়দরাবাদে ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল।

২. অযোধ্যার নবাব অধীনতামূলক মিত্রতা স্বীকার করে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল রোহিলখন্দ ও গোরক্ষপুর ইংরেজদের হাতে তুলে দিলেন। অযোধ্যা রাজ্যে ইংরেজ কর্তৃত্ব কায়েম হল।

৩. মহীশূরের টিপু সুলতান ইংরেজদের দাক্ষিণাত্য থেকে উৎখাত করার জন্য বিদেশী শক্তির সাহায্য নিতে পারেন এই আশংকায় ওয়েলেসলি টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ

মহীশূরে

ঘোষণা করেন (৪র্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ১৭৯৯)। আক্রমণকারী ইংরেজ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে টিপু বীরের মৃত্যুবরণ করেন। মহীশূর রাজ্যের কিছু অংশ ইংরেজ কোম্পানি অধিকার করে এবং অবশিষ্ট অঞ্চল পূর্বতন হিন্দু রাজপরিবারে ফেরত দেওয়া হয় এবং নতুন মহীশূর রাজ্য বস্তুত ইংরেজের অধীনরাজ্যে পরিণত হয়।

৪. মহারাষ্ট্রে ১৮০০ খৃস্টাব্দে নানা ফড়নবিশের মৃত্যুর পর সামন্ত নায়কদের মধ্যে

কলহ উপস্থিত, প্রত্যেকেই পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওকে নিজের আয়ত্তে রাখতে চেষ্টা করতে থাকে। পেশোয়া সিন্ধিয়ার সঙ্গে যোগ দিলে ক্ষুব্ধ হোলকার তাঁদের মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করে। এইরূপ অবস্থায় ভীত হয়ে পেশোয়া ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি গ্রহণ করেন। যদিও নানা ফড়নবিশ এই প্রস্তাব পূর্বে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বেসিন সন্ধি অনুসারে পেশোয়া ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তাঁর রাজ্যে এক ব্রিটিশ সেনাদল মোতায়েন রাখার শর্ত মেনে নেন এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে সার্বভৌম শক্তিরূপে স্বীকার করেন।

মহারাষ্ট্রে

৫. মারাঠা সামন্ত নায়ক ভোঁসলেকে পরাস্ত করে ওয়েলেসলি দেবগাঁও সন্ধি দ্বারা কটক ও বালেশ্বর অধিকার করেন। এর ফলে বাংলা থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত একটানা সমস্ত অঞ্চল ইংরেজের অধিকারে আসে।

৬. মারাঠাদের অন্যতম সামন্ত নায়ক সিন্ধিয়াকে পরাজিত করে আহমদনগর, বরোচ, দিল্লী ও আগ্রা ইংরেজের অধিকারে আনা হয়। ওয়েলেসলি একে একে কোম্পানির প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলিকে কূটনীতি ও অস্ত্রবলে পরাভূত করে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান।

মারাঠা শক্তি অন্যত্র

প্রধান মারাঠা নায়কগণ ইংরেজের কাছে মাথা নত করায় ছোট রাজ্যগুলো, যেমন যোধপুর, বুন্দি প্রভৃতি ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে। তখনকার একজন বিখ্যাত ইংরেজ কর্মচারী বলেছিলেন—'আমরা এখন পুরোপুরি ভারতবর্ষের প্রভু। আমরা যদি আমাদের ক্ষমতা স্থায়ী করতে চাই, কেউই আমাদের টলাতে পারবে না।'

ওয়েলেসলি ভারতে সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি (Forward Policy) অনুসরণ করে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্যের মানচিত্র সম্পূর্ণ বদলে দেন। অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ও যুদ্ধনীতি দ্বারা তিনি ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল কোম্পানির শাসনাধীন করেন। তাঁর কৃতিত্ব আলোচনা করে ঐতিহাসিক পি. ই. রবার্টস বলেছেন, সাত বছরকাল সময়ের মধ্যে তিনি বিপুল পরিবর্তন সাধন করেন, মারাঠাশক্তি চূর্ণ, হায়দরাবাদ ও অযোধ্যার মুসলিম শক্তি নিয়ন্ত্রিত, তাঞ্জোর, সুরাট এবং কর্ণাটক করায়ত্ত, সিন্ধিয়ার কাছ থেকে দিল্লী অধিকৃত, মহীশূর বশংবদ রাজ্যে পরিণত—এ সবই ওয়েলেসলির প্রচণ্ড কর্মশক্তির পরিচায়ক।

সাম্রাজ্য বিস্তারে ওয়েলেসলির কৃতিত্ব

লর্ড হেস্টিংস ঃ লর্ড ওয়েলেসলির পর লর্ড হেস্টিংস (১৮১২-১৮২৩) সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে ভারতে ব্রিটিশ শক্তিব প্রভূত বিস্তার সাধন করেন। বলা যায়, ওয়েলেসলির কার্যকলাপকেই তিনি পূর্ণতার দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব হল—

নেপাল যুদ্ধ (১৮১৪-১৫) ঃ অষ্টাদশ শতকে নেপালের গুর্খাদের রাজ্য পূর্বে

সিকিম থেকে পশ্চিমে বিপাশা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; দক্ষিণে সুনির্দিষ্ট সীমানা চিহ্ন না থাকায় ইংরেজ অধিকারে নেপালীদের প্রায়ই অনুপ্রবেশ ঘটত। ১৮১৪ খৃস্টাব্দে এইরূপ সীমান্তবিরোধ নিয়ে ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধ বাধে। লর্ড হেস্টিংসের নির্দেশে জেনারেল অক্টারলনি নেপালীদের যুদ্ধে পরাজিত করেন। ১৮১৬ খৃস্টাব্দে স্বাক্ষরিত সগৌলির সন্ধি দ্বারা ইংরেজরা গাড়োয়াল ও কুমায়ুন জেলা লাভ করে; সিমলা, মুসৌরি, নৈনিতাল, আলমোড়া ও রাণীক্ষেত অধিকার করা হয়; নেপাল সরকার কাঠমাণ্ডুতে একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট রাখতে রাজি হন।

ঘ. ইঙ্গ শিখ সম্পর্ক

শিখরাজ্যের উদ্ভব ঃ মোগলসম্রাটদের হাতে নির্যাতিত শিখগণ নেতৃহীন হয়েও পাঞ্জাবের পাহাড় পর্বতে ধর্ম ও সাহস অবলম্বন করে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করতে থাকে। নাদির শাহের দিল্লী আক্রমণের (১৭৩৮-৩৯ খৃঃ) ফলে মোগলশক্তি যখন টলায়মান তখন তারা ভিন্ন ভিন্ন দলে পাঞ্জাবে আত্মপ্রকাশ করে। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১ খৃঃ) মারাঠাদের পরাজয় এবং মোগলসাম্রাটের হীন অবস্থা শিখদের রাজ্যগঠনের পক্ষে পরম অনুকূল সময়। পাঞ্জাবে তখন তাদের বাধা দেবার কেউ না থাকায় শিখ নেতারা স্থানীয় জাঠদের শিখধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে নিজেদের দল ভারী করে এবং ছোট ছোট অঞ্চল দখল করে। ক্রমে তারা প্রায় সমগ্র পাঞ্জাব দখল করে বিজিত অংশ ১২টি 'মিস্‌ল' বা সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত করে।

শিখ রাজ্যের উদ্ভব

রণজিৎ সিংহ ও শিখরাজ্য ঃ পাঞ্জাবের সুকরচুকিয়া মিস্‌লের নেতা মোহন-সিংহের পুত্র রণজিৎ সিংহ (১৭৮০-১৮৩৯ খৃঃ) গুজরানওয়ালায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর মাত্র ১২ বৎসর বয়সে তিনি মিসলের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হন। কাবুলের জমানশাহ পাঞ্জাব আক্রমণকালে রণজিৎ সিংহের নিকট যে সহায়তা পেয়েছিলেন তার প্রতিদানে তিনি রণজিৎ সিংহকে লাহোরের শাসক নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে রাজা উপাধি প্রদান করেন (১৭৯৮ খৃঃ)। রণজিৎ সিংহ ক্রমে অন্যান্য মিস্‌লগুলি নিজের আয়ত্তে আনেন, অমৃতসর, কাশ্মীর, পেশোয়ার প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করেন এবং এক বিরাট স্বাধীন শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে 'মহারাজা' উপাধি ধারণ করেন।



রণজিৎ সিংহ

রণজিৎ সিংহ শতদ্রু নদীর পশ্চিমতীরের মিস্‌লগুলি নিজের অধীনে একত্রিত করেছিলেন। শতদ্রুর পূর্বপারের মিস্‌লগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে সেখানেও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হন। কিন্তু ইংরেজরা বাধা দিলে ইংরেজ কোম্পানি ও রণজিৎ সিংহের মধ্যে অমৃতসর সন্ধি (১৮০৯ খৃঃ) স্থাপিত হয়, যার দ্বারা শতদ্রু নদী শিখরাজ্যের পূর্বসীমা বলে নির্ধারিত হয়। রণজিৎ সিংহ দূরদর্শী, কূটনীতিজ্ঞ, রণদক্ষ শাসক ছিলেন।

শতদ্রুর পূর্বতীরে রণজিৎ সিংহের প্রভাব ব্যাহত

প্রথম শিখযুদ্ধ (১৮৪৫ খৃঃ) : ১৮৩৯ খৃস্টাব্দে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখরাজ্যে গোলযোগ দেখা দেয়। রাণী ঝিন্দনের তত্ত্বাবধানে নাবালক পুত্র দলীপ সিংহ রাজ্যভার গ্রহণ করেন কিন্তু দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী আয়ত্তে রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। রাজ্যের অশান্তির উৎস অন্যদিকে চালিত করার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীকে শতদ্রুর পূর্বপারে ইংরেজ অধিকার আক্রমণ করতে পাঠালে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৫ খৃঃ) শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে শতদ্রুর পশ্চিম পারস্থিত সমগ্র শিখ রাজ্য বাজেয়াপ্ত করা হল বলে ঘোষণা করেন। **মুদকি** ও **ফিরোজশা'র** যুদ্ধে শিখবাহিনী প্রবল বিক্রমে বহু ইংরেজ সৈন্য নিহত করেও পরাজিত হয়। পরবর্তী এক যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। সর্বাধিক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় শতদ্রু তীরে সোব্রাওন প্রান্তরে (১০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৬)। শিখসৈন্য অতুলনীয় বীরত্ব ও সংকল্পের পরিচয় দিয়েও সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ইংরেজ সৈন্য রাজধানী লাহোর অধিকার করে এবং সন্ধিপত্রে ইংরেজদের প্রায় সকল শর্তই শিখদের মেনে নিতে হয়।

রণজিৎ সিংহের পর

ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ

প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের ফলে শিখ রাজ্য সংকুচিত হল। শতদ্রুর দক্ষিণে যাবতীয় অঞ্চল ইংরেজদের ছেড়ে দিতে হয়। শিখ সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে এবং কামান ব্যবহার নিষিদ্ধ করে ইংরেজরা শিখবাহিনীকে দুর্বল, পঙ্গু করে রাখার পরিকল্পনা করেছিল। ডালহৌসি দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ দ্বারা পাঞ্জাব কোম্পানির রাজ্যভুক্ত করেন।

যুদ্ধের ফল

শিখরা প্রথম যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পারেনি। তারা ইংরেজের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য মনে মনে তৈরি হচ্ছিল। রাণী ঝিন্দনকে ইংরেজের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রের অভিযোগে লাহোর থেকে অপসারণ করায় তাদের অসন্তোষ আরও বেড়ে যায়। মুলতানের শাসনকর্তা দেওয়ান মুলরাজ বিদ্রোহ করলে দ্বিতীয় যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

ডালহৌসি ১৮৪৮ খৃস্টাব্দে ১০ অক্টোবর যুদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফের পরিচালনায় ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে শিখবাহিনীর তীব্র যুদ্ধ হয়

চিলিয়ানওয়ালায় এবং তীব্রতর যুদ্ধ হয় গুজরাটে (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৯)। অসীম

দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ

তেজের সঙ্গে যুদ্ধ করেও যোগ্য নেতার অভাবে শিখসৈন্য পরাজিত হয়। শিখদের স্বাধীন রাজ্যরক্ষার স্বপ্ন বিলীন হয়ে যায়। শিখরাজ্য ইংরেজের অধিকারে আসে। দলীপ সিংহ ও রাণী ঝিন্দনকে ইংলণ্ডে বসবাস করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ডালহৌসি ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার

লর্ড ডালহৌসি : উগ্র সাম্রাজ্যবাদী শাসক লর্ড ডালহৌসি—(১৮৪৮-৫৬ খৃঃ) ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে সার্বভৌম শক্তিতে রূপান্তরের কাজ সম্পূর্ণ করেন।

ডালহৌসির চরিত্র ও কৃতিত্ব

লর্ড ওয়েলেসলির পর তাঁর সমকক্ষ রাজ্যবর্ধক শাসক আর কেউ ভারতে আসেননি। বিভিন্ন অঞ্চল ও রাজ্য কোম্পানির শাসনভুক্ত করতে তিনি তিনটি নীতি অবলম্বন করেছিলেন— ১. স্বত্ববিলোপ নীতি, ২. যুদ্ধ, ৩. নানা অজুহাতে রাজ্য অধিকার।

স্বত্ববিলোপ নীতি কী ? ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতি (Doctrine of Lapse) ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে :

অধীনস্থ কোন রাজ্যের শাসক উত্তরাধিকারী (পুত্র) বিহীন অবস্থায় পরলোকগত হলে সেই রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানিতে বর্তাবে এবং দত্তকপুত্র কেবলমাত্র পরলোকগতর সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করবে।

মূলসূত্র তাৎপর্য

স্বত্ববিলোপ নীতি এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের সার্বভৌম শক্তি এবং কোন রাজ্যের শাসকের দত্তক গ্রহণ ব্যাপারে অনুমতি না দেবার অধিকার তার আছে।

রাজ্য অধিকার : ডালহৌসির রাজ্য অধিকার নীতি প্রয়োগের ফলে কোন্ কোন্ অঞ্চল ইংরেজ কোম্পানির শাসনাধীনে আসে ?

১. স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে ক. মহারাষ্ট্রে সাতারা, খ. বুন্দেলখন্দে জৈতপুর, গ. ওড়িশায় সম্বলপুর, ঘ. সিমলার নিকটস্থ ব্যাঘাত, ঙ. মধ্যপ্রদেশে উদয়পুর অধিকার করে নেওয়া হয়। এছাড়া **নাগপুর** ও বুন্দেলখন্দের **ঝাঁসী** ইংরেজরা দখল করে। ঝাঁসীর শাসক গঙ্গাধর রাও অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে রাণী লক্ষ্মীবাঈ দত্তকপুত্রের অভিভাবিকারূপে রাজকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। রাজ্যচ্যুত হয়ে তিনি সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করেন।

২. পিণ্ডারিদস্যুরা মধ্য ভারতে সাধারণ মানুষের জীবনে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল। লর্ড হেস্টিংস বিরাট সৈন্যবাহিনী দ্বারা এই দস্যুদের নির্মূল করে জনজীবনে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন। এজন্য কোম্পানি জনসাধারণের শুভেচ্ছা লাভ করেছিল।

৩. চতুর্থ ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে লর্ড হেস্টিংস পেশোয়া ও মারাঠা নায়কদের ইংরেজের

বিরুদ্ধে সম্মিলিত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে মারাঠাশক্তি পুনরুত্থানের শেষ প্রয়াস বিফল করে দেন। লর্ড ওয়েলেসলির আমলে পেশোয়া অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করে যে ভুল করেছিলেন তা সংশোধন করার চেষ্টায় সমরে অবতীর্ণ হন কিন্তু সহযোগী ভোঁসলে ও হোলকারসহ বারবার পরাজিত হয়ে ইংরেজের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ইংরেজের বৃত্তি নিয়ে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। লর্ড হেস্টিংস লর্ড ওয়েলেসলির অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে ভারতে ইংরেজ প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

সিন্ধু অধিকার ঃ ইংরেজ আধিপত্য যখন প্রায় সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত তখন ভারতের স্বাভাবিক সীমান্ত পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তারের বাসনা কোম্পানির শাসকদের মনে জাগে। সিন্ধুদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে, এর নদীপথে আফগানিস্তানে সৈন্যসামন্ত, রসদ পাঠান সহজ ; ওদিকে পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংহ যদি সিন্ধু জয় করে নেন তাঁর শক্তিবৃদ্ধি হবে। কাজেই ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে লর্ড এলেনবরা (১৮৪২-৪৪) সিন্ধুর আমীর (শাসক)-কে চোখ রাঙিয়ে সিন্ধু দখল করে নিলেন (১৮৪৩)।

সিন্ধুদেশ ও ব্রিটিশ শক্তি

২. যুদ্ধ দ্বারা অধিকৃত রাজ্যগুলি হল (ক) পাঞ্জাব (খ) ব্রহ্মদেশ।

(খ) ব্রহ্মদেশ ঃ দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ দ্বারা ব্রহ্মদেশের দক্ষিণাংশ পেগুপ্রদেশ অধিকার করা হয়।

লর্ড আমহার্স্টের আমলে (১৮২৪-২৬) প্রথম যুদ্ধ দ্বারা ব্রহ্মের উত্তরাঞ্চলে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রিটিশ বণিকদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে এই কারণ দেখিয়ে লর্ড ডালহৌসি দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং অনায়াসে দক্ষিণাংশের পেগুপ্রদেশ অধিকার করে নেন। ১৮৫২ খৃস্টাব্দে রেঙ্গুনে রাজধানী করে ব্রহ্মপ্রদেশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৩. কুশাসনের অজুহাত দেখিয়ে ডালহৌসি যে রাজ্যগুলি অধিকার করেন তা হল (i) **অযোধ্যা** ও (ii) **সিকিম**। এছাড়া অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির শর্ত হিসাবে ব্রিটিশ সৈন্যের ব্যয়ভার বহন করার জন্য হায়দরাবাদের নিজামকে **বেরার** প্রদেশ ইংরেজদের হাতে দিতে বাধ্য করা হয়। ডালহৌসির কার্যকলাপ থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছিল যে, যে কোন পন্থায় ভারতে ইংরেজ শক্তিকে সার্বভৌম শক্তিতে পরিণত করাই ছিল সাম্রাজ্যবাদী নীতি।

———

৬.

ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি

ইংরেজ শাসনক্ষমতা বৃদ্ধির স্বরূপ ঃ বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজরা সামরিক শক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখিয়েছিল। সেখানে ভারতীয়দের শিবির থেকে মীরজাফরের মত কোন বিশ্বাসঘাতক ইংরেজদের সাহায্য করেনি। তথাপি ইংরেজ সেনাপতি মন্‌রো প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক যুদ্ধে জয়লাভ করেন। রাজনৈতিক দিক থেকেও বক্সারের গুরুত্ব পলাশীর তুলনায় অধিক ছিল। ক্লাইভের বিজয়ের ফলে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়, মন্‌রোর জয় তাকে সম্পূর্ণ করে। বক্সার ভারতের ইতিহাসের অন্যতম চূড়ান্ত যুদ্ধ ; এর ফলে বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অযোধ্যায় ইংরেজদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার পথ প্রস্তুত হয়।

ক্লাইভ থেকে মন্‌রো

দেওয়ানির তাৎপর্য ঃ ক্লাইভ দিল্লী সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে যে 'ফরমান' সংগ্রহ করেন তার দ্বারা কোম্পানিকে চিরকালের জন্য বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি দেওয়া হয় (১২ আগস্ট, ১৭৬৫)। এর পরিবর্তে বাংলার রাজস্ব থেকে তাঁকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার ফলে কোম্পানি বাংলা সুবার (বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার) ওপর পূর্ণ অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করল। সম্রাটকে ২৬ লক্ষ এবং নবাবের ব্যয়নির্বাহের জন্য ৫৩ লক্ষ টাকা দেওয়ার পর উদ্বৃত্ত রাজস্বের ওপর কোম্পানির পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে। এই উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে সুবার প্রতিরক্ষার জন্য সৈন্যদল প্রতিপালন এবং নিজামতের (শাসন-পরিচালনার) ব্যয় নির্বাহ হবে। পূর্বে নাজিম বা সুবাদার এই সকল দায়িত্ব পালন করতেন।

বাংলা সুবার পূর্ণ অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব

কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে দেখলে শাহ আলম কেবল নামেমাত্র সম্রাট ছিলেন। তিনি তখনও দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নি ; তিনি কোন রাজ্যেরও শাসক ছিলেন না। যে প্রদেশের ওপর তাঁর কোন কর্তৃত্ব নেই সেই প্রদেশের জন্য দেওয়ান নিয়োগ করার কোন অধিকার তাঁর ছিল না। এ ছাড়া মুর্শিদকুলি খাঁর সময় থেকে সুবাদারই বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করতেন, সম্রাট তাঁকে নিয়োগ করতেন না। ক্লাইভের আদায়-করা ফরমানটি

প্রকৃত রাজনৈতিক অবস্থা

প্রকৃতপক্ষে ছিল একটি আইনের ফাঁকি। দেওয়ানি লাভের কয়েক মাস আগে নাজিমুদ্দৌল্লার সঙ্গে সন্ধির ফলে কোম্পানি যে ক্ষমতা লাভ করে মোগল সম্রাটের অনুমোদন নিয়ে তাকে আইনসঙ্গত করাই ক্লাইভের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বাংলার রাজস্বের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব চেয়েছিলেন। তাঁর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই রাজস্বের এক অংশ কোম্পানির বাণিজ্যে বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করা। এই ব্যবস্থার ফলে কোম্পানি ইংলণ্ড থেকে মূলধন না এনেও বাণিজ্য করার সুযোগ পায়। ক্লাইভের অন্য উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানির ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের শান্ত রাখা। কোম্পানি প্রকাশ্যে বাংলা শাসন করলে ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা তাদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত হত। তাই প্রকৃত উদ্দেশ্য আড়াল করে রাখতে ভারতে আইনসঙ্গত অধিপতি মোগলসম্রাটের নাম আবরণস্বরূপ ব্যবহার করা হল।

ক্লাইভের লক্ষ্য ও ফরমানের আইনের ফাঁক

শাহ আলমের 'ফরমানের' প্রত্যক্ষ ফল বাংলায় দেওয়ানরূপে কোম্পানির এবং নাজিম রূপে নবাবের দ্বৈত শাসন প্রতিষ্ঠা। আপাতদৃষ্টিতে এর ফলে মোগলযুগের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হল কিন্তু ১৭৬৫ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বাক্ষরিত চুক্তির মাধ্যমে নবাব নাজিমুদ্দৌলা প্রশাসনের ও সৈন্যবাহিনীর ওপর কর্তৃত্ব ত্যাগ করে কোম্পানির বৃত্তিভোগী হন। অতএব ইংরেজরা নাজিম ও দেওয়ান উভয়ের ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বাংলার প্রকৃত শাসকে পরিণত হয়। তবে ক্লাইভ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ না করে মুখোশে-ঢাকা শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। কোম্পানি বাংলায় রেজা খাঁ ও বিহারে সিতাব রায়ের ওপর দেওয়ানি ও নিজামত বিভাগের সকল দায়িত্ব অর্থাৎ রাজস্ব আদায়, দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার, পুলিশব্যবস্থা ও সাধারণ প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। কোম্পানির মনোনীত ব্যক্তিরূপে তাঁরা কোম্পানির স্বার্থরক্ষা ও তার আদেশ পালন করতেন। কাজেই প্রকৃতপক্ষে দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা ছিল না, কারণ নবাব ইংরেজদের সমকক্ষ অংশীদার না হয়ে তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হলেন। এই ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ক্ষমতা ও দায়িত্বের মধ্যে বিভেদ। ইংরেজরা পূর্ণ প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষমতার অধিকারী হল কিন্তু দেশের সুশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করল না। এর ফল কোম্পানি এবং বাংলার প্রজাসাধারণ উভয়ের পক্ষেই শোচনীয় প্রমাণিত হল। জনগণের দুর্ভোগ বাড়ল, কোম্পানির কর্মচারী এবং নায়েব-দেওয়ানরা প্রভূত ধনের মালিক হল।

দেওয়ানির প্রত্যক্ষ ফল

দ্বৈত শাসনের স্বরূপ

একথা অনস্বীকার্য যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন লর্ড ক্লাইভ। কিন্তু তারপর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে দুজনকে গভর্নর হিসাবে পাঠিয়েছিলেন, তারাই ছিলেন ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের দৃঢ় বুনিয়াদ স্থাপয়িতা।

তাঁরা বিদেশী শক্তির শোষণ কায়েম রাখতে দেশের সামগ্রিক শক্তিকে কাজে

লাগাবার কথাই ভেবেছিলেন। তাঁরা জানতেন, বিদেশী হিসাবে ব্যাপক গণ সমর্থন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তাঁরা সচেষ্ট ছিলেন দেশের শক্তিমান জনসংখ্যাকে সুযোগ দিয়ে তাঁদের সমর্থক করে তুলতে। ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে ওয়ারেন হেস্টিংস এবং কর্ণওয়ালিসের শাসন সংস্কারের বৈশিষ্ট্য এখানে। তাঁদের শাসন সংস্কারগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিচার করা যায়।

১. **রাজস্ব ব্যবস্থা ঃ** দ্বৈতশাসন যে ব্রিটিশস্বার্থকে পুষ্ট করবার পক্ষে যথেষ্ট নয় এবং মূলতঃ ব্যর্থ, তা প্রমাণিত হতে হেস্টিংস প্রথমেই ঐ ব্যবস্থা নাকচ করে দিলেন।

হেস্টিংস মহম্মদ রেজা খাঁ ও সিতাব রায়কে নায়েব পদ থেকে অপসারিত করলেন। এখন থেকে কোম্পানি সাক্ষাৎভাবে দেওয়ানের দায়িত্ব গ্রহণ করল এবং কোম্পানির কর্মচারীগণ রাজস্ব ব্যবস্থার তদারক ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। রাজস্ব আদায়ের পন্থা হিসাবে ব্যবস্থা হল যিনি নীলামে সর্বোচ্চহারে রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হবেন, তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া। প্রত্যেক জেলায় রাজস্ব ও সাধারণ প্রশাসনের দায়িত্ব দেওয়া হল একজন ইংরেজ কালেক্টরের ওপর। কালেক্টরকে সাহায্য করার জন্য নিযুক্ত হলেন একজন ভারতীয় দেওয়ান। ফাটকাবাজরা উচ্চ নীলাম দরে রাজস্ব আদায়ের অধিকার কিনে নিয়ে জমিদারদের হটিয়ে দিল, তারা প্রজার কাছ থেকে জুলুম করে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করতে গিয়ে তাদের দুর্দশা বাড়িয়ে দিল, কিন্তু তারাও আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করতে পারল না। ফলে রাজস্বসংগ্রহের এই পরীক্ষামূলক ব্যবস্থায় জমিদার, চাষী এবং রায়তের দুর্ভোগ হল প্রচুর আর কোম্পানি নিদারুণ আর্থিক ক্ষতি ভোগ করল।

ওয়ারেন হেস্টিংসের সংস্কার

পঞ্চবার্ষিক স্বত্বনীতি

২. **রাজস্ব ঃ** ওয়ারেন হেস্টিংস পাঁচ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ জমিদারদের কাছ থেকে কালেক্টর মারফৎ রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই ব্যবস্থায় প্রজার কাছ থেকে কড়াকড়ি করে খাজনা আদায়ে যতখানি স্বার্থ ছিল, প্রজার চাষ-আবাদের উন্নতির প্রতি ততখানি উৎসাহ ছিল না। কারণ, পাঁচ বছর পরে জমিদারি তাঁদের হাতে থাকবে কিনা তা নিশ্চিন্ত ছিল না। কর্ণওয়ালিস নিজে ইংল্যাণ্ডের একজন বিখ্যাত জমিদার। জমিদারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি এই মালিকানার অবসান ঘটানর উদ্দেশ্যে প্রথমে ১০ বছরের মেয়াদে, পরে ১৭৯৩ খৃস্টাব্দের ২২ মার্চ থেকে **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত** (Permanent Settlement) দ্বারা জমিদারদের রাজস্বের ১১ ভাগের ১০ ভাগ কালেক্টরকে জমা দেবার শর্তে জমির স্থায়ী মালিকানা দিলেন।

কর্ণওয়ালিস জেলার সংখ্যা কমিয়ে ২৩ করলেন। কালেক্টরদের মাসিক বেতন বৃদ্ধি করে ১৫০০ টাকা করলেন এবং তাঁদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য করার অধিকার

* Thus the Zamindars, Farmers and Ryots all suffered, while Company also incurred serious losses. Advanced Hist. of India, part 3, p 785

বাতিল করে আদায় করা রাজস্বের শতকরা এক ভাগ কমিশন দেবার ব্যবস্থা করলেন।

৩. **বিচারব্যবস্থা** ঃ ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় রাজস্ব ও বিচারব্যবস্থা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। দেওয়ানি গ্রহণে এই দুই দায়িত্বই কোম্পানির হাতে এসেছিল। কোম্পানি কালেক্টর মারফৎ রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে বিচারব্যবস্থাও প্রবর্তন করল। প্রতি জেলায় একটি **দেওয়ানি আদালত** ও একটি **ফৌজদারি আদালত** স্থাপিত হয়। টাকা-কড়ি-সংক্রান্ত মামলা দেওয়ানি আদালতে এবং হত্যা, শান্তিভঙ্গ ইত্যাদি অপরাধমূলক মামলার বিচারের ভার ছিল ফৌজদারি আদালতের ওপর। এছাড়া কলকাতায় স্থাপিত **সদর দেওয়ানি** ও **সদর ফৌজদারি আদালতে** জেলার আদালত থেকে আপীল করা চলত। দেওয়ানি ও সদর দেওয়ানি আদালতের বিচারক হতেন যথাক্রমে কালেক্টর এবং সপরিষদ্ কাউন্সিলের সভাপতি অর্থাৎ গভর্নর জেনারেল স্বয়ং। পুরাতন রীতি অনুসারে ফৌজদারি আদালত ভারতীয় বিচারকদের অধীনেই ছিল। তবে দেওয়ানি ও সদর দেওয়ানি আদালতের ওপর কালেক্টর ও কাউন্সিলের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকত।

১৭৭৪ খৃস্টাব্দে জেলা বিচারালয়ে (District Courts) 'আমিল' নামক ভারতীয় কর্মচারি নিযুক্ত হয়। প্রতি জেলায় ফৌজদারি বিচারের জন্য একজন করে ফৌজদার নিয়োগ করা হয়।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে ১৭৭৪ খৃস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়। একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন বিচারক নিয়ে গঠিত সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ার ছিল শুধু ব্রিটিশ প্রজার ওপর। এই অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে পরে জটিলতা দেখা দিয়েছিল।

৪. **নতুন বিচার ব্যবস্থা** ঃ দেওয়ানি ও রাজস্বসংক্রান্ত বিষয় বিচারের জন্য কর্ণওয়ালিস **জিলা আদালত** (Zilla Court) গঠন করেন। এর ওপর ৪টি **প্রাদেশিক আদালত** (Provincial Court) কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ও পাটনা শহরে স্থাপিত হয়। সবার ওপরে আপীল শুনানির জন্য ছিল সদর দেওয়ানি আদালত।

ফৌজদারি মামলার বিচারের ভার ছিল নবাবের হাতে। তাঁর পক্ষে ডেপুটি নবাব মহম্মদ রেজা খাঁ মুর্শিদাবাদে স্থাপিত সদর নিজামত আদালতে ফৌজদারি মামলার বিচার করতেন। জেলাগুলিতে দারোগার ওপর এইরূপ বিচারের ভার ছিল। কর্ণওয়ালিস রেজা খাঁকে পদচ্যুত করে স্বয়ং ডেপুটি নবাবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। জেলা দারোগার পরিবর্তে বিচারের ভার প্রদত্ত হয় প্রাদেশিক শহরে স্থাপিত চারটি ভ্রাম্যমান আদালতের (Court of Circuit) ওপর। ভারতীয় উপদেষ্টার সহায়তায় দুজন করে কর্মচারী প্রাদেশিক অঞ্চলে বছরে দুবার গিয়ে বিচার ব্যবস্থা চালাতেন।

নতুন ব্যবস্থায় কালেক্টরের ওপর ছিল শাসনকার্য ও রাজস্ব আদায়ের ভার, জেলাজজের ওপর দেওয়ানি মামলা ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের ওপর ফৌজদারি মামলা

বিচারের দায়িত্ব। এইভাবে শাসন ও বিচারকার্য দুই ধরনের পৃথক কর্মচারীর ওপর ন্যস্ত করা হয়। আইনের শাসন ব্যাপক করে কর্ণওয়ালিস বিধান দিয়েছিলেন যে সরকারি আদালত, সরকারি কর্মচারী এমন কি গভর্নমেণ্টেরও বিচার করতে পারবে।

আইনের শাসন (Rule of Law) প্রবর্তন কর্ণওয়ালিস সংহিতার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এর দ্বারা মোগল আমলে প্রচলিত স্বেচ্ছামূলক ব্যবস্থা এবং ক্ষমতার অবাধ প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন সম্ভব হল। আদালতে প্রযোজ্য আইনের শাসন হল সবার ওপরে। এই ব্যবস্থায় প্রজার নাগরিক অধিকারের গোড়াপত্তন হল এবং এর ফলে ক্রমে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন সম্ভব হয়।

৫. নতুন পুলিশ ব্যবস্থা : জমিদারদের নিজস্ব এলাকায় শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ রাখার অধিকার ছিল। কর্ণওয়ালিশ পুলিশ ব্যবস্থা জমিদারদের হাত থেকে নিয়ে প্রথমে কলকাতায়, পরে জেলাগুলিতেও পুলিশ নিযুক্ত করেন। ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে সংকলিত কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত বিধিগুলি **কর্ণওয়ালিশ কোড** (Cornwalish Code) নামে পরিচিত।

৬. রাজস্ব বৃদ্ধির প্রচেষ্টা : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথমে বঙ্গদেশ ও বিহারে প্রবর্তিত হয় ; পরে উড়িষ্যা, মাদ্রাজের উত্তরাংশের জেলাগুলি এবং বারাণসী জেলাতেও এই ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়। মধ্যভারত ও অযোধ্যার কোন কোন অংশে অস্থায়ী জমিদারি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল। এতে জমিদারদের জমির ওপর স্থায়ী স্বত্ব দেওয়া হয় কিন্তু তাদের দেয় রাজস্ব কিছুকাল অন্তর অন্তর পুনর্নির্ধারণ করা হত। বিদেশী শাসক ইংরেজকে যারা নানাভাবে সাহায্য করেছে তাদের ভূমি দিয়ে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা হলে অন্য এক ধরনের জমিদার সৃষ্টি হয়।

৭. রাজস্ববৃদ্ধির প্রয়োজন : ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে রাজস্ব থেকে প্রশাসনের ব্যয়ভার বহন করতে হত। এছাড়া কোম্পানির মালিক অংশীদারদের লাভের টাকা ও ব্যবসা চালানোর জন্য মূলধন যোগান দেওয়ার দায়িত্বও ছিল। এরূপ অবস্থায় রাজস্ব বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। কোম্পানি দেওয়ানি হাতে নিয়ে প্রথম দিকে রাজস্ব আদায়ের জন্য পূর্বের ব্যবস্থা অনুসরণ করলেও রাজস্বের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৭২২ খৃস্টাব্দে সংগৃহীত রাজস্ব ছিল ১,৪২,৯০,০০০ টাকা ; ১৭৬৪ খৃস্টাব্দে ছিল ৮১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। ১৭৭১ খৃস্টাব্দে ঐ রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলেও আশানুরূপ রাজস্ববৃদ্ধি হল না। রাজ্যের অন্য অংশে পৃথক ধরনের রাজস্ব-বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয়।

রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত : দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে জমিদারি প্রথা ছিল না। সেখানে ভূমিচাষীর সঙ্গে সরাসরি রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করা হয়। এর ফলে রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদারকে রাজস্বের একটা অংশ খরচ বাবদ দেওয়ার প্রয়োজন হত না। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে এই প্রথা উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে চালু করা হয়। এটি স্থায়ী বন্দোবস্ত নয়, ২০ থেকে ৩০ বছর পর পর এর পুনর্বিন্যাস

হয় এবং প্রতিবারেই রাজস্ব-পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়।

মহল-ওয়ারি ব্যবস্থা ঃ গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চল, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, মধ্য-ভারতের কিছু অংশ এবং পাঞ্জাবে মহলওয়ারি রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এ ব্যবস্থায় গ্রাম বা মহলের তরফ থেকে জমির মালিক বা গ্রামের প্রধানদের সঙ্গে সমবেতভাবে রাজস্ব-ব্যবস্থা নির্ধারিত হয়। পাঞ্জাবে গ্রাম-ভিত্তিক বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয়। মহল বা গ্রামের নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদানের দায়িত্ব থাকত সমগ্রভাবে গ্রামবাসীদের ওপর। জমিদারি ও রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় দেশের প্রচলিত ভূমিব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন হয়ে গেল। এর সুফল কৃষকের কাছে পৌছল না। সারা দেশে ভূমি করা হল বিক্রয়যোগ্য, বন্ধক রাখার যোগ্য এবং হস্তান্তরযোগ্য। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল যাতে সরকারের রাজস্ব আদায়ে কোনরূপ অসুবিধা দেখা না দেয়। রায়ত প্রয়োজনে জমি বিক্রি করে বা বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে খাজনা শোধ করতে পারত কিংবা সে অসমর্থ হলে সরকার তার জমি নীলাম করে খাজনা আদায় করতে পারত। জমি বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তি গণ্য হওয়ার হলে ভারতীয় সমাজ-জীবন ও গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তন সূচিত হয়।

৭. শিল্প ও বাণিজ্য

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তার : ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন ভারতে বাণিজ্য শুরু করে তখন ১৬০০ খৃস্টাব্দ থেকে ১৭৫৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানি নিছক একটি বাণিজ্য-সংস্থার ভূমিকা পালন করেছিল। তারা মূল্যবান ধাতু বা পণ্যবস্তুর বিনিময়ে ভারত থেকে বস্ত্র, মশলা প্রভৃতি ক্রয় করে বিদেশে বিক্রি করে লাভ করত। স্বভাবতই তারা নিজেদের স্বার্থে বিদেশে ভারতীয় পণ্যের বাজার বাড়ানোর চেষ্টা করত। এদের উদ্যমের ফলে বিদেশে ভারতীয় উৎপন্ন পণ্যের চাহিদা বাড়ত, রপ্তানি বেশি হত, ভারতের উৎপাদক লাভবান হত। বাণিজ্য মাধ্যমে দেশে অর্থাগম হত বলে ভারতীয় শাসকগণ কোম্পানিকে তাঁদের অঞ্চলে কারখানা স্থাপন করতে উৎসাহ দিতেন। তখন কোম্পানি ছিল লক্ষ্মীর বাহন। কিন্তু ইংরেজ উৎপাদকরা ভারতীয় পণ্যের জনপ্রিয়তা রীতিমত ঈর্ষার চোখে দেখত। ভারতের উত্তম হালকা সুতীবস্ত্র ইংলণ্ডে এমন জনপ্রিয় হল যে লোকে তাদের দেশের তৈরী মোটা পশম বস্ত্রের পরিবর্তে হালকা সুতীবস্ত্র ব্যবহার করতে লাগল। ভারতের ক্যালিকো বা সুতীদ্রব্য ইংরেজদের ঘরে ঘরে স্থান করে নেয়। ইংলণ্ডের উৎপাদকেরা ভারতের পণ্য ওদেশে বন্ধ করার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগল এবং ১৭২০ খৃস্টাব্দে ছাপানো বা রঙিন সুতীবস্ত্র

পুরাতন রীতি

ইংরেজ আমলে বিপরীত সরকারী নীতি

ব্যবহার নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করা হল। ১৭৬০ খৃস্টাব্দে এক ভদ্রমহিলার কাছে আমদানি-করা একখানা রুমাল থাকায় তাঁকে ২০০ পাউণ্ড জরিমানা দিতে হয়। এছাড়া সাদামাটা বস্ত্র আমদানির ওপরও মোটা হারে শুল্ক ধার্য করা হয়, উদ্দেশ্য ইংলণ্ডের অধিবাসীদের কাছে ভারতীয় বস্ত্র এমন দুর্মূল্য করে তোলা যাতে তারা ঐ পণ্য ক্রয় করতে আগ্রহী না হয়। কিন্তু এই প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও ভারতের রেশম ও সুতীবস্ত্র ১৮শ শতক পর্যন্ত ইংলণ্ডের বাজার ধরে রাখতে পেরেছিল। তার পরেই অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল।

ভারতীয় শিল্পের পতন

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নতুন ভূমিকায়ঃ ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করায় তাদের বণিকের ভূমিকায় গুণগত পরিবর্তন দেখা গেল। রাজনৈতিক ক্ষমতাবলে তারা ভারতীয় বাণিজ্যের বিস্তার ঘটালো, বাংলার রাজস্ব ভারতীয় পণ্য রপ্তানির ব্যবসায়ে নিয়োগ করতে লাগল। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে ভারতীয় উৎপাদকদের লাভবান হওয়ার কথা কিন্তু ইংরেজ শাসক কোম্পানি তাঁতীদের কোম্পানির নির্ধারিত কমমূল্যে উৎপাদিত মাল বিক্রয় করতে বাধ্য করল; তাদের কাজের স্বাধীনতাও কেড়ে নেওয়া হল; কোম্পানির কারখানায় কম মজুরিতে তাদের কাজ করতে বাধ্য করা হল; দেশী বা বিদেশী অন্য কোন প্রতিযোগী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যাতে নিপুণ কর্মীদের কাজে নিযুক্ত করতে না পারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এমন ব্যবস্থাও করল। অধিকন্তু কোম্পানির কর্মচারীরা তুলা বিক্রির একচেটিয়া অধিকার হাতে নিয়ে বাংলার তাঁতশিল্পীর কাছ থেকে অধিক মূল্য আদায় করতে লাগল। এই ব্যবস্থার ফলে তাঁতীরা দুই দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে—ক্রেতা হিসাবে চড়া দামে ক্রয়, বিক্রেতা হিসাবে কম দামে বিক্রয়। এই সঙ্গে ভারতীয় বস্ত্র ইংলণ্ডে রপ্তানি করতে ওদেশে চড়া হারে শুল্ক ধার্য করা হল। ঐ সময় ইংলণ্ডে যন্ত্র-উৎপাদিত বস্ত্র ভারতীয় বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যাতে টিকতে পারে সেই উদ্দেশ্যে উচ্চহারে আমদানি শুল্ক বসানো হয়েছিল কারণ তখনও ভারতের বস্ত্র মানের উৎকর্ষে এবং মূল্যের অনুপাতে ব্রিটিশ বস্ত্র অপেক্ষা বেশি আকর্ষণীয় ছিল। এতৎসত্ত্বেও ভারতীয় বস্ত্র ইংলণ্ডের বাজারে তার নিজের স্থান কিছুটা রেখেছিল কিন্তু ১৮১৩ খৃস্টাব্দের পর ভারতীয় হস্তশিল্পের আসল দুর্দিন শুরু হল। তখন শুধু বিদেশের বাজারই হাতছাড়া হল না, ভারতেও শিল্পের সংকট দেখা দিল।

ভারতীয় শিল্পের সঙ্কটের সূচনা

ভারতীয় শিল্পের অবনতিঃ ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব সে দেশের সমাজ ও অর্থনীতিতে বিরাট পরিবর্তন আনে; যন্ত্র সহায়তায় শিল্পের উন্নতি ও দ্রুত বিস্তার ঘটে। ব্রিটেন বাণিজ্য বিস্তার করে অনেক দেশের বাজার প্রায় একচেটিয়াভাবে দখল করে ফেলে। উৎপাদন এবং শিল্প পণ্যদ্রব্যের মানের উন্নতি ঘটিয়ে ব্রিটিশ উৎপাদনকারীরা ইংরেজের উপনিবেশে এবং অনুন্নত দেশগুলিতে শিল্পদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করতে থাকে। তারা এই সকল

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতি

যন্ত্রশিল্পে অনগ্রসর দেশ থেকে কৃষিজাত ও খনিজ কাঁচামাল নিজ দেশে নিয়ে যেত এবং সেখান থেকে যন্ত্রে উৎপাদিত দ্রব্য এইসব দেশে রপ্তানি করত। ভারত থেকে এইভাবে কৃষিজাত দ্রব্য ইংলণ্ডে রপ্তানি হত এবং এই কাঁচামাল দিয়ে এদেশে শিল্প কারখানা স্থাপন করতে দেওয়া হত না, কারণ তাতে ভারতের লাভ হত কিন্তু ক্ষতি হত ইংলণ্ডের। ব্রিটেনে নতুন উৎপাদক-শ্রেণী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিচালন ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এরা অর্থ উপার্জন করত পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের মাধ্যমে, বাণিজ্য করে নয়। কাজেই এরা ভারত থেকে পণ্য আমদানি করে ব্যবসা করতে আগ্রহী ছিল না, এরা চাইত নিজেদের কলকারখানার শিল্পজাত দ্রব্য ভারতে রপ্তানি করতে এবং ভারত থেকে কাঁচামাল হিসাবে তুলা ব্রিটেনে আমদানি করতে। বস্ত্রশিল্প তখন ইংলণ্ডের প্রধান শিল্প। ১৭৬৯ খৃস্টাব্দে ব্রিটিশ শিল্পপতিরা আইন করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বছরে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ড মূল্যের শিল্পদ্রব্য রপ্তানি করতে এবং ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে বছরে ৩ হাজার টন মাল বহনে বাধ্য করে।

ভারত হবে কাঁচামালের সরবরাহ কারক ও বাজার

ব্রিটিশ শিল্পপতিদের বস্ত্রশিল্পের বাজার কিরূপ স্ফীত হয়েছিল তা বোঝা যায় কয়েক বছরের রপ্তানির পরিমাণ থেকে। ১৭৯৪ খৃস্টাব্দে ভারতে ১৫৬ পাউণ্ড মূল্যের ব্রিটিশ সুতীবস্ত্র এসেছিল ; ১৮১৩ খৃস্টাব্দে ভারতে আমদানি হয় প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ডের সুতীদ্রব্য অর্থাৎ প্রায় ৭০০ গুণ বেশি। ব্রিটিশ শিল্পপতিরা এতেই সন্তুষ্ট ছিল না ; রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর বিখ্যাত Economic History of India গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ১৮১২ খৃস্টাব্দে পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটির উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে ভারতীয় শিল্পদ্রব্য হটিয়ে ব্রিটিশ শিল্পজাত বস্ত্র ভারতে চালু করা যায় এবং কিভাবে ভারতীয় শিল্প উৎখাত করে ব্রিটিশ শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো যায় তার উপায় উদ্ভাবন করা।

ব্রিটিশ লাভের হিসাব

কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার লোপ ঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করছিল ব্রিটিশ শিল্পপতিদের পক্ষে ভারত শোষণে তা প্রতিবন্ধকস্বরূপ ছিল। শিল্পপতিরা ভারতের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ কামনা করেছিল যাতে তারাও বাণিজ্যে অংশ নিতে পারে। ১৭৯৩ থেকে ১৮১৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আন্দোলন করে তারা পার্লামেণ্টকে দিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লোপ করায়। এর ফলে কৃষি-ভারত ব্রিটিশের অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত হয়। ভারত সরকার মুক্ত বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করে অর্থাৎ ব্রিটিশ পণ্য অবাধে ভারতের বাজারে আসার সুযোগ পায়। এদেশে আমদানি-কৃত ব্রিটিশ পণ্য বিনা শুল্কে অথবা নামমাত্র শুল্কে ভারতের বাজারে উপস্থিত হয় ; ভারতের হস্তশিল্প ব্রিটিশ পণ্যের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়। ইংলণ্ডের কাপড়ের কলগুলিতে উন্নত পদ্ধতিতে প্রস্তুত বস্ত্র সস্তাদরে বিক্রয় হতে থাকলে ভারতের হাতে-তৈরী কাপড়

ব্রিটিশ অবাধ পণ্যনীতি

তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারল না। তখনকার ভারত সরকার ভারতের শিল্পের নয়, ব্রিটিশ শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাই ভারতীয় শিল্পকে রক্ষার বা তার উন্নতির কোন ব্যবস্থা করা হল না। বরং বিদেশী পণ্যকে ভারতে অবাধ প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হল। এর ফলে ভারতে ব্রিটিশ সুতীবস্ত্রের আমদানি ১৮১৩ খৃস্টাব্দে ১ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ডের স্থানে ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে ৬৩ লক্ষ পাউণ্ডে পৌছায়।

অ-সম নীতি ঃ ভারতে বিদেশী পণ্যের অবাধ প্রবেশ অধিকার দেওয়া হলেও ভারতীয় হস্তশিল্পজাত-সামগ্রী ইংলণ্ডে রপ্তানি করতে উচ্চহারে শুল্ক দিতে হত। কতক ভারতীর সামগ্রীর ওপর ব্রিটেনে এত বেশি হারে শুল্ক আরোপ করা হত যে, তা রপ্তানি বন্ধ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় ১৮২৪ খৃস্টাব্দে ভারতীয় ক্যালিকোর ওপর ধার্য আমদানি শুল্ক ছিল ৬৭½% এবং ভারতীয় মসলিনের ওপর ৩৭½%। কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয় পণ্যের ওপর ব্রিটিশ আমদানি শুল্ক ছিল শতকরা ৪০০ ভাগ। ব্রিটিশ বাণিজ্যনীতির এই অন্যায় অ-সম দিক উল্লেখ করে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক উইলসন বলেছেন, ভারতের নিজস্ব শিল্প ধ্বংস করে ব্রিটিশ শিল্পের পুষ্টি সাধন করা হয়েছে। ভারত স্বাধীন থাকলে সে এর প্রতিশোধ নিত কিন্তু সে বিদেশের অধীনে অসহায়। তাই ন্যায়ের পথে তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা না করে অন্যায় উপায়ে তার শিল্পকে হত্যা করা হয়েছে।

নীতির বৈষম্য

কাঁচামাল রপ্তানি ঃ ব্রিটেন ভারতকে কাঁচামাল উৎপাদক দেশরূপে রেখে নিজে শিল্পসামগ্রী প্রস্তুত করে বিপুল অর্থোপার্জনের ব্যবস্থা করে। ব্রিটিশ শিল্পের জন্য যে কাঁচামাল প্রয়োজন—যেমন তুলা, রেশম, চিনি, নীল এবং চা ভারত থেকে আমদানি করত। সেখানে খাদ্যশস্যের ঘাটতি ছিল, কাজেই খাদ্যশস্যও আমদানি করতে হত। ভারত থেকে দেওয়া প্রধান কাঁচামাল ছিল কাঁচাতুলা। তুলার অনুপাতে সুতীবস্ত্রের পরিমাণ ছিল অনেক কম। ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে ভারতের রপ্তানি কাঁচাতুলার মূল্য ছিল ৪৩ লক্ষ পাউণ্ড, সুতীবস্ত্রের মূল্য মাত্র ৮ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড। ব্রিটেন ভারতের আফিম চীনদেশে রপ্তানি করত যদিও মাদক হিসাবে আফিমের কুফলের জন্য চীন আফিম আমদানি নিষিদ্ধ করেছিল। অর্থের লোভে চীনদেশে জোর করে আফিম রপ্তানি করলেও ইংরেজরা নিজেদের দেশে এই দ্রব্যটির আমদানি কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ রেখেছিল। ভারত থেকে চীনে আফিম রপ্তানি করে ইংরেজ বণিক এবং কোম্পানি-নিয়ন্ত্রিত ভারত সরকার প্রচুর লাভ করত। এইভাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ইংরেজ বণিক ও মিল মালিকদের স্বার্থে ভারতের পণ্য ব্যবহার করত কিন্তু ভারত যাতে শিল্পে উন্নত হয়ে স্বাবলম্বী হতে পারে সেদিকে কোন উৎসাহ দেখায়নি, বরং ভারত যাতে কাঁচামাল উৎপাদনকারী দরিদ্র দেশ হয়েই থাকে তাই ছিল তাদের লক্ষ্য।

ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ

আর্থিক শোষণ ঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন বণিক সংস্থা হিসাবে ভারতে বাণিজ্য করত তখন তার যে রূপ আর সেই কোম্পানিই যখন ভারতের শাসনভার হাতে পেল তখনকার তার রূপে বিরাট পার্থক্য। শাসকরূপে কোম্পানি ভারতের আর্থিক সমৃদ্ধি সাধনের ন্যায্য কর্তব্য উপেক্ষা করে এদেশকে নানাভাবে শোষণ করতে থাকে।

শোষণের পরিমাণ ও প্রকৃতি

১৭৫৭ খৃস্টাব্দ থেকেই কোম্পানি কর্তৃক শোষণ শুরু হয়। কোম্পানির কর্মচারীরা নানাভাবে এদেশের লোকের কাছে অর্থ আদায় করে স্বদেশে নিয়ে যেতে থাকে। ১৭৫৮ থেকে ১৭৬৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে তারা প্রায় ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ইংলণ্ডে পাঠায়—এই পরিমাণ ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে বাংলার নবাবের মোট রাজস্বের চারগুণ বেশি ছিল। কোম্পানি বিনা মূলধনে এদেশে লাভজনক ব্যবসা করতে থাকে। কোম্পানি বাংলার রাজস্ব মূলধন হিসাবে নিয়োগ করে কাঁচামাল কিনে তা ইংলণ্ডে পাঠিয়ে প্রচুর লাভের কারবার চালাতে থাকে। এই ব্যবস্থা ইংরেজ কোম্পানির কাছে কিরূপ লাভজনক শোষণের যন্ত্রে পরিণত হয়েছিল, একজন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্ বিশেষজ্ঞের মন্তব্য থেকে বুঝতে পারা যায়। মাদ্রাজ রাজস্ববোর্ডের প্রেসিডেণ্ট জন স্থলিভান বলেছিলেন, 'আমাদের ব্যবস্থা অনেকটা স্পঞ্জের মত—গঙ্গার তীর থেকে সব ভাল জিনিস শোষণ করে নিয়ে টেমসের তীরে তা নিংড়ে ঢেলে দেওয়া।'*

———

* Our Systems acts very much like a sponge, drawing up all the good things from the banks of the Ganges, and squeezing them down on the banks of the Thames ; Quoted by Bipan chandra in Modern India p. 99

৮.

সাংস্কৃতিক দৃশ্যপট

শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন ঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশের শাসনভার নেওয়ার পর প্রথম ৬০ বছরে শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কোন উৎসাহ দেখায়নি। তার প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্যবসা ও লাভ করা। তবে সামান্য ব্যতিক্রম ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮১ খৃস্টাব্দে মুসলিম আইন ও আনুষঙ্গিক বিষয় পড়ানোর জন্য **কলকাতা মাদ্রাসা** স্থাপন করেন। পরে ১৭৯১ খৃস্টাব্দে জোনাথান ডানকান হিন্দু আইন ও দর্শন পাঠের জন্য বারাণসীতে **সংস্কৃত কলেজ** প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানির আদালতের বিচার পরিচালনায় মুসলিম ও হিন্দু আইন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ব্যক্তি সরবরাহ করা, কারণ তখনও ব্রিটিশ আইন এদেশে প্রচলিত হয়নি।

মুসলিম আইন ও হিন্দু আইন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল মানুষ প্রয়োজন

মিশনারীগণ, তাঁদের সমর্থকরা এবং বহু মানবকল্যাণব্রতী মানুষ এদেশে ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য ধরনের শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য কোম্পানির ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। এঁদের উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য ছিল। মানবদরদী লোকেরা, তাঁদের মধ্যে অনেক ভারতীয় ছিলেন, মনে করতেন এদেশে সামাজিক, অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক উন্নতির জন্য আধুনিক শিক্ষা একান্ত আবশ্যক ; মিশনারীগণ বিশ্বাস করতেন আধুনিক শিক্ষা লাভ করলে ভারতীয়রা তাদের নিজেদের ধর্মের প্রতি আস্থা হারিয়ে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করবে। উভয় তরফ থেকেই আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের ওপর জোর দেওয়া হয়।

সূত্রপাত ঃ মিশনারীদের হস্তক্ষেপে শিক্ষার প্রাচীন ধারার আমূল পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। মিশনারীরা দেশের নানাস্থানে যে নতুন ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন সেখানে লেখাপড়া ও অঙ্ক ছাড়াও ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি নানা নতুন বিষয় পড়ানো শুরু হল। ছাত্রদের মান অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হল। এক শ্রেণীতে পাঠের কাল নির্দিষ্ট হল এবং ছাপানো পাঠ্যপুস্তক দেবার ব্যবস্থা হল। এইভাবে এদেশে এক নতুন শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াপত্তন হল। মিশনারীরা এদেশে মেয়েদের শিক্ষার জন্যও বিদ্যালয় খুললেন কিন্তু সাধারণের সমর্থনের অভাবে সেগুলি ভাল চলল না। মুখ্যত মিশনারীদের চেষ্টাতেই ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ১৮১৩ খৃস্টাব্দে

Charter Act-এ শিক্ষার জন্য ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ

Charter act অনুযায়ী এদেশে প্রাচ্যবিদ্যার পরিপোষকতা ও ইউরোপীয় বিদ্যার প্রসারের জন্য ১ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করে। ঐ আইনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, ভারতে সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতি, পণ্ডিত ব্যক্তিদের উৎসাহদান এবং ভারতবাসীর মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের প্রসারের জন্য যেন বার্ষিক ঐ টাকা (১ লক্ষ) ব্যয় করা হয়। এই ধারা থেকে ভারতের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন। [ইতিমধ্যে রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, ডেভিড হেয়ার প্রমুখ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চার জন্য ১৮২৭ খৃস্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়]।

ইংরেজি শিক্ষা ঃ কেমনভাবে এই টাকা ব্যয় হবে এবং কোন ভাষা মাধ্যম হবে তা নিয়ে বিতর্ক উদ্ভব হয়। মীমাংসার দায়িত্ব দেওয়া হয় মেকলেকে। তিনি যে পরামর্শ দেন, তা 'মেকলে মিনিটস্' নামে বিখ্যাত। সেই পরামর্শ অনুযায়ী বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার নীতি গ্রহণ করলে দেশে কতকগুলি ইংরেজি স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বেণ্টিঙ্কের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল ১৮৩৭ খৃস্টাব্দে উচ্চ আদালতে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজি ভাষার প্রবর্তন। মোগল আমল থেকে আদালতে ফার্সী ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। বেণ্টিঙ্ক উচ্চ আদালতে ইংরেজি ও নিম্ন আদালতে স্থানীয় ভাষার ব্যবহার প্রবর্তন করলেন। এর ফলে একদিকে ইংরেজি ভাষার জনপ্রিয়তা ও প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়। অন্য দিকে বাংলা ভাষায় গদ্যরূপ ও তার প্রয়োগের সুযোগ আসে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার যে উদ্যম দেখা দেয়, তার প্রথম ফল পাশ্চাত্য চিকিৎসা রীতি প্রবর্তনের জন্য কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত (১৮৩৫ খৃঃ) হয়। কর্ণওয়ালিসের সময় মোগল আমলে প্রচলিত ফৌজদারি আইনবিধির পুনর্বিন্যাস করা হয়েছিল। আইন সদস্য মেকলে তাই ভিত্তি করে আইমবিধি সংকলন করেন। ১৮৬১ খৃস্টাব্দে সকল ভারতীয় আদালতে ইংরেজ বিচারপদ্ধতি ও বিচার চিন্তাধারার প্রচলন হয়। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বহু ভারতীয় তাঁদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মননশীলতার পরিচয় দেবার সুযোগ পান।

১৮৩৫ খৃস্টাব্দের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার নীতি গৃহীত হলে দেশে, বিশেষ করে বঙ্গদেশে, কতকগুলি ইংরেজি স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। ঐ সময় জনসাধারণের জন্যে বহুসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কোন উদ্যোগ নেওয়া হল না। পরবর্তীকালে সরকারের এইভাবে প্রাথমিক শিক্ষাকে উপেক্ষা করার নীতির কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। তবে মাধ্যমিক ইংরেজি শিক্ষা এবং কলেজ শিক্ষার সমর্থনে একথা বলা যায় যে, সারাদেশব্যাপী বিপুলসংখ্যক প্রাথমিক স্কুল পরিচালনা করতে যে শিল্পকর্মীদল প্রয়োজন তাদের শিক্ষার জন্যও স্কুল কলেজ আবশ্যক ছিল। কিন্তু উচ্চশিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণের শিক্ষা কর্মসূচীও চালু করা উচিত ছিল। তা সম্ভব হয়নি, কারণ সরকার সামান্য পরিমাণ অর্থ ছাড়া

ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্যয়ভার বহনে ইচ্ছুক ছিল না। সরকারের এই অক্ষমতা বা অনিচ্ছা এক অদ্ভুত তত্ত্ব দিয়ে আড়াল করতে চাওয়া হয়। যে সামান্য পরিমাণ অর্থ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল তা দিয়ে শিক্ষার বিরাট কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা অসম্ভব। তাই স্থির হয়, উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর লোকেদের ভিতর থেকে অল্প-সংখ্যককে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিলে এরা তাদের নিচের স্তরের লোকেদের মধ্যে শিক্ষা পৌঁছিয়ে দেবে। শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ফিলট্রেশন থিওরী বা 'শিক্ষা চোয়ানো নীতি' নামে পরিচিত। অল্পদিনের মধ্যেই এ নীতির ব্যর্থতা বুঝতে পারা যায় এবং ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে সরকারীভাবে এ নীতি বাতিলও করা হয় কিন্তু এখন পর্যন্ত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন সম্ভবপর হয়নি। তবে 'শিক্ষা চোয়ানো' নীতির প্রবর্তকদের আশা অনুযায়ী পুঁথিগত শিক্ষা চুইয়ে না এলেও গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য, ন্যায়বিচার, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব প্রভৃতি আধুনিক চিন্তার প্রভাব গ্রাম ও শহরবন্দর সকল অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যেই বিস্তারলাভ করেছে। অবশ্য আধুনিক যুগের বিবিধ গণ মাধ্যম, যেমন রাজনৈতিক দল, পত্র পত্রিকা, সভাসমিতি প্রভৃতি সকল স্তরের নাগরিকের সচেতনতা বাড়াতে সহায়ক হয়ে থাকে।

স্বদেশীয় ভাষা-শিক্ষার অবনতিঃ ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে ভারত সচিব উডের (Wood's Despatch) ডেসপ্যাচে শিক্ষার 'নিম্নমুখী চোয়ানো তত্ত্ব' বাতিল করে দেওয়া হয়। ঐ বিখ্যাত শিক্ষাসংক্রান্ত নির্দেশনামায় ভারত সরকারকে জনসাধারণের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করার আদেশ দেওয়া হলেও সাধারণের শিক্ষার জন্য বিশেষ কিছুই করা হয়নি। এদিকে ইংরেজি শিক্ষার সূচনা হলে এই শিক্ষা গ্রহণের জন্য উচ্চ, মধ্য ও নিম্নবিত্ত লোকেদের মধ্যে প্রবল আগ্রহের সঞ্চার হয়। সে যুগে সামান্য ইংরেজি জানা থাকলেই সওদাগরী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ছোটখাট কর্মের সংস্থান হত। তাই স্বদেশীয় ভাষায় পরিচালিত স্কুলগুলির প্রতি লোকের আকর্ষণ কমে যায়। এর ওপর লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ে ১৮৪৪ খৃস্টাব্দে এক সরকারী ঘোষণায় জানান হয় যে, সরকারী চাকুরীর প্রার্থীর ইংরেজির জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই ঘোষণার ফলে ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলগুলি জনপ্রিয় হয় এবং চাকুরী সংস্থানের আশায় ছাত্রগণ ভার্নাকুলার পরিত্যাগ করে ইংরেজি শেখার দিকে ঝোঁকে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার পরিবর্তে ইংরেজির ওপর গুরুত্ব দেওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারে ব্যাঘাত ঘটে। তৃতীয়ত, শিক্ষা ব্যয়সাধ্য হওয়ায় ইংরেজি শিক্ষা ধনী এবং শহরবাসীদের প্রায় একচেটিয়া হয়ে দাঁড়ায়। দেশের বিরাট সংখ্যক সাধারন মানুষ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। আগে ভার্নাকুলার স্কুল পল্লী অঞ্চলে শিক্ষার প্রসার ঘটাত কিন্তু সরকারের নীতি এবং ইংরেজি শিক্ষার মোহ স্বদেশীয় ভাষায় শিক্ষার প্রবাহ রুদ্ধ করে দেয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শ : ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত ভারতবাসী পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শনবিষয়ক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। পাশ্চাত্য জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় তাঁদের কাছে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। বিদেশী মনীষীদের জ্ঞান ও চিন্তার আলোকে তাঁরা স্বদেশের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার বিচার করতে তৎপর হলেন। সংবাদপত্র হল তাঁদের প্রচারের মাধ্যম। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শ প্রথম দিকে এদেশে সমাজে তরুণদের মধ্যে অল্পকালের জন্য চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্ট সাংস্কৃতিক সংস্পর্শই জাতির আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ করে দেশে নবজাগরণ আনয়ন করে।

(i) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস

সূচনা : ইংরেজ রাজত্বের প্রথম একশো বছরে রাজনৈতিক ওলট পালট ও অর্থনৈতিক দীনদশার মধ্যেও এমন কতকগুলি ব্যবস্থার সূত্রপাত হয় যার ফল হয়েছে সুদূরপ্রসারী। এই সময়ে ভারতের সমাজ ও জাগ্রত মানুষের চিত্তক্ষেত্র আলোড়িত করে নতুন কর্ম ও চিন্তার প্রবর্তন ঘটেছে। এই যুগকে নব ভারতের উষা যুগ বলা চলে।

কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি স্যার উইলিয়ম জোন্স ১৭৮৪ খৃস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি **বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটি** (Asiatic Society of Bengal) প্রতিষ্ঠা করেন। এর উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়—এশিয়ার 'মানুষ' এবং 'প্রকৃতি' (Man and Nature) সম্বন্ধে অনুসন্ধান, আলোচনা ও গবেষণা। এই কাজে কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে প্রাচ্য-বিদ্যা-দরদী বহু ব্যক্তি ক্রমে এসে যোগ দেন। সোসাইটির মুখপত্র 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' নামক গবেষণামূলক পত্রিকায় এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশের বিশেষ করে ভারতবর্ষের ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান রচনা প্রকাশ হতে থাকে। এসবের ভিতর দিয়ে ভারতের সংস্কৃতির ওপর আলোকপাত করা হয়।

এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা, ১৭৮৪ খৃঃ

সোসাইটির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস ভারত সংস্কৃতি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার জন্য উইলকিন্সকে দিয়ে ভগবদ্গীতার ইংরেজি অনুবাদ করান। এইভাবে গীতার মহিমা প্রথম ইউরোপে প্রচারিত হওয়ার সুযোগ পায়। এরপর সোসাইটি থেকে আরো নানা গ্রন্থ ইংরেজিতে অনূদিত হতে থাকে। জার্মান কবি গ্যেটে শকুন্তলার অনুবাদের অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

গীতার অনুবাদ

বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০০ খৃস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন। এখানে নবাগত ইংরেজ যুবক সিভিলিয়ানদের দেশ শাসনের যোগ্য করে তোলার জন্য সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ করে দেওয়া হত। এর জন্য ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পণ্ডিতব্যক্তিদের আনিয়ে অধ্যাপনার

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন ১৮০০ খৃঃ

কাজে নিয়োগ করা হত। বাংলা, মারাঠী, ওড়িয়া, হিন্দুস্থানী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষাভাষী পণ্ডিতদের সমাবেশ হত। ফলে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ভারত-সংস্কৃতি সাহিত্য প্রচারের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

ভাষা শিক্ষা দিতে গদ্যের আশ্রয় নেওয়া দরকার। কাজেই বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিতদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের পাঠোপযোগী পুস্তক গদ্যে প্রণয়নের ব্যবস্থা হয়। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত সুধীগণ নানা আঞ্চলিক গদ্য সাহিত্য রচনা ও অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। শুধু সাহিত্যই নয়, ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতিও সংকলিত হয়। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের অন্যতম পাদ্রী উইলিয়ম কেরী নিজস্ব মুদ্রাযন্ত্রে প্রাচ্য ভাষায় সাহিত্য প্রকাশ করে জ্ঞানের বিস্তারে সহায়তা করেন। একদিকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং অন্যদিকে শ্রীরামপুর মিশন এ দুয়ের কর্ম তৎপরতায় পাশ্চাত্যের পক্ষে প্রাচ্যের জ্ঞান গরিমা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীর কাছেও তার নিজের জ্ঞান-সংস্কৃতির অতুল সম্পদ উদ্ভাসিত হল। সংস্কৃতি-উন্মেষক এই সকল প্রচেষ্টার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ভারতে নতুন যুগের সূচনা করে। ডঃ ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন, নতুন পাশ্চাত্য শিক্ষানীতির সূত্রপাত সমগ্র উনিশ শতকের সর্বাধিক সুদূর প্রসারী একক ব্যবস্থা (the most far-reaching single measure in the whole nineteenth century).

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সাহিত্যকর্ম

(ii) সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন

বিদেশী জাত ইংরেজ এখানে শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে দেশীয় লোকদের সহযোগিতা নিয়েছিল। তাদের ভাষা এদেশের লোকেরা বুঝলে কাজকর্মের সুবিধা হয়, সেজন্য ইংরেজি শিক্ষা প্রচলন ইংরেজ বণিক ও ইংরেজ শাসক উভয়েরই কাম্য ছিল। ক্রিশ্চান পাদরিরা ভারতবর্ষের বাসিন্দাদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের বিপুল সম্ভাবনা চিন্তা করে উল্লসিত হয়েছিল। বিদেশী ধর্ম, বিদেশী ভাষা, বিদেশী আচার ব্যবহার ভারতীয় সমাজের ওপর বিবিধ ভাবের প্লাবন সৃষ্টি করেছিল এবং মনে হয়েছিল প্রাচীন সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি সব বুঝি ভেসে যাবে। সেই যুগে যেসব স্থিতধী ভারতীয় মনীষী শতদলের মত জেগে উঠে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রঃ) ঃ রামমোহন রায় বাংলার তথা ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক চিন্তানায়ক ও কর্মনেতারূপে সম্মানিত। হুগলী (তখনকার বর্ধমান) জেলার রাধানগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম। নবাবী আমলে ও ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে ফার্সী ভাষার খুব আদর ছিল। অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধির বলে রামমোহন বাংলা, ফার্সী, ইংরেজি; গ্রীক, হিব্রু, ল্যাটিন, ও উর্দু ভাষা আয়ত্ত করেন। মাত্র ২৩ বছর বয়সে ১০টি ভাষা শিখে তিনি অদ্ভুত মনীষার পরিচয় দিয়েছিলেন। গভীর অধ্যয়ন, দূরদৃষ্টি, সমাজ কল্যাণচিন্তা ও স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে সকল মঙ্গলকার্যে ব্রতী হয়েছিলেন সংক্ষেপে সেগুলো হল ঃ

(১) **সমাজ সংস্কার ঃ** সতীদাহ প্রথার বিলোপে গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিককে সাহায্য দান। ১৮২৯ খৃস্টাব্দে আইন করে এই প্রথা রহিত করা হয়। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা প্রভৃতি সামাজিক কু-রীতির বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ, নারীমুক্তি আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ।



রাজা রামমোহন রায়

(২) **সাংস্কৃতিক সংস্কার ঃ** অজ্ঞতা কুসংস্কার সমাজের বড় শত্রু। যুবকরা যাতে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কুসংস্কার দূর করতে পারে সেজন্য রামমোহন ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহী হন। অন্যান্যদের সঙ্গে ডেভিড হেয়ার ও রামমোহনের সমবেত চেষ্টায় হিন্দু কলেজ (পরবর্তীকালের প্রেসিডেন্সি কলেজ) স্থাপিত হয় (১৮১৭)। তিনি নিজেও একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

রামমোহন রায়কেই সহজবোধ্য, মার্জিত বাংলা গদ্যের প্রবর্তক বলা যায়। সেকালের ভাষা ছিল সংস্কৃতবহুল, দুর্বোধ্য। অতি দুরূহ বিষয়ও সহজ বাংলায় লিখে রামমোহন বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন।

(৩) **ধর্মীয় সংস্কার ঃ** আরবী, ফার্সী ভাষা শেখার সময় রামমোহন ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং হিন্দুর মূর্তিপূজার বিরোধী হয়ে ওঠেন। খৃস্টান পাদরিগণ হিন্দুদের মূর্তিপূজাকে পুতুলপূজা বলে নিন্দা করত। বেদ উপনিষদ প্রভৃতি হিন্দু-মূল শাস্ত্রগ্রন্থগুলো গভীরভাবে পাঠ করে রামমোহন বুঝতে পারেন, উপনিষদের মূল কথা হল, একমাত্র ব্রহ্মই অনাদি ; ব্রহ্মের উপাসনাই সার। মূর্তিপূজা বাদ দিয়ে তিনি নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনা প্রবর্তন করেন। তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক। ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে ইংলণ্ডে ব্রিস্টল শহরে তাঁর প্রাণবিয়োগ হয়।

ডিরোজিও এবং নব্যবঙ্গ ঃ হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) কলকাতার এণ্টালি অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন এবং ডেভিড ড্রামণ্ডের ধর্মতলা অ্যাকাডেমিতে বিদ্যাশিক্ষা করেন। সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন এই তিনটি ছিল এখানকার বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়।

বিখ্যাত দার্শনিক ডেভিড হিউমের আদর্শে অনুপ্রাণিত ড্রামণ্ড তাঁর ছাত্রদের মধ্যে সত্যনিষ্ঠা ও মানবতাবোধ জাগ্রত করতে সচেষ্ট ছিলেন। বিদ্যাবত্তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের

প্রতি দরদ ও প্রীতি ডিরোজিওর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় এবং তাঁর বিদ্যাদান ও সাহিত্যচর্চায় তাঁর প্রকাশ ঘটে। ছাত্রের চরিত্রগঠনকারী শিক্ষকরূপে ডিরোজিও তরুণদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। শিক্ষক ডিরোজিওর প্রভাবে যেসব তরুণ ছাত্র সমাজসেবা, শিক্ষাবিস্তার ও সামাজিক ও রাজনৈতিক গ্লানিমোচনে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, সামগ্রিকভাবে তাদের বলা হয় যুব-বাংলা বা নব্যবঙ্গ। সমাজের যারা নিয়ামক তাদের দুর্নীতি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে তাদের প্রাধান্য খর্ব করা, কলুষমুক্ত করে সমাজের আমূল পরিবর্তন এবং তা অতি দ্রুত ঘটানোর জন্য এই তরুণরা সমসাময়িকদের কাছে 'বিপ্লবী' বলে অভিহিত হয়েছিল। নব্যবঙ্গের আদর্শবাদী মুখপত্র ছিল দুখানি পত্রিকা—(১) কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক The Enquirer এবং (২) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত **'জ্ঞানান্বেষণ'** (১৮৩১)। এদের উদ্দেশ্য ছিল প্রগতিশীল মতবাদ প্রচার, অজ্ঞানতা দূর করে স্বদেশবাসীর মনে জ্ঞানের আলো বিকিরণ, দয়া ও সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং শঠতা ও ভণ্ডামি দূর করা।



ডিরোজিও

এই 'বিপ্লবী' তরুণদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ পরবর্তীকালের কৃতী ব্যক্তিগণ। এঁদের চেষ্টায় নারীমুক্তি, শিক্ষাবিস্তার, কুসংস্কার দূরীকরণ প্রভৃতি সমাজকল্যাণকর কাজের সূত্রপাত হয়েছিল।

ব্রাহ্মসমাজ ঃ উপনিষদের একেশ্বরবাদকে ভিত্তি করে রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেছিলেন। রামমোহন মূর্তিপূজার বিরোধী হলেও সনাতন হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি, কারণ সনাতন হিন্দুধর্মের মূল ভূমি হল বেদ এবং উপনিষদ বেদেরই অঙ্গ, ঈশ্বরোপলব্ধির উন্নত পর্যায়ের তত্ত্ব যাতে আলোচিত হয়েছে। ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের সু-সংস্কৃতরূপ হিসাবে তৎকালীন হিন্দু যুবকদের খৃস্টধর্ম গ্রহণের প্রবণতা অনেকাংশে রোধ করেছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ঃ রামমোহনের পর দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজে নতুন উদ্যম সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য তিনি **'তত্ত্ববোধিনী সভা'** প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার আদর্শ প্রচারের জন্য 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। রামমোহনের আদি ব্রাহ্মসমাজে উপনিষদের শ্লোক, পাঠ ও ব্যাখ্যা ছিল ব্রাহ্মদের সমবেত কৃত্য। দেবেন্দ্রনাথ উপাসনা পদ্ধতি প্রবর্তন এবং ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন।

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪): ভক্তি ও কর্মনিষ্ঠার জন্য প্রীত দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র সেনকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। পরে ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনার ব্যাপারে মতভেদ দেখা দিলে কেশবচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করে **ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ** (Brahma Samaj of India) প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাংলার বাইরে বিভিন্ন প্রদেশে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারমূলক চিন্তাধারা প্রচার করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) ঃ মেদিনীপুর (তৎকালীন হুগলী) জেলার বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী। ঈশ্বরচন্দ্র মাতৃভক্ত এবং অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। নিজের চেষ্টায় তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ লাভ করেছিলেন। পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর উপাধি হয়েছিল **'বিদ্যাসাগর'**। যেসব গুণ ও কৃতিত্বের জন্য বিদ্যাসাগর এদেশে প্রাতঃস্মরণীয় তার কতক হল ঃ



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১. **সমাজ সংস্কার ঃ** হিন্দু সমাজের রোষ অগ্রাহ্য করে বিধবাবিবাহ প্রচলন করেছিলেন এবং নিজপুত্রের সঙ্গে এক বিধবার বিবাহ দিয়েছিলেন।

২. **শিক্ষার উদ্যম ঃ** ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা করেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক বই সহজ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। শিশুদের উপযোগী সরল নীতিকথার বই লিখেছিলেন। বাংলা সাহিত্য তাঁর দানে সমৃদ্ধ হয়েছে। বর্ণপরিচয়, কথামালা, বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী, সীতার বনবাস প্রভৃতি তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থ। রামমোহন যে গদ্যরীতির প্রবর্তন করেছিলেন, বিদ্যাসাগর তাকে আরও সহজ, সুন্দর, সচল করেছেন। শিক্ষাবিভাগের সহকারী পরিদর্শকরূপে তিনি শিক্ষা প্রসারের, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বালিকাদের শিক্ষার জন্য অনেক স্কুল স্থাপন করেছিলেন।

স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ ঃ (১৮১৭-১৮৯৮ ঃ) দিল্লীতে এক বিশিষ্ট মুসলমান পরিবারে সৈয়দ আহমদের জন্ম। শৈশবে উর্দু, আরবী ও পার্সী ভাষাতে শিক্ষালাভ করেছিলেন। ইংরেজি শেখেননি। কর্মজীবনে তিনি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে দিল্লীতে সেরেস্তাদারের চাকরি গ্রহণ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি বিদ্রোহীদের সহায়তা না করে ইংরেজদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। সেজন্য তিনি ইংরেজ সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছিলেন। সৈয়দ আহমদ সংস্কার ও কৃতিত্বের জন্য মুসলিম সমাজে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়েছেন।

প্রার্থনা সমাজ ঃ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ প্রচারের জন্য

বোম্বে, মাদ্রাজসহ দক্ষিণ ভারতের অনেক শহরে ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতায় শিক্ষিত সম্প্রদায় আকৃষ্ট হয় ও কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপ সমাজ কতক শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। বোম্বেতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ 'প্রার্থনা সমাজ' নামে অভিহিত হয়েছিল। বিখ্যাত মারাঠী পণ্ডিত গোবিন্দরাম রাণাডে ছিলেন প্রার্থনা সমাজের সভাপতি।

দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৭-১৮৮৩) : বেদজ্ঞ পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে বোম্বেতে আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। রামমোহনের মত দয়ানন্দও বিশ্বাস করতেন, বেদই হিন্দুধর্মের মূল এবং হিন্দু ধর্ম আচরণে যেসব যুক্তিহীন প্রথা প্রবেশ করেছে তা দূর করে ধর্মের সংস্কার করা সম্ভব। তাঁর প্রবর্তিত আর্য সমাজের আদর্শ রূপায়ণে সে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬) : দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের পূজারী মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার পুরুষ। নিজের অপূর্ব জীবনচর্যা, বাস্তব অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞানের আলোকে ধর্ম ও মানব জীবনের সারসত্যের প্রকাশ মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছিল। তাঁর উপদেশ হল :

ক. সব ধর্মমতই সত্য : ধর্ম নিয়ে তিনি নিজে বিভিন্ন ধর্মমত অনুসারে আরাধনা করে ঈশ্বর উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন—সকল ধর্মের মূলতত্ত্বই সত্য; সকল ধর্মের পথেই ঈশ্বরে পৌঁছান যায় ; ঈশ্বর এক, কেবল নাম ভিন্ন। তিনি বলেছেন—যত মত, তত পথ।

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন নতুন ধর্মমত বা সংস্কারবিধি প্রচার করেননি। তাঁর সরল, পবিত্র জীবন হিন্দুধর্মকে নতুন করে সতেজ করেছে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র জ্ঞানী ভক্ত সাধক রামকৃষ্ণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান ছিলেন।

খ. লোকশিক্ষা : পরমহংসদেব নিজের জীবন ও কথামৃত মাধ্যমে সমাজ কল্যাণকর লোকশিক্ষা দিয়েছেন, হিন্দু ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করেছেন। তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ গুরুর জ্ঞান ও ভাবধারা দেশ-বিদেশে প্রচার করে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। জীবকে শিবজ্ঞানে সেবার আদর্শ স্বামীজীর দীপ্ত বাণীতে প্রচারিত এবং রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যকলাপে প্রতিফলিত।

সরকারী উদ্যমে সমাজ সংস্কার :

ক্রীতদাস প্রথা বিলোপ : প্রাচীনকাল থেকে ভারতের সমাজে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে আইন করে এই মর্যাদাহানিকর প্রথার বিলোপ ঘটানো হয়।

লটারি প্রথা লোপ : প্রাদেশিক সরকারগুলির ব্যবস্থাপনায় লটারি প্রচলিত ছিল। লটারিতে প্রাপ্ত টাকা স্থানীয় উন্নতির কাজে প্রয়োগ করা হলেও নৈতিকতার ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা বিলাপ করা হয়।

নরবলি প্রথা বিলোপ ঃ উড়িষ্যার খন্দ-উপজাতির মধ্যে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নরবলি দেবার রীতি ছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৭ থেকে ১৮৫৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে এই বীভৎস প্রথার বিলোপ সাধন করেন।

৯. (ক) কৃষক বিদ্রোহ

ফেরাজি-ওয়াহাবি আন্দোলন ঃ মক্কার এক ধর্মসংস্কার আন্দোলনের নেতা আবদুল ওয়াহাবের ধর্মমত ওয়াহাবিবাদ নামে পরিচিত। ওয়াহাব বিশ্বাস করতেন, ধর্মের বহিরঙ্গ, বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান ও পুরোহিততন্ত্র ধর্মের মূলশক্তি খর্ব করে। ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিক অপেক্ষা উপাসকের আন্তরিকতা, তন্ময়তা ও নিষ্ঠার ওপর তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

ভারতবর্ষে এই ধর্মীয় বিপ্লব প্রভাব বিস্তার করেছিল। বেরিলির সৈয়দ আহমদ নামে এক ব্যক্তি এই নতুন মতবাদ প্রচারে অগ্রণী ছিলেন। সৈয়দ আহমদ নিজেকে ইমাম বলে ঘোষণা করেন এবং এই মতবাদ প্রচারের জন্য এক সংগঠন গড়ে তোলেন, নতুন বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত পল্লীর মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে ওয়াহাবি মতবাদের মর্মবাণী পৌঁছিয়ে দেন। প্রচারের বাহন ছিল সহজ সরলভাষায় লিখিত গান ও কবিতা। বিভিন্ন অঞ্চলে এই মতবাদের লোকেদের উপনিবেশ স্থাপন এবং সেখান থেকে সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্মসংস্কারের বাণী ছড়িয়ে দেওয়া ছিল এদের প্রচারের অঙ্গ। পাটনা ছিল প্রচারের মূলকেন্দ্র।

ওয়াহাবি ধর্মসংস্কার আন্দোলন

ওয়াহাবিদের ধর্মের লক্ষ্য ছিল প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও আনুষঙ্গিক আচার অনুষ্ঠানের সংস্কার ; রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল তৎকালীন ধর্মীয় শাসকগোষ্ঠীর উচ্ছেদ ও ইসলাম-ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ওয়াহাবিরা পাঞ্জাবে রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত শিখ-প্রভুত্বের অবসানের জন্য সচেষ্ট হয় এবং ১৮২৬ খৃস্টাব্দে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৮৩০ খৃস্টাব্দে তারা পেশোয়ার অধিকার করে নিয়েছিল। পরে ১৮৩১ খৃস্টাব্দে সৈয়দ আহমদ যুদ্ধে নিহত হন। ইংরেজগণ পাঞ্জাব অধিকার করলে ওয়াহাবিদের রাজনৈতিক লক্ষ্য হয় ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধন।

রাজনৈতিক লক্ষ্য বিধর্মীর শাসন উচ্ছেদ ও ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠা

ওয়াহাবিরা বাংলা দেশে 'ফেরাজি' নামে পরিচিত।* পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় ফেরাজিদের বিশেষ প্রভাব ছিল। এদের বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বর সকল-মানুষের জন্যই জমি সৃষ্টি করেছেন, তাই ব্যক্তিগত মালিকানা ন্যায়ের বিরোধী। ফেরাজিরা জমির ফসলের অংশবিশেষ খাজনা হিসাবে সরকারকে দেওয়ার পক্ষপাতী কিন্তু এ বিষয়ে জমিদারের অধিকার স্বীকার করতে নারাজ। ফেরাজিরা সরকারি সম্পত্তি নতুন নদীচরে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে। জমিদারের খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে এবং আইনসম্মত নয় এমন করের বিরুদ্ধে ওয়াহাবিরা সংঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু করে। জমিদারগণও ফেরাজিদের নিজ অঞ্চল থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা

* ফার্সী শব্দ ফরজ-এর অর্থ আল্লাহ্‌র আদেশ। আল্লাহ্‌র আদেশ পালনকারীরা 'ফেরাজি'।

করতে থাকে। নীল চাষের মালিকদের বিরুদ্ধেও ওয়াহাবিরা তৎপর ছিল। তাই ফেরাজি দমনে নীলকর ও জমিদারদের সমবেত প্রয়াস পল্লীবাংলায় এক নতুন শ্রেণী সংগ্রাম সূচনা করে।

উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসাত অঞ্চলে ১৮৩১-৩২ খৃস্টাব্দে ফেরাজি আন্দোলন আরম্ভ হয়। এর নেতৃত্ব দেন তিতুমীর। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত হায়দরপুর গ্রামে ১৭৮২ খৃস্টাব্দে তিতুমীরের জন্ম। প্রথম জীবনে পেশাদার পালোয়ান ছিলেন, পরে লাঠিয়াল হন। মক্কায় গেলে ওয়াহাবি সম্প্রদায়ের নেতা সৈয়দ আহমদের শিষ্য হন এবং মক্কা থেকে ফিরে ওয়াহাবি ধর্মমত অনুসারে ইসলামের সংস্কার সাধনের জন্য প্রচার করতে থাকেন। দরিদ্র কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করতে গেলে জমিদারদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ উপস্থিত হয়। ক্রমে হায়দরপুর ও তৎসন্নিকটবর্তী নারিকেলবেড়িয়ার চারপাশে দশক্রোশব্যাপী অঞ্চলের তাঁতী ও কৃষকদের মধ্যে তাঁর প্রভাব বৃদ্ধি পায়। জমিদারদের খাজনা বন্ধ করে দিয়ে তিনি টাকি ও গোবরডাঙায় জমিদারদের নিকটই কর দাবি করলেন। পুলিশ ও নীলকরদের সাহায্য নিয়ে জমিদাররা তিতুমীরকে পরাস্ত করতে না পারায় তাঁর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। নিজেকে 'বাদশাহ' বলে ঘোষণা করে তিতুমীর নারিকেলবেড়িয়ায় একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেন এবং ভাগিনেয় মাসুম খাঁ-কে সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। তাঁকে দমন করতে গিয়ে বারাসাতের কালেক্টর আলেকজাণ্ডার পরাজিত হন ও বসিরহাটের দারোগা নিহত হন। গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায় তিতুমীরের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ হারান। অবশেষে তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল বেন্টিঙ্কের আদেশে কামান এবং গোরা ও সিপাহীসেনাসহ একজন কর্নেল ফোর্ট উইলিয়ম থেকে এসে গোলার আঘাতে কেল্লা ধ্বংস করেন। সংঘর্ষে তিতুমীর নিহত এবং ৩৫০ জন বন্দী হলেন (১৮৩১ খৃঃ)। বিচারে তিতুমীরের ভাগিনেয় মাসুম খাঁ-র ফাঁসি হয়।

তিতুমীর ও বাঁশের কেল্লা

তিতুমীরের এই হাঙ্গামাকে ভারতে গণবিক্ষোভের নিদর্শন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর দ্বারা এই আন্দোলন দমন করা হয়।

১৮৩৯ খৃস্টাব্দ থেকে পূর্ব বাংলার ফরিদপুর অঞ্চলে ফেরাজিদের কর্মতৎপরতা দেখা গিয়েছিল। শরিয়ত উল্লা ও তাঁর পুত্র দুদুমিঞা এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। এদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল পাঁচচরের নীলকুঠির সাহেব ডানলপ, স্থানীয় জমিদার গোপীমোহন এবং তাঁর অত্যাচারী আমলারা। কিন্তু ফেরাজিরা সফল হতে পারেনি। রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক আন্দোলন মাত্র আংশিকভাবে সফল হয়েছিল। সাধারণ মুসলমান কৃষক ধর্ম বিশ্বাসে আমূল পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকে সহজে গ্রহণ করেনি।

শরিয়ত উল্লা ও দুদুমিঞা

বলপ্রয়োগ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য সাধারণ হিন্দু কৃষকও ফেরাজিদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল না। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিপীড়ন ফেরাজিদের ব্যর্থতার একটি কারণ। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন মাত্র আংশিকভাবে সফল হয়েছিল। তবু ফেরাজি আন্দোলনের ঐতিহ্য সাধারণ কৃষকদের বহুদিন অনুপ্রাণিত করেছে।

ব্যর্থ হলেও কৃষকদের অনুপ্রেরণা-স্থল

৯০

কৃষক অসন্তোষ ও বিদ্রোহ

(খ) উপজাতি আন্দোলন: কোল বিদ্রোহ (১৮৩১-৩৩) বিদ্রোহের পটভূমি ছোটনাগপুরের পালামৌ অঞ্চলে অরণ্যে আচ্ছাদিত অংশে কোল উপজাতির আদি বাসভূমি। এখানে নদী, পাহাড় ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নিকেতনে সভ্য-জগতের দৃষ্টির বাইরে কোল উপজাতির লোকেরা পুরুষানুক্রমে নিজেদের জীবনধারা অনুসরণ করে আসছিল। বাইরের কোন শাসক তাদের জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি।

১৭৬৫ খৃস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন দিল্লী সম্রাটের কাছ থেকে দেওয়ানি লাভ করে তখন বিহার সুবার অংশ হিসাবে পালামৌ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অধীনে আসে। কোম্পানি এই উপজাতির লোকদের কাছ থেকে কর আদায়ের জন্য তাদের ভিতর থেকে এক প্রধানকে রাজা উপাধি দিয়ে তার ওপর রাজস্ব আদায়ের ভার দেয়। কোলরা বনজঙ্গল পরিষ্কার করে আবাদযোগ্য জমি উদ্ধার করেছে, জমির জন্য কাউকে কর দেয়নি। অনেকেই এই কর দিতে পারল না। ফলে কোম্পানি সমগ্র কোল অধ্যুষিত অঞ্চল স্থানীয় রাজাউপাধিধারী জমিদারের হাত থেকে নিয়ে নীলামে বিক্রি করার ব্যবস্থা করল এবং একজনের ওপর জাগীর হিসাবে অঞ্চলটি ন্যস্ত করে টাকা আদায় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করল। এর ফলও ভাল হল না। উপজাতিভুক্ত নয় এমন বহু লোক খাজনা আদায় করা, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা ইত্যাদি কাজের জন্য পালামৌ অঞ্চলে উপস্থিত হল। এইভাবে দারোগা, আমীন, জরিপকর্মী, দোকানদার, সুদখোর মহাজন প্রভৃতি স্বার্থলোভী মানুষ

নানাভাবে সরল বনবাসী কোলদের ওপর শোষণ ও উৎপীড়ন চালাতে থাকে। ঋণের দায়ে মহাজন কোলদের জমি কেড়ে নেয়, বাকি খাজনার দায়ে ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে।

কোলদের কাছ থেকে অধিক রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে সরকার তাদের ওপর আবগারি কর ধার্য করে। কোলরা নিজেদের ঘরে তৈরী 'পচাই' বা 'হাঁড়িয়া' পান করতে অভ্যস্ত ছিল। তাদের অঞ্চলে ঠিকাদারের মদের দোকান স্থাপন করায় সাধারণভাবে উপজাতির লোকদের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত হল। বহিরাগত আবগারি লোকেরা এসে নিরীহ লোকেদের নানাভাবে নির্যাতন করতে থাকে। ১৮২৮ খৃস্টাব্দে কোলরা দলবদ্ধ হয়ে ছোটনাগপুরে গিয়ে আবগারি ঠিকাদার করম আলির বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ পেশ করে।

নিজেদের জমি থেকে বঞ্চিত, বহিরাগত অসৎ লোকেদের শোষণে জর্জরিত, সরকারের উদাসীনতায় হতাশ কোলেরা তাদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদ জানানোর উপায় হিসাবে সংগ্রামের পথ বেছে নিল। তাদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী উপ-জাতির লোকেদের অস্ত্রধারণের আহ্বান জানাতে একটি করে তীর তাদের গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে দেয়। ১৮৩১ খৃস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর একদল কোল কুমুং গ্রাম থেকে জমির ঠিকাদার মহম্মদ আলির ছুশো গরু লুঠ করে নিয়ে যায়। পুলিশ অনুসন্ধান করতে গেলে উত্তেজিত কোলরা পুলিশদলকে আক্রমণ করে। ক্রমে সারা পরগণা জুড়ে প্রায় ৪০০০ কোল দলবদ্ধ হয়ে বহিরাগত লোকেদের বাড়িঘর আগুনে জ্বালিয়ে, লোকেদের নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সৈন্য নিয়োগ করে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এই বিদ্রোহ দমন করে। বিন্দ্রাই মান্‌কি, গুগ্রা ও গঙ্গানারায়ণ সিংহ বিদ্রোহের নেতারূপে লড়াই করেছিলেন।* এই বিদ্রোহ দমন করার সময় বহু সম্পত্তি ও জীবননাশ ঘটে। জে. এইচ. হাটন বলছেন, ছোটনাগপুরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠা ঐ অঞ্চলের উপজাতি লোকদের চরম দুর্দশা এনেছিল।

সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭)

বিদ্রোহের পটভূমি ঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৮২৩ খৃস্টাব্দে দামিনকো (বর্তমান সাঁওতাল পরগণা) সরকারী সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করে। তখন এই অঞ্চল ঘোর জঙ্গলে পূর্ণ, বাঘ-ভালুকের অবাধ বিচরণক্ষেত্র ছিল। এই বনভূমি চাষ আবাদের আওতায় এনে সমৃদ্ধ কৃষি অঞ্চলে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সরকার একজন স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করেন যিনি সাঁওতালদের সহায়তায় এই কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। সাঁওতালদের এই বনাঞ্চলে বসবাস করতে উৎসাহ দেওয়া হয়।

* Unrest Against British Rule in Bihar, 1831-1859. Ed. K.K. Dutta, p.16.

তারা কঠোর পরিশ্রম করে হিংস্র বন্য প্রাণীর সঙ্গে লড়াই করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে এলাকাটি কৃষিযোগ্য করে তোলে। জঙ্গল সাফাই করার সময় সাঁওতালদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, (১) জঙ্গলাকীর্ণ ভূমির জন্য প্রথম তিন বছর তাদের খাজনা দিতে হবে না; (২) পরের তিন বছর সামান্য খাজনা ধার্য হবে। এ সময় একটি গ্রাম বছরে ৩ থেকে ১০ টাকা খাজনা দিত; (৩) এর পরে পাঁচ বছরের জন্য যখন তাদের জমি লিজ দেওয়া হবে, তখন তাদের মাঝি (প্রধান)-দের পঞ্চায়েত গ্রামের বার্ষিক খাজনা ঠিক করে দেবে।* কিন্তু খাজনার পরিমাণ ক্রমশ বাড়ানো হতে থাকে এবং অল্পদিনের মধ্যে তা প্রায় ১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। এক ফলে সরকার এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় সাঁওতালদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

জঙ্গল কেটে কৃষি জমি

কিন্তু খাজনার রেহাই নেই

জমিতে ফসল ফলতে শুরু হলে আশেপাশের জমিদারদের লোভ পড়ল জমির ওপর; বাইরে থেকে ব্যবসায়ী, মহাজন শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটল; থানা-আদালত বসল: সাঁওতালদের সরকারী প্রশাসনের অধীনে আনা হল। বন-জীবনের পরিবেশে অত্যন্ত নিরীহ অধিবাসীদের ওপর বহিরাগত দুষ্ট প্রকৃতির লোকরা নানা অছিলায় শোষণ অত্যাচার চালাতে থাকে। ফলে সাঁওতালদের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে।

পুলিশ, মহাজন, ব্যবসায়ীর অত্যাচার

বিদ্রোহের কারণ: অর্থনৈতিক বিক্ষোভ ছিল সাঁওতাল বিদ্রোহের মূল কারণ। বাঙালী ও পশ্চিম ভারতীয় মহাজন ও ব্যবসায়ীরা সরলমতি সাঁওতালদের নানাভাবে প্রতারিত করে তাদের ক্ষিপ্ত করে তোলে। মহাজনদের সুদ ছিল চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা ৩৩ টাকা। একবার ঋণ করলে সেই ঋণের দশ গুণ শোধ করলেও শোধ হত না। এর জন্য জমির ফসল, লাঙ্গলের বলদ হারাতে হত। এমনকি নিজে সপরিবারে মহাজনের আজীবন দাস হয়ে যেত। ব্যবসায়ীরা ভুয়া দাড়িপাল্লা ব্যবহার করত। সাঁওতালদের জমির শস্য নষ্ট করে দিয়ে কৌশলে তাদের ঋণ গ্রহণে বাধ্য করা হত।

মহাজনদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে একদল সাঁওতাল প্রতিহিংসা সাধনের উদ্দেশ্যে বীর সিং মাঝি নামে এক সাঁওতাল সর্দারের নেতৃত্বে এক ডাকাত দল গঠন করে। উদ্দেশ্য মহাজনদের বাড়িতে ডাকাতি করে অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া। জমিদার মহাজন-দারোগা পরামর্শ করে বীরসিংহ ও গোক্কো নামে এক সাঁওতাল সর্দারকে লাঞ্ছিত করে। এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে প্রায় ৭ হাজার সাঁওতাল

---

* স্বপন বসু—গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, পৃ ৪৩

বীরভূম, বাঁকুড়া, ছোটনাগপুর ও হাজারিবাগ থেকে দক্ষিণ অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয় (১৮৫৫ খৃঃ)। সাঁওতাল পরগণার সদর শহর বারহাইত থেকে সামান্য দূরে ভাগনাদিহি গ্রামের চার দরিদ্র সাঁওতাল ভ্রাতা—সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব—সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন।

সমবেত সাঁওতালদের উদ্দেশ করে সিধু বলেন, ভগবান সকল উৎপীড়নকারীদের উচ্ছেদ করে সাঁওতালদের স্বাধীন জীবন-প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। দশ সহস্র সাঁওতাল শোষক-উৎপীড়ক বিতাড়ন করে, সকল জমি নিজেরা অধিকার করে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করে। এই দাবি আদায়ের জন্য নেতৃবৃন্দ কলকাতায় লাটবাহাদুরের নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য ৩০ হাজারের অধিক অনুগামীসহ যাত্রা করে। পথে সাঁওতালগণ পাচকেঠিয়ার বাজারে এসে অত্যাচারী মহাজনদের হত্যা করে, দারোগা ও সঙ্গীদের হত্যা করেএবং তীরধনুক, তরবারি ও কুঠার হাতে এরা চতুর্দিকে ধ্বংসলীলা চালাতে থাকে।

--বিদ্রোহ

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিদ্রোহ দমন করার জন্য সামরিক আইন জারি করে এবং পনের হাজার সৈন্যের সাহায্যে নৃশংস অত্যাচারে সাঁওতালদের শত শত কুটির ধ্বংস করে বিদ্রোহের অবসান ঘটায়। সিধু ও কানু ইংরেজ সৈন্যের গুলিতে প্রাণ দেন, চাঁদ ও ভৈরব যুদ্ধে বীরের মৃত্যু বরণ করেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের তীব্রতা সরকারের ভীতি উৎপাদন করেছিল এবং ইংরেজ শাসনের ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে দিয়েছিল। বিদ্রোহ শান্ত হলে সরকার পৃথক সাঁওতাল পরগণা গঠন করে এর প্রশাসনের জন্য একজন ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত করেন।

দমন ও ফল

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশের জমিদার, মহাজন ও দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের সহযোগী করে কৃষকের ওপর যে শোষণ অত্যাচার চালিয়েছিল, সাঁওতাল বিদ্রোহ তারই রক্তাক্ত প্রতিবাদ। একে সিপাহী বিদ্রোহের অগ্রদুত বলা চলে।

১০.

১৮৫৭ র বিদ্রোহ

বিদ্রোহের কারণঃ সিপাহীরা ইংরেজ সেনানায়কের অধীনে নিয়মশৃঙ্খলা মেনে এতদিন ধরে কাজ করেছিল। শিখ, রাজপুত, বিহারী, উত্তরপ্রদেশী, গোর্খা প্রভৃতি সিপাহীগণ পৃথক পৃথক রেজিমেণ্টে ভাগ হয়েছিল ; তাদের থাকা-খাওয়া পৃথক ক্যাম্পে ; তাদের পূজা-অর্চনারও বন্দোবস্ত ছিল। তবে এরা ইংরেজের বিরুদ্ধে এত রুষ্ট হল কেন ? এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

সিপাহী বিদ্রোহের মূল কারণগুলো মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করে দেখান যায়। যেমন ১. রাজনৈতিক কারণ ২. অর্থ নৈতিক ও সামাজিক কারণ ৩. ধর্মীয় কারণ ৪. সামাজিক কারণ।

রাজনৈতিক কারণঃ ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক দেশীয় রাজ্য গ্রাস। লর্ড ডালহৌসি স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে ঝাঁসী, সাতারা, নাগপুর অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্য অধিকার করে নেন।

এছাড়া প্রাক্তন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র নানাসাহেবকে ভাতা দিতে অস্বীকার করা, সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (শাহ আলম)-কে প্রাসাদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা প্রভৃতি হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোককে বেশী ক্ষুব্ধ করেছিল।

রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণঃ জমিদারি বাজেয়াপ্ত। দক্ষিণ ভারতে প্রায় ২০ হাজার জমিদারি বাজেয়াপ্ত করা হলে জমিদারদের যেমন দুর্দশা ঘটে তেমনি বহুলোক বেকার হওয়ায় সমাজে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে।

এ ছাড়া সতীদাহ ও শিশুহত্যা নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রচলন প্রভৃতি হিন্দু সমাজকে ধ্বংস করার জন্য ইংরেজদের ষড়যন্ত্র বলে অনেকে প্রচার করতে থাকে।

ধর্মীয় কারণঃ ইংরেজ প্রাধান্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে খৃস্টান পাদরিদের ধর্ম প্রচারের উদ্যম এবং এদেশীয় লোকেদের নানা প্রলোভনে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করা হিন্দু মুসলমান কেউই ভাল চোখে দেখেনি। তাদের সন্দেহ হয়, ইংরেজ কালক্রমে সব লোককেই খৃস্টান করে নেবে। এর ফলে ইংরেজ বিদ্বেষ দানা বেঁধে উঠতে থাকে।

সামরিক কারণঃ ইংরেজ প্রভু ও সিপাহীদের মধ্যে সম্পর্কে চিড় ধরে যে যে কারণে তা হল—

ক. সিপাহীরা মনে করত তাদের সহযোগিতা ও কর্মনিষ্ঠার ফলেই ইংরেজরা সংখ্যায় অল্প হয়েও এদেশে বিশাল রাজ্য স্থাপন করতে পেরেছে কিন্তু সেবার অনুরূপ বেতন ও ভাল ব্যবহার তারা পায়নি।

খ. অযোধ্যা রাজ্যের অধিবাসীদের নিয়ে গঠিত বাঙালি পল্টন অযোধ্যা ইংরেজের অধিকারে যাওয়ায় অসন্তুষ্ট হয়েছিল। ইংরেজদের সেবার প্রতিদানে ইংরেজরা তাদের দেশই কেড়ে নিল। এ ক্ষোভ তাদের মনে ধূমায়িত হচ্ছিল।

গ. অনেক সিপাহী ভারতের বাইরে সাগর পাড়ি দিয়ে ব্রহ্মদেশে যেতে অনিচ্ছুক ছিল। লর্ড ক্যানিং এক নতুন আইন করে যারা ব্রিটিশের আদেশে ভারতের বাইরে যেতে প্রস্তুত এমন লোকেদের সৈন্যদলে নেবার ব্যবস্থা করে। সব সিপাহী এটা পছন্দ করেনি।

ঘ. প্রথম আফগান যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য পরাজিত হলে তারা যে 'অপরাজেয়' এ ধারণা সিপাহীদের মন থেকে দূর হয়ে যায়। তারা ভাবে শক্তভাবে আঘাত করে ইংরেজকেও পরাজিত করা সম্ভব।

ঙ. ভারতে দেশীয় সিপাহীর তুলনায় ইংরেজ সৈন্য ছিল অনেক কম। এতে সিপাহীদের মনোবল বেড়েছিল।

চ. ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে রাশিয়ার সঙ্গে ইংরেজ ক্রাইমিয়ার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। মুসলিম নায়ক আজিমুল্লা খাঁ রুশ 'বীর'দের দেখতে কনস্টানটিনোপল গিয়েছিলেন। তিনি রুশদের আখ্যা দিয়েছিলেন 'মহাশক্তিধর রুস্তম' যারা ফরাসী ও ইংরেজ সৈন্যকে পরাভূত করেছিল।

ছ. ভারতের সাধারণ লোকের মধ্যে একটা গুজব রটেছিল যে, একশ বছর পর পর দিল্লীর শাসকদের বদল হয়ে থাকে। ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীর পর ১৮৫৭-তে ইংরেজ রাজত্বের শতবর্ষ পূর্ণ হবে ; কাজেই তারও বদল হওয়ার সম্ভাবনা।

জ. **প্রত্যক্ষ কারণ এনফিল্ড রাইফেল প্রবর্তন :** ইংলণ্ডে এনফিল্ড কারখানায় প্রস্তুত নতুন ধরনের রাইফেলে যে টোটা পুরতে হত তার আবরণ দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিতে হত। এই কার্তুজে পশুচর্বি (শূকর ও গরুর চর্বি) মেশান ছিল বলে জানাজানি হলে হিন্দু-মুসলমান সিপাহীগণ ধর্মহানির আশংকায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। প্রথমে প্রকাশ্য সৈন্যবিদ্রোহ শুরু হয় ১০ মে, ১৮৫৭ মীরাটে। তার আগে ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডে একক বিক্ষোভ দেখিয়ে বিদ্রোহের অশনিসংকেত দেখিয়েছিলেন।

বিদ্রোহের গতি ও পরিণতি : ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডে ও বহরমপুরে সিপাহীদের বিক্ষোভ বিদ্রোহের সূচনা করে। ১০ মে মীরাটের সৈন্য ছাউনিতে সিপাহীরা সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে। তারপর তারা দিল্লী অধিকার করে বৃদ্ধ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুরশাহকে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলে ঘোষণা করে। দিল্লী

থেকে বিদ্রোহ দ্রুত বেরিলি, কানপুর, বিহারের জগদীশপুর এবং মধ্য ভারতের ঝাঁসীতে ছড়িয়ে পড়ে।

বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন নানাসাহেব, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রাওসাহেব, তাঁতিয়া তোপী, অযোধ্যার নবাবের উপদেষ্টা আজিমুল্লা খাঁ, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, জগদীশপুরের রাজপুত জমিদার কুনওয়ারসিংপ্রভৃতি নেতাগণ। ঝাঁসীর রাণী পুরুষের বেশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেন।

কানপুর অধিকার করে বিদ্রোহীরা সমস্ত ইংরেজ নরনারীকে হত্যা করেছিল। অন্যপক্ষে ইংরেজরা দিল্লী অধিকার করে বহু লোককে হত্যা করে এবং সেনাপতি হাডসন বাহাদুর শাহের পুত্রদের নিজ হাতে গুলি করে হত্যা করেছিল।

পেশোয়া পরিবারের মহিলাগণ এবং অযোধ্যার বেগম হজরত মহল নেপালে চলে যান। নানাসাহেবও নেপালের জঙ্গলে পালিয়ে আত্মগোপন করেন। বিদ্রোহ কঠোরহস্তে দমন করে ইংরেজরা বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করেন। ১৮৬২ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র ঃ ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে বিদ্রোহের প্রথম ইঙ্গিত মেলে ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের বিক্ষোভের ঘটনায়। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের ১০ মে মীরাটে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হয়। তারপর বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে—দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যভারত ও বিহারের কতক অংশে। বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্রগুলো ছিল—দিল্লী, বেরিলি, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, জগদীশপুর এবং মধ্যপ্রদেশের ঝাঁসী।

বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ : শুধু উন্মাদনা দিয়েই যে যুদ্ধ জয় করা যায় না, সিপাহীবিদ্রোহের পরিণতি তার বড় প্রমাণ। সিপাহীদের সঙ্গত ক্ষোভ ছিল, উৎসাহ, আত্মত্যাগের অভাব ছিল না। তবু সংগঠিত ইংরেজ সৈন্যদলের কাছে তাদের পরাজিত হতে হয়েছিল। পরাজয়ের কারণগুলো মোটামুটি ছিল—

১ **জাতীয়তাবোধের অভাব ঃ** সিপাহীগণ ও তাদের সহায়ক নায়কেরা কোন সুসম্বদ্ধ উদ্দেশ্য ও যুদ্ধ-পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেননি। ফলে যোদ্ধারা তাদের শক্তি ঐক্যবদ্ধ করে তীব্র করে তুলতে পারেনি।

২. **বিদ্রোহীদের বিভিন্ন লক্ষ্য ঃ** মুসলিম সিপাহীরা চেয়েছিল মোগলশক্তির পুনরুত্থান, হিন্দুরা চেয়েছিল পেশোয়া-রাজ প্রতিষ্ঠা। স্বার্থের সংঘাত সাফল্যলাভে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

৩. **সংগ্রাম সর্বভারতীয় হয়নি ঃ** প্রধানত উত্তরপ্রদেশ ও আশেপাশের অঞ্চলে বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ ছিল। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও রাজপুতানা শান্ত ছিল।

৪. **সিপাহীদের মধ্যে অনৈক্য ঃ** ইংরেজ সৈন্যদলের শিখ, গুর্খা ও রাজপুত রেজিমেন্ট ব্রিটিশের অনুগত ছিল। সকল সিপাহী সমবেত হলে ফল অন্যরকম হতে পারত।

৫. **লোকবল ও অস্ত্রবলের অভাবঃ** অস্ত্রশস্ত্র ও যোদ্ধার অভাবে অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধ বন্ধ করতে হয়েছিল।

৬. **যোগ্য সামরিক সংগঠন ও নেতৃত্বের অভাবঃ** বিদ্রোহীরা দেশপ্রেমিক নায়ক পেয়েছিলেন কিন্তু সমরকুশল, সংগঠন সক্ষম দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সেনাপতি ছিলেন না কেউই। সে তুলনায় ইংরেজপক্ষের লরেন্স, হ্যাভলক, নিকলসন, আউটরাম প্রভৃতি ছিলেন অভিজ্ঞ যোদ্ধা ও সমরনায়ক।

৭. **ইংরেজপক্ষে যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধাঃ** ডাক ও তার বিভাগ এবং রেলপথ ব্যবহারের সুযোগ ছিল ইংরেজদের হাতে। এর ফলে দ্রুত সৈন্য ও রসদ সরবরাহ করায় ইংরেজদের যতখানি সুবিধা হয়েছিল ঠিক ততখানি অসুবিধা হয়েছিল সিপাহীদের।

৮. **ইংরেজের নৌশক্তিঃ** সমুদ্রে আধিপত্য থাকায় ইংরেজরা স্বদেশ থেকে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করতে পেরেছিল কিন্তু বিদ্রোহীদের পক্ষে বিদেশ থেকে অস্ত্রসংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না।

৯. **ইংরেজের কূটনীতিঃ** শুধু অর্থ ও অস্ত্রবলেই ইংরেজরা শক্তিশালী ছিল না, কূটনীতি প্রয়োগ করে তারা বিদ্রোহকে আঞ্চলিক সংঘর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। শিখ ও পাঠানদের ইংরেজরা স্বপক্ষে রেখেছিল; গোয়ালিয়র ও হায়দরাবাদের শাসক ইংরেজদের বিরুদ্ধে যায়নি। আফগানিস্তানের আমীর ইংরেজের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখে। দেশের কিছু অংশ সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিলেও বাকি অংশ উদাসীন অথবা ইংরেজদের প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করেছিল।

এই অবস্থায় বিদ্রোহ যে ব্যর্থ হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। প্রধানত সামরিক কারণে ব্যর্থ হলেও সিপাহীদের সংগ্রাম ভারতের পরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তাবনা-অধ্যায় হিসাবে ভারত-ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ।

সিপাহী বিদ্রোহের ফলঃ সিপাহীদের বিদ্রোহ দমন করে অবস্থা শান্ত করা হলেও তার প্রভাব ও ফল মুছে যায়নি। বিদ্রোহের ফল দেখা যায় বিশেষ করে দুটি ক্ষেত্রে—১. **প্রশাসনিক** (administrative) ও **রাজনৈতিক** (Political) ব্যবস্থার।

প্রশাসনিক পরিবর্তনঃ ক. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এতদিন একটি বাণিজ্যসংস্থা হয়েই রাজ্যশাসন করেছিল। মাঝে মাঝে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সনদ নতুন করে কোম্পানির ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ও মেয়াদবৃদ্ধি করেছেন এইমাত্র। বিদ্রোহের পর পার্লামেন্ট আইন করে কোম্পানির বিলোপ ঘটান এবং ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া ভারত শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন (১ নভেম্বর, ১৮৫৮)। ভিক্টোরিয়া হলেন ভারত সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্ঞী।

খ. বোর্ড অব কন্ট্রোল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে ভারত শাসন করত। এই Board of Control বাতিল করে ভারত সচিবের পদ সৃষ্টি করা হল।

গ. গভর্নর জেনারেল হলেন ভাইসরয় অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি। বিদ্রোহের সময় গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড ক্যানিং। তিনিই হলেন প্রথম ভাইসরয়।

বিদ্রোহ শেষে বিদ্রোহীদের প্রতি কঠোর প্রতিশোধকমূলক ব্যবস্থা নেবার জন্য অনেক ইংরেজ দাবি জানিয়েছিলেন কিন্তু ধীর, শান্ত, বিচক্ষণ ক্যানিং প্রতিশোধ গ্রহণে অসম্মত হয়ে ভারতীয়দের মন থেকে ক্ষোভ ও দুঃখবোধ মুছে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর নরম মনোভাবের জন্য অনেক ইংরেজ বিদ্রূপ করে তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'করুণাময়ী ক্যানিং।'

ঘ. ভারতে ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা বেশি করা হল এবং ভারতীয়দের সৈন্যদলে গ্রহণে এমন ব্যবস্থা নেওয়া হল যাতে পরে এরা বিদ্রোহের সুযোগ না পায়।

রাজনৈতিক পরিবর্তন ঃ ক. মহারাণীর ঘোষণাপত্রে (Queen's Proclamation) ভারতবাসীকে জানান হল—(i) ভারতে রাজ্যবিস্তারের কোম্পানির নীতি অনুসরণ করা হবে না; (ii) ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা হবে। প্রজাদের ধর্মাচরণে স্বাধীনতা থাকবে, তাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না। (iii) সরকারি কর্মে নিযুক্তির ব্যাপারে কোনরূপ বৈষম্য করা হবে না।

খ. দেশীয় রাজ্য অধিকার করার নীতি বর্জন করা হল এবং স্বত্ববিলোপ নীতির ধারা পরিবর্তন করে অপুত্রক শাসকদের দত্তকপুত্র গ্রহণের অধিকার স্বীকার করা হল।

গ. বিদ্রোহে হিন্দু মুসলমান মিলিতভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। কূটবুদ্ধি ইংরেজ এবার কৌশলে হিন্দু মুসলমানকে পৃথক করে শাসন করার (divide and rule) নীতি প্রয়োগ করতে তৎপর হল। বিদ্রোহের পর ইংরেজশক্তি হিন্দুদের থেকে মুসলিমদের পৃথক করে তাদের রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা দিয়ে স্বপক্ষে রাখার নীতি গ্রহণ করে। এই ধারণার ফলশ্রুতি হয়েছিল মুসলমানদের মুসলিম সংগঠন এবং তাতে ব্রিটিশ শাসকের সমর্থন ও সহানুভূতি।

ঘ. বিদ্রোহ দমনে এবং বিদ্রোহ শেষে ইংরেজদের যে রূপের পরিচয় ভারতবাসী পায়, তাতে তাদের মনে এই বোধ স্পষ্ট হয় যে, নিজেরা স্বাধীন না হতে পারলে ইংরেজের কাছে ন্যায়বিচার আশা করা যাবে না, কারণ, সাম্রাজ্যবাদী শাসক প্রজাকে শোষণ করে, পঙ্গু করে রেখেই তার শাসন কায়েম রাখতে চাইবে। তাই গৌণভাবে হলেও সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের মুক্তিসংগ্রামের পথরেখা প্রস্তুত করেছিল। ইংরেজরা ভারতীয়দের নতুন করে চিনেছিল এবং ভবিষ্যতে এর চেয়ে ভয়াবহ কিছু না ঘটে সেজন্য মনে মনে সতর্ক ছিল ঃ ভারতীয়রা নতুন করে ইংরেজদের চিনেছিল এবং বুঝেছিল, আংশিকভাবে ঐক্যবদ্ধ ভারত ইংরেজশক্তিকে টলাতে পারবে না, এর জন্য প্রয়োজন হবে ব্যাপক সংগঠন এবং অন্তর-শক্তির উদ্বোধন।

সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃতি ঃ সিপাহী বিদ্রোহ আসলে কি শুধু কিছু সংখ্যক বিক্ষুব্ধ সিপাহীর ক্রোধের ফল, না এটি বৃহত্তর কোন পরিকল্পনার প্রকাশ? অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের স্বরূপ কী?—এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন পক্ষ বিভিন্নভাবে দিয়েছেন।

বেশির ভাগ ইংরেজ ঐতিহাসিক মনে করেন, ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের বিদ্রোহ চর্বিমিশ্রিত কার্তুজ প্রবর্তনের ফলে সামরিক বিক্ষোভ ছাড়া আর কিছু নয়। কতক গোঁড়া মুসলিম ও ব্রাহ্মণ নতুন কার্তুজের গুজব ছড়িয়ে সৈন্যদের উত্তেজিত করে, ফলে এই বিদ্রোহ। লরেন্স, আউটরাম প্রভৃতি ইউরোপীয় লেখকের এই মত।

পি. ই. রবার্টস বলেছেন, বিদ্রোহটা সামরিক, তবে যখন এটি ঘটে তখন দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষ ছিল। তাই বিদ্রোহীরা এর সুযোগ নিয়েছিল।

এই মতের সমর্থনে বলা হয়েছে—ক. পাঞ্জাব, সিন্ধু, রাজপুতনা, দাক্ষিণাত্য—এই বিদ্রোহে যোগ দেয়নি। তারা ইংরেজদেরই সমর্থন করেছিল। কাজেই এ বিদ্রোহকে জাতীয় সংগ্রাম বলা চলে না। খ. অল্পসংখ্যক দেশীয় নৃপতি বিদ্রোহীদের পক্ষ নেয়, অনেকে আবার ইংরেজদের সাহায্য করে। গ. দেশের জনগণের বৃহৎ অংশ বিদ্রোহে যোগ দেয়নি বরং নীরব ছিল। ঘ. কতক শহরের লোক বিদ্রোহে যোগ দিলেও গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দারা উদাসীন ছিল।

ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিকদের বিপরীত মত পোষণ করেন। দেশপ্রেমিক বীর সাভারকর তাঁর War of Independence গ্রন্থে বলেছেন—যুদ্ধের প্রধান দাপট সিপাহীরাই সহ্য করেছেন। তবু বহু সহস্র ভারতীয় নাগরিক এতে অংশগ্রহণ করে। এ বিদ্রোহ স্বার্থপর নৃপতিদের যুদ্ধ নয়, এটি ছিল জাতীয় উত্থান। ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে জনগণ ইংরেজের কবল থেকে মুক্তি কামনা করছিল। সেইসময় চর্বিমিশ্রিত কার্তুজ সঞ্চিত-অসন্তোষের বারুদস্তূপে আগুন ধরিয়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে জনসাধারণ নানাভাবে সিপাহীদের সাহায্য করে। সকল দিক বিবেচনা করে সিপাহী বিদ্রোহকে 'প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম' বলা অসঙ্গত নয়।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে বিদ্রোহ সংগঠিত, সুপরিকল্পিত, সুপরিচালিত ও ভারতব্যাপী বিস্তৃত ছিল না সত্য কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এটি ছিল বড় আকারে প্রথম সাক্ষাৎ প্রতিরোধ (direct challenge)।

সিপাহী বিদ্রোহের স্বরূপ সম্বন্ধে নানাজনের অভিমত শোনার পর একথা বলা যায়, বিদ্রোহের সূত্রপাত সামরিক ব্যাপার উপলক্ষ করে হলেও এর আসল কারণ ছিল ইংরেজ শাসনভার ছুঁড়ে ফেলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা। এজন্য আগ্রহী শহীদের সংখ্যা সকল দেশেই স্বল্পই থাকে এবং সিপাহীদের উদ্যমও ব্যর্থ হয়েছিল। তবু তাঁদের মহান আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে সংশয় নেই। কাজেই এটাকে নিছক 'সিপাহী বিদ্রোহ' না বলে প্রথম মুক্তি-সংগ্রাম বলাই যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্নাবলী

প্রথম অধ্যায় ঃ ভুগোল ও ইতিহাস

১। ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোলের সম্পর্ক কি? ইতিহাস পড়তে বসে ভূগোলের কথা তুলবার প্রয়োজন কি?

২। ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগগুলি কি কি? এর দ্বারা ইতিহাস কিভাবে নিয়ন্ত্রিত তা বল।

৩। দেশের ওপর ভূগোলের প্রভাব আলোচনা প্রসঙ্গে (ক) সমভূমি অঞ্চল (খ) মধ্যভারতের মালভূমি অঞ্চল (গ) দাক্ষিণাত্যের মালভূমির অবস্থার বিবরণ দাও।

৪। দেশের অধিবাসীর ওপর ভূগোলের প্রভাব কি?

৫। ভারতের ইতিহাসের ওপর ভূগোলের প্রভাব সম্পর্কে নিজের ভাষায় বল।

৬। কোন্ কোন্ গোষ্ঠীর লোক নিয়ে ভারতের জনসমষ্টি গঠিত? উদাহরণ দিয়ে তোমার বক্তব্য প্রতিষ্ঠা কর।

৭। ভারতে মিশ্রজাতির উদ্ভব হল কিভাবে? এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য কি?

৮। ভারতে কিভাবে মিশ্রসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে আলোচনা কর। এর সঙ্গে ভারতীয় জনমণ্ডলীর বিশেষত্ব কিভাবে জড়িত?

৯। ভারতে অনৈক্যের মাঝে ঐক্য বিরাজিত—এই উক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে মূলগত ঐক্যের কারণ উল্লেখ কর। একে ভারতীয় ইতিহাসের বিশেষত্ব বলা যায় কিভাবে?

১০। হিমালয়-হিন্দুকুশের তিনটি গিরিপথের নাম কর। ভারত ইতিহাসে তাদের গুরুত্ব কি ও কতখানি?

১১। স্থলপথে বিদেশী আক্রমণ উত্তর-ভারতেই বেশি ঘটেছে কখন এবং কেন?

১২। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১৩। কোন্ ঐতিহাসিক ভারতবর্ষকে নৃতাত্ত্বিক যাদুঘর বলেছেন? উক্তিটির সার্থকতা আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ভারতীয় সভ্যতার সূচনা

১। 'কপি মানব' কাদের বলা হয়?

২। নবপ্রস্তর যুগের মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল?

৩। নবপ্রস্তর যুগের অবদান কি?

৪। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো কোথায় অবস্থিত? আবিষ্কার করেন কে? হরপ্পা-সভ্যতাকে নাগরিক সভ্যতা বলা হয় কেন?
৫। হরপ্পা সভ্যতার প্রাচীনত্ব আলোচনা কর। এ সভ্যতা কোন্ যুগের সভ্যতা?
৬। হরপ্পাসভ্যতায় সমাজজীবন খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহস্থালীর সামগ্রী ও আর্থিক অবস্থার পরিচয় দাও।
৭। হরপ্পা সভ্যতায় মানুষের ধর্ম ও শিল্পকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা কর।
৮। হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগ কেমন ছিল?
৯। হরপ্পা সভ্যতার বিস্তৃতি কতদূর ছিল?

তৃতীয় অধ্যায়ঃ বৈদিক যুগ

১। 'আর্য' শব্দের অর্থ কি? আর্যদের আদি বাসভূমি ও আর্যদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতগুলির উল্লেখ কর।
২। 'বেদ' কি? বেদ কয়ভাগে বিভক্ত এবং ভাগগুলির নাম কি?
৩। আর্যদের রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা কর।
৪। চতুরাশ্রম বলতে কি বোঝায়? চতুরাশ্রমের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লিখ।
৫। বর্ণভেদ প্রথা কাকে বলে? এই প্রথার কিভাবে জন্ম হয়েছিল?
৬। আর্যদের সাহিত্যের নাম কি? ঐ সাহিত্য পাঠ করে আমরা আর্যদের ধর্ম-জীবন সম্বন্ধে কি জানতে পারি?
৭। উপমহাদেশে আর্যসভ্যতার বিস্তার কিভাবে হয়?
৮। লৌহযুগ কখন শুরু হয়?

চতুর্থ অধ্যায়ঃ প্রতিবাদ আন্দোলন

১। জৈন ধর্মের সূত্রপাত কে করেছিলেন? তাঁর মূলশিক্ষা কি ছিল?
২। মহাবীরের পূর্বনাম কি? তিনি কোথায় জন্মেছিলেন? তাঁর কোথায় মৃত্যু হয়েছিল?
৩। পঞ্চযাম কি কি?
৪। জৈন নামের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল? জৈন ধর্মের মূল নীতিগুলি কি?
৫। জৈন ধর্মের দুটি শাখার নাম কর। এই দুটি শাখার জন্ম কিভাবে হয়েছিল? দুটি শাখার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর মূল পার্থক্য উল্লেখ কর।
৬। বুদ্ধের জন্মস্থান কোথায়? বুদ্ধ শব্দের অর্থ কি? বুদ্ধদেব সর্বপ্রথম কোথায় ধর্মপ্রচার করেছিলেন। কোথায় তাঁর দেহান্ত হয়েছিল?
৭। আর্যসত্য কে প্রচার করেছিলেন? আর্যসত্যগুলি কি কি? মধ্যপন্থা কি?
৮। 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' কাকে বলে? এই মার্গগুলি কি কি? 'নির্বাণ' কি?
৯। 'পঞ্চশীল' কোন ধর্মের বৈশিষ্ট্য? পঞ্চশীলের উল্লেখ কর।

১০। 'ত্রিপিটক' কি ? ত্রিপিটকের অংশগুলির নাম কর।

১১। 'জাতক' বলতে কি বোঝায় ?

১২। ধর্মপদ কি ?

১৩। 'বৌদ্ধ সঙ্ঘ' ও 'বৌদ্ধ সঙ্গীতি' কি ? প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি কেন এবং কোথায় আহ্বান করা হয়েছিল ?

১৪। ভারতবর্ষের বাইরে যে সব দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল তার মধ্যে কয়েকটির নাম কর। বৌদ্ধ ধর্মের পতনের কারণগুলি উল্লেখ কর।

পঞ্চম অধ্যায় : সাম্রাজ্যিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের যুগ

১। ষোলটি মহাজনপদের মধ্যে চারটি বৃহত্তর রাজ্যের নাম কর। এইগুলির মধ্যে শেষ পর্যন্ত কোন্ রাজ্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় ?

২। বিম্বিসার কে ? তাঁর পুত্রের নাম কি ?

৩। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ? তিনি কিভাবে এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ? তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা কে ছিলেন ?

৪। চাণক্য কে ? তাঁর গ্রন্থের নাম কি ?

৫। বিম্বিসার কোন বংশের রাজা ছিলেন ? বিন্দুসার কোন্ বংশের রাজা ছিলেন ? বিম্বিসারের পর কে রাজা হয়েছিলেন ? বিন্দুসারের পুত্রের নাম কি ?

৬। মেগাস্থিনিস কোন্ দেশের অধিবাসী ছিলেন ? তিনি কোন্ যুগে ভারতবর্ষে এসেছিলেন ? তাঁর গ্রন্থ থেকে আমরা ঐ যুগ সম্বন্ধে কি জানতে পারি ?

৭। অশোক 'ধর্মাশোক' নামে কেন খ্যাত হয়েছিলেন ?

৮। তুমি কাকে মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট মনে কর ? তাঁর কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৯। গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? গুপ্তবংশের প্রথম খ্যাতনামা সম্রাট কে ছিলেন ? তাঁর রাজধানী কোথায় ছিল ?

১০। হরিষেণ কার সভাকবি ছিলেন ? তাঁর রচিত প্রশস্তি থেকে আমরা ঐ সম্রাটের রাজত্বকাল সম্বন্ধে কি জানতে পারি ?

১১। গুপ্তবংশের কোন্ সম্রাট 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন ? তিনি অন্য কোন্ নামে খ্যাত হয়েছিলেন ? তাঁর রাজসভার বিখ্যাত তিন ব্যক্তির নাম কর।

১২। গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের কারণ আলোচনা কর। গুপ্তযুগের সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লিখ।

১৩। ফা-হিয়েন কার রাজত্বকালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন ? তিনি তাঁর বিবরণে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি লিখেছিলেন ?

১৪। ভারতবর্ষে বৈদেশিক আক্রমণের সূচনা কে করেছিলেন ?

১৫। আলেকজান্দার কোন্ দেশের রাজা ছিলেন ? তিনি যখন ভারত আক্রমণ

করেন তখন মগধে কোন্ বংশের রাজত্ব ছিল ? আলেকজান্দারের সেনাপতি কে ছিলেন ?

১৬। কুষাণদের আদি বাসস্থান কোথায় ? কুষাণবংশের শ্রেষ্ঠ রাজার কৃতিত্বের আলোচনা কর।

১৭। কণিষ্ক কোন্ বংশের রাজা ? তাঁর রাজধানী কোথায় ছিল ? তাঁর রাজসভার দুজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম কর।

১৮। কুষাণযুগে বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ কিভাবে হত ? ফলাফল কি ? ভারতের ইতিহাসে কুষাণযুগের গুরুত্ব আলোচনা কর।

১৯। হূণ কারা ছিল ? একজন হূণ নেতার নাম কর। হূণদের পরাজিত করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এমন এক ভারতীয় রাজার নাম বল।

২০। পুরু কোন্ দেশের রাজা ছিলেন ? তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ কেন ?

২১। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কোন্ রাজবংশকে উচ্ছেদ করেছিলেন ? তাঁর সঙ্গে কোন্ গ্রীক সেনাপতির যুদ্ধ হয়েছিল ? এই যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল ?

২২। আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণের ফলাফল আলোচনা কর।

২৩। গান্ধার কোথায় ? গান্ধার-শিল্পের বিকাশ কোন্ যুগে হয়েছিল। এই শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য কি ?

২৪। বৌদ্ধ ধর্মে বিদেশী প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

২৫। ভারতবর্ষে বিদেশী আক্রমণের সামাজিক প্রতিক্রিয়া আলোচনা কর।

২৬। রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা কর। তিনটি রাজপুত রাজ্যের নাম কর।

২৭। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা কে এবং কেন বিখ্যাত ?
কাইরাস, আলেকজান্দার, সেলুকাস, কুজল কদফিস্, খারবেল, গোতমীপুত্র সাতকর্ণী, মিহিরকুল, যশোধর্মন।

ষষ্ঠ অধ্যায় : প্রাধান্য লাভের সংগ্রাম

১। হর্ষবর্ধন কোন্ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন ? তাঁর সঙ্গে শশাঙ্কের কেন যুদ্ধ হয়েছিল ? দাক্ষিণাত্যে রাজ্যবিস্তার করতে গিয়ে হর্ষবর্ধন কোন্ রাজার কাছে বাধা পেয়েছিলেন ?

২। হিউয়েন-সাঙ কার রাজত্বকালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন ? তাঁর লিখিত বিবরণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৩। কোন্ অঞ্চলে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য 'ত্রি-শক্তি সংগ্রাম' হয়েছিল ? কোন্ কোন্ শক্তি এই সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল ?

৪। পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? তিনি কিভাবে সিংহাসনে বসেছিলেন ?

৫। ধর্মপাল কিভাবে উত্তর ভারতে অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন ? তিনি কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন ?

৬। দেবপালকে পালসাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয় কেন?
৭। প্রাচীন ভারতবর্ষের কোন যুগকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়? তার কারণ কি?
৮। কালিদাস কোন্ রাজার সমসাময়িক ছিলেন? তাঁর লেখা দুটি গ্রন্থের নাম কর। 'মুদ্রারাক্ষস' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
৯। গুপ্তযুগকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করার কারণ কি? গুপ্তযুগের অভূতপূর্ব উন্নতির মূলে কি কারণ ছিল?
১০। বাণভট্ট কে? তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থের নাম কর।
১১। প্রাচীন ভারতের একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।
১২। শীলভদ্র কে? দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ কে ছিলেন?

সপ্তম অধ্যায়ঃ ৭ম থেকে ১২ শতাব্দীর সমাজ ও জীবন

১। সেনযুগের একজন খ্যাতনামা কবি এবং তাঁর একটি কাব্যের নাম কর।
২। কৌলিন্য প্রথা কে প্রবর্তন করেছিলেন? কৌলীন্য প্রথার অর্থ কি?
৩। পল্লব, চালুক্য ও চোল শিল্পের একটি করে শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের উল্লেখ কর।
৪। রাষ্ট্রকুট, চন্দেল্ল, গঙ্গদের শিল্পকীর্তি একটি করে নিদর্শনের উল্লেখ কর।
৭ম থেকে ১২শ শতাব্দীতে বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যির / সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আলোচনা কর।

মধ্যযুগের ভারত [১৫২৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত]

১। ভারতের ইতিহাসের কোন্ কালকে মধ্যযুগ বলা হয়? এই যুগের ঐতিহাসিক উপাদান কি কি?
২। মধ্যযুগে বিদেশীদের কয়েকটি বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী ও গ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।
৩। দাসবংশ কে প্রতিষ্ঠা করেন? 'দাসবংশ' নামকরণ কেন হয়েছিল? ইলতুৎমিসকে এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থলতান বলা হয় কেন?
৪। গিয়াসউদ্দীন বলবন কোন বংশের শাসক ছিলেন? তিনি কিভাবে তাঁর সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করেছিলেন?
৫। আলাউদ্দীন খিলজী কি উপায়ে সিংহাসন লাভ করেছিলেন? তিনি কিভাবে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন? (তাঁর একজন বিখ্যাত সভাসদের নাম কর।)
৬। আনন্দপাল, পৃথ্বীরাজ, মালিককাফুর এবং আমীরখসরু কে এবং কেন বিখ্যাত?
৭। ইতিহাসে 'পাগলা রাজা' নামে কে পরিচিত? তাঁকে এই নামে অভিহিত করার কারণ কি? এই নামকরণ কি সত্যই যুক্তিসঙ্গত?
৮। মহম্মদ বিন্ তোগলকের পর কে দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন? তাঁর রাজত্বকালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৯। মেবারের দুজন খ্যাত রাণার নাম কর। তাঁদের বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা কর।

১০। তৈমুরলঙের আক্রমণ কখন হয়। এর ফলাফল কি হয়েছিল ?
১১। বাংলায় হোসেন শাহ ও নসরৎ শাহের রাজত্বকালে সাহিত্য ও সাংস্কৃতির কিরূপ বিকাশ ঘটে ?
১২। বাহ্‌মনী রাজ্য কোন্ কোন্ পাঁচটি রাজ্যে ভাগ হয়ে গিয়েছিল ?
১৩। বিজয়নগর রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নরপতি কে ? তাঁর আমলে কোন্ বিদেশী পর্যটক ভারতে এসেছিলেন ?
১৪। বিজয়নগর শাসকদের আমলে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কেমন ছিল আলোচনা কর।
১৫। বিজয়নগর রাজ্যে সামাজিক / সাংস্কৃতিক / অর্থ নৈতিক অবস্থা বিবৃত কর।
১৬। ভারতের সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে ইসলামের কিরূপ প্রভাব পড়েছে ?
১৭। কয়েকজন সুফী ও ভক্তিবাদী ধর্মপ্রচারকের নাম কর। এদের মধ্যে দুজনের বাণী আলোচনা কর।
১৮। শাসক গোষ্ঠী কিভাবে ভারতীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন ?
১৯। উর্দু ভাষার উদ্ভব কিভাবে হয় ?

মোগলযুগ [১৫২৬-১৭০৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত]

১। মোগলযুগের ঐতিহাসিক উপাদানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
২। প্রথম পানিপথ যুদ্ধে প্রতিপক্ষ কে কে ছিলেন ? ফলাফল কি হয়েছিল ?
৩। খানুয়ার ও ঘাগরা যুদ্ধের গুরুত্ব কি ?
৪। বাবরের বংশ পরিচয় দাও। তিনি কিভাবে ভারতে মোগলসাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন ?
৫। আকবরের জাগীরব্যবস্থা / রাজস্বব্যবস্থা আলোচনা কর।
৬। 'দীন ইলাহী' কি ? কে এর প্রবর্তক ?
৭। আকবরের রাজসভার কয়েকজন গুণীব্যক্তির পরিচয় দাও।
৮। আকবরের নির্মিত সৌধের উল্লেখ কর।
৯। আকবর সাহিত্য বিকাশে কিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন ?
১০। জাহাঙ্গীরের শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি কি *
১১। জাহাঙ্গীরের শিল্পবোধের পরিচয় দাও।
১২। শাহজাহানের রাজত্বকাল গৌরবময় বলে খ্যাত কেন ?
১৩। শাহজাহানের শিল্পকীর্তির পরিচয় দাও।
১৪। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান ইউরোপীয় বণিকদের প্রতি কিরূপ নীতি গ্রহণ করেছিলেন ? উভয়ের রাজত্বকালে মোগল -ইউরোপীয় বণিক সম্পর্ক আলোচনা কর।
১৫। ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতাদের যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
১৬। দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া মোগল সাম্রাজ্যের ওপর কেমন হয়েছিল।

* দ্রষ্টব্য : মোগলযুগ, পৃঃ ৬৬।

১৭। মোগলযুগে ইউরোপীয় বণিকদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লিখ।
১৮। বিদেশীর চোখে ভারতের শাসক সমাজ কিরূপ প্রতিভাত হয়েছিল ?
১৯। মোগলযুগে স্থাপত্য / চিত্রকলা / সাহিত্য / ইতিহাস রচনা / সঙ্গীত / সাহিত্য কিরূপ অগ্রগতি হয়েছিল ?
২০। ঔরঙ্গজেবের চরিত্রের প্রশংসনীয় দিকগুলির উল্লেখ কর। কোন্ প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেছেন ?
২১। নাদির শাহ ও আহম্মদ শাহ তুরানী কে ছিলেন ? নাদির শাহের ভারত আক্রমণের ফল কি হয়েছিল ? আহম্মদ শাহ আবদালি কোন্ ঐতিহাসিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন ? ঐ যুদ্ধে তাঁর প্রতিপক্ষ কারা ছিল ?
২২। শিবাজীর রাজ্যশাসন / সামরিক শাসনব্যবস্থা আলোচনা কর।
২৩। তেগ বাহাদুর কে ? তাঁর কিভাবে মৃত্যু হয়েছিল ? তাঁর পুত্রের নাম কি ?
২৪। গুরু গোবিন্দ শিখ ইতিহাসে কিভাবে নবযুগের সূচনা করেছিলেন ?
২৫। মোট ক'জন শিখগুরু ছিলেন ? প্রথম ও শেষ গুরুর নাম কর। 'খালসা' শব্দের অর্থ কি ? 'খালসা' সৃষ্টির তাৎপর্য কি ?
২৬। 'মিসল'-এর উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল ? ঐক্যবদ্ধ শিখরাজ্য কে স্থাপন করেছিলেন ? তাঁর সঙ্গে ইংরেজদের কোন্ সালে সন্ধি হয়েছিল ? ঐ সন্ধির নাম কি ? সন্ধির সর্ত কি ছিল ?
২৭। বান্দা কে ? তিনি কেন প্রসিদ্ধ ?

ব্রিটিশ শক্তির অধিকার স্থাপনের যুগ [১৭০৭-১৮৫৭]

১। নাদির শাহ কখন ভারত আক্রমণ করেন ? আক্রমণের ফল কি হয়েছিল ?
২। মোগল সাম্রাজ্যের অবনতির যুগে আঞ্চলিক শক্তির উদ্ভব ঘটে কি কি কারণে ?
৩। মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে-ওঠা প্রধান রাজ্যগুলির নাম কর। এগুলির প্রতিষ্ঠাতা-প্রাণপুরুষের নাম উল্লেখ কর।
৪। বাংলার মুর্শিদকুলী খাঁর শাসন ও তার চরিত্র আলোচনা কর।
৫। আলিবর্দী খাঁর শাসনকালে মারাঠা ও ইংরেজদের সঙ্গে কিরূপ সম্পর্ক ছিল, লিখ।
৬। তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধ কখন হয় ? মারাঠাপক্ষের সেনাপতির নাম কি ছিল ?
৭। তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয়ের কারণ ও যুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর।
৮। অযোধ্যার প্রতিষ্ঠাতা কিভাবে রাজবংশ স্থাপন করেন এবং দেশে শান্তিশৃঙ্খলা প্রবর্তন করেন ? তাঁর কৃতিত্ব আলোচনা কর।
৯। শিখদের আদিগ্রন্থ কে সংকলন করেন ? আদিগ্রন্থের বিষয়বস্তু কি ?
১০। গুরু নানকের ভক্তিধর্ম কিভাবে বীরধর্মে রূপান্তরিত হয় আলোচনা কর। গুরু গোবিন্দ সিংহের জীবন ও কার্যাবলী বিবৃত কর।

১১। মারাঠাদের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ ও তার ফলাফল আলোচনা কর।

১২। পেশোয়াতন্ত্র কিভাবে স্থাপিত হয়। প্রথম তিনজন পেশোয়ার নাম ও কীর্তিকলাপ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১৩। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কোন্ সালে গঠিত হয়? ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কোথায় ইংরাজ কুঠি নির্মিত হয়? কলকাতা নগরীর পত্তন কে কোন্ সালে করেছিলেন? কলকাতায় নির্মিত দুর্গের নাম কি ছিল?

১৪। ডুপ্লে কে ছিলেন? তাঁর কি উদ্দেশ্য ছিল? তাঁর উদ্দেশ্য কেন ব্যর্থ হয়েছিল?

১৫। কতবার কর্ণাটকের যুদ্ধ হয়েছিল? কর্ণাটকের তখন নবাব কে ছিলেন? কর্ণাটকের যুদ্ধের দুজন ফরাসী ও একজন ইংরাজ নায়কের নাম কর।

১৬। সিরাজদ্দৌলা কোন্ সালে নবাব হন? তাঁর সঙ্গে ইংরাজদের বিরোধের কারণগুলি আলোচনা কর।

১৭। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পক্ষের দুজন বীর সেনাপতির নাম কর। কোন্ শর্তে মীরজাফরের সঙ্গে ইংরেজদের ষড়যন্ত্র হয়েছিল? এই যুদ্ধের গুরুত্ব কি?

১৮। ১৭৫৭, ১৭৬৪ এবং ১৭৬৫—এই তিনটি সালের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা কর।

১৯। মীরকাশিম কোন্ সময় বাংলার নবাব হয়েছিলেন? তাঁর সঙ্গে ইংরেজদের কেন বিরোধ দেখা দিয়েছিল? মীরজাফর ও মীরকাশিমের চরিত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কি?

২০। হায়দার আলি কে ছিলেন? তাঁর সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের কাহিনী বর্ণনা কর। হায়দারের পুত্রের নাম কি?

২১। টিপু স্থলতানের পিতার নাম কি? টিপুর সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষের কাহিনী বিবৃত কর।

২২। অধীনতামূলক মিত্রতা-নীতির প্রবর্তক কে? এই নীতিটি ব্যাখ্যা কর।

২৩। পিণ্ডারী কারা? পিণ্ডারীদের কে এবং কিভাবে দমন করেছিলেন?

২৪। প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের কাল নির্ণয় কর। ঐ সময় শিখদের নেতা কে ছিলেন কোন্ সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হয়েছিল?

২৫। স্বত্বলোপ নীতির প্রবর্তক কে? এই নীতির ব্যাখ্যা কর।

২৬। মীরকাশিমের সংঙ্গে ইংরেজদের সংঘাতের কারণ কি? এর ফলাফল আলোচনা কর।

২৭। মহীশূর রাজ্যে কিভাবে ইংরেজদের প্রাধান্য বিস্তৃত হয় আলোচনা কর।

২৮। পাঞ্জাব রাজ্য কখন গঠিত হয়? পাঞ্জাব রাজ্য কখন কিভাবে ইংরেজের অধিকারে আসে?

২৯। লর্ড ওয়েলেসলির সাম্রাজ্য জয়ের নীতি কি ছিল?

৩০। লর্ড ডালহৌসি কি নীতি প্রয়োগ করে রাজ্যগুলি অধিকার করেন ? কোন কোন অঞ্চল এইভাবে ব্রিটিশের অধীনে আসে ?

৩১। লর্ড হেস্টিংস / লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনসংস্কার আলোচনা কর।

৩২। লর্ড কর্ণওয়ালিস শাসন কেন্দ্রায়িত করতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ?

৩৩। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্যকলাপে ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের কি ক্ষতি হয় আলোচনা কর।

৩৪। পাশ্চাত্য সংস্পর্শে ভারতে শিক্ষা ও সমাজজীবনে কি কি পরিবর্তন আসে তা আলোচনা কর।

৩৫। বাংলায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন কোন্ কোন্ মনীষী ? তাদের তিনজনের নাম কর এবং তাঁদের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৩৬। মহারাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে প্রধান অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় দাও।

৩৭। ফেরাজিদের লক্ষ্য কি ছিল ? তাঁদের কয়েকজন নায়কের নাম ও কার্যকলাপ উল্লেখ কর।

৩৮। তিতুমীর সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখ।

৩৯। কোলবিদ্রোহের মূল কারণ কি ছিল ? বিদ্রোহের নায়ক কে ছিলেন ? বিদ্রোহের ফলাফল বর্ণনা কর।

৪০। সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণ আলোচনা কর। সাঁওতাল বিদ্রোহের কয়েকজন নায়কের নাম লিখ। বিদ্রোহের ফল কি হয়েছিল ?

৪১। ১৮৫৭-র বিদ্রোহের কারণগুলি আলোচনা কর।

৪২। ১৮৫৭-র বিদ্রোহের কয়েকজন নায়কের পরিচয় দাও।

৪৩। দ্বৈতশাসন কে প্রবর্তন করেছিলেন ? দ্বৈতশাসন বলতে কি বোঝায় ? এই শাসন-ব্যবস্থার কুফল কি হয়েছিল ?

৪৪। প্রথম গভর্নর-জেনারেল কে ? তাঁর রাজস্ব ও বিচার-বিষয়ক সংস্কারগুলি আলোচনা কর।

৪৫। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোন খৃস্টাব্দে এবং কে প্রবর্তন করেন ? এই বন্দোবস্ত বলতে কি বোঝায় ?

৪৬। সংস্কারক রূপে উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৪৭। সতীদাহ প্রথা কোন্ গভর্নর-জেনারেল উচ্ছেদ করেছিলেন ? কোন্ ভারতীয় নেতা এই প্রথার অবসানে সহায়তা করেছিলেন ? বিধবাবিবাহ আইন কোন্ ব্রিটিশ শাসকের সময় প্রবর্তিত হয়েছিল ? বিধবাবিবাহ আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন ?

৪৮। উইলিয়াম কেরী এবং ডেভিড হেয়ার কেন প্রসিদ্ধ ?

৪৯। লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালের শিক্ষাসম্বন্ধীয় দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার নাম কর।

৫০। শিশুহত্যা প্রথা কে নিষিদ্ধ করেছিলেন? কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ কার শাসনকালে প্রতিষ্ঠিত হয়? সতীদাহ প্রথার অবসান কোন্ খৃষ্টাব্দে হয়েছিল? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

৫১। উনিশ শতকের নবজাগরণের কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।

৫২। রাজা রামমোহন রায়কে ভারতবর্ষে নবযুগের প্রবর্তক রূপে অভিহিত করার সপক্ষে তাঁর তিনটি উল্লেখযোগ্য কাজের আলোচনা কর।

৫৩। ব্রাহ্মসমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

৫৪। ডিরোজিও কে ছিলেন? তাঁর অনুগামী ছাত্ররা কি নামে পরিচিত হয়েছিলেন? তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে দুজনের নাম কর।

৫৫। নব্যবঙ্গ বলে কারা পরিচিত হয়েছিলেন? তাঁদের প্রগতিশীল ভূমিকার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর।

৫৬। রবীন্দ্রনাথের পিতা ও পিতামহের নাম কি? বাংলার নবজাগরণে তাঁর অবদান কি ছিল?

৫৭। প্রার্থনা-সমাজের নীতি ও আদর্শ কি ছিল। এই সমাজের একজন বিশিষ্ট নেতার নাম কর।

৫৮। আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে? এর মূলনীতি ও কর্মসূচীর আলোচনা কর।

৫৯। 'যত মত তত পথ'—এই বাণী কার? তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য কে?

৬০। 'দয়ার সাগর' নামে ইতিহাসে কে পরিচিত? শিক্ষাবিস্তারে তাঁর অবদান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৬১। আলিগড়ে অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? এই কলেজ প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা কর।

বিষয়মুখী প্রশ্নের অনুশীলনী [Objective Questions]

১। গঙ্গা ও সিন্ধুনদীর উৎসস্থল কোথায়?

৩। প্রাচীন ইতিহাসের একটি উপাদানের উল্লেখ কর।

৪। সিন্ধু সভ্যতা মূলতঃ কি সভ্যতা ছিল?

৫। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতা কোনটি?

৬। বৈদিক আরাধনার অন্তর্নিহিত মূল আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল একই ঈশ্বরের পূজা বা একেশ্বরবাদ।

৭। দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের উপায় সন্ধান করা কোন ধর্মের প্রধান লক্ষ্য?

৮। কুষাণ যুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন?

৯। ঐতিহাসিক স্মিথ কোন্ সম্রাটকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' আখ্যা দিয়েছেন?

১০। হিউয়েন-সাঙ কার রাজত্বকালে ভারতে এসেছিলেন?

১১। পাল রাজত্বের সূচনা করেছিলেন কে ?
১২। কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন কে ?
১৩। আঙ্কোরবট বিষ্ণুমন্দিরটি কোথায় অবস্থিত ?
১৪। শৈলেন্দ্রবংশের স্থাপত্যকীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কি ?
১৫। দাসবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা কে করেছিলেন ?
১৬। দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন কোন সুলতান ?
১৭। খানুয়ার যুদ্ধে বাবর কাকে পরাজিত করেন ?
১৮। তানসেন কোন সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন ?
১৯। জাহাঙ্গীর হলদিঘাটের যুদ্ধে কাকে পরাজিত করেন ?
২০। কোন সম্রাটের রাজত্বকাল থেকেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল ?
২১। কোন সম্রাটের দাক্ষিণাত্য নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী ?
২২। আফজল খাঁকে কে নিহত করেছিলেন ?
২৩। দশম শিখগুরু কে ছিলেন ?
২৪। অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি কে প্রবর্তন করেছিলেন।
২৫। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ কার শাসনকালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ?
২৬। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে প্রবর্তন করেছিলেন ?
২৭। ব্রাহ্ম সমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?
২৮। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে কে আন্দোলন করেছিলেন ?
২৯। আলিগড়ে অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ কে প্রতিষ্ঠা করেন ?
৩০। ভারতের প্রথম ভাইসরয় কে ছিলেন ?

(খ) কোন উত্তরটি সঠিক নির্দেশ করুন :

[উদাহরণ : প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈদেশিক আক্রমণের সূচনা করেন (ক) আলেকজান্দার (খ) কুজল কদফিস্ (গ) কাইরাস।
উত্তর : কাইরাস।]

১। আর্য সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উৎস হল : (ক) প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান (খ) রামায়ণ-মহাভারত (গ) বৈদিক সাহিত্য (ঘ) বৈদেশিক বিবরণ।
২। মগধ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন :
(ক) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (খ) বিন্দুসার (গ) অশোক (ঘ) বিম্বিসার।
৩। সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয় :
(ক) মৌর্য যুগকে (খ) কুষাণ যুগকে (গ) পাল যুগকে (ঘ) গুপ্ত যুগকে।

৪। বিক্রমশিলা মহাবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন :
(ক) দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ (খ) শীলভদ্র (গ) জ্ঞানভদ্র (ধ) বোধিসেন।

৫। ভারতে মুসলমান বিজয়ের সূচনা করেছিলেন :
(ক) বাবর (খ) আলাউদ্দীন খিলজী (গ) মহম্মদ বিন্ কাসিম (ঘ) কুতবউদ্দীন।

৬। কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' ও কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' রচিত হয়েছিল :
(ক) গুপ্তযুগে (খ) সেনযুগে (গ) সুলতানী যুগে (ঘ) মুঘল যুগে।

৭। "চৌথ" ও "সরদেশমুখী" ছিল :
(ক) দুজন রাজার নাম (খ) জায়গার নাম (গ) দুই প্রকার কর (ঘ) দুই শ্রেণীর সৈন্য।

৮। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন :
(ক) লর্ড ক্যানিং (খ) লর্ড ডালহৌসী (গ) লর্ড ওয়েলেসলি।

(গ) সময়ানুক্রমিকভাবে সংখ্যা নির্দিষ্ট কর :

[উদাহরণ : হুমায়ুন ২ ঔরঙ্গজেব ৬ জাহাঙ্গীর ৪
বাবর ১ আকবর ৩ শাহজাহান ৫]

১। কুষাণ যুগ
মৌর্য যুগ
হর্ষের রাজত্বকাল
গুপ্ত যুগ
পাল যুগ

২। মেগাস্থিনিস
আবুল ফজল
মহাবীর বর্ধমান
কালিদাস
দয়ানন্দ সরস্বতী

৩। আলাউদ্দীন খিলজী
ইব্রাহিম লোদী
মহম্মদ বিন্ তোগলক
ইলতুৎমিস

৪। দ্বিতীয় পানিপথ যুদ্ধ
বক্সারের যুদ্ধ
দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ
হলদিঘাটের যুদ্ধ

৫। বিধবা বিবাহ আন্দোলন
ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা
হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
সতীদাহ প্রথার অবসান

(ঘ) নিম্নলিখিত তারিখগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কি :

২৭৩ খৃঃ পূঃ ; ৬০৬ খৃস্টাব্দ ; ১৫২৬ ; ১৫৫৬ ; ১৭৫৭ : ১৭৬১ ; ১৭৬৪ ; ১৭৬৫ ; ১৭৯৩ ; ১৮৫৭।
